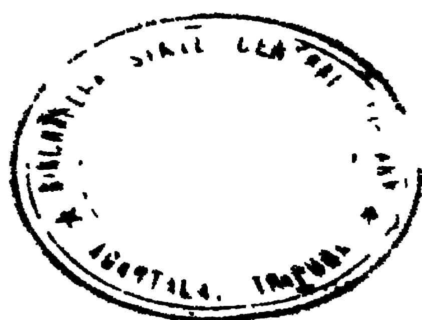
পুত্র পিতাকে

চাণক্য সেন

পুত্র পিতাকে

চাণক্য সেন



প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ : আগস্ট, ১৯৫৭

প্রকাশক :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রাকর :
শ্রীগোপাল চন্দ্র রায়
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট :
শ্রীমনোজ বিশ্বাস

আঠার টাকা

উৎসর্গ

জুন-কে

যার দেহ ও মনের রং শুভ্র

ভূমিকা

এ উপন্যাসের কিছু অংশ অধুনা-লুপ্ত "কালি ও কলমে" প্রকাশিত হ'য়েছিল। পাঠক-পাঠিকাদের অনেকে উপন্যাসটি অসমাপ্ত থাকায় দুঃখ প্রকাশ ক'রে চিঠি লিখেছিলেন। শেষ করতে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। এ উপন্যাসের মাধ্যমে বর্তমান পৃথিবীর যুব-মানসকে পিতাদের কাছে উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছি। দ্রুত পরিবর্তনের যুগে পিতারা পুত্রদের চিনতে পারছেন না, পুত্ররা পিতৃ-পরিচয় হারিয়ে ফেলছে। দুই স্রোতধারার পারস্পরিক পরিচয় করিয়ে দেবার দুঃসাহসে এ উপন্যাসের সৃষ্টি।

চাণক্য সেন

নিউ দিল্লী

বাবা, আজ আমার চব্বিশ বছর পূর্ণ হ'লো। গতকাল তোমার চিঠি পেয়েছি, চিঠি নয়, তোমার স্মারকলিপি, যা তুমি এক সপ্তাহ ধ'রে লিখেছিলে আজকের দিনকে স্মরণ রেখে, তাও ঠিক নয়, আজ থেকে চব্বিশ বছর আগের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে ছ'কুড়িচার বছর পরিক্রমণ, যাতে তুমি, আমার জনক, এবং আমি, তোমার পুত্র, এবং জীবন নামক বিস্ময়কর ধারাবাহিকতার আত্মপ্রকাশ, মিলে মিশে এক গভীর রহস্য জমাট হ'য়ে রয়েছে। জন্মদিনটা এমন বিশেষ কিছু দিন নয়, অন্যদিনের মতোই তার চেহারা, তাকে আলাদা ক'রে নি আমরা বাহুল্য অহমিকায়, সময়ের গতির মধ্যে ক্ষণিক যতি, কতগুলি মুহূর্তকে মুঠোর মধ্যে ধ'রে তাদের আয়না ক'রে নিজেকে নিজের বিকৃত স্বরে বলা: এই যে আমি, যে আসলে কেউ নই এবং সব কিছু, আমারও একটা আরম্ভ আছে, এই দিনে, এই ক্ষণে আমার শুরু অর্থাৎ আমি অন্তত একটুখানি একান্ত আমি, আমরা-তোমরা তাবার মধ্যে একেবারে নিঃশেষে বিলীন নই। আই দেখ না আমি আজ চারটি 'তার' পেয়েছি শুভেচ্ছা ও আজকের দিনের বহু পুনরাবৃত্তি কামনা জানিয়ে, পেয়েছি ছোট ছোট ক'টি উপহার, বন্ধুরা রাত্রে একত্র-আহার-আনন্দের নিমন্ত্রণ জানিয়েছে, এবং জোনাকি, যার আসল নাম জুন, আমার জন্যে পুরো একটা কার্ডিগান বুনে রেখেছে আর আমি এই সুদূর টরোন্টো শহরের হিউরন স্ট্রীটের বাড়িটায় আমার একক ঘরের বাসস্থানে ব'সে জানলার পানে তাকিয়ে দেখছি, বাইরে বরফ পড়ছে, গাছের ন্যাংটো ডালগুলি শাদা, রাস্তায় শাদা বরফের প্রলেপ লেগেছে, গাড়িগুলির বনেট গেছে ঢেকে, দেখছি, আর তোমার চিঠি, আমার চোখের সামনে পড়ার টেবিলে খোলা, আর তুমি, এবং মা, এবং অনেক দূরে থেকেও সর্বদা অনেক কাছের ভারতবর্ষ, তার সঙ্গে চব্বিশ বছরের অলিখিত ইতিহাস, কতো মানুষ, কতো শহর, দেশ, আকাশ আর সমুদ্র, কতো ঘটনা, কথা, অন্তত আওয়াজ, কতো চিন্তা-ভাবনা, অন্তত মস্তিষ্কের পরিশ্রম, এবং সবকিছু ছেপে কয়েকটি মুখ আমার চারপাশে ভিড় করেছে, তাদের সঙ্গে আমার মিতালি এবং শত্রুতা, কিন্তু, বড়ো কথা, তারা আমার, আমি তাদের, সঙ্গে গ্রথিত। ভিড় ভেদ ক'রে, সবাইকে, সর্বকিছুকে হ্রস্ব আর লঘু ক'রে, যে মানুষটি অসম্ভব বিরাটত্ব আর অনস্বীকার্য স্বচ্ছতা নিয়ে বার বার

আমার সামনে দাঁড়াচ্ছে, সমুদ্রের ঢেউ ভেদ ক'রে জাহাজ যেমন এসে দাঁড়ায় দৃষ্টিপথে, তাকে আমি চিনি, খুব চিনি, সে হচ্ছ তুমি, আমার পিতা।

তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে, বাবা, অনেক কথা।

পুত্র পিতাকে বলছে, বিশ্বের সব পুত্ররা, এবং পিতারা, শোনো, অমৃতের সন্তান নাই বা তোমরা হলে।

তুমি লিখেছ: "আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে এই দিনে তুমি জন্মেছিলে। সে ঘটনার গুরুত্ব আজও আমাকে সম্মোহিত করে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি অর্থপূর্ণ আজকের দিন। তুমি যেদিন জন্মেছিলে, আমার বয়স তখন মাত্র চব্বিশ হয়েছিল। আজ তোমার বয়স চব্বিশ হল। কেন জানি না এই অবধারিত ঘটনা আমার সমস্ত সত্তার ওপর একটা মোহের যাদু ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমি যেদিন চব্বিশ ছিলাম, তোমার সেদিন আরম্ভ, আজ তোমার চব্বিশে নতুন কোনও জীবন শুরু হয়নি, অতএব আমরা এখনও পিতা পুত্র সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। অথচ চব্বিশের আমি আর চব্বিশের তুমিতে কি ভীষণ প্রভেদ। আমার আটচল্লিশের সেই কথাবার্তার সঙ্গে তোমার চব্বিশের জীবনায়ন একবার মিলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। তুমি যদি বলো, আমি শুনতে উৎসুক।"

বাবা, ইতিহাসের পাতায়, অথবা সাহিত্যে, অথবা ধর্ম পুস্তকে, বলার স্বীকৃত অধিকার তোমাদের, আমাদের নয়। পিতা, পিতামহ, তোমরাই তো মহাকালের বাহন। কনফুসিয়াস থেকে মনু এবং মহম্মদ পর্যন্ত একটানা পিতৃবাদ। পুত্র ছিলেন একমাত্র যীশু কিন্তু তাঁকেও খৃষ্টানরা পিতামহ বানিয়ে রেখেছে। তোমাদের সভ্যতা-সমাজ নামক সেতুবন্ধনে কাঠবেড়ালির চেয়ে গুরুতর ভূমিকা আশা করা আমাদের বারণ। অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণমালায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশ্বের পিতৃকুলের তরফ থেকে হুংকার দিয়ে হুকুম করেছিলেন, সদা সত্য কথা বলিবে, তাই আমরা পুত্ররা মুখে কথা ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যে বলার কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছি, আজ, বাবা, তুমিও জান, আমিও জানি, যে কেবল সত্যি কথা বলে, সে বলে সামান্যই। স্কুলে লর্ড চেস্টারফিল্ডের পুত্রকে লেখা পত্র মুখস্থ করেছি, কলেজে পোলোনিয়াসের উপদেশ-অমৃত, তখন বেশ জানা হ'য়ে গেছে, পুত্রদের, অর্থাৎ আমাদের, আণ্ডারগ্রাউণ্ড লাইফে, লুকানো জীবনে, পিতাদের প্রবেশ নিষেধ, যেখানে আমরা সত্যিকারের আমরা, সেখানে তোমরা অনুপস্থিত। তোমাদের আর আমাদের মধ্যে 'অমুক'-কটি শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে প্রতিদিন, কথোপকথন হচ্ছে না একেবারেই। এবং তোমাদেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, তোমাদের পথে চলে আমরা আমাদের পুত্রদের সঙ্গে পারস্পরিক অজ্ঞাতবাসের সম্পর্ক তৈরি করছি অথবা করবো, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে

পারো। এমনি করেই চলে আসচে, চলছে, চলবে পিতৃ-নির্মিত মনুষ্য সমাজ পিতা-পুত্রের 'দুই বিপরীত পথে, রথে প্রতিরথে।'

চলে আসচে, যতোদূর দেখতে পাচ্ছি, সভ্যতার পত্তন থেকে। কনফুসিয়স নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'পুত্রের কর্তব্য পিতৃকুলকে মেনে চলা,' আমাদের শাস্ত্রকাররা পিতাকে স্বর্গ, ধর্ম, পরমতপ ঘোষণা ক'রে তোমাদের সাম্রাজ্য যে ইতিহাসের প্রাচীন কাল থেকেই আন্তর্জাতিক তার প্রমাণ রেখে গেছেন। উপনিষদের যুগ থেকে জবাহরলাল নেহেরুর যুগ পর্যন্ত আমরা আরুণি, আমরা শ্বেতকেতুঃ। তোমাদের নির্দিষ্ট পথে আমরা সৎ আর আত্মনের সন্ধান ক'রে এসেছি, যতদিন না বুঝতে পেরেছি আরুণির মতো তোমাদের পৃথিবীরও শেষ সীমান্ত কেবলমাত্র অকোমল গান্ধার, আর আমাদের পৃথিবীর সীমা অনিশ্চিত অন্ধকারে সুদূর প্রসারিত, তোমাদের চোখ থেকে গৃহীত আলো সে অন্ধকারকে বিদীর্ণ করতে অক্ষম। বাবা, জ্ঞানশলাকা দিয়ে পিতারা পুত্রদের অন্ধ ক'রে দিয়ে আসচে, পরের পংক্তিতে পুনরায় পিতারা পুত্রদের এবং পুনরায়, পুনরায়; তাই না আমরা সবাই, সব মানুষ সবখানে, সযত্নে লালন ক'রে আসছি আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টির অন্ধকার, পড়ে আছি 'ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নিয়ে এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে'।

মনে আছে, বাবা, আমার বয়স যখন বারো,—আজকের আমি কি তখন অর্ধেক ছিলাম?—স্কুলের মধ্যপথ সবে অতিক্রম করেছি, তোমাকে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম :

"আমার নাম শ্বেতকেতু রাখলে কেন?"

তুমি পাল্টা প্রশ্ন করেছিলে, 'খুব অপছন্দ বুঝি?'"

"বিশ্রী নাম। উচ্চারণ করতে দাঁত ভাঙ্গে। সবাই তো বলে 'কেতু'।"

"বলুক না!"

"নামটা বাছলে কোত্থেকে? বাছলে কেন?"

তুমি বলেছিলে "ছান্দোগ্য উপনিষৎ থেকে।"

এবং তুমি আরুণি শ্বেতকেতুর গল্প বলেছিলে। শুনে আমার দারুণ রাগ হয়েছিল

"গল্পটা কেমন?" তুমি জানতে চেয়েছিলে।

"বিশ্রী", বলতে দ্বিধা হয় নি আমার।

তুমি হেসে বলেছিলে, "বিশ্রী কেন?"

"বিশ্রী নয়? বারো বছর পরে শ্বেতকেতু বাড়ি এলো, বাবার সঙ্গে দেখা হতেই একগাদা বড়ো বড়ো কথা—সৎ, আত্মা, আরও কতো কি, আবার একগাদা শিক্ষা শুরু হল।"

তুমি খুব হেসেছিলে। তোমার হাসি আমাকে আরও রাগিয়ে দিয়েছিল।

বলেছিলাম, "তুমি কি চাইবে আমি শ্বেতকেতুর মতো সুশীল সুবোধ হবো? তোমার একান্ত বাধ্য? তুমি যা বলবে আমি তাই করবো?"

তুমি বলেছিলে, "না। তা চাইবো না।"

"কি চাইবে?"

"চাইবো তুমি নিজে বিচার বিবেচনা ক'রে যা করবে তার সঙ্গে আমাকে মানিয়ে নিতে।"

"আমি বিচার করবো কি ক'রে?"

"বুদ্ধি দিয়ে, তোমার নিজের মন দিয়ে।"

"কিন্তু, বাবা, আমার মন, আমার বুদ্ধি, তাও তো তোমরাই তৈরি ক'রে দিচ্ছ, তাই না?

তুমি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলে, আমার স্পষ্ট মনে আছে। কিছুক্ষণ আমরা নীরবে হেঁটেছিলাম, ইণ্ডিয়া গেটের সবুজ ঘাসের ওপর, নিঃশব্দ পা ফেলে।

তুমি হঠাৎ বলে উঠেছিলে, "কেতু, তোর কি সত্যি তাই মনে হচ্ছে?"

"কী মনে হচ্ছে, বাবা?"

"মনে হচ্ছে যে তোর মন, তোর বুদ্ধি, বিবেচনা আমরা, মানে আমি, তোর মা, তোর মাষ্টারমশাইরা, এবং আমাদের মতো আরও অনেকে অনবরত তৈরি করে দিচ্ছি?"

"তাই দিচ্ছ না কি বাবা?"

"যদি তাই তোর মনে হ'য়ে থাকে এখন থেকেই, এই বারো বছর বয়স থেকেই তাহলে যা বলছি ভালো ক'রে শুনে নে, আর কোনদিন বলবো কিনা কে জানে।"

তুমি আর আমি ঘাসের ওপর বসেছিলাম।

তুমি বলেছিলে, "বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবি তোকে বহুর সঙ্গে মিলিয়ে নেবার, স্বতন্ত্র হ'য়ে বাড়তে না দেবার, বিরাট এক ষড়যন্ত্র চারদিকে অনবরত কাজ করে যাচ্ছে। যে সব বই তোকে পড়তে হবে, যাদের কাছে পড়তে হবে, যে-সব নিয়ম বিধি কানুন সর্বদা তোকে মেনে চলতে হবে, তার সবটুকু মহাপ্রাচীন, এবং প্রবীনদের তৈরি। এ শুধু আমাদের দেশে নয়, সব দেশে, সব সমাজে, নতুনকে পুরাতনের ছাঁচে ফেলে চলতির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার ব্যাপক ব্যবস্থা মানুষ তৈরি ক'রে রেখেছে, প্রাচীন ও প্রবীণরা সর্বদা সতর্ক পাহারা দিচ্ছে যাতে নতুনের হাতে এ ব্যবস্থা তচনছ না হয়ে যায়। এরই মধ্যে, এ ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েও, প্রয়োজন হলে অ-মানতে-পারার নাম স্বাধীনতা। যেমন দেশ, জাতি, সমাজের পক্ষে, তেমনি ব্যক্তির পক্ষে। কোনও দেশেই, কোনও সমাজেই স্বতন্ত্র মানুষ, তাই, বেশি নেই।"

তোমার কথা শুনে আমি বলেছিলাম, "বড়ো হ'তে একটুও ভালো লাগে না, বাবা।"

তুমি বলেছিলে, "ছোট থাকতে তার চেয়েও খারাপ লাগবে, কেতু। দেখনা একটা বছর একটুও না বেড়ে।"

তোমাকে যদি প্রশ্ন করি, বাবা, তোমার কি বাচ্চা হ'তে ভালো লেগেছিল, কি উত্তর দেবে তুমি?

বলবে, মনে নেই।

যদি একটু মনে-করে সত্যি কথা বল, হয়তো বলবে বুঝতে পারি নি।

সব মানুষের সকল কালের অনুভূতি সমান নয়, এ কথা আমরা জানলেও মানতে চাই নে। তোমাদের জীবনে অনেক কিছু তোমরা অনুভব করো নি, যা আমরা করেছি, আবার কিছু কিছু অনুভূতি তোমাদের নিশ্চয় ছিল, যা আমাদের নেই, হয় নি।

তোমরা প্রায় সব কিছুকেই গ্রহণ ক'রে নেবার, মেনে নেবার নিরামিষ অনুভূতির মধ্য দিয়ে জীবনের বাড়ন্ত বছরগুলি কাটিয়েছ। প্রশ্ন করো নি, বর্জন করো নি, এসব তোমাদের শাস্ত্রে মানা ছিল।

আমরাই বোধহয় সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের প্রথম পুত্রকুল, যারা বিদেশী প্রভাবের ঘা খেয়েও, প্রশ্ন করতে শিখেছি, একটু-আধটু বর্জন করতেও। আমাদের মধ্যেও অধিকাংশ, আমি জানি, এখনও বাধ্য হ'য়ে বিনা প্রশ্নে অনেক কিছু গ্রহণ করে চলেছে। কিন্তু আমার মত, আমার থেকে আলাদা, কিছু কিছু পুত্ররা প্রশ্ন করতে পেরেছি, বর্জন করতেও।

তোমরা ও আমরা পিতাপুত্র হলেও বোধকরি দুই দুনিয়ার মানুষ।

তোমাদের চেয়ে আমাদের দুঃখ, ব্যথা বেশি। তোমরা বিনাপ্রশ্নে গ্রহণ ক'রে, বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়ে, 'শান্তি' পেয়েছ, 'সুখে' থেকেছ।

আমরা প্রশ্ন ক'রে না-মানতে-পেরে, প্রতিবাদে বর্জন করেও বেশিদূর যেতে পারিনি। কেন? শুধু এ জন্যে যে তোমাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধন সব কিছু সত্বেও, এখনও গভীর। আমরা তোমাদের মেনে নিতে পারি নে, তোমাদের ছাড়া আমাদের মন বিকল।

আমরা স্বাধীনতা, স্বকীয়তা স্বাতন্ত্র্য এসবের মূল্য বুঝি, এসব আয়ত্ত করতে চাই, কিন্তু পারি নে, কারণ আমরা সত্যিকারের স্বকীয়, স্বতন্ত্র নই। তোমরা আমাদের হ'তে দাও নি। হ'তে চাইবার মতো বলও নেই আমাদের।

যাদের মধ্যে আমার চার বছর কাটতে চলল তারা এই উত্তর আমেরিকার

ছেলেমেয়েরা। এদের আমি দেখেছি নিউ ইয়র্কে। দেখছি টরণ্টোয়। আলাপ-পরিচয়ের প্রথম তিন মিনিটের মধ্যেই এরা পরিষ্কার ঘোষণা করে: 'আমার বাপ হচ্ছে একটা হরিব্‌ল্ মানুষ। আই হেট্ হিম। অথবা, 'আমার মা……।' একবার কৌতূহলের সঙ্গে হিসেব করে দেখেছি দশটি ছেলে মেয়ের মধ্যে আটটি তাদের বাপ-মাকে শ্রদ্ধা করে না, ভালোবাসে না। এবং এ সংবাদ দশজনকে পরিবেষণে তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। এই একটা ক্ষেত্রে এসব দেশের ছেলেমেয়েরা সমানুভূতিতে আবদ্ধ। ইংরেজ পুত্র কন্যারাও তাই, তবে নর্থ আমেরিকানদের মতো এতো সহজে তারা মনের ভাব প্রকাশ করে না।

আর আমরা?

তোমরা পিতারা, শুনে আহত হবে, তবু বলছি, আমরা তোমাদের অনেকের মধ্যেই শ্রদ্ধা করবার মতো কিছু খুঁজে পাই নে। কেবল পিতা বলেই তোমরা শ্রদ্ধেয়, তোমাদের তুষ্টিতেই জগৎ তুষ্ট, তোমরা স্বর্গ অথবা ধর্ম, এসব বুজরুকী আমাদের কাছে অর্থহীন।

আমরা যখন নিজেদের মধ্যে তোমাদের নিয়ে আলোচনা করি, অদৃশ্যভাবে উপস্থিত থেকে তা শুনলে তোমরা মূর্ছা যাবে, অন্তত আমাদের ভরণপোষণের ব্যয় বহন করবে না।

তোমরা তোমাদের বাবাদের দেখতে না, জানতে না, চিনতে না। কেবল মানতে, ভক্তি করতে, ভয় করতে।

আমরা তোমাদের দেখি, জানি, চিনি। একেবারে না মেনে পারি নে, ভয়ও করি, কিন্তু শ্রদ্ধা প্রায় করি নে।

তোমরা বিশেষ একটা শ্রদ্ধার পাত্র নও, তাই।

কিন্তু আমরা এখনও উচ্চারিত শব্দে বলতে পারি নে, আই হেট ইউ। মনে মনে বলি। উচ্চারণ করতে পারি নে, এ কথাগুলির শব্দ আমাদের বুকেই দারুণ আঘাত দেয়।

অনুচ্চারিত অশ্রদ্ধা নিয়ে আমাদের রোজ চলতে হয়। আমরা তোমাদের তৈরি প্রায় কোনও কিছুকেই শ্রদ্ধা করি নে। কিন্তু ঘৃণা করার সাহস আমাদের নেই। আজও হয় নি। তাই বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট একটা অনুচ্চারিত গ্লানি আমাদের নিত্য সহচর হ'য়ে থাকে।

এ শাস্তি কি তোমাদের পেতে হ'য়েছিল, বাবা?

তোমার চিঠিখানা বার বার পড়ে আমার প্রায় মুখস্ত হ'য়ে গেছে। তুমি লিখেছ, "পুত্র হবার দায়িত্ব কি, আদৌ কিছু আছে কিনা, সে বিচার আজ আর আমার নয়।

আমি আজ আর পুত্র নই, পিতা। এককালে আমিও, আমিমাত্র পুত্র ছিলাম, [illegible] সেকাল অন্তকাল, তখন পুত্রের কর্তব্য জীবন-কিতাবে গোটা গোটা অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকতো, পিতার কর্তব্যও। যখন থেকে পিতৃত্বের অনুভূতি সত্যিকার পেতে শুরু করেছি, তুমি একটু একটু ক'রে বড়ো হবার সময় থেকে, তখন থেকেই একটা ভয় আমার অন্তরে দানা বেঁধে উঠেছে; বর্ষা আকাশে একখণ্ড কালো মেঘ যেমন ক্রমে ক্রমে বিরাট ব্যাপ্তি নেয়, এ ভয়ও তেমনি আমার স্নায়ুতে শিরাতে, রক্তপ্রবাহের সঙ্গে মিলে মিশে বেড়ে চলেছে। ভয়টা বার বার আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমায় প্রশ্ন করেছে: সন্তানকে হাতে তুলে দেবার মতো জীবনে কি অভিজ্ঞান তুমি সঞ্চয় করেছ? যাকে তুমি পৃথিবীতে এনেছ, যার কাছে তুমি বীরের চেয়েও বীর, যে তোমার মধ্য দিয়ে জীবনের রহস্যময় অন্ধকারে পথের সন্ধান করবে, বার বার তাকাবে তোমার মুখে পথের নিশানার জন্যে, তাকে দেবার মতো, পথ দেখাবার মতো কি সঞ্চয় তোমার আছে? তুমি তাকে খাইয়ে দাইয়ে বড় করবে, পোষাক পরিচ্ছদে সাজিয়ে গুজিয়ে সুশ্রী করবে, স্কুলে পাঠাবে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, তারপর তাকে জুতে দেবে চাকরী নামক সুপরিচিত ঘানিতে, তাকে বিয়ে দেবে, তোমার মত তাকেও পিতা হবার সাবেকী বন্দোবস্ত করে দেবে, তারপর অনিচ্ছায়, অদৃশ্যের বাধ্যবাধকতায় তিলে তিলে যাবে তার জীবন থেকে সরে, তোমার পাংশুটে দৃষ্টান্ত ধরে সেও তার পুত্রের প্রতি সাধন ক'রে যাবে ঐতিহাসিক ধারাবাহিক 'কর্তব্য', এই কি তোমার পিতৃত্বের আদি এবং অন্তিম স্বাক্ষর? এ সবের বাইরে, অনেক ওপরে, তার যে অন্য দাবী আছে, প্রশ্ন আছে, প্রাপ্য আছে, তার ইংগিত পর্যন্ত সে তোমাকে দিতে পারবে না, দিলেও তুমি বুঝবে না, জানবে না। তুমি টেরও পাবে না, তোমার পুত্র, বেঁচে থেকে বড়ো হবার প্রত্যেক সন্ধিক্ষণে, তোমাকে বলছে, 'তুমি আমার পিতা, আমার নায়ক, আমাকে দাও, দাও আমাকে জীবন থেকে কি তুমি আহরণ করেছ। একটু আলো, অন্তত একটু আলো আমাকে দাও।' সে আলো নেই খাদ্যে, বসনে, গৃহ-জমি-অর্থের উত্তরাধিকারে। তার চেয়েও বড়ো কিছু উত্তরাধিকারের জন্যে পুত্র তোমার কাছে হাত পাতছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, পেলেও তোমার দেবার কিছু নেই, তুমি আলোকের মালিক নও, নেই তোমার সঞ্চিত অভিজ্ঞান যা তুমি তার হাতে তুলে দিতে পার। সে অমৃতপ্রার্থী, তুমি কেবল তার হাতে পাথর তুলে দিতে পার, সে পাথরের নাম বেঁচে থাকা, যাকে ভুল ক'রে তুমি বল জীবন।"

বেশ একটু উচ্ছ্বাস ক'রে ফেলেছ, বাবা, উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি তোমাদের অভ্যেস, কিন্তু মোটামুটি তোমার কথাগুলি ঠিক। আমরা তোমাদের কাছে অমৃত চাই নে, অমৃত বলে কোনও পদার্থ নেই, আমাদের ঈশ্বর পর্যন্ত নিশ্চিত নশ্বর, অনেকের মতে

তার-নামের আগে ইতিমধ্যেই চন্দ্রবিন্দু স্থান করে নিয়েছে, অমৃতস্য পুত্রেরা যদি বা কোনও প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্থলচর ছিলেন, আজ তাঁরা নিতান্ত অনুপস্থিত। আমরা তোমাদের কাছে কি চাই জানো? সব চেয়ে বেশি, সব চেয়ে তীব্র কি আমাদের দাবী, মিনতি, কামনা, প্রার্থনা, অনুরোধ: যাই বলো না কেন?

সততা।

আমরা তোমাদের কাছে সততা চাই।

সবল সহানুভূতি চাই।

আনন্দ চাই।

তোমরা জানতেও চাও না, জানলেও মানবে না মোটেই, যে প্রায় আগাগোড়া তোমরা আমাদের সঙ্গে ছল চাতুরী করে যাও।

যখন থেকে আমরা বুঝতে শিখি, তখন থেকে আমরা যাতে বুঝতে না পারি, তার আয়োজনের প্রয়োজন তোমাদের পেয়ে বসে।

যখন থেকে আমাদের চোখ খুলতে আরম্ভ হয়, যখন থেকে আমরা যাতে দেখতে না পাই তার ব্যবস্থায় তোমরা মেতে ওঠ।

যখন থেকে আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয় প্রখর হয়ে ওঠে, আমরা যাতে না শুনতে পাই তার গুরুত্বে তোমরা গম্ভীর হ'য়ে পড়।

তোমরা আমাদের সরিয়ে দাও, দূরে রেখে দাও তোমাদের বড়দের দুনিয়ার বাইরে, কেননা সে নিষিদ্ধ দুনিয়া মিথ্যা অর্ধ মিথ্যা, চাতুরী-চালাকি, পারস্পরিক প্রবঞ্চনা প্রতারণার ধনদৌলত ভরা তোমাদের দুনিয়া আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে তোমরা কি চেষ্টাটাই না করো।

তোমরা ভেবেও দেখ না, পিতা হ'য়ে পুত্রকে প্রথম থেকেই তোমরা ঠকাতে শুরু করো।

তোমরা যা নও তাই বিশ্বাস করাতে চাও আমাদের। তোমাদের দুনিয়া যা নয় তাই বোঝাতে চাও আমাদের।

অথচ, বাবা, তোমরা জান না যে আমরা তোমাদের অনেক কিছু জেনে ফেলি, দেখে ফেলি, শুনে ফেলি, আমাদের হিসেবে গোড়া থেকেই গোলমাল হয়ে যায়, তোমরা যা বলো আর যা করো, যা উচিৎ বলে চেঁচাও আর যা অনায়াসে প্রতিপাদন করো, আমরা তার বিরাট ব্যবধান প্রথম থেকেই মিলিয়ে উঠতে পারি নে।

অতএব, আমরাও গোড়া থেকে তোমাদের ঠকাই।

তোমরা আমাদের শাসন করো। বকো, ধমক দাও, মারো। ভয় দেখাও। ভালোবাসো। সবকিছু মিলে যাতে তোমাদের মানি, কথা শুনে চলি, অবাধ্য না

হই, বশ্যতা স্বীকার করি, এককথায় সুবোধ সুশীল হই, তার ব্যবস্থা করো। তোমাদের রাজত্বে আমরা যাতে নিরুপদ্রব প্রজা হ'য়ে বাস করি তার ব্যবস্থা।

আমরাও তলে তলে অবাধ্যতার, অশ্রদ্ধার, না-মানার, সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করে নি।

তোমরা আমরা, পিতা-পুত্র, প্রথম থেকেই বেশ সুন্দর একটা মিথ্যা ও প্রতারণার পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ক'রে তাকে নানা রংএর রেশমী অসত্যে সাজিয়ে বাধ্যতার, বশ্যতার, মান্যতার, সুনীতির সুচারু অবয়ব প্রদান করি।

দিল্লীতে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মল্লিকের কথা মনে পড়ছে, বাবা। তোমার অনেক বন্ধুদের একজন। তিনি একদিকে উঁচু রাজপুরুষ, অন্যদিকে আদর্শ পিতা।

বড়ো ছেলে সিতাংশু কলেজে আমার এক বছরের সিনিয়র। আমি সবে বি. এ. ভর্তি হয়েছি। সিতাংশু সেকেণ্ড ইয়ারে।

একদিন মল্লিক কাকারা এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে সান্ধ্য-সন্দর্শনে। তোমরা বাবা-মারা বৈঠকখানায় গল্প করছিলে। সিতাংশু আর আমি পেছনের বারান্দার ছোট ঘরটাতে ঘন হ'য়ে ব'সে সংলাপ করছিলাম।

তোমাদের কথাবার্তা কিছু কিছু আমাদের কানে আসছিল।

মল্লিককাকা বলছিলেন, "কেতুকে আপনি আর্টস্ পড়তে দিলেন কেন?"

তুমি বলছিলে, "আমি দেবার কে? ওর যা ইচ্ছে হল তাই পড়ছে।'

মল্লিককাকা বলছিলেন, "এটুকু বয়সে ওরা কি ক'রে বুঝবে কি ভালো, কি মন্দ? ওদের ইচ্ছের কি কোনও দাম আছে, না অর্থ আছে?"

তুমি কেবল হেসে উঠেছিলে।

মল্লিককাকা বলছিলেন, "সিতাংশু আমাকে প্রশ্ন করল, কি নিয়ে পড়বো? আমি বললাম, ফিসিক্স। তাই হল।'

তুমি প্রশ্ন করেছিলে, "ওর ভালো লাগছে তো?"

মল্লিককাকা জবাব দিয়েছিলেন, "নিশ্চয়! হাই ফার্স্ট ক্লাস নম্বর পেয়েছে পার্ট ওয়ানে।"

তুমি বলেছিলে, 'ভেরী গুড।'

মল্লিককাকিমা বলেছিলেন, 'সিতু দারুণ বাধ্য ওর বাবার। স্কলারশিপের টাকাটাও বাবাকে দিয়ে দেয়।'

মা বলেছিল, 'তাই তো দেওয়া উচিত।'

মল্লিককাকিমা বলেছিলেন, 'নিজের তো কিছু খরচ নেই। চা, কফি, সিগারেট কিচ্ছু খায় না। ওসবের ধার দিয়ে যাবে না।'

আমি সিতাংশুকে বললাম, "এই, শালা, সিগারেটটা নিবিয়ে ফ্যাল্। শুনছিস না তোর মা কি বলছে।"

সিতাংশু বলেছিল, "বলতে দে।"

"তোর বাবা-মা জানে না তুই সিগারেট খাস ?"

"না।"

"রোজ কফি-হাউসে ব'সে জল খাস গ্লাসের পর গ্লাস ?"

"কফি-হাউসে যাই-ই না।"

"তাই নাকি ? ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাস রোজ, আর বাড়িতে বলিস যাই ই না ?"

সিতাংশু বলল. "ওরা যা শুনলে খুশি হবেন তাই বলে দি। আমার কোনও ক্ষতি তো হয় না।"

"পয়সা পাস কোথায় ?"

"মা দেয়।"

"কি কারণ দেখাস ?"

"অনেক। বই কিনতে হয়, খাতা-পত্র, ল্যাবে যন্ত্রপাতি ভাঙার ফাইন, লাইব্রেরীর ফাইন।"

"এতো মিথ্যে বলিস ?"

"ভীষণ মজা লাগে। ওরাও তো হরদম মিথ্যে বলেন।"

"একটা স্যাম্পল্ শোনা।"

"না থাক। গুরুজনদের নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই।"

ঠিক এমন সময় তুমি কি করেছিলে মনে আছে, বাবা ?

ডেকে উঠেছিলে, "কেতু !"

আমি ঘরে যেতে, বলে উঠলে "আমার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। তোর কাছে আছে, একটা দিতে পারিস ?"

আমি কি রকম থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম।

"তোরও নেই ?"

আমি বলেছিলাম, "চা-র-মি-না-র—"

"আমি জানি তুই চারমিনার খাস। তাই চাইছি একটা নিয়ে আয়।"

সিগারেট খাওয়াটা এমন কিছু বড়ো ব্যাপার নয়। মানে, যার খুসি সেই খায়। আমেরিকায় একদিকে সিগারেট বিক্রী বাড়াবার জন্যে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন করা হয়, অন্যদিকে জনসাধারণকে সাবধান করে দেওয়া হয়, সিগারেট খেলে ক্যানসার হবার ভয় আছে। টেলিভিশনে রোজ বোধ হয় সবশুদ্ধ

ঘণ্টাখানেক সিগারেট প্রচারের বিজ্ঞাপন থাকে, এক [redacted] থাকে সিগারেট পানের বিরুদ্ধে। এই হল একটি নমুনা জনকল্যাণ-গণতন্ত্রের।

আমাদের দেশে সংখ্যায় যারা অনেক বেশি সেই গ্রামের, শহরে বস্তির দরিদ্রদের মধ্যে সিগারেট বা বিড়ি নিয়ে মানুষে মানুষে মান নির্ণয় নেই। বাপের সামনে সাত বছরের ছেলে নির্বিবাদে বিড়ি খায়, একই হুকায় তামাক টানে।

মুস্কিল বাধে মধ্যবিত্তদের নিয়ে। এখানে, তথাকথিত ভদ্র সমাজে, 'ছোটদের' জীবনকে অসংখ্য 'না' দিয়ে ঘিরে রাখ তোমরা পিতা-মাতারা। তোমাদের সন্তান বুঝি দারুণ ঠুনকো, একান্ত ভঙ্গুর, তাই এমন সতর্ক পাহারায় বহু প্রহরী দিয়ে সর্বদা যাকে রক্ষা করতে হয়।

মনে পড়ছে, আমি বোধহয় তখন ক্লাস এইটে পড়ি, তুমি একদিন প্রশ্ন করেছিলে, "কেতু, তুই সিগারেট খেয়েছিস ?'

আমি বলেছিলাম, "না।"

"একটাও খেয়ে দেখিস নি ?"

"না।"

"ইচ্ছে হয় নি ?"

"না, গন্ধটা আমার ভালো লাগে না।"

"যদি ই'চ্ছে হয়, বলিস।"

"কেন ?"

তুমি একটু ভেবে বলেছিলে, "ছেলেরা লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খেতে শুরু করে। খানিকটা কৌতূহলে, অনেকটা স্রেফ 'বড়ো' হবার চেষ্টায়। বড়োরা মানা করে তাই লুকিয়ে অন্যায় করবার ইচ্ছে প্রবল হয়ে ওঠে। তুই যদি কখনও খেতে চাস, আমার কাছে চেয়ে নিস। অন্তত দোকান থেকে ভালো সিগারেট কিনে খাস। আর আমাকে বলিস, কেমন লাগল।"

আমি জানতে চেয়েছিলাম তুমি কত বছর বয়সে সিগারেট খেতে শুরু করেছিলে।

"অনেক বড়ো হয়ে। যখন বি. এ. পড়তাম, হস্টেলে আমার ঘরের দেওয়ালে নোটিশ লাগিয়ে রেখেছিলাম, 'এ ঘরে ধূমপান নিষেধ।' তারপর এম. এ. পড়বার সময় নিজেই খেতে শুরু করলাম। একদিন বিবেকানন্দ রোড আর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছি, চলন্ত ট্রাম থেকে লাফ মেরে পড়ল বাসুদেব চক্রবর্তী, যাকে ক্লাসের সবাই আমরা বলতাম 'গুরুদেব'। সোজা সামনে এসে চোখ কপালে তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী রে। তোর মুখে আগুন পড়ল কবে থেকে!' "

আমি প্রথম সিগারেট খেলাম কলেজে ভর্তি হবার দিন। নিজের ইচ্ছেয় নয়।

সেন্ট ষ্টিফেন্‌স্‌ কলেজের "র‍্যাগিং" এক ভীষণ ব্যাপার। আমাকে যারা প্রথম দিনেই "র‍্যাগিং" করেছিল, তাদের একজন সিগারেট কেস বার ক'রে একটা সিগারেট অফার করার সঙ্গে সঙ্গে আমি এমনভাবে গ্রহণ করেছিলাম যেন জন্ম থেকেই আমি ধূমপানে অভ্যস্ত। তাকে যদি বিন্দুমাত্র বুঝতে দিতাম সিগারেট আমি এর আগে কখনও খাই নি, ওরা আমাকে অন্তত এক প্যাকেট খাইয়ে ছাড়ত, আমার মাথা ঘুরে যেতো, বমি করে ফেলতাম। তাই এমন কায়দায় সিগারেট খেয়ে গেলাম, একজন প্রশ্ন করল, "কবে থেকে এ অভ্যেস, ইয়ার?" আমি 'শ্রাগ ক'রে জবাব দিলাম, যার মানে, বহুদিনের।

সন্ধ্যেবেলা তুমি পড়ার ঘরে কাজ করছিলে। তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে, প্রশ্ন করলে, "কেমন কাটল কলেজে প্রথম দিন?"

"দারুণ। সিগারেট খেলাম।"

তুমি বললে, "তাই নাকি? কেমন লাগল?"

"বিশ্রী।"

তুমি হাসলে। আমি তোমাকে ঘটনাটা বললাম।

"দ্বিতীয় বার খেতে অত খারাপ লাগবে না।"

"তুমি যেন আমায় সিগারেট খেতে উৎসাহ দিচ্ছ মনে হচ্চে।"

"মোটেই না। বরং আমার সন্দেহ নেই তোমার পক্ষে না খাওয়াই ভালো। যাদের সহজে সর্দি কাশি হয়, তাদের পক্ষে সিগারেট ভালো নয়।"

"তাহলে বলছ কেন দ্বিতীয় বার খেতে অত খারাপ লাগবে না।"

"সত্যি কথা বলছি। অন্তত আমি যা জানি তাই বলছি। খাবে কি না খাবে তুমি নিজে ঠিক করবে। আমি খাই, তোমাকে বারণ করলে তুমি শুনবে কেন? তবে আমি চাই নে তুমি লুকিয়ে খাও। লুকোবার প্রয়োজন নেই একটুও।"

"তোমার সামনে খেলে তুমি দুঃখ পাবে।"

"ভুল বললে। আমাকে লুকিয়ে খেলে বরং দুঃখ পাবো।"

"মা দুঃখ পাবে।"

"মাকে আমি বুঝিয়ে বলবো।"

"এখন আমার আর খাবার ইচ্ছে নেই।"

"বেশ তো।"

কিন্তু, বাবা, আমি তার পরের দিনই আবার খেয়েছিলাম, এবং তুমি ঠিকই বলেছিলে, প্রথম বারের মতো খারাপ লাগে নি। তোমাকে বলার মতো সাহস আমার হয় নি, বোধহয় মাকে আরও ভয় করেছিলাম। রোজ দুচারটে সিগারেট

খাওয়া আমার অভ্যেস হ'য়ে গিয়েছিল। তুমি জানতে না, মা-ও না, শুধু মিতু জানতো।

তারপরের ঘটনা আমার পরিষ্কার মনে পড়ছে।

মিতুকে নিয়ে মা গিয়েছিল কলকাতায়, দিল্লীর বাসায় তুমি আর আমি। প্রায়ই আমরা রাত্রির আহার বাইরে করছি। একদিন ইচ্ছে হল দক্ষিনী খাবার, তুমি আমাকে নিয়ে গেলে গ্রীণ পার্কের এক দক্ষিনী রেঁস্তোরায়। গ্রীষ্মকাল। আমরা বাইরে বসে দোসে-সম্বার বড়া খেয়ে গল্প করছি, তুমি একটার পর একটা সিগারেট খাচ্ছ, আর আমার দারুণ খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। হঠাৎ এমন সামান্য একটা ব্যাপার এতদিন তোমার কাছে লুকিয়ে রাখার জন্যে নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হল। হঠাৎ বলে ফেলাম, "বাবা, আমাকে একটা সিগারেট দেবে ?"

তুমি অবাক হলে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, কিন্তু চট ক'রে বিস্ময় চেপে বললে, "নিশ্চয়।"

তোমার হাত থেকে সিগারেট নিয়ে সেই আমি প্রথম খেলাম।

তোমাকে বলতে হল না কিছুই। তুমি বুঝলে।

তোমার আর আমার মধ্যে যে বন্ধুত্বের জোরে আজকের এই দীর্ঘ জবানবন্দী তোমাকে লিখছি, তার একটা মজবুত স্তম্ভ তৈরি হল সেদিনকার উত্তীর্ণ গ্রীষ্ম সন্ধ্যায়।

তুমি পিতা, আমি পুত্র, কিন্তু আমরা দুজনে এক নই, দুটি বিভিন্ন মানুষ। আমাদের মন আলাদা মনন আলাদা, জীবন আলাদা। এই সাধারণ সত্যটাকে মনে রাখলে অনেক গোলমাল মিটে যায়।

আমার সহপাঠী অজিতেশকে তোমার মনে আছে নিশ্চয়। নিউইয়র্ক থেকে গত সপ্তাহ শেষে বেড়াতে এসেছিল টরন্টোতে অজিতেশ। সঙ্গে এনেছিল ওর বাবার লেখা খানকয়েক চিঠি।

শ্রীযুক্ত প্রাণেশকুমার দত্ত লিখেছেন, "তুমি আজ শিক্ষা পাইয়া, বিদেশে গিয়া মনে করিয়াছ তুমি স্বাধীন, স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তোমার জীবনের সম্পূর্ণ অধিকার একমাত্র তোমারই। বুঝিতে পারিতেছ না এ বিশ্বাস কি ঘোরতর অসত্য এবং অন্যায়। তুমি আমার রক্তমাংসে গড়া, তুমি আমি এক, অন্য নহি। যে গভীর সূত্রে আমি আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের সঙ্গে সংযুক্ত, সে সূত্র তেমনই গভীর ভাবে তোমাকে আমার সহিত আবদ্ধ রাখিয়াছে। সীতাপুরের দত্তবংশের সন্তান তুমি, যে উত্তরাধিকার লইয়া জন্মাইয়াছ তাহা হইতে তোমার পরিত্রাণ নাই। আমি তোমাকে অন্ন, শিক্ষা, স্নেহ, সমাদর দিয়া মানুষ করিয়াছি, আমার প্রতি তোমার ততখানিই

কর্তব্য আছে যাহা ছিল মদীয় পিতৃদেবের প্রতি, পিতার ছিল পিতামহের প্রতি। মনুষ্য জন্ম একটা আকস্মিক ঘটনা নহে। প্রতি মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ শিশু জন্মাইতেছে। তুমি তোমার মাতার গর্ভে জন্ম লইয়া দত্ত পরিবারের পুত্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবে এই ঘটনার পশ্চাতে নিশ্চয় জন্মজন্মান্তরের অজ্ঞেয়, অলিখিত ইতিহাস রহিয়াছে। আজ বিদেশ ও বিদেশিনীদের সম্মোহনে তুমি তোমার উত্তরাধিকার ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হইতে পার, বিভ্রান্তিবশতঃ দুর্ভাগ্য পিতার বক্ষে শক্তিশেল হানিতে পার, কিন্তু একদিন তোমাকে পরিতপ্ত হৃদয়ে দত্ত পরিবারের দ্বারে ফিরিতেই হইবে, কেননা এই বিরাট বিশ্বে এই তোমার একমাত্র আপনার পীঠস্থান। সেদিন হয়ত আমি এবং তোমার দুর্ভাগিনী জননী জীবিত থাকিব না, কিন্তু আমাদের ব্যথিত আত্মা তোমার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় মর্ত্তলোকের এই গৌরবান্বিত প্রাচীন কোণটুকুতে বিচরণ করিবে।"

অজিতেশকে প্রশ্ন করলাম, "এ পত্রাঘাতের কারণ?"

অজিতেশ বলল, "তিনবছর দেশে যাই নি, লিখেছিলাম এবছরও যাচ্ছি না, ধরে নিয়েছে বোধহয় দেশে আর ফিরছি না।"

"ঘুরে আয় না একবার।"

"দুত্তোর। কি হবে গিয়ে?"

"সবার সঙ্গে দেখা হবে।"

"কাউকে দেখবার গরজ নেই।" একটু থেমে, "মাকে ছাড়া।"

"মাকেই না হয় দেখে আয়।"

"মা তো শুধু আমার মা নয়। বাবার স্ত্রী, দাদা দিদিদের মা, বৌদিদের শাশুড়ী, ভাইপো ভাইঝিদের"

"দেশে ফিরছিস না তুই?"

"কি জানি? ফিরে কি হবে?"

"এদেশে, মানে আমেরিকায় থেকেই বা কি হচ্ছে?"

"কিচ্ছু না। তবু বেঁচে আছি তো! কি করছি না করছি জবাবদিহি করতে হচ্ছে না।"

"করছিসটা কি?"

"ইচ্ছে হলে মদ খাচ্ছি। বান্ধবীদের সঙ্গে রাত কাটাচ্ছি। মেজাজ হলে 'পট' খাচ্ছি।"

"দেশে অবশ্যি এসব চলবে না।"

"চাকরী নামক আফিং খেতে হবে, স্ত্রী নামক বিষপান করতে হবে।"

"আফিং আর বিষ না হোক জীবন মানে যে চাকরী আর স্ত্রী তাতে সন্দেহ নেই।"

"অসহ্য।"

"তুই এদেশে এলি কেন?"

"মানে? দস্তুরমত কলম্বিয়ায় পি. এইচ ডি. করার ছাড়পত্র পেয়ে। ফেলোশিপ দিয়ে ডেকে আনে নি ওরা?"

'পি. এইচ-ডি করছিস তুই?"

"ছাড়ি নি তো?"

"তুই তো দেশে নক্সাল হ'য়ে গিয়েছিলি, না?"

"ঐ রকম একটা রোগে পড়েছিলাম। পড়তাম পাটনায়, হঠাৎ মনে হল গরীব চাষীরা বন্দুক না ধরলে অচলায়তন ভারতবর্ষ বদলাবে না। ভারতের মধ্যবিত্তেরা বিপ্লব করবে না কোনওদিন, করবে না শ্রমিকরা, তারা যে সর্বদা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক হবার তালে আছে। মনে হল, মুক্তির চাবি রয়েছে দরিদ্র চাষীর হাতে, শুধু তাকে বন্দুক ধরিয়ে গেরিলা ক'রে দিতে হবে।"

"এবং তাই তোমরা সব গ্রামের পথ ধরলে?"

"নিশ্চয়। মাও তুং-তাং করে চীনে যা ঘটাতে পারল, ভারতবর্ষেই বা তা ঘটবে না কেন?"

"উত্তর খুব সহজ। ভারতবর্ষ চীন নয়, এখানে মাও নেই, তুং তাংও নেই।"

"মনে হল, তুং তাং জ ধরাই করব। কিন্তু মুস্কিল বাধল কোথায় জানিস?"

"হৃদয়ে।"

"ভুল। ঐ বাবা যা লিখেছে সেই উত্তরাধিকারে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার পিতা শ্রীযুক্ত প্রাণেশ দত্ত, জমিদার। মনে পড়ে গেল কংগ্রেসী ভূমিসংস্কারের কৃপায় তিনি তাঁর উত্তরাধিকারের চৌদ্দশ বিঘা জমির এক ইঞ্চিও হাতছাড়া করেন নি, বাবা, ভাই, এমনকি যারা কোনও কালে কোনও দিন জন্মায় নি তাদের নামে কেবল ভাগ করে দিয়েছেন মাত্র। এবং ব্যারিষ্টর বন্ধু অর্ধেন্দু দস্তিদারের বুদ্ধির দৌলতে সরকার থেকে হাজার পঞ্চাশ টাকা ক্ষতিপূরণও আদায় ক'রে নিয়েছেন।"

"এ মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র চাষীর বিরুদ্ধে বন্দুক ধরলি?"

"বিহারে হাজারিবাগ জিলায় আমরা বেশ একটু কাজ করতে পেরেছিলাম। যে স্কোয়াডে আমি ছিলাম সেটা বেশ জঙ্গী হয়ে উঠছিল। গোটাকয়েক জোতদার আমাদের লক্ষ্য ছিল। তাদের একজনের বাড়ি আক্রমণের উদ্যোগ হচ্ছে এমন সময় এক রাত্রে আমার মনে ঝড় উঠল। মনে হল, যা করছি তা যদি দেশে

ছড়িয়ে পড়ে তাহলে সীতাপুরের দত্ত বংশের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এ বংশের সবটুকু প্রতিপত্তি, দাপট, ঐশ্বর্য দরিদ্র চাষীর বুকের রক্ত শোষণ ক'রে। চোখের সামনে দেখতে পেলাম শ্রেণীযুদ্ধে উন্মত্ত চাষীরা আমার বাবা মা ভাই বোনদের কচুকাটা করছে। আর কারুর জন্যে বিশেষ ব্যথা হল না। কেবল মা আর ছোটবোন বাণীকে ওরা কাটছে এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলাম না। পরের দিনই একটা শক্ত অজুহাত বানিয়ে পাটনা চলে এলাম। কলম্বিয়ার অফারটা মাস দুই আগে এসেছিল, গ্রহণের খবর দিয়ে তার করলাম। সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে চলে এলাম ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের তীর্থস্থানে।"

"হিন্দুশাস্ত্রে 'আত্মরক্ষার' চেয়ে বড়ো কাজ নেই। তুই যথার্থ হিন্দুর মতো কাজ করেছিস। পিতৃদেব নিশ্চয় পুলকিত হয়েছিলেন।"

"আসবার আগে বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বটে, কিন্তু, কথাবার্তা কিছু হয় নি।"

"এখানে এসে তো পড়াশোনায় বেশ মন দিয়েছিলি। হঠাৎ বিগড়ে গেলি কেন?"

"আমেরিকান বিপ্লবে জড়িয়ে পড়েছিলাম। কলম্বিয়ায় ছাত্ররা যেদিন কেমিষ্ট্রি বিলডিং দখল করল, আমিও ফিসিক্স্ ল্যাব থেকে বেরিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম।"

"তা কি আর আমি জানি নে? আমাদের ইংরেজী বিভাগের সেমিনার চলছিল। হঠাৎ খবর এল ছাত্ররা একের পর এক বিলডিং দখল করতে লেগেছে। রোজ-মেরী ওয়ালকট নামে একটা মেয়ে পেপার পড়ছিল। হঠাৎ পড়া বন্ধ করে চেঁচিয়ে উঠল, 'স্ক্রু দ' এস্‌টাব্লিসমেণ্ট, ফাক্ অল দ' ডীন্‌স্।' ক্লাস নিচ্ছিলেন বুড়ো অধ্যাপক ইউজিন ভ্যালেন্‌সী। বইপত্র তুলে নিয়ে সুড় সুড় সরে পড়লেন। অনেকে ছুটল কেমিষ্ট্রি বিলডিংএর দিকে। আমি চলে গেলাম ডর্মে। যদি জানতাম তুই আছিস, কেমিষ্ট্রিবিলডিং-এর অন্তত আশেপাশে একবার ঘুরে বেড়াতাম।"

সে অভিজ্ঞতা কখনও ভুলব না। আমরা পঞ্চাশ ষাট জন ছাত্রছাত্রী বিলডিং দখল করে বসে আছি। বাইরে য়ুনিভারসিটির সিকিউরিটি সশস্ত্র গার্ডরা জমা হয়েছে। জানলা টপকে আরও ছেলেমেয়েরা আসছে, কেউ আমাদের সঙ্গে দখল নেবে, কেউ বা শুধু তামাশা দেখতে। ক্যাম্পাসে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর ভিড়। আমাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলছে কর্মপন্থা নিয়ে, দেখা যাচ্ছে পথের বা মতের মিল নেই, প্রায় যতো ছাত্র ততো মত, ততো পথ। গুজব আসচে কর্তারা পুলিশ ডাকছে, শিগ্‌গিরই পুলিশ এসে আমাদের টেনে বার করবে, বাধা দিলে গোলাগুলি চলবে। ছাত্রছাত্রীরা কেউ বা

নাচছে, অনেকে দলবেঁধে জটলা করছে, সন্ধ্যা হ'তে কোথা থেকে রাশি রাশি খাবার চলে এল। আমরা সব পেট ভরে খেলাম, তারপর আবার বিতর্ক সভা বসল। এবার দেখা গেল আমাদের মধ্যে জন কুড়ি উগ্রপন্থী, বোধহয় এস-ডি-এসের মেম্বার, তারা কিছুতেই বিলডিং ছাড়তে রাজী নয়, পুলিশ এলেই তারা খুশি, তাহলে ঘটনা নাটকীয় হবে। জন দশেক পুলিশের সঙ্গে হামলা করার বিরুদ্ধে, তাদের ইচ্ছে প্রতিবাদ তো করাই হয়েছে, এবার কর্তৃপক্ষকে বলা হোক আপোশে আলোচনায় রাজী হলে বিলডিং ছেড়ে দেওয়া হবে। এমন সময় বাইরে দারুণ হৈচৈ, রাত তখন বোধহয় দশটা। আমরা সবাই জানলায় এসে দেখি জনা পঁচিশ নিগ্রো ছেলেমেয়ে হুড়মুড় ক'রে বিলডিং-এ ঢুকে পড়ল, তাদের কারুর কারুর কাছে রিভলবার। তারা এসে আমাদের বলল, তোমরা শাদারা বেরিয়ে যাও, এ বিলডিং আমরা দখল করব, তোমরা আসলে কাপুরুষ, পুলিশের ভয়ে পেচ্ছাব ক'রে দিচ্ছ, তোমাদের দিয়ে লড়াই হবে না। আমরা তো প্রথমে হতভম্ব, তারপর শুরু হল আবার তর্ক বিতর্ক, এস-ডি-এসের ছেলেরা শাদায়-কালোয় বিপ্লবী ঐক্যের ধ্বনি তুলল, কিন্তু কালোরা অটল, তাদের লড়াই তারাই লড়বে, শাদাদের সাহায্য তারা চায় না, বিশ্বাস করে না শাদাদের। তর্ক চলছে তুমুল, এমন সময় বাইরে থেকে আমার নাম-চিৎকার শুনতে পেয়ে আমি ভীষণ অবাক হলাম। কে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে 'অজিতেশ! অজিত! অজিতেশ! অজিত!' হঠাৎ মনে হল এ গলা আমি চিনি, অন্তত চিনতাম। জানলায় এসে চেঁচিয়ে বললাম, 'কে ডাকছ? এই তো আমি।' এবার বুঝলাম, কে—আমার বাবার বন্ধু পূর্ণেন্দু রায়, যিনি আমদানী-রপ্তানী ব্যবসা এবং অন্যায়ে কালোবাজারী ক'রে ধনী এবং যার সঙ্গে নিউ ইয়র্কে এসে একবার মাত্র আমার দেখা হয়েছিল। রায়কাকা বললেন, খাঁটি বাংলায়, তুই ওখানে কি করছিস? চলে আয়। আমি বললাম, 'আপনি খবর পেলেন কি ক'রে?' উত্তর এল, 'তোর বাবা তার করেছে তোর খবর নেই বহুদিন, কলম্বিয়ায় গোলমাল চলছে, ওরা খুব উদ্বিগ্ন। আমি খবর করতে গিয়ে শুনলাম তুই গুণ্ডাদের সঙ্গে বিলডিং দখল করে বসে আছিস। শিগগির নেমে আয়!' আমি বললাম, 'নামবো না, আপনি বাড়ী যান, এক্ষুনি হয়তো পুলিশ আসবে, গুলি চলতে পারে, বিপদে পড়বেন।' রায়কাকা বললেন, 'এমন অপদার্থ যে তুই হবি ভাবতেও পারিনি। যাদের দেশে পড়াশোনা করতে এসেছিস কোথায় তাদের মেনে চলবি, না তাদেরই পেছনে লেগেছিস। ডিপোর্ট ক'রে দেবে দেখবি এক মাসের মধ্যে।' আমি বললাম, 'আপনি চলে যান, পুলিশ এলে বিপদে পড়বেন।' রায়কাকা বললেন, 'পুলিশ আসতে দেরী আছে, আজ রাত্রে আসবে না, মেয়র লিন্ডসে তোদের প্রেসিডেন্টকে বলেছেন তিনি চান না পুলিশে-ছাত্রে

সংঘর্ষ হোক'। তুই চলে আয়।' এবার আমার রাগ হল। বললাম, 'আপনি এখানে দাঁড়িয়ে এমন করে চেঁচাবেন না। আমি নামবো না। আপনি এবার যেতে পারেন। রায়কাকা বললেন, 'তোর বাবাকে কি লিখবো?' আমি বললাম, 'আপনার যা খুশি।'

"পরের দিন সকালে তো তোরা বিলডিং ছেড়ে দিলি!"

"রাত্রে ঠিক হল, কালোদের দখলে কেমিষ্ট্রি বিলডিং ছেড়ে দিয়ে আমরা 'লো' বিলডিং দখল করবো, যেখানে প্রেসিডেন্ট কোরডিয়ের এবং তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গদের আপিস।"

"তুই তো 'লো' বিলডিং দখল করতে যাস নি?"

"না। কেমিষ্ট্রি বিলডিং থেকে সোজা আমার এ্যাপার্টমেন্টে চলে যাই। গিয়ে দেখি বারবারা বসে আছে। সারারাত আমার জন্যে অপেক্ষা করেছে বেচারী। ওর সঙ্গে শুতে বসতে দিনটা কেটে গেল। 'লো' বিলডিং দখল করা আমার আর হল না।"

"বাজে কথা বলছিস। হল না সত্যি কি হল? সরে পড়লি কেন?"

"দুটো কারণে। মনে হল, শাদা-কালোর সংঘাতে আমার স্থান নেই। আমার মন আমাকে টানছে কালোদের দিকে। কিন্তু আমেরিকায় কালোদের সংগ্রাম আমি বিপ্লবী সংগ্রাম বলে গ্রহণ করতে পারি নে। ওরা শাদাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়তে চায় না। ওরা শ্রেণী সংগ্রামের পথ এড়িয়ে চলতে চায়। অন্তত কলম্বিয়ার কালোরা। আরও একটা কারণ আছে। পুরো একটা দিন ওদের সঙ্গে কাটিয়ে মনে হল, আমি ওদের একজন নই, আলাদা, অন্য কেউ। দেশের সংগ্রাম থেকে পালিয়ে এসে এদের সঙ্গে একটা বিরাট তামাশায় ভিড়ে যাওয়াটা হাস্যকর মনে হল।"

"অতএব বারবারাকে নিয়ে শুলি, বসলি।"

"ভাগ্যিস এদেশে এই মেয়েগুলি ছিল। ভাগ্যিস সস্তা বীয়র আর মদ ছিল! নইলে বেঁচে থাকা অসম্ভব হ'য়ে উঠত।"

"পড়াশোনা ছাড়লি কেন?"

"কি হবে পি-এইচ-ডি ক'রে?"

"না ক'রেই বা কি হবে?"

"অন্তত রোজ মাষ্টারগুলির মুখ দেখতে হবে না। শালার কটনকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। পনের বছর ধরে পেন্টাগনের টাকায় রিসার্চ ক'রে আসছে, মিলিটারীর কাছে ওর আত্মা পর্যন্ত বাধা। ওর ছাত্র হ'য়ে পি-এইচ-ডি পাওয়ার চেয়ে অসম্মান কিছু ভাবতে পারিস?"

"কটা সায়ান্টিস্ট আছে আমেরিকায় যারা মিলিটারীর জন্যে কাজ করে নি, করছে না?"

"বেশি নেই। শুধু সায়ান্টিস্ট কেন, সোস্যাল সায়ান্সেরও তো একই অবস্থা।"

"সাহিত্য এ পাপ থেকে মুক্ত, কি বলিস।"

"রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির পণ্ডিতরা একসঙ্গে রাজশক্তির সেবায় নিযুক্ত। সাহিত্যিকরাও প্রতিবাদ প্রতিরোধের পথ ত্যাগ করেছে। সেক্স, মার্ডার, ভায়োলেন্স, এ্যালিয়েনেশন: এই তো এ যুগের সাহিত্যের মাল মশলা। এর মধ্যে নতুন সমাজের ইংগিত কোথায়?"

"তুই তাহলে করবিটা কি? দেশ থেকে পালিয়ে এলি নিজের শরীরে কুলাক রক্ত আবিষ্কার করে; এখানে এসেও পড়াশোনা ছেড়ে দিলি! তারপর?"

"তারপর যাহা, ইতিহাস তাহা লেখে নাই কোনও কালে।"

"বারবারার খবর কি?"

"জানিনা।"

"মানে?"

"ছ'মাস বন্ধুত্বের পরেই বিয়ে করতে চায়! মেয়ে তো নয়, ডাইনী!"

"তা তো চাইবেই! তোর মতো সুপাত্র!"

"বলে কিনা, চাকরী নেই তো কি হয়েছে? আমি তো চাকরী করছি?"

"একেই তো এককালে বলতো রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব!"

"কাজ নেই আমার অত সুখে! বিয়ে মানেই পি. এইচ. ডি, তারপর চাকরী, তারপর গাড়ী, বাড়ী, ছেলে-পুলে, ব্যাংকে টাকা জমান, অর্থাৎ দত্ত বংশের ছেলে হ'য়ে বেঁচে থাকা। আমি ওর মধ্যে নেই।"

"তুই দত্ত বংশের ছেলে নোস?"

"প্রাণেশ দত্ত তদীয় স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম ক'রে অন্যমনস্ক ভাবে একটি জীবনের সৃষ্টি করেছিল। নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশত: সে জীবনটি হ'য়ে দাঁড়ালাম আমি। আমার জীবনের প্রথম কর্তব্য এ দুর্ঘটনার প্রায়শ্চিত্ত করা। আমি আর যাই হই দত্ত বাড়ীর ছেলে নই। আমি কারুর পুত্র নই, জানিস? আমার পিতা নেই।"

একটু থেমে অজিতেশ আবার বলল, "শুধু আমি কেন? আমরা কেউ কারুর পুত্র নেই। আমাদের কারুর পিতা নেই।

"আমরা ভারতবর্ষের প্রথম বৃন্তচ্যুত যুবকের দল। তুই মানিস আর না মানিস, অনেকে এ দুর্ঘটনার খবরই রাখে না, অনেকে এক আধটু বোঝে, আর তক্ষুনি বুদ্ধিকে ধামাচাপা দেয়, কিন্তু আমি যা বলছি তা সত্যি, আমাদের পিতা নেই, আমরা পিতৃহীন নই, জারজ নই, পিতৃচ্যুত। তুই মানিস কি না মানিস......"

জর্জ অরওয়েল ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী সমাজে অমরত্ব লাভ করেছে সাম্যবাদী সমাজের বিকৃত মূল্যায়নের হৃদয়গ্রাহী আক্ষরিক পট এঁকে ; আমি যখন নিউ দিল্লীর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মিশনারী স্কুলে নবম শ্রেণীর ছাত্র, তখন আমাকে "এ্যানিমেল ফার্ম" পড়তে হয়েছিল আইরিশ ব্রাদারদের তদারকে। আমার মনে আছে, স্কুল থেকে নতুন পাঠ্য বই নিয়ে বাড়ী এলে তুমি বইগুলি নেড়ে নেড়ে দেখবার সময় "এ্যানিমেল ফার্ম" দেখে আঁতকে উঠেছিলে। বলেছিলে, "এই বই তোদের পড়তে দিয়েছে, কেতু !"

আমি বলেছিলাম "শুধু পড়তে নয়, বাবা, ব্রাদার ও'কনর বললেন, এটা আগা-গোড়া মুখস্থ ক'রে ফেলতে হবে।"

তুমি বলেছিলে, "কি সর্বনাশ ! তোদের এমনি ভাবে ব্রেন-ওয়াশ করবে ?"

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, "ব্রেন-ওয়াশ মানে কি ?"

তুমি জবাব দিয়েছিলে, "শূন্য মাথায় বাছাই-করা চিন্তা-ভাবনা ভ'রে দেওয়া।"

আমার অবাক লেগেছিল।

"তাতে সর্বনাশের কি দেখলে ? তোমরা সবাই তো আমাদের শূন্য মাথা বাছাই-করা চিন্তাভাবনায় ভ'রে দিচ্ছ।"

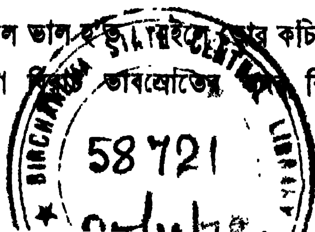
"তা দিচ্ছি। দেখতে হবে, বাছাই করছে কে ? করছে কেন ?"

"এ্যানিমেল ফার্ম বইটে ভাল নয় ?"

"চমৎকার বই। দারুণ মজার। খুব ভালো লেখা। কিন্তু এটা শুধু পশুদের গল্প নয়। পশুদের প্রতীক ক'রে কম্যুনিজম্ নিয়ে একটা চমৎকার প্রহসন।"

"মানে, যা বলছে তা সত্যি নয় !"

"আমি কি ক'রে জানবো, সত্যি কিনা ? আমি তো সাম্যবাদী সমাজে বাস করি নি। জর্জ অরওয়েলও করে নি। তবু সে এমন একটা বই লিখেছে যা পড়ে ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েরা সাম্যবাদী সমাজ সম্বন্ধে বিরূপ ভাব পোষণ করে। মানে, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যে আন্তর্জাতিক লড়াই, তার বেশ চোস্ত একটি হাতিয়ার এই ছোট্ট বইখানা। এ বই তোকে পড়তেই হবে, কিন্তু তার সঙ্গে কম্যুনিজম-এর সপক্ষে দুএকটা বই পড়ে নিলে ভাল হয়। তাহ'লে তোর কাচা মনে হয়তো আগে থেকেই বর্তমান পৃথিবীর একটা বিরাট ভাবস্রোতের প্রতি বিরাগ জন্মে যাবে।"



"স্কুলে তো আমাদের বাইবেলও পড়তে হয়।"

তুমি একটা গল্প বলেছিলে। "স্কুলে বাইবেল ক্লাস বসেছে। মাস্টারমশাই একটি মেয়েকে প্রশ্ন করেছেন, 'মেরী, তুমি বাইবেল দেখেছ?' মেরী দশ বছরের চটপটে মেয়ে, বলল, 'নিশ্চয় দেখেছি স্যার।' 'পড়েছ?' 'নিশ্চয়।' বাইবেলে কি আছে বলতে পারো?' 'খুব পারি!' 'বলো তো।' 'বাইবেলের মধ্যে কি আছে, বলবো স্যার? আছে, মার চুলের কাঁটা, দাদার লেখা তিনটে চিঠি, বাবার চশমার খাপ, আর আমার চ্যুইংগাম।"

আমি দারুণ হেসেছিলাম গল্পটা শুনে। বলেছিলাম, "ছোট্টবেলায় দেখেছি আম্মার শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যে তামাকের গুড়োর কৌটা থাকতো।"

তুমি আমাকে সুকুমার রায়ের হ-য-ব-র-ল কিনে দিয়ে বলেছিলে, জর্জ অরওয়েল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটাও পড়িস।

"এটাও কি ব্রেন-ওয়াশ, বাবা?" প্রশ্ন করেছিলাম; তুমি জবাবে বলেছিলে "এ্যানিমেল ফার্ম পড়ে তোর মাথায় যা ঢুকবে, এইটেতে তা ওয়াশ হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা।"

'সুকুমার রায় কি ক্যাপিটালিজ্ম্ নিয়ে লিখেছে?"

"হয়তো লিখেছে, হয়তো লেখে নি। মুস্কিল কি জানিস? এ্যানিমেল ফার্মের পাল্টা বই আমার জানা নেই। লুই ক্যারলের 'এ্যালিস' হয়তো আছে, কিন্তু এ্যালিসের ব্যঙ্গ সব সমাজ ব্যবস্থাকে নিয়ে। জর্জ অরওয়েলের রসিকতার মধ্যে একটা সর্বনাশের আতংক আছে, তার প্রকৃত চেহারা দেখবি। কিন্তু মজার কথা হল, কোন সমাজে ঘটবে আজ আর তা কেউ জোর বিশ্বাসে বলতে পারে না। যে অন্ধকারের চেহারা অরওয়েল সাম্যবাদী সমাজে দেখতে পেয়েছিল, আজ গণতান্ত্রিক সমাজেও তার কালো ছায়া নেমেছে।"

তোমার কথা সেদিন, অত ছোট বয়সে, বুঝতে পারি নি। আজ আমার চব্বিশ বছর পূর্ণ হল, এর মধ্যে আমি পৃথিবীর বেশ কিছু বিভিন্ন সমাজ তো দেখলাম, দেখলাম অনেক দেশের অনেক বর্ণের, অনেক ভাষার পিতামহদের, পিতাদের, পুত্রদের, এবং তাদের স্ত্রীলিংগদের—মাতামহ, মাতা, কন্যা। পৃথিবী ছোট হ'য়ে গেছে, বিজ্ঞান ভৌগোলিক দূরত্বকে ইতিহাসের পুরাণ পৃষ্ঠায় দিয়েছে নির্বাসন। আজ আর কোনও দেশ বা সমাজ নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকতে পারছে না, সারা বিশ্বের ঝড়-ঝাপটা লাগছে তার বুকে, মুখে, মনে। এক অর্থে আমরা সত্যি 'ওয়ান ওয়ার্লডে' বাস করছি। অথচ অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে মানুষে মানুষে ব্যবধান বেড়েছে, নতুন পরিচয়ের, সামান্য জ্ঞানের ব্যবধান অপরিচয় অজ্ঞানতার

ব্যবধানের চেয়ে বড়ো বই কি? যখন পৃথিবী 'অনেক' ছিল, 'এক' হয় নি, তখন দেশে দেশে, মানুষে মানুষে অচেনা-অপরিচয়ের রোমান্স ছিল, আজ আর তা নেই। আধুনিক প্রচার যন্ত্র পৃথিবীকে 'এক' করতে গিয়ে 'অনেক' করেছে, আজ কতো সহজে এক দেশের মানুষকে অন্যদেশ সম্বন্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা যায়, প্রচারের আলোয় এক দেশের জন-হৃদয়কে অন্য দেশ সম্বন্ধে অন্ধকার ক'রে রাখা যায়। আমার তো মাঝে মাঝে পৃথিবীর কথা ভেবে সাংঘাতিক হাসি পায়। মনে পড়ে সুকুমার রায়ের কথা: "পৃথিবীটা যদি চ্যাপ্টা হত, আর সব জল গড়িয়ে ডাঙায় এসে পড়ত, আর ডাঙার মাটি সব ঘুলিয়ে প্যাচ্-প্যাচ্ কাদা হ'য়ে যেত, আর লোকগুলো সব তার মধ্যে ধপাধপ আছাড় খেয়ে পড়ত……।" তাই কি শেষ পর্যন্ত হ'তে বসেনি, বাবা?

পৃথিবীর সব দেশেই কি সব রাস্তা কাদা প্যাচ প্যাচ হ'য়ে যায় নি? সোজা পথে, শক্ত পথে স্থির পদে কেউ কি চলতে পারছে?

সবাই কি আমরা অনবরত আছাড় খাচ্ছি না? তোমরা, আমরা? পিতাগণ, পুত্ররা?

ভাবতে মজা লাগে তুমি আমাকে কচি বয়সে অরওয়েলের 'এ্যানিমেল ফার্ম' পড়তে দেখে ভয় পেয়েছিলে। ভেবেছিলে, সাম্যবাদী সমাজ সম্বন্ধে আমি বীতরাগ হবো। অথচ তুমি তো সাম্যবাদী নও। তুমি লিবারেল ডেমোক্রাট —উদারপন্থী গণতান্ত্রিক, অর্থাৎ তুমি খোলা মনে নিজের পথে চলতে চাও। কিন্তু, বাবা, খোলা মন আর নিজের পথ দুটোর একটাও কি এ পৃথিবীতে আছে? বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব, জাতীয়তাবাদ এই তিন মেঘ কি আমাদের সবাকার মন আচ্ছন্ন ক'রে দেয় নি? তোমার উদার পন্থা সত্যিকারের কতটুকু উদার? আমার মন আসলে কতটুকু খোলা? তোমার পথ, আমার পথ, যারা আমার এ পত্র পাঠ করছে তাদের পথ কতোটুকু নিজের বেছে নেওয়ার পথ, বলতে পারো?

আমি যেদিন জন্মেছিলাম আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে, তার দুদিন আগে দারুণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়েছিল।

আমার মা আসন্ন-প্রসবা, পেটের মধ্যে আমি অস্থির হ'য়ে উঠেছি, বেরিয়ে আসার জন্যে অধৈর্য, তুমি নতুন এবং প্রথম বাবা হবার শংকিত উত্তেজনা নিয়েই নাগপুরের নিউ কলোনীতে আমাদের বাংলোবাড়ী তোমার সহকর্মী ও বন্ধুদের সাহায্যে রঙিন কাগজ আর আলোয় সাজাতে লেগেছিলে স্বাধীনতার জন্মদিনকে সুস্বাগত করতে।

বাড়ীর সামনে যে পোর্টিকো ছিল, টাইল দিয়ে তৈরী তার ছাদ, তার ওপরে উঠে আলোর মালা তৈরি করতে গিয়ে সেটা হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়েছিল, আর তুমি বলে উঠেছিলে, 'দেশ দুটুকরো-করে-স্বাধীনতা নিয়ে মহোৎসব করা ভগবানের ইচ্ছে নয়, বুঝলে ? আলোর মালা স্বরাজ-দেবতার গলায় আর উঠল না।'

এ গল্প আমি অনেকবার শুনেছি।

স্বাধীনতা আসবার আগে হিন্দু মুসলমানে হানাহানিতে বহুলোকের প্রাণ গিয়েছিল। বহু অতি সাধারণ লোক—যারা গরীব, অথবা মধ্যবিত্ত, অথবা যাদের ভাবাবেগ এতো বেশি যে প্রাণ বাঁচিয়ে চলবার মতো চাতুর্য তাদের জানা নেই। তারা নেতা নয়; শাসক নয়, নেতা এবং শাসকরা কখনও প্রাণ দেয় না। তারা বেঁচে থাকবার কায়দা-কানুন ষোল আনা জানে, তারা না বাঁচলে শাসন করবে কে ? অতএব তাদের শাসন সম্ভব করার জন্যে অনেক সাধারণ মানুষকে মরতে হয়, তিলে তিলে কিংবা একবারে।

আমি মিতু বড়ো হ'তে হ'তে শিখে গিয়েছিলাম, মুসলমানরা মানুষ নয়, পশুর চেয়ে অধম, তারা কেবল হিন্দুদের মারে আর কাটে, তারা বর্গী, দস্যু, দুষমন। তুমি শেখাও নি, মা-ও না, শিখিয়েছিলে তোমরা সবাই মিলে—তোমাদের মধ্যে কথাবার্তায়, আলাপ আলোচনায় মুসলমানদের এই পরিচয়টাই আমাদের মনে ছাপ রেখেছিল। তারপর, নীরুপিসি, যে রান্না করতো আর আমাদের গল্প শোনাত। সেই নীরুপিসি রক্ত মাংস লাগিয়ে সে ছাপটাকে একটা বিরাট কিছুতে পরিণত করেছিল। নীরুপিসি পূর্ববঙ্গের পলাতক নির্বান্ধব উদ্বাস্তু, মুসলমানদের অত্যাচারের কাহিনী তার মুখে শেষ হ'ত না।

মনে আছে, আমি ভীষণ ধাক্কা খেয়েছিলাম যখন বাড়ীতে প্রথম মুসলমান এল। তোমার বন্ধু আমানুল্লাহ্, কাদের :

'তার' পেয়ে তুমি তো ভীষণ খুশি। মাকে বললে, 'আমানুল্লাহ্ আসচে, দুদিন থাকবে, অতিথি-ঘরটা ঠিক করে রেখো।'

মা বলল, 'আমানুল্লাহ্ কে ?'

তুমি বললে, 'বাঃ, মনে নেই ? কলকাতা স্টেটস্ম্যানে একসঙ্গে কাজ করেছি ! ও চলে যাবে পাকিস্তান, যাবার পথে আমার সঙ্গে দুদিন কাটিয়ে যাবে। এখানে আত্মীয়ও আছে কয়েকজন।'

মাকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'কে আসচে ? আমাদের কাকা বুঝি ?'

মা বলেছিল, 'বাবার এক মুসলমান বন্ধু।'

মিতুর কি হয়েছিল জানিনা, তখন তো ও খুবই ছোট, আমি বিস্ময়ে আতঙ্কে

জমাট হ'য়ে গিয়েছিলাম। মুসলমান আসছে? মুসলমান আবার বাবার বন্ধু হয় কি করে? সে আসচে নিশ্চয় বাবাকে কাটতে, মারতে, বাবাকে, মাকে আমাদের সবাইকে। আমরা তো হিন্দু! বাবার গলায় পৈতে নেই, মা বাড়ীতে পূজা করে না, লক্ষ্মীর পূজাও না, তবু জন্ম থেকে জানি, মৃত্যুর পরেও জানব আমরা, আমি, হিন্দু। মুসলমান কি ক'রে আসবে হিন্দুর বাড়ীতে বন্ধু হ'য়ে?

মাকে জড়িয়ে ধ'রে তাই আমি দারুণ কেঁদেছিলাম। তোমাদের বাঁচাবার ব্যাকুলতায় কেঁদে বাড়ী মাৎ করেছিলাম।

মা অনেক বুঝিয়েছিল, 'সব মুসলমান সমান নয়। ভালোও আছে, খারাপও। দেখতে পাবে আমানুল্লাহ্, খুব ভালো লোক। তোমাদের সঙ্গে খেলবে।'

আমার কান্না থামে নি। শেষ পর্যন্ত মা রেগে গিয়ে মেরেছিল আমায়। মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

রাত্রিতে মা তোমাকে ঘটনাটা বলেছিল। তুমি রেগেছিলে নীরুপিসির ওপর। পরের দিন সকালে আমাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলে, 'কেতু, তুমি আমানুল্লাহ্ আসবে শুনে ভয় পেয়েছ?'

আমি চোখ বড় ক'রে ভয়ে ভয়ে ঘাড় নেড়ে জবাব দিয়েছিলাম, পেয়েছি।

তুমি অনেক কিছু বলেছিলে, যার অর্থ আমি বুঝি নি, আমার কানে নীরুপিসির ধ্বনি: 'হিন্দুরা মুসলমানদের বাড়ীতে ডেকে আশ্রয় দিয়েছে, আর মুসলমান কেবল হিন্দুদের কেটে টুকরো টুকরো করেছে।' আমি কেবল ভাবছি, কি ক'রে তোমাকে, তোমাদের সবাইকে, আমাকে বাঁচান যায়! ভাবছি আর কাঁদছি।

সেদিনই তুমি আমানুল্লাহ্‌কে নিয়ে এলে স্টেশন থেকে। আমাকে ডাকলে, আমি কিছুতেই কাছে গেলাম না। আমানুল্লাহ্ আমার দিকে এগিয়ে আসতে দৌড়ে পালালাম। সুন্দর একটা বড় রাবারের বল এনেছিলেন আমার জন্যে। মিতুর জন্যে পুতুল। তোমরা রাত্রিতে খাওয়ার পর গল্প করছিলে, মা আমাকে শোবার ঘরে বলটা দিয়েছিল, আমি আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে তোমাদের অলক্ষ্যে বসবার ঘরে এসে বলটা সবটুকু শক্তি দিয়ে আমানুল্লাহ্‌র মাথায় ছুঁড়ে মেরেছিলাম। ওটাই ছিল আমার সাধ্যের শক্তিশেল।

তুমি আর মা অপ্রস্তুত হ'য়ে হতবাক। আমানুল্লাহ্ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠেছিলেন। মা আমাকে জোর করে তুলে নিয়ে শোবার ঘরে চলে গিয়েছিল। মারে নি। শুধু বলেছিল, "খুব খারাপ কাজ করেছ। এবার এসো, ঘুমুবে।"

বড়ো হ'য়ে তোমার কাছে শুনেছি তুমি আমানুল্লাহ্‌কে সব ব্যাপারটা খুলে বলছিলে।

শুনে, তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'ঘরে ঘরে এই হচ্ছে, ভারতে, পাকিস্তানে। আমরা আমাদের মনের বিষ আর অন্ধকার সন্তানদের মনে চালান দিচ্ছি। ওরা এই বিষ আর অন্ধকার বুকে বহন ক'রে বড় হবে। তারপরে কি ঘটবে ভাবতেও আমার সাহস হয় না।'

তুমি বলেছিলে, আমানুল্লাহ্ পাকিস্তান চায় নি। কিন্তু তাকে ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে যেতে হ'য়েছিল। তার বাবা-মা-ভাই-বোনরা ছিল পাকিস্তানে। শ্বশুরবাড়ীও। স্ত্রী চলে গিয়েছিল পাকিস্তানে। বাবা তার জন্যে অনেক টাকা মাইনের চাকরী জোগাড় করেছিল। ভারতবর্ষে থেকে যাবার তার কারণ ছিল না কিছুই। তবু সে বেশ কিছুদিন ছাড়তে চায় নি। শেষ পর্যন্ত চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছিল। কারণ, কলকাতার অনেকেই তাকে সন্দেহের চোখে দেখত। বলত পাকিস্তানের স্পাই। সবাই চলে গেছে, তবু ভারতবর্ষে পড়ে আছে একা। স্পাই না হ'লে কি কেউ থাকে এমনি ভাবে?

আমি কিন্তু ঐ বিষ আর অন্ধকার নিয়েই বড় হচ্ছিলাম। দিল্লীতে যে বছর আমার ক্লাসে প্রথম একটি মুসলমান ছেলে দেখতে পেলা'ম, তখন আমার দশ বছর, আমি প্রথম থেকেই তাকে এড়িয়ে চলতাম, তাকে দেখলে কেমন ভয় আর ঘৃণা হ'ত। সারা স্কুলে আমার একজন মুসলমান ছেলের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয় নি। আর ছিলই-বা ক'জন মুসলমান ছেলে। প্রতি সেকসনে একটাও নয়।

অতএব, বুঝতেই পার, বাবা, বিষ আর অন্ধকার আমার মনে বেশ জমাট হয়ে ছিল। বড় হবার পর তোমার অনেক কথা, গল্প, উপদেশ শুনেও সে বিষ আর অন্ধকার বিশেষ কাটে নি। তুমি যখন মুসলমানদের দুর্দশার কথা বলতে, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার কথা, বলতে দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় কাটাকাটি মারামারিতে হিন্দুরাও কম যায় নি, বলতে আর আমি শুনতাম, কিন্তু মনের মধ্যে, বুঝতে পারতাম, বিষও আছে, অন্ধকারও।

স্বাধীন ভারতবর্ষে জন্মে এই বিষ আর অন্ধকারই বুঝি আমার প্রথম উত্তরাধিকার। আমার, এবং লক্ষ কোটি আমাদের।

এখন ভেবে দেখো কি আমার অবস্থা যেদিন নিউ ইয়র্কে প্রথম রুস্তম আর সুমনাকে দেখলাম।

সবে এক সপ্তাহ হয়েছে নিউ ইয়র্কে এসেছি। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ছাত্রকেন্দ্রের দপ্তর থেকে পত্র পেয়েছি, জনৈক আমেরিকান দম্পতি এক সপ্তাহশেষ তাঁদের সঙ্গে কাটাবার জন্যে আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

পত্রে তাঁদের ফোন নম্বর ছিল। ডায়াল করতে, স্ত্রীকণ্ঠে ধ্বনি উঠল, হ্যালো!

আমি প্রশ্ন করলাম তিনিই মিসেস ডাল্টন কিনা।

জবাব এল, আই অ্যাম্ সী।

নিজের পরিচয় দিতে উৎসাহে মহিলা উচ্চকণ্ঠিত হলেন। মিনিট খানেকের মধ্যে ঠিক হল, আমি লং আইল্যাণ্ড রেল ষ্টেশন থেকে শুক্রবার সন্ধ্যায় ট্রেন চেপে তাঁদের 'গ্রামে'র ষ্টেশনে পৌছলে তিনি বা তাঁর স্বামী এসে গাড়ী ক'রে আমায় স্বগৃহে নিয়ে যাবেন।

টেলিফোন ছেড়ে দেব এমন সময় মিসেস ডাল্টন বলে উঠলেন, "ও, মিষ্টার গুপ্ত, একটা কথা তোমাকে বলা হয় নি, মানে বলতে ভুলে গেছি। আমার বাড়িতে ঐ সময় আর দুজন বিদেশী অতিথি থাকবে। তোমার অসুবিধে হবে না তো?"

"একেবারেই না, যদি আপনাদের না হয়। আমার বরং ভালই লাগবে। বন্ধু পাওয়া যাবে।'

"খুব সুন্দর কথা। আমরাও তাই ভাবছিলাম। ওরা তোমাদের ওদিককার লোক। স্বামী-স্ত্রী।"

"ভারতবর্ষের?"

"পাকিস্তানের।"

মনটা হঠাৎ দমে গেল।

"তোমার আপত্তি নেই তো। থাকলে নিঃসংকোচে বলো। আমরা তোমাকে আসচে বার ডাকবো।"

"কিছুমাত্র নেই। বরং খুব খুসি। জীবনে পাকিস্তানী বন্ধু হয় নি। এবার হবার সম্ভাবনা।"

লং আইল্যাণ্ড নিউ ইয়র্ক সহরের বিরাট শহরতলী, কয়েক লক্ষ লোক রোজ সহরে কাজ করতে আসে, 'গ্রাম' থেকে গাড়িতে রেল ষ্টেশন পর্যন্ত, গাড়ি পার্ক করে রেল চেপে নিউ ইয়র্ক, আবার ফেরবার সময় রেল ষ্টেশন থেকে নিজের গাড়ীর ব্যবহার। কর্তাকে অনেক সময় গিন্নী রেল ষ্টেশন পর্যন্ত পৌছে দেন, আবার সেখান থেকে নিয়ে যান। প্রত্যেক বাড়ীতে অন্তত দুখানা গাড়ী না থাকলে এদের জীবনযাত্রা অচল, কর্তা একখানা গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেলে গিন্নীকে অন্যখানার শরণাপন্ন হ'তে হয়। 'গ্রাম' মানে তো সহরের বাপ, যা নেই তা হল আকাশ ছোঁওয়া বাড়ী, 'গ্রামে'র বাড়ীগুলো দোতলা, তিনতলা অথবা চারতলা।

নির্ধারিত রেল ষ্টেশনে নেমে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থাকতেই দেখতে পেলাম এক মহিলা হাসিমুখে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। বুঝলাম মিসেস ডালটন।

মেমসাহেবদের চেহারা দেখে বয়স আমি এখনও আন্দাজ করতে পারিনে, তখন

তো পারার কথাই ছিল না। মিসেস ডালটনকে দেখে মনে হল বছর চল্লিশেক হবেন, আসলে ওঁর বয়স ছিল চৌত্রিশ। দীর্ঘাঙ্গী, মাথায় একঝাঁক তামাটে চুল, মুখখানা এমনিতে গোল, কিন্তু চিবুকের দিকে হঠাৎ ত্রিভুজ-আকারে এসেছে নেমে, তাতে বেশ একটি মিষ্টি, মোলায়েম আদল লেগেছে মুখে। চোখের রং হালকা নীল।

"মিঃ গুপ্ত! আমি হেলেন।"

করমর্দন হল। এগিয়ে চলতে চলতে হেলেন ডালটন বললেন, তাঁর স্বামী স্টেক্ রান্না করছেন, তাই তাঁকে একা আসতে হল, স্বামী খুব ভালো রাঁধিয়ে, যদিও রোজকার রান্না তিনি নিজেই ক'রে থাকেন। রবার্ট ডালটন চাকরী করেন একটা অস্ত্র-কারখানায়, বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা হ'য়ে যায়। হেলেন ডালটন কাছাকাছি এক হাসপাতালে ড্রাগ-এ্যাডিক্ট্‌দের সামাজিক পরিচয় সংগ্রহ করেন, বেশির ভাগ রুগীদের সঙ্গে কথাবার্তায়, মাঝে মাঝে তাদের বাড়ী গিয়ে। মহিলার কথাবার্তায় এমন একটা সহজ মিত্রভাব যে আমার প্রথম কয়েক মিনিটের পরিচয়েই ওঁকে ভালো লেগে গেল। ডালটনদের তিন সন্তান, বড় মেয়েটির তের বছর পূর্ণ হয়েছে, নাম এলেন, দ্বিতীয় জর্জ, এগার বছর, তৃতীয় হেনরী, ন'বছর।

আধঘণ্টা গাড়ীচলা পথে হেলেন ডালটন অনেক কিছু বললেন, জনসনের ভিয়েৎনাম যুদ্ধের সর্বনাশা পরিণাম থেকে রবার্ট ডালটনের সঙ্গে নিউইয়র্ক য়ুনিভারসিটিতে পড়ার সময় বন্ধুত্ব হওয়া পর্যন্ত; এরই মধ্যে প্রশ্নও করলেন অনেক, যেমন আমি নিরামিষাশী কিনা, বিদেশে পড়তে এসেছি কেন, পড়ার শেষে কি দেশে ফিরবো, না মার্কিন মুলুকেই যাবো থেকে, আমি বিবাহিত কিনা, আমার দেশে এখনও মেয়েদের বাচ্চাকালেই বিয়ে হবার নিয়ম চালু আছে কি? কথাবার্তার মাঝে একসময় আমরা ডালটনদের 'গ্রামে' ঢুকলাম, গ্রামের নাম পার্ল, আমার মনে হল সত্যি মুক্তোর মত সুন্দর, রাস্তার দু'পাশে বেশ দূরত্ব রেখে এক একটি ছবির মতো বাড়ী, রাস্তার দু'পাশে কেবল সুসজ্জিত বন, বনের বুক কেটে মাঝে মাঝে গাড়ী চলতে পারে এমন সব রাস্তা, কোথাও বা পিকনিক করবার জন্যে কাঠের টেবিল, তারপর আমরা পেরিয়ে গেলাম 'গ্রামে'র বাজার, যেখানে কয়েকহাজার মোটরগাড়ী বিক্রীর জন্যে পর পর সাজান, এবং বড় বড় সুপারমার্কেটে না আছে এমন বস্তু নেই। বাজার পেরিয়ে গির্জা, গির্জার পর আবার বাড়ী, এমনি একটি বাড়ীর সামনে হেলেন গাড়ীর বেগ কমিয়ে সোজা

কটক দিয়ে গ্যারেজে ঢুকে গেলেন। গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীতে ঢুকতেই করমর্দন করতে এগিয়ে এলেন হেলেনের স্বামী রবার্ট। রবার্টের ছ'ফুট দু'ইঞ্চি সরু দেহের ওপর একেবারে টেকো গোলাকার মাথার পুরোটা না দেখতেই আমার নজর পড়ল আমারই মতো তামাটে বর্ণের একটি ছেলের ওপর। বয়স তার আমার চেয়ে দু-এক বছর বেশীই হবে, মাথায় একরাশি কালো চুল, চোখে চশমা। নাক বেশ মোটা এবং দীর্ঘ, এবং তাকে আরও ভালো করে দেখবার আগে মনে পড়ল, এই তো সেই পাকিস্তানী মুসলমান ছেলেটি, যার সম্বন্ধে হেলেন আমাকে টেলিফোনে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন।

রবার্ট পরিচয় করিয়ে দিলেন, "রুস্তম। শ্বেতকেতু।"

আমি দু'হাত তুলে নমস্তে করলাম। রুস্তম বলল, হাই।

আমরা আর কিছু বলবার মতো পেলাম না একজনেও।

রবার্ট ডালটন বললেন, "রুস্তম মাসখানেক হল নিউইয়র্কে এসেছে। তোমার মত কলম্বিয়ারই ছাত্র।"

আমি বললাম, "তাহলে ইনি আমার সিনিয়র।"

এমন সময় হেলেন ঘরে এলেন একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে, যার পানে তাকিয়ে আমি কেমন নিথর হ'য়ে গেলাম। মনে হল অমন সুশ্রী মেয়ে খুব কম দেখেছি জীবনে।

হেলেন বললেন, "এ হচ্ছে সুমনা। রুস্তমের স্ত্রী।"

আমি হঠাৎ কেমন বোবা হয়ে গেলাম।

সুমনা বলল, "আপনি নতুন এসেছেন, না?"

আমি বললাম, "দেখেই বুঝি বুঝতে পারছেন? গায়ে এখনও ভারত-ভারত গন্ধ?"

সবাই হেসে উঠল, আমি একটু আত্মবিশ্বাস পেয়ে নিজের মধ্যে তাকিয়ে নিলাম, দেখতে পেলাম রুস্তমকে আমার কেমন যেন সহ্য হচ্চে না।

সাইকেল চেপে এমন সময় বাড়ী ঢুকল একটি মেয়ে, দেখতে বছর ষোল, পরণে নামমাত্র প্যাণ্ট, হাঁটুর ওপরে অনেকখানি নগ্ন, এবং একটা নাইলনের আঁটসাট সার্ট, যার মাধ্যমে বেলের মতো দুটি মজবুত যুবতি বুক সুস্থ আস্ফালনে সুপরিস্ফুট। মাথায় একবাঁক রুপালি চুল। হেলেন ও রবার্ট মেয়েকে দেখে, অর্থাৎ মেয়ের পোষাক দেখে, বিব্রত; কিন্তু তার প্রকাশ চেপে উৎসাহ দেখিয়ে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন, "এলেন, ইনি হচ্ছেন মিঃ গুপ্ত, ইণ্ডিয়া থেকে এসেছেন, কলম্বিয়ায় পড়তে, রুস্তম ও সুমনাকে তো তুমি চেনই।"

এলেন আমার দিকে তাকিয়ে আলগা হেসে বললে, হাই।

দেখলাম মুখখানা তেমন সুন্দর নয়, লম্বাটে, ছোট ছোট চোখ জোনাকি, ঠোঁট দুটো লাল টুক টুক, আর হাসলে গালে ভাঁজ পড়ে। মনে পড়ল, এর বয়স তের। অর্থাৎ খুকি। অথচ দেখে কে বলবে!

রবার্ট বললেন মেয়েকে, "এক্ষুনি ডিনার হবে। তুমি কি স্নানের ঘরে যাবে জামা-কাপড় বদলে আসবে?"

এলেন একবার নিজের দিকে তাকাল। তারপর বাবা-মার দিকে।

"আমি মুখ ধুয়ে আসছি।"

দৌড়ে সে ভেতরে চলে গেল।

হেলেন বললেন, "মেয়ের বয়স মাত্র তের। আজকাল ওরা এতো তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে যে কে বলবে ওর বয়স ষোল নয়।"

রবার্ট বললেন, "ভালো খেতে পায়, আমাদের দেশে সব খাদ্যদ্রব্যে বাড়তি ভিটামিন জুড়ে দেওয়া হয়। নিউট্রিশন ইনডাসট্রি শিশুদের দেহ পুষ্ট করছে, কম্যুনিকেশন ইনড্রাষ্ট্রি মন বিগড়ে দিচ্ছে! ওদের আর দোষ কি? ওরা যা হচ্চে, তা নিয়ে আমরা বিলাপ করছি, অথচ ওদের এ অবস্থার জন্য দায়ী আমরাই!"

হেলেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "জনসন ভিয়েৎনাম যুদ্ধ না করলে আমাদের ছেলেমেয়েগুলির এ অবস্থা হ'ত না।"

রবার্ট যোগ দিলেন, "জনসনকে একা দায়ী কোরো না, ডার্লিং। দোষ আমাদের সবারই। আমি ভিয়েৎনাম যুদ্ধের জন্যে অস্ত্র তৈরী করছি। লড়াই থেমে যাক, আমাদের কারখানায় শত শত লোকের চাকরী যাবে।"

খেতে বসলাম আমরা সবাই, ডিনার টেবিলে জ্বলল বিজলির মোমবাতি, হেলেন পরিবেষণ করলেন রবার্টের রান্না 'ষ্টেক', সঙ্গে আলু সেদ্ধ আর সালাড পাতা, এবং গ্রেভী অর্থাৎ ঝোল। খেতে খেতে কথাবার্তা চলল।

রবার্ট মেয়েকে প্রশ্ন করলেন, "আজ স্কুলে কি হল?"

এলেন মুখ উলটে জবাব দিল, "নাথিং।"

"পড়া হল না?"

"না।"

"কেন?"

এলেন কিছু বলল না।

কস্তুর বলল, "এ্যান্টি-ওয়ার হাওয়া কি স্কুলেও বইতে শুরু করেছে নাকি?"

হেলেন বললেন, "নিউ ইয়র্ক রাজ্যে তো তাই দেখছি। এলেনদের স্কুলে বেশ গোলমাল চলছে। ছাত্ররা ক্লাস না করে মার্চ করছে।"

রবার্ট বললেন, "টেলিভিশন। টি. ভি.-তে রোজ যা দেখছে তাই সবাই করতে চাইছে।"

হেলেন বললেন, "যুদ্ধের বিপক্ষে আমিও। কিন্তু স্কুলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের উস্কে দেওয়া মোটেই ঠিক কাজ নয়।"

এলেন এবার বলে উঠল, "স্কুলের ছেলেরা তো ড্রাফ্‌ট কল্‌ পাচ্ছে? যদি ভিয়েৎনাম যুদ্ধে মরতে পারে তাহলে বেঁচে থাকবার দাবী নিয়ে মার্চ করতে পারবে না কেন?"

হেলেন চুপ করে গেলেন। মিনিট খানেক কারুর মুখে কথা নেই।

রবার্ট বললেন, "লড়াই তো আমরাও করেছি!"

এলেন এবার গলা কর্কশ ক'রে বলে উঠল, "আমরা করতে চাই নে। যে শিক্ষাব্যবস্থায় আঠার বছরের ছেলেদের ধ'রে ধ'রে মৃত্যুর হাতে সঁপে দেওয়া হয়, সে শিক্ষা ব্যবস্থা পচা, আমরা তা চাইনে।"

বাবা-মা দুজনেই একেবারে চুপ।

আমার মনে হল আবহাওয়াটা একটু হালকা হ'লে আহারটা আরামদায়ক হ'তে পারে। অথচ রসিকতা করার মত কথা মুখে এল না।

বলে উঠলাম, "আপনারা সব ভিয়েৎনাম ট্রাজেডির কথা বলছেন, এদিকে আমার যে কি ক্ষতি হল তা কেউ জানতেও পারছেন না। আমিও এতক্ষণ জানতে পারি নি, এখুনি পারলাম।"

খুব গুরুগম্ভীর গলায় কথাগুলি বলতে পেরেছিলাম, সবাই একসঙ্গে আমার দিকে তাকাল। এলেনও।

রবার্ট বললেন, "ক্ষতি? কি ক্ষতি হল তোমার?"

"সর্বনাশ হল। আমার জাত গেল।"

"জাত? কেন? জাত গেল কেন?"

"হিন্দুর ছেলে গোমাংস খেলাম, জাত যাবে না?"

ডালটন দম্পতির মুখ চুণ হ'য়ে গেল।

হেলেন বললেন, "গরুর মাংস খাওয়া তোমার ধর্মে বারণ বুঝি? আহা, আগে বলো নি কেন? আমি আমিষ না নিরামিষ খাও জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু গরুর মাংস যে খাওয়া বারণ তা তো আমার মনে হয় নি!"

আমি বললাম, "আপনার মনে হবে কি ক'রে? আমারই হয় নি!"

এবার ওঁরা বুঝলেন আমি কৌতুক করছি।

সুমনা বলল, "গরুর মাংস খেলে হিন্দুদের জাত এখনও যায়। তবে তারা মিঃ গুপ্তের মত হিন্দু নয়। তারা আসল হিন্দু।"

আমি বলে উঠলাম, "আপনি মুসলমান বিয়ে ক'রে বসে আছেন, আসল হিন্দুর খবর কি রাখেন?"

বললাম হেসে হেসে, হালকা স্বরে, তবু মনে হল কথাগুলোর একটু ঝাঁজ থেকে গেল।

রুস্তম বলল, "গতকাল আমরা পর্ক খেয়েছি। আমারও জাত নেই।"

আমি বললাম, "আপনি মুসলমান নন?"

রুস্তম বলল, "যেমন আপনি হিন্দু।"

হেলেন রবার্ট ও এলেন অবাক হ'য়ে আমাদের কথা শুনছিল। এবার হেলেন বললেন, "তোমরা হিন্দু-মুসলমানে বিয়ে করেছ বুঝি? মানে, এটা কি খুবই অসাধারণ ব্যাপার?"

আমি বললাম, "স্কুল কলেজে ইতিহাস যা পড়েছি তাতে শিখেছি মুসলমানদের চিরদিন হিন্দু মেয়েদের ওপর দারুণ লোভ। ধ'রে ধ'রে গরুর মাংস খাইয়ে জাত খুইয়ে মুসলমান ক'রে দেওয়া এদের অভ্যাস।"

রুস্তম সুমনাকে প্রশ্ন করল, "আমি তোমার জাত খুইয়ে দিয়েছি?"

দুজন ওরা দুজনের পানে এমন চোখে তাকাল যে আমার বুঝতে দেরী হল না ওরা পরস্পরকে গভীর ভালোবাসে।

সুমনা বলল, "আমাকে বিয়ে করবার জন্যে রুস্তমের অনেক ক্ষতি হয়েছে। বাবা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করেছে। শেষটায় এমন অবস্থা হ'য়ে দাঁড়াল যে পূর্ব-পাকিস্তানে আর আমাদের বাস করা সম্ভব হল না।"

আমি বললাম, "আপনি যেমন জীবন্ত মেয়ে, আপনাকে বিয়ে করলে বিপদে পড়বে না এমন পুরুষ আমাদের মুলুকে কমই আছে।"

সুমনা বলল, "মানে, আপনারা জীবন্ত স্ত্রী চান না?"

"একটু-আধটু, তার বেশি না। বৌ হবে শান্ত, ম্রিয়মান, লাজুক, বাধ্য, অনুগত, স্বল্পবাক, স্বল্পবুদ্ধি, যদিও বি. এ. পাশ।"

এবার এলেন প্রশ্ন করল আমাকে, "তোমার বৌ আছে?"

আমি উত্তর দিলাম, "যদি বলি নেই, তুমি কি আমার সঙ্গে ভাব করবে?"

এলেন বলল, "আমি ভীষণ জীবন্ত।"

আমি বললাম, "তাহলে আর আমার বৌ-এর কথায় কাজ নেই। বরং এঁদের বিয়ের গল্পটা শোনা যাক।"

রুস্তম বলল, "বলবার মতো কিছু নেই। বাবা মুসলিম লীগের নেতা, গোঁড়া মুসলমান। আমার জন্তে পাত্রী ঠিক ক'রে রেখেছিলেন, তাঁর এক বন্ধুর মেয়ে। আমি যখন সুমনাকে বিয়ে করতে চাইলাম, প্রথম খুব রেগে গেলেন, পরে বললেন, বেশ তো, কাফেরের মেয়েকে কলমা পরিয়ে মুসলমান ক'রে নে তারপর বিয়ে। আমি বললাম, তা হবে না, সুমনা হিন্দুই থাকবে, বিয়ে হবে রেজিষ্ট্রী ক'রে। তখন কুরুক্ষেত্র বাধল।"

সুমনা যোগ দিল: "রুস্তমকে সাতদিন ঘরের মধ্যে বন্দী ক'রে রেখেছিল।"

রুস্তম বলল, "আটকাতে পারল কোথায়? পালিয়ে গিয়ে হাজির হলাম সুমনার হস্টেলে। সেখানেও দারুণ গোলমাল। দুজনে পালিয়ে গিয়ে আমাদের কয়েকটি বন্ধুর শরণাপন্ন হলাম। তাদের কেউ মুসলমান, কেউ হিন্দু। তারা লুকিয়ে রাখল আমাদের, বিয়ে দিল, এবং একদিন দুজনে আমরা রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা বিমান বন্দর থেকে উধাও হলাম।"

"একেবারে সোজা আমেরিকায়? আপনাদের পক্ষে এদেশে আসা কি এতই সোজা?"

রুস্তম বলল, "আমি কলম্বিয়ায় এ্যাডমিশন এবং ফেলোশিপ পেয়ে গিয়েছিলাম। সুমনাকে নিয়ে আসতে হল, এই যা বাড়তি ঝুকি।"

হেলেন সুমনাকে প্রশ্ন করল, "তোমার বাবা-মাও কি আপত্তি করেছিলেন?

সুমনা জবাব দিল, "ভীষণ। হিন্দুর মেয়ে অন্ত জাতে বিয়ে হওয়াই দুষ্কর, আর রুস্তম তো মুসলমান।"

এলেন বলে উঠল, "আমি যদি কখনো নিগ্রো অথবা ইহুদিকে বিয়ে করতে চাই আমার বাবা মাও মূর্ছা যাবেন।"

হেলেন আর রবার্ট পরস্পরের চোখ চাওয়াচাওয়ি ক'রে নীরব রইলেন।

আমি বললাম, "দেশে একটি আমেরিকান ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ওরেগন রাজ্যে পোর্টল্যাণ্ড শহরে তার বাড়ী, ছেলে আর বাপ দুজনেই মাল জাহাজে কাজ করে। ছেলেটি একটি ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করেছিল। মেয়েটি বাঙ্গালী, আমারই স্বজাত, বেশ কালো দেখতে। তার বাবা-মা খুশি হ'য়ে মত দিয়েছিলেন। আমি ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি যদি একটি কালো আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করতে চাইতে ওঁরা খুশিতে মত দিতেন? ছেলেটি জবাব দিয়েছিল, 'খুশিতে কেন, অখুশিতেও মত দিতেন না। বাপ-মার সঙ্গে সম্পর্ক আমার চুকে যেত।"

রবার্ট এবার আমাকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি তো অবিবাহিত, না? তোমার কি ইচ্ছেমত বিয়ে করবার স্বাধীনতা আছে?"

আমি বললাম, "আমার বাবা আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন থেকে বলে আসছেন পৃথিবীর যে কোনও দেশের যে কোনও মেয়েকে বিয়ে করার স্বাধীনতা আমার আছে, তিনি এবং আমার মা হাসিমুখে পুত্রবধুকে গ্রহণ করবেন। আমার বাবা বলেন, কেবল ভালোবাসার জন্যে বিয়ে করবে, আর কিছুর জন্যে না।"

এলেন বলে "তুমি তাঁর কথা বিশ্বাস করো?"

আমি নিঃসংকোচে বললাম, "না। বাবা জাত, ভাষা, দেশ নিয়ে আপত্তি করবেন না। কিন্তু আমার স্ত্রী হবার যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁর যা মাপকাঠি তার বাইরে গেলে তিনি উদার হবেন কিনা গভীর সন্দেহ। আমার মা অবশ্যি চান আমি একটি বাঙালী লক্ষ্মী মেয়ের হাতে মালা গ্রহণ করি। তিনি জাত মানেন না, হয়তো ধর্মেও আপত্তি নেই। কিন্তু ভাষায় তাঁর দারুণ গোঁড়ামি। আসলে যে মেয়ে বাংলা বলতে পারবে না তার সঙ্গে প্রাণখুলে কথাবার্তা বলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে।"

এবার সুমনা, "আপনি নিশ্চয় ওঁদের তালিকা মিলিয়ে পাত্রী নির্বাচন করবেন!"

আমি, "কি ক'রে বলি? এ পর্যন্ত আমার প্রেম সব একতরফ। অর্থাৎ আমিই কাবু হয়েছি, প্রতিপক্ষ বিশেষ নরম হয় নি। তাই এদেশে এসে শক্ত হবার সংকল্প করেছি। অর্থাৎ এলেনের ভয় করবার কিছু নেই, আর আপনি তো একবারে পাল তুলে বন্দরে পৌঁছে গেছেন।"

রুস্তম বলল, "মিঃ গুপ্তের বাবা তবু তো উদার। আমার বাবা একেবারে পাষাণের মত শক্ত। অথচ তিনি বুঝতে পারেন তাঁর কাছে যে সব জিনিষ মূল্যবান, আমার কাছে তার এককড়ি দামও নেই। তিনি মনে করেন হিন্দু মুসলমান দুই জাতি, পরস্পরের রক্তশত্রু! আমি মনে করি নে। তিনি ধর্মের বাইরে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির অস্তিত্ব মানেন না, আমি মানি। তিনি পাকিস্থানী, আমি বাঙালী। আমাদের কোনও মিল নেই। অথচ তিনি চান আমি তাঁর ইচ্ছার সুতো নিয়ে আমার জীবনের নকসা বুনব। এ যে হয় না, হ'তে পারে না, পারা উচিত নয়, তা তিনি বুঝতে পর্যন্ত চান না। আমরা, অতএব, দুই দুনিয়ার মানুষ, আমাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকলেও মনের, হৃদয়ের আর মস্তিকের সম্পর্ক নেই। তিনি একথাও বুঝতে পারেন না যে এমন একদিন হয়তো আসবে যখন আমি, আমার মতো অনেকে পাকিস্থানে বাস করতে চাইবো না, পারবো না, হয়তো আমরা আমাদের স্বাধীন পূর্ববঙ্গ তৈরী করব, এবং সেদিন হয়তো আমাদের মতো অনেক ছেলেরা তাদের পিতাদের দেখতে পাবে বিপক্ষে, দুষমনের পক্ষে। এ কথা তাঁকে একদিন

বলেছিলাম, তিনি রাগে অন্ধ হ'য়ে আমার গালে বিরাট চড় মেরেছিলেন, এবং পীরের কাছে হাজির হয়েছিলেন মানত করতে, যাতে আমার দেহমন থেকে হিন্দু ভূত বিদায় নেয়।"

শুনতে শুনতে আমার শরীরে ছোট একটা বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। বহু দিনের জমাট নোংরা অন্ধকার হঠাৎ আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে গেল, মন কেমন হালকা হ'য়ে উঠল। হৃদয়ের কোথাও যেন অনেক পাখী একসঙ্গে গান গেয়ে উঠল। সুমনার মুখে তাকিয়ে দেখলাম আশ্চর্য অরুণাভা এই সন্ধ্যেবেলা সেখানে ঝকমক করছে, সুমনার নিমপাতার মত পাতলা আর নরম ঠোঁট দুটি কাঁপছে, চোখ ছলছল।

রুস্তম সেই মুহূর্ত থেকে আমার বন্ধু হল।

রুস্তমের কথাগুলো আমাদের সবাইকে গম্ভীর ক'রে দিয়েছিল। খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হেলেন ডেসার্ট দেবার কথা বুঝি ভুলেই গিয়েছিলেন। দেখতে পেলাম, এক চোখে তিনি রুস্তমকে দেখছেন।

আমি বললাম, "পুরোপুরি গোঁড়া হলে একরকম মন্দ নয়। বুঝতে পারা যায় পথ আলাদা। চলতে হলে অন্যপথে চলো, নইলে রাস্তায় কাৎ হও। লিবারেলদের নিয়েই আসল মুস্কিল। তারা ভাবে তাদের উদারতার শেষ নেই। এবার উদার হবার দায়িত্ব তোমার। অথচ লিবারেল্‌দের চামড়া চুলকে দেখো, দেখতে পাবে সবাই গোঁড়া রক্ষণশীল।"

এবার এলেন বলে উঠল, "হিয়ার হিয়ার।"

দেখতে পেলাম আমরা তিন দেশের তিন সমাজ সংস্কৃতির চারটি সন্তান, আমাদের মধ্যে প্রভেদের অন্ত নেই, ধর্মের, ভাষার, সভ্যতার, সমাজের, মানসিকতার, এমন কি জল হাওয়ার, খাদ্যের, বেশভূষার, চালচলনের; রুস্তম-সুমনা এবং আমি এক ভৌগোলিক উপমহাদেশের মানুষ হ'য়েও আমাদের মধ্যে চীনের প্রাচীর: আর এই মার্কিন পরিবারের তো কথাই নেই; তবু, এই সব প্রভেদ সত্ত্বেও, আমরা সন্তানরা, এ শতাব্দীর, এ যুগের, এ পৃথিবীর সন্তানরা যেন কতগুলি, অনেকগুলি একই সুতোয় বাঁধা, আমাদের রক্তে বিদ্রোহ, অথচ সবার সাহস নেই, রুস্তমের আছে, আমার বুঝি নেই, সিতাংশুর তো নেইই, নেই অজিতেশেরও, তবু আমরা স'রে এসেছি অনেক দূরে আমাদের পিতাদের থেকে, তাঁদের পৃথিবী আমাদের ধ'রে রাখতে পারছে না, অথচ আমাদের নিজেদের পৃথিবী নেই, গ'ড়ে নেবার মতো শক্তি ও সাহস নেই, কেননা গড়তে হলে, বাবা, আগে তোমাদের পৃথিবীকে ভাংতে হয়, যা তোমরা আমাদের করতে দেবে না, তোমাদের অনেক শক্তি, অনেক সঞ্চয়, তোমাদের পৃথিবী বড় বেশি

মজবুত। তোমরা চাইছ আমরা আমাদের বিদ্রোহ হজম ক'রে তোমাদের দাক্ষিণ্যে তোমাদেরই পায়ের তলায় নির্দিষ্ট আসনে বসে তোমাদের পৃথিবীকে তোমাদের মতোই চালিয়ে নিয়ে যাই, এক আধটু অদল বদলে আপত্তি করার মতো ছোট মন তো নও তোমরা, সে স্বাধীনতা সন্তানদের তোমরা দিয়েই রেখেছ, শুধু দাওনি তাদের ইচ্ছামত বাঁচবার অধিকার, যা তোমরা পাওনি তোমাদের পিতাদের কাছে, চাও নি, তোমাদের দরকার ছিল না নিজেদের মতো ক'রে বাঁচবার। পিতামহ থেকে পিতা থেকে পুত্র পর্যন্ত তোমাদের ধারাবাহিকতা ছিল, আজ আর নেই, ইতিহাসের সেতু ভেঙ্গে পড়ছে, কালের গতি বিচ্ছিন্ন, সময় বিক্ষুব্ধ, ইতিহাস জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল্ খেয়ে বন্ধ্যা।

রুস্তম, সুমনা, এলেন এবং আমি, আমরা কেউ তোমরা নই, বাবা। আমরা আমরা। এ কথাটা বার বার লক্ষ কোটি বার বললেও শেষ হ'তে চায় না। তার কারণ, এ কথা কেবল মাত্র বলা শুরু হয়েছে। আমরা যতো তারস্বরেই না বলবার প্রয়াসী, তোমাদের কানে পৌঁচচ্ছে না, তোমরা তোমাদের প্রচারে সম্মোহিত। টেলিভিশন, বেতার, সংবাদপত্র, সব তোমাদের মাহাত্ম্য ও প্রভুত্ব প্রচারে সর্বক্ষণ নিযুক্ত।

কিন্তু সময়, বিক্ষুব্ধ বিধ্বস্ত সময়, আমাদের মিত্র।

ভবিষ্যতের পৃথিবী, বাবা, আমাদের, যদি ইতিমধ্যে পৃথিবী নামক প্রায় গোলাকার গ্রহটাকে তোমরা পুরোপুরি ধ্বংস না ক'রে ফেল। সে অস্ত্র তোমাদের কব্জায়। মৃত্যু ও ধ্বংসকে বগলদাবা ক'রে তোমরা জীবন নামক প্রহসনের পালা দেখিয়ে চলেছ, আর আমরা, তোমাদের সন্তানরা, অনেক নিকটের বহুদূর থেকে আহত বিস্ময়ে পরাজিত সম্ভ্রমে তোমাদের দেখছি, এবং বলছি, তোমাদের পরেও অনন্তকাল আছে, যদি পৃথিবী বেঁচে থাকে, যে-কাল আমাদের, যদি আমরা, অর্থাৎ পুত্ররা, পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে বেনামী ভস্মে পরিণত না হই।

তুমি পিতা, আমি পুত্র হলেও, বাবা আমরা দুই পৃথক, আলাদা মানুষই কেবল নই, দুই পৃথিবীর মানুষ। তোমার চেয়ে আমি মাত্র চব্বিশ বছরের ছোট, অথচ এই শতাব্দী-চতুর্থাংশ কি বিরাট পরিবর্তনকেই না অতিক্রম ক'রে বসে আছে! গোটা ধরিত্রীর কথা না হয় না-ই তুললাম, আমাদের সুপ্রাচীন অতি-মন্থর ভারতবর্ষেরই দেখ না তোমার জন্ম আর আমার জন্মের ব্যবধানে, আমার চব্বিশ আর তোমার প্রায় পঞ্চাশ বয়সের পরিক্রমায়, কি বিরাট পটপরিবর্তন ঘটে গেছে!

তুমি জন্মেছিলে পূর্ববাংলার তলপেটের এক গ্রামে।

আমি জন্মেছিলাম মধ্যভারতের বেশ বড় এক শহরে।

তোমার গ্রামে মাটির ভিৎ, টিনের ছাত, টিনের বেড়ার ঘরে কেরোসিনের লণ্ঠন এবং সরষে তেলের প্রদীপ স্তিমিত আলো আনত: রাত্রির অন্ধকারকে মেনে নেওয়া ছাড়া তোমার উপায় ছিল না। তোমরা অনেকগুলো পরিবার একসঙ্গে একবাড়ীতে বাস করতে, তোমাদের বাল্যকাল যৌথ ছিল, অনেকের অনেক কিছু দিয়ে তৈরী। গ্রামের মাটির রাস্তা বৃষ্টি হলে এক-পা কাদা, পুকুরের টলমল জল, তার বুকে আম কাঁঠাল নারকেল গাছের ছায়া, বকুল-কামিনী-টগর-মালতি-গন্ধরাজ-শিউলি-নন্দদুলাল, কুমড়ো-লাউ-ঢেঁকি-মুলো-নটেশাক, ডোবার জল নিষ্কাশন করে কৈ-মাগুর-শোল-শিংমাছ-ধরা, হাওয়ায় নুয়ে পড়া বাঁশের ঝাড় গোবর-ঘুটে-শুকনোপাতা, ঝিঁঝিপোকা-জোনাকি-ব্যাঙ জোঁক-ফড়িং, বৈরাগী-বাউল-সত্যপীর, দোল দুর্গোৎসব-বারোমাসের-তের-পার্বন, এবং মাঘমন্ডলের ব্রত দিয়ে তৈরী তোমার বাল্যকাল। তারসঙ্গে একদলে কাকা-পিসি-জ্যাঠা-ঠাকুমা-দাদু-বড়দা-মেজদা ঠাকুর্দা। গ্রামের লোক, যারা যৌথজীবনের সঙ্গে নানাভাবে সংযুক্ত। গ্রামের পূর্বদিকে পদ্মা, কাশবনের সঙ্গে নীল আকাশের হাতমেলান বন্ধুত্ব, কালবৈশাখী, আষাঢ়-শ্রাবনের বন্যা, শীতের পলাশ, ফাগুনের কৃষ্ণচূড়া, এরাও তোমাদের বাল্যকালের সঙ্গী। এতো কিছু ছিল বলেই বোধকরি তোমাদের জীবনে পিতার প্রয়োজন ছিল কম।

তোমার কথাই ধরো না, বাবা। তোমারও তো বাবা ছিলেন, যাকে আমি খুব ছোটবেলায় দেখেছি। তখন তিনি প্রায় অন্ধ, আমার মুখে, গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বার বার বলতেন, ছেলেটা দেখতে নিশ্চয় খুব সুন্দর, আমি ভালো ক'রে দেখতেও পাই নে। তিনিই তো তোমার বাবা। তিনি তাঁর সারাজীবন কাটিয়েছেন দূরের

শহরে স্কুলে পড়িয়ে : মাকে কেন্দ্র ক'রে তোমরা ভাইবোনরা গ্রামে বাস করেছ বাবার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক তোমার গড়ে ওঠে নি, তার অভাব পর্যন্ত তুমি বোধ করো নি। অপরিচয়ের গৌরবে তোমার বাবা তোমার কাছ থেকে নিশ্চিন্ত দূরে থেকে গেছেন, তুমি তাঁকে ভয় করেছ, মান্য করেছ, ভালোও হয়তো একধরণের বেসেছ—মানুষের স্নায়ুতে কতো রকম ভালোবাসাই না জন্ম নেয়—তিনি তো, শুনেছি, তুমি-প্রাণ ছিলেন, অথচ, তুমিই বলেছ, তিনি তোমাকে চিনতেন না বললেই হয়, জানতেন সামান্যই, আর তুমিও কেবল অনেক বড়ো হবার পর, বুদ্ধি দিয়ে, তোমার অনুভূতিশীল ধারাল মন দিয়ে, তোমার পিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ একটা পুরুষকে বুঝতে, জানতে, চিনতে চেষ্টা করেছিলে, এবং এ-অধ্যবসায়ে যা তোমার লাভ হয়েছিল তাতে তোমার জীবন আলোকে উদ্ভাবিত হয় নি, বরং অন্ধকারে ম্লান হয়েছিল, কেননা তুমি বুঝতে পেরেছিলে যার ঔরসে তুমি জন্মপ্রাপ্ত হয়েছিলে, তাঁর জীবনে দেবার মত ছিল না কিছুই, জীবন থেকে পাবার মত পান নি কিছু তিনি, কেবল দীর্ঘ সত্তর বছর একটা ভারী শূন্য বহন ক'রে শেষ পর্যন্ত একদিন বারাণসীর বাঙালীটোলার একটা স্যাঁতসেঁতে বাড়ীর আধ-অন্ধকার ঘরে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে রেহাই পেয়েছিলেন।

বাবাকে চিনতে, বুঝতে পে'রে তোমার আরও বড় ক্ষতি হয়েছিল। ছোটবেলা থেকে তুমি মার সঙ্গী, মা-ই তোমার জীবনবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সবাই জানত তুমি মাতৃভক্ত। তোমার দুটো বোন, দুটো ভাই ছিল, তাঁরা আমার পিসি ও কাকা, এখন তাঁরাও পুত্রকন্যার জনক জননী: ছোটবেলা তুমি ছিলে বড়, গ্রামের বাড়ীতে, পাঁচজনের পরিবারে মা ছিলেন রাণী আর তুমি প্রধান মন্ত্রী, প্রতি মাসে পঁচিশ টাকার রাজস্ব বিনিয়োগে তোমাদের রাজত্ব: তুমি জানতে তোমার মা স্বামী প্রেমে ধন্যা নন, বাবা তোমার মার প্রতি উদাসীন, এবং তাঁর ঔদাসীন্যের দান তোমরা পাঁচ ভাই বোন, তোমাদের দারিদ্র্য, তোমার মার বুক জোড়া চাপা ব্যথা। মার প্রতি টনটনে টান বাবাকে তোমার কাছ থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, অবশ্য এ দূর রচনায় সে ভদ্রলোকও চেষ্টার কার্পণ্য করেন নি, তোমার মনে তাঁর প্রতি অনেক নালিশের পাথর জমা হ'য়েছিল যা তুমি কারুর সঙ্গে আলোচনা পর্যন্ত করতে চাইতে না। অথচ পিতার স্থান বহুলাংশে অন্ধকার থাকা সত্ত্বেও তোমার জীবনে মা প্রায় সবখানি জুড়ে ছিলেন, তাই বাল্যকালে তুমি নিরেট ছিলে, মেনে চলার সঙ্গে সঙ্গে বেশ খানিকটা স্বাধীনভাবও তোমার রক্তে, স্নায়ুতে সঞ্চিত হয়েছিল, যার পরিণতি আমার আর মিতুর কাছে পরম শুভ, তুমি তো আমাদেরই বাবা, এমন বাবা ক'জনের আছে, বলো? তুমি আমাদের বাবা এবং বন্ধু, পিতা এবং সখা, অনেক কিছুর ব্যবধান সত্ত্বেও তুমি আমাদের নিকটতম, আমরা তোমার। অথচ তুমি তোমার

বাবার ধারে কাছেও ছিলে না, যদিও মার খুব কাছে ছিলে, যতদিন—না বাবাকে চিনলে, জানলে। জানবার ফলে বাবা তোমার নিকটতর হলেন না, কিন্তু মা চলে গেলেন অনেকখানি দূরে, কেন না তুমি বুঝলে তোমার বাবার নিঃস্বতার জন্যে তোমার মার কোনও দায়িত্ব ছিল না, কারুর কোনও দায়িত্ব ছিল না, তোমার বাবা ছিলেন স্বয়ং নিঃস্ব, তাঁর ঔদাসীন্য কারুর কিছুর প্রতিক্রিয়া নয়, তাঁর ঔদাসীন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ। অথচ এমন একটা সম্ভাবনাময়, অন্তত অসাধারণ, মানুষকে তোমার মা সারা জীবনে একটুও চিনতে বা বুঝতে পারেননি, তাঁর বীতরাগের অর্থ খুঁজেছেন সাধারণ, সাবেকী কারণে, যেমন যৌবনে ব্যর্থ কোনও প্রেম, অথবা দ্বিতীয় রমণীতে উৎসাহ, কিম্বা স্ত্রীর প্রতি গভীর অনীহা। এ যেন অন্ধকারে দুটি ব্যক্তির পরস্পরকে দেখতে চাইবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। বাবাকে চিনতে পেরে তুমি মাকেও চিনতে পারলে, বুঝলে মার প্রতি বাবা যদি অন্যায় ক'রে থাকেন, মাও বাবার প্রতি ততখানিই অন্যায় করেছেন, দুজনে পরস্পরকে জানেন নি বোঝেন নি বছরের পর বছর বিবাহিত জীবনে, অতএব বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ যতটা অকারণ, মার প্রতি তীক্ষ্ণ সহানুভূতিও ততটাই অহেতুক, এবং এর পরে মার কাছ থেকে ক্রমে ক্রমে দূরে সরে পড়া ছাড়া তোমার আর উপায় রইল না, তোমার মা এজন্যে দোষী করলেন আমার মাকে, বৌ এসে ছেলেকে পর ক'রে দিল, এতো প্রাচীন ভারতের তুষার শাশুড়ীদের সনাতন নালিশ।

বাবার প্রতি শ্রদ্ধা তোমার বেড়েছিল, মার প্রতি তুমি আস্তে আস্তে উদাসীন হয়ে উঠেছিলে।

এসব আমি তোমার কাছেই শুনেছি, বাবা! তোমার নিশ্চয় মনে আছে, দুজনে আমরা বহু সময় যাপন করেছি নিজেদের পিতামাতা বিশ্লেষণে।

তুমি বলতে, "শাস্ত্রে বলে, নিজেকে জানো। নিজেকে জানতে হলে পিতামাতাকে জানা নিতান্ত প্রয়োজন। তাঁরাই তোমাকে জন্ম দিয়েছেন। তোমার শিশুমন তাঁদেরই প্রভাবে তৈরী। বালক ও কিশোর কালে তুমি তাঁদের কেন্দ্র করেই বৃদ্ধি পেয়েছ। তুমি যা, তোমার মানস, তোমার রক্ত, তোমার স্নায়ুতন্ত্র, এসবের অনেকখানি তৈরী তাঁদের হাতে, তাঁদের প্রভাবে। বাবা-মার অ্যানাটমি যদি ভালো ক'রে না বোঝ, নিজেকে বুঝতে পারবে না অনেকখানি।

আমি মন্তব্য করেছিলাম, "বাবা-মা খুব কাছের হ'য়েও ত অনেক দূরে।"

তুমি বলেছিলে, "তবুতো আমরা তোমাদের অনেক কাছে। আমাদের বাবা-মা, অন্তত বাবা, ছিলেন সত্যিকারের দূরে। দূরত্ব বজায় রাখাটাই ছিল নিয়ম।"

"তাহলে তুমি তোমার বাবা-মাকে চিনলে কি ক'রে?"

"মানুষে মানুষে সম্পর্ক বড় মজার জিনিষ। অনেক দূরত্বও হঠাৎ সংকুচিত সন্নিকটে ছোট্ট হয়ে পড়ে। আবার একান্ত নৈকট্য দূরত্বে দুর্লঙ্ঘনীয় হয়।"

"তুমি মাঝে মাঝে দারুণ শক্ত বাংলা বল। যা এক্ষুনি বললে, তাতে কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব হল না।"

"আমার বাবা একদিন তাঁর অনেক দূরত্ব নিয়েও খুব কাছের মানুষের মত পরিষ্কার হ'য়ে গেলেন। আমি তখন নাগপুরে সবে এসেছি। আসবার সময়ই তুমি মায়ের পেটে বেশ নড়ছ-চড়ছ। নাগপুরে আসবার তিন মাসের মধ্যে তোমার জন্ম হল।"

"চব্বিশ বছর বয়সে তুমি একটা দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক হ'য়েছিলে।"

"ছোট্ট কাগজ। মালিক ছিলেন তখনকার সি. পি. ও বেরারের মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক ওজন ছিল কাগজটার।"

"আমি জন্মেছিলাম ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে।"

"দশ দিনের দিন। এবং তার কিছু পরেই খুলনা জেলা পাকিস্থানে স্থানান্তরিত হল। আমার বাবা-মা-ভাইবোনদের খুলনা ছেড়ে নাগপুর চলে আসতে হল।"

"বাবাকে শেষ পর্যন্ত তুমি কাছে পেলে।"

"অত সহজে নয়। যে মানুষটা সারাজীবন পরিবার থেকে দূরে কাটিয়েছে, নিজের একাকীত্ব বাঁচিয়ে, নিঃসঙ্গতাই বুঝি তার সত্যিকারের সহচর ছিল, সে হঠাৎ আপনজনের একটানা নৈকট্য সহ্য করতে পারল না। দরিদ্র হ'য়েও যে সবাকার ভরণপোষণের দায়িত্ব আজীবন সংহত দম্ভে বহন ক'রে এসেছে, বঞ্চিত করেছে নিজেকে, অন্যকে সাধ্য থাকতে নয়, হঠাৎ ছেলের রোজগারে নির্ভরশীল হ'তে তার আত্মসম্মানে দারুণ লাগল। গরীব স্কুল মাষ্টারের না ছিল সঞ্চয়, না পেনসন; পঁয়ত্রিশ বছর দেহের রক্ত আর মনের সবটুকু রস উজাড় ক'রে যে বিদ্যায়তনের সেবা হল, বিদায় দেবার সময় একমাত্র একখানা মানপত্র ও একটি ফুলের মালা ছাড়া তার শাইলক হাত থেকে আর কিছু বেরুল না। আমার বাবা আমার কাছে এ'সে নিকট হলেন না, আরও দূরে চ'লে গেলেন।"

"তাহলে তুমি তাঁকে চিনলে কি ক'রে? তাঁর কাছে পৌছলে কি ক'রে?"

"মানুষটাকে জীবনে প্রথম আমি সর্বদার জন্যে চোখের সামনে দেখতে পেলাম। আমার ওপর নির্ভরতা তাকে পীড়া দিত সর্বদা, অন্তরের জ্বালা ব্যবহারে প্রকাশ পেত, অনেক সময় বিনা কারণে অশান্তির সৃষ্টি হত, কিন্তু এত সব বেড়াজাল দিয়েও নিজেকে সে ঢেকে রাখতে পারল না। মানুষটাকে আমি চিনে ফেললাম। দেখতে পেলাম আজীবন আত্মপীড়নের ফলে একটা মানুষ ভেতরে ভেতরে একই সঙ্গে কি নিদারুণ শুভ্র এবং কালো হয়ে উঠতে পারে। বুঝতে পারলাম যে মানুষ নিজের

ভেতরে পরিতৃপ্তি পায় নি, সে একেবারে শূন্য। যে নিজেকে কেবল বঞ্চিত করে এসেছে তার মহানতার মধ্যে বিরাট নগ্ন দারিদ্র্য রয়েছে লুকিয়ে।"

"তোমার কথা একেবারে বুঝতে পারছি না, বাবা।"

"বিষয়টা এত জটিল যে তোমার ভাষায় আমি তার অনুবাদ করতে পারছি না। সবাই আমার বাবাকে আত্মত্যাগী সাধু পুরুষ বলত। নিজেকে কিছু না দিয়ে তাঁর উপার্জিত সব কিছু তিনি স্ত্রীপুত্রকন্যা ভাইপো-ভাইঝি বিধবা কাকিমাদের ভরণপোষণে ব্যয় করতেন। এক বিধবা কাকিমার মেয়ের বিয়েতে বহু কষ্টে দীর্ঘ দিনের সঞ্চয় শ' পাঁচেক টাকার শেষ পয়সাটি পর্যন্ত দিয়েছিলেন। কারুর সঙ্গে তাঁর বিবাদ ছিল না, কারুর কোনও অহিত তিনি করেন নি। দরিদ্র হ'য়েও তিনি অনেকের কাছে সম্মান এবং শ্রদ্ধা পেতেন। কিন্তু এই আত্মত্যাগে'র মূলে ছিল আত্মবঞ্চনা, যা তাঁর পক্ষে হ'য়ে উঠেছিল প্যাথলজিক্যাল, অর্থাৎ মানসিক অসুখ বিশেষ। নিজে কিছু-পাই-নি, এই সত্যকে কখনও-কিছু-চাইনি নামক অসত্যে পরিণত ক'রে আমার বাবা আত্ম-বঞ্চনার মধ্যে একটা আত্মরতি আবিষ্কার করেছিলেন, যা আমার চোখে ধরা পড়ে গেল, এবং একদিন এই নিয়ে মুখোমুখি একটা সংঘর্ষও আমাদের হ'য়ে গেল, যে-সংঘর্ষের ফলে বাবা আমার কাছে অনেকটা সহজ হ'তে পারলেন।"

সংঘর্ষের ঘটনাটা তুমি আমাকে একাধিকবার বলেছ আমার বেশ মনে আছে। আজ তোমার কাছে তোমারই জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে বিবৃত করতে আমি কিছুটা বিব্রত বোধ করছি, বাবা। ছোটবেলার শোনা কাহিনী, মনে তখন রেখাপাত করেছিল ব'লে আজও মনে আছে, কিন্তু সে ঘটনাকে আমি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার চেষ্টা করেছি, ফলে তোমার জীবনের ঘটনাটা এখন আর কেবল তোমার নেই, আমারও হ'য়ে গেছে। এ রাসায়নিক রূপান্তর বেশ কৌতূহল জাগায়, না বাবা? তোমার বাবা, তুমি, আমার বাবা, আমি, এবং আরও বহু অসনাক্ত মানুষ। আমাদের প্রত্যেকে এই ঘটনাকে নিজের মানসিক ও ব্যবহারিক রসায়নে সিঞ্চিত ক'রে নিয়েছি, এক ঘটনা বহুর কাছে বিভিন্ন তাৎপর্যে ফুটে উঠেছে। অতএব আমি যে-ঘটনার ছবি আঁকছি, তা তোমার মনে সে একই ঘটনার ছবি থেকে পৃথক হ'তে বাধ্য। আমি যখনই তোমার বাবা ও তোমার মধ্যে সেই সংঘর্ষের কথা ভেবেছি, আমার মন আলোড়িত হ'য়ে একটা নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ নাটকীয় টেকনিকে আমি ঘটনাটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি অনেকটা সহজে। নাটকীয় টেকনিকের মাধ্যমে তোমার কাছে সে ঘটনার পুনর্বিন্যাস করছি, এতে অন্তত একই কাহিনীর বাসি পুনরাবৃত্তি তোমাকে পড়তে হবে না, অন্তত খানিকটা অভিনব মনে হবে অতীতের একটা অধ্যায়কে।

নাটকের স্থান নাগপুর শহরের নিউ কলোনীতে একটা বাংলো বাড়ী, পুরান, কিন্তু বেশ বড়। বাড়ীওয়ালার যত্নের অভাব বাড়ীটার সর্বত্র লক্ষণীয়। চুণকাম হয়নি বছর পাঁচেক, দেয়ালে এখানে ওখানে প্লাষ্টার খসে পড়ছে, পাঁচটা ঘরের তিনটাতে মেঝেয় ফাটল দেখা দিয়েছে। বাড়ীটার প্রথমে একটা বড় পর্টিকো, তারপর বারান্দার দু কোণে দু খানা ছোট ঘর। বারান্দার পরে বৈঠকখানা, তার দু পাশে দুটো শোবার ঘর। বাঁদিকের শোবার ঘরের সংলগ্ন খাবার ঘর। বাড়ীটার পেছনে আর একটা বড় বারান্দা, তারপর মস্ত উঠোন, উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘর, চাকর-বাকরদের ঘর। সামনের লনে চারটে ইউকিলিপটাস গাছ, একটা আতা গাছ, পেছনের উঠোনে একটা বিরাট পেয়ারা গাছ, বড় একটা কমলালেবুর গাছও।

বারান্দায় বসে আছেন বৃদ্ধ অভয়কুমার গুপ্ত, বয়স সাতান্ন, দেখায় সাতষট্টি। মাথা ভরতি এক ঝাঁক ধবধবে শাদা চুল, গালে দু' দিনের জমানো খসখসে শাদা দাড়ি, পরণে আধময়লা ধুতি, গা খালি। অভয়কুমার গুপ্তের দু' চোখে ছানি, দেখতে পান অল্পই। তিনি বসে আছেন একটা বিরাট ডেক-চেয়ারে, তাঁর জীর্ণ দেহ চেয়ারের ভেতরে যেন হারিয়ে গেছে, বসার ভঙ্গীতে আরামকরার লক্ষণ নেই, অভয়কুমার চেয়ারটা ব্যবহার ক'রেও তার আরামটুকু গ্রহণ করতে রাজী হন নি। তাঁর স্বল্প-দৃষ্টি চোখ সামনের লন, তারপরে প্রকাণ্ড পার্ক পেরিয়ে দিগন্তে গিয়ে পৌঁচেছে, কিন্তু তাঁর সজাগ কান এবং অনেকখানি মন সতর্ক পাহারা দিচ্ছে বারান্দায় ক্রীড়ারত দুবছরের একটি শিশুকে। শিশুটি অভয়কুমার গুপ্তের নাতি, মাথাভরতি লাসটে কোঁকড়া চুল, গা খালি, ছোট্ট চাড্ডি পেটের নীচে নেমে গেছে, একটা ছোট লাঠির সাহায্যে সে কালো পিঁপড়ে তাড়া করছে। হাঁটতে শিখেছে নতুন, হামাগুড়িতেই অভ্যাস, নয়তো ব'সে ব'সে কোমর ঘসে এগিয়ে যেতে।

অভয়কুমার গুপ্ত দিগন্তে চোখ রেখেই বললেন, "দাদু, ওদিকটায় যেয়ো না, ওখানে নোংরা আছে, এদিকে এসে খেল।" নাতি একবার ফিরে তাকাল, তারপর নিষিদ্ধ দিকে অগ্রসর হল। অভয়কুমার কিছুক্ষণের জন্যে চুপ থেকে আবার বলে উঠলেন, "এদিকে এসো। আমার কাছাকাছি খেল। অত দূরে গেলে আমি দেখতে পাই নে যে।"

কাচের গেলাসে দুধ নিয়ে বারান্দায় এল অভয়কুমার গুপ্তের পুত্রবধূ, সুমিতা। সুমিতার বয়স চব্বিশ, দীর্ঘাঙ্গী, মাথার চুল গভীর কালো এবং কোঁকড়া, নেমে এসেছে ঝাঁকে ঝাঁকে সারা পিঠে, পরনে সবুজ রঙের তাঁতের শাড়ী, নীল রঙের ব্লাউজ, চোখে চশমা, কপালে ঘাম, দেখেই বোঝা যায় সে রান্না করছিল, তার হাবভাবে তাড়া। অভয়কুমার গুপ্তের খুব কাছাকাছি এসে সুমিতা একমিনিট দাঁড়িয়ে রইল, তারপর

সুমিতা : আপনার দুধ এনেছি, বাবা।

অভয়কুমার নীরব। তাঁর দৃষ্টি দিগন্তে।

সুমিতা আবার : আপনার দুধ।

অভয়কুমার নীরব। দৃষ্টি দিগন্তে!

সুমিতা, একটু বড় গলায় : দুধটা খেয়ে নিন।

অভয়কুমার : দেখ তো, ছেলেটা মাঠে নেমে গেল নাকি?

সুমিতা : না, বারান্দায়ই আছে। দুধটা খেয়ে নিন।

অভয়কুমার নীরব। দৃষ্টি দিগন্তে।

সুমিতা দুধ নিয়ে আরও মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইল। অতঃপর বৈঠকখানার মধ্য দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

অভয়কুমার বলে উঠলেন : মা কালী! মহামায়া! দাদু, কোথায় গেলে তুমি! কাছাকাছি এসে খেল। বারান্দা থেকে চলে যেও না।

বাঁ দিকের শোবার ঘর থেকে অভয়কুমার গুপ্তের স্ত্রী সুবর্ণরেখার কণ্ঠস্বর শোনা গেল : দুবার কোনও মতে লোকদেখান ভদ্রতা করে বৌ চলে গেল রান্না ঘরে। এদিকে লোকটা দু'দিন জলটুকু পর্যন্ত খায় নি। আমাদের কালে হ'লে শ্বশুরকে না খাইয়ে ভাতের গ্রাস মুখে উঠত না! বাড়ীশুদ্ধ লোক দিব্যি চার বেলা খেয়ে যাচ্ছে, আর বুড়ো মানুষটা দু'দিন ধ'রে জলটুকু খাচ্ছে না। একেই বলে কলিকাল……।

ডান দিকের শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল অভয়কুমার গুপ্তের মেয়ে সুনন্দা। বাইশ বছর বয়স বিয়ে হয় নি, একহারা ছিমছাম শ্যামবর্ণ যুবতী, চিবুকে বড় একটা তিল, ঠোঁট দুটো একটু মোটা, নাক একটু চ্যাপ্টা, কিন্তু মুখে একটা ভাসাভাসা আলগা লাবণ্য আছে! বড় বড় চোখ দুটি গভীর কালো, তাতে সুনন্দাকে ভাবুক ভাবুক মনে হয়। সুনন্দা বারান্দায় এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে বাচ্চা ছেলেটাকে এক কোণে আবিষ্কার ক'রে : এই বাপী, ওখানে বসে একমনে কি করা হচ্ছে? ও মা! মাটি খাওয়া হচ্ছে! বাবা, আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন না বাপী কি করছে ব'সে ব'সে। দেয়াল থেকে ঝরে পড়া চুণ বালি মাটি একমনে খেয়ে যাচ্ছে।

সুনন্দা ঝটপট এগিয়ে গিয়ে বাপীর হাত থেকে উপাদেয় আহার্য বস্তু কেড়ে নিল। বাপীকে কোলে ক'রে অন্দরের দিকে এগিয়ে গেল, বলতে বলতে : চান করবি চল। ক্ষিদে পেয়েছে তো বলতে পার না? চুণ মাটি খেয়ে পেট ছাড়বে এবার, দেখো। চল, তোকে চান করিয়ে দি' গে। বাপী বিশেষ প্রতিবাদ করছে না, কেবল হাতের আঙুলে অবশিষ্ট চুণ-বালি-মাটি মুখে পুরবার চেষ্টা করছে।

অভয়কুমার : নন্দা! ও নন্দা!

সুনন্দা বাপীকে কোলে ক'রেই বেরিয়ে এল।

সুনন্দা : ডাকছেন ?

অভয়কুমার : তোকে একটা প্রশ্ন করার ছিল।

সুনন্দা প্রশ্নের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। বাপী কোলে থাকতে চাইছে না। অভয়কুমার কিছু বলছেন না। বাপী নামতে চাইছে।

সুনন্দা। কি বলবেন বলুন। বাপীকে স্নান করাতে হবে।

অভয়কুমার। দাদার ঘরে ঝি-গিরি করেই কি তোর বাকী জীবন কাটবে ?

সুনন্দা চুপ। বাপী অস্থির। অগত্যা সুনন্দা বাপীকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছে। "দূরে যেয়ো না। এখানেই থাকো। এক্ষুনি স্নান ক'রে খাবে।"

অভয়কুমার। কিছু বলছিস না যে।

সুনন্দা। ঝিগিরির কি দেখলেন ?

অভয়কুমার। তুই ভাবছিস তোর দাদা-বৌদি তোকে বিয়ে দেবে ? কখনও দেবে না। সাতশো টাকা মাইনে পায়, ইচ্ছে করলে তোর বিয়ে দিতে পারে না ? তোকে দিয়ে সারাজীবন সংসারের কাজ করিয়ে নেবে। আর বুড়ো বয়সে মরা পর্যন্ত আমাকে তাই দেখতে হবে।

সুনন্দা দাদা কিন্তু বাড়ীতেই আছে।

অভয়কুমার, একটু ভ'য়ে ভ'য়ে : বাড়ীতেই আছে ? এখনও বেরোয় নি ?

সুনন্দা। না বাড়ীতে বসেই লিখছে।

অভয়কুমার। ক'টা বাজল ?

সুনন্দা। এগারটা বেজে গেছে।

অভয়কুমার। খোকা এখনও বাড়ীতেই আছে ? শরীর ঠিক আছে তো ? অসুখ-বিসুখ ক'রে নি তো ?

সুনন্দা। বোধ হয় না। কিছু শুনিনি তো।

অভয়কুমার। তোর মাকে ডাক। না, থাক্, মাকে ডেকে কিছু হবে না। সে তার নিজের দেহ নিয়েই কাতর। দিনরাত উঃ, মাঃ, গেলাম, মরলাম। পঞ্চাশ বছর ধরে রোজ মরছে। অথচ···তোর বৌদিকে ডাক। তোর বৌদি নাকি তোকে দিয়ে রোজ রাত্রিরে রাঁধায় ?

সুনন্দা। না তো। বৌদি তো দুবেলার রান্নাই দুপুরে ক'রে রাখে। মাঝে মধ্যে রাত্রে দুএকটা খাবার আমি গরম ক'রে দি।

বাঁ পাশের ঘর থেকে সুবর্ণরেখার কণ্ঠস্বর : "ওকেই সহজ বাংলায় রান্না করা বলে। আমার শাশুড়ীর আমলে আমি সকালে হেঁসেলে ঢুকেছি, বেরোতে রাত দশটা। আর

এখন। সন্ধ্যাবেলা আজকালকার বৌদের রান্নাঘরে ঢুকতে বল, কুরুক্ষেত্র। একবেলার রান্না চারবেলা খাও। সহজে আমার কিছু হজম হয় না।"

অভয়কুমার। তোর বৌদিকে ডাক।

সুনন্দা বাপীকে তুলে অন্দরে চলে গেল। অভয়কুমার আর একবার ' কালী! মহাকালী!'' ডাক ছাড়লেন। একটু পরেই সুমিতা এল। হন্তদন্ত ভাব।

সুমিতা। ডাকছেন, বাবা?

অভয়কুমার। খোকা নাকি আপিস যায় নি?

সুমিতা। না। পরে যাবে।

অভয়কুমার। অসুখ বিসুখ ক'রে নি তো?

সুমিতা। বলছে তো, ক'রে নি।

অভয়কুমার। তাহলে বাড়ীতে ব'সে আছে?

সুমিতা। আমি কি ক'রে বলবো? লিখছে।

অভয়কুমার। জ্বরটর হয় নি তো?

সুমিতা। ডেকে দিচ্ছি, আপনিই জিজ্ঞেস করুন।

অভয়কুমার, সন্ত্রস্ত হ'য়ে: না, না, ডাকতে হবে না। অসুখ করলে তুমি জানতেই।

সুমিতা। আপনার দুধটা দিয়ে যাই? দুপুরে কি খাবেন আজ?

অভয়কুমার নীরব।

সুমিতা, ধীরে, নরম গলায়: দু'দিন উপোস ক'রে আছেন, শরীর ভেঙে পড়বে! তাতে কারুর তো লাভ হবে না!

অভয়কুমার। তুমি নিজের কাজে যাও।

সুমিতা কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বৈঠকখানা দিয়ে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল।

অভয়কুমার দিগন্তে চোখ রাখলেন।

বৈঠকখানার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে অভয়কুমার গুপ্তের ছেলে, কুমারেশ গুপ্ত। পঁচিশ বছরের যুবক।

কুমারেশ দরজায় দাঁড়িয়ে আকাশের পানে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। বোঝা গেল অভয়কুমার তার উপস্থিতি টের পেয়েছেন। অভয়কুমারের দৃষ্টি দিগন্তে আবদ্ধ, কিন্তু দেহ নিজের অজান্তেই শক্ত হল।

কুমারেশ: আপনি এসব কি ছেলেমি করছেন?

অভয়কুমার নীরব। দৃষ্টি সীমান্তে আবদ্ধ।

কুমারেশ : দুদিন ধ'রে কিছু খাচ্ছেন না কেন ?

অভয়কুমার : আহারে রুচি নেই।

কুমারেশ : ক'দিন এমনি না খেয়ে কাটবে ?

অভয়কুমার : আমি তো বলেছি। আমায় কাশী পাঠিয়ে দাও। এখানে আমি আর জলস্পর্শ করব না।

কুমারেশ : আমিও তো বলছি। চোখটা কাটা হো'ক। দৃষ্টি ঠিক হলে কাশী যাবেন।

অভয়কুমার : আমি এক্কুনি কাশী যাবো। আজই।

কুমারেশ : কেন ? আজই, এখুনি যাবার দরকার কি আপনার ?

অভয়কুমার : আমি কাশীতে মরবো।

কুমারেশ : তার তো দেরী আছে। এক্কুনি তো মরতে বসেন নি।

অভয়কুমার : আমি আজই যাবো।

কুমারেশ : একা একা কাশীতে কে দেখবে আপনাকে ? মার তো একটুও ইচ্ছে নেই যাবার।

অভয়কুমার : সারাজীবন কে দেখেছে আমাকে ? তোমার মা, না তুমি ?

কুমারেশ : সারাটা জীবন একা একা অযত্নে কাটালেন। এখন দু চার বছর একটু আরামে থাকবেন তা আপনার ধাতে পোষাচ্ছে না। শুধু শুধু আপত্তি করছেন।

অভয়কুমার, হঠাৎ ভীষণ রেগে গিয়ে, চেঁচিয়ে : "একে আরাম করা বল তুমি ? চোখের উপরে মেয়েটার বয়স বেড়ে বেড়ে বিয়ের কাল পেরিয়ে গেল, তোমরা কিছুতেই ওকে বিয়ে দেবে না। তোমাদের রাজত্বে দু বেলা দু মুঠো ভাত খেয়ে চুপচাপ ব'সে থাকাকে আরাম করা ব'লা ?

কুমারেশ : রিটায়ার করার পরে তো সবাই চুপচাপ ব'সে থাকে। চোখটা সারলে টুকিটাকি কাজকর্ম করতে পারবেন।

অভয়কুমার : নিশ্চয় ! তোমার বাগানে মালীর কাজ, তোমাদের বাজার করে দেওয়া, ছেলে রাখা, এসব কাজ বেশ সস্তায় করিয়ে নিতে পারবে।

কুমারেশ, রাগ চেপে : আপনি ভীষণ বাজে কথা বলছেন।

অভয়কুমার : আমি বাজে কথা বলছি !

কুমারেশ : তা নয়তো কি ? শুধু শুধু নিজে কষ্ট পাচ্ছেন, সবাইকে কষ্ট দিচ্ছেন।

অভয়কুমার : আমি সারাজীবন কাউকে কষ্ট দিই নি।

কুমারেশ : কি ক'রে জানেন আপনি !

অভয়কুমার : কতোটুকু জানো তুমি আমাকে ?

কুমারেশ। খুব সামান্য। কোনও দিন বলেছেন নিজের কথা, যে জানবো ?

অভয়কুমার, অস্বস্তি বোধ ক'রে : বলার কি আছে !

কুমারেশ। আপনি বাবা, আমি ছেলে। ছোটবেলা থেকে রয়েছেন দূরে। ছুটিতে যখন দেশের বাড়ী আসতেন, আপনার আসার অপেক্ষায় আমরা ভাই বোনেরা উৎসাহে অস্থির হতাম, আসবার দিন সকাল থেকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম, কিন্তু আপনি যখন আসতেন, একদিনও কি আমাদের, আমাকে, কাছে ডেকে আদর করেছেন, সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, গল্প শুনিয়েছেন ? কাকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে কতো আদর করতে দেখেছি আপনাকে, দূরে দাঁড়িয়ে বুক-বোঝাই ব্যথা আর হিংসে হজম করেছি। কৈ ? জানতে পেরেছেন কিছু আপনি ? অথচ কি গভীর ভালোবাসা আপনার আমাদের জন্যে তা কি আমরা বুঝতে পারি নি ? বড় হবার পরেও কি একদিন আপনি মন খুলে নিজের কথা বলেছেন ? স্কুল পাশ করার পর কলকাতা কলেজে পড়তে যাবার পথে আপনার সঙ্গে চারদিন ছিলাম, রোজ আমাকে নিয়ে বিকেলে রেল লাইন ধ'রে হাঁটতে গেছেন, কোনও গাল-গল্প হয়েছে আমাদের মধ্যে ? আপনাকে জানবার চিনবার সুযোগ দিয়েছেন কখনও ?

অভয়কুমার, অত্যন্ত অশান্ত, তথাপি শক্ত : বাবা ছেলে কি ইয়ার বন্ধু যে সব সময় বক বক করবে !

কুমারেশ। ইয়ার না হলেও বন্ধু হ'তে বাধা কি ? আপনি আমার জনক, আমাকে জন্ম দিয়ে তৈরী করেছেন, লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন, খুলনায় চারদিন আপনার সঙ্গে বাস ক'রে প্রথম বুঝতে পেরেছি কতো কষ্টে আপনার দিন কাটতো। আমাদের ভরণপোষণের জন্যে, কিছু খাদ্য, পোষাক, শিক্ষা, এসব ছাড়া বাবার কি ছেলেকে আর কিছুই দেবার নেই ! অন্তত নিজেকে তো দেওয়া যায় ? আপনি সারাটা জীবন নিজেকে কৃপণের মতো নিজের জন্যে রেখে দিয়েছেন, আর কারুর সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে চান নি। অস্বীকার করতে পারেন ?

অভয়কুমার। এসব তোমাদের এ যুগের শিক্ষা। আমাদের বাবারাও আমাদের ইয়ার-বন্ধু ছিলেন না !

কুমারেশ। আপনি যদি বাবার কাছ থেকে মানসিক কিছু না পেয়ে থাকেন, আপনার দুর্ভাগ্য। সব অভাব বোধ সবাকার থাকে না। আপনি হয়তো সে অভাবই বোধ করেন নি। আমি করি, ছোটবেলা থেকে ক'রে এসেছি। আমি আমার বাবাকে কাছে পেতে চেয়েছি, জানতে চেয়েছি, বুঝতে, ভালোবাসতে, ভালবাসা

গেছে। আপনি বোধ হয় আমার এ দারুণ অভাব-বোধ টের পর্যন্ত পান নি আজ তাই আমার সঙ্গে বাস করতে আপনার অসহ্য লাগছে, ভয় পাচ্ছেন পাছে আপনার দূরত্ব ভেঙে পড়ে।

অভয়কুমার: তুমি বাজে কথা বলছ।

কুমারেশ: বলছি না। আপনি দরিদ্র স্কুল মাস্টার। আজীবন নিজেকে বঞ্চিত ক'রে পরের সেবা করেছেন। কিন্তু এ সত্যির মধ্যে কি অনেকখানি মিথ্যে নেই? নিজেকে সব রকম ভোগ থেকে সরিয়ে রাখাটা কি আপনার কাছে একটা কঠিন দম্ভ ও অহংকারে পরিণত হয় নি? দারিদ্র্যকে আপনি এক ধরণের সম্পদে পরিণত ক'রে নেন নি? পাছে আপনার দারিদ্র্য চ'লে যায়, পাছে জীবনে কিছু সুখভোগ হয়, এ ভ'য়ে আপনি সারাজীবন অন্য চাকরী খোঁজেন নি, একই স্কুলে সামান্য মাইনায় চল্লিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। আজ, আমার সঙ্গে বাস ক'রে আপনার আসল ভয় যে-কি আমার জানা নেই ভাবছেন? আসল ভয়, পাছে আপনার একটু আরাম হয়, পাছে আপনি আপনার দরিদ্র পরিচয় হারিয়ে ফেলেন। বলুন; আপনি ধর্মপরায়ণ, সত্যভাষী, বলুন আমি মিথ্যে বলছি কি না!"

অভয়কুমারের মুখে কথা নেই, ঠোঁট কম্পমান।

কুমারেশ: আপনি যেমন আমার বাবা, আমিও তেমনি সন্তানের পিতা। আপনাকে জানিয়ে রাখছি, আমার সঙ্গে সন্তানদের সম্পর্ক একেবারে অন্যরকম হবে। আমি সত্যি তাদের ইয়ার-বন্ধু হবার আপ্রাণ চেষ্টা করব। কারণ আমি জানি, পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের মতো স্বার্থপর, দাবীদার সম্পর্ক কিছু নেই। আমরা প্রত্যেকে দুবার ক'রে বাঁচতে চাই, একবার নিজের জীবনে আর একবার সন্তানদের জীবনে। নিজের জীবনে যা অপ্রাপ্ত তা আদায় ক'রে নিতে চাই সন্তানদের জীবনে। আমার পক্ষেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না, শুধু একটা রকমফের হ'বে। আমার নিজের জীবনে বাঁচার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের জীবনে আমি বাঁচবো নিজের ইচ্ছার দড়িতে সন্তানকে বন্দী ক'রে নয়, সন্তান যে ভাবে স্বেচ্ছায় বাঁচবে, সেই হবে সুখকর দ্বিতীয় জীবন। এ সম্ভব হবে যদি সন্তান ও আমি সত্যিকারের সুহৃদ হ'তে পারি, সত্যিকারের বন্ধু। আপনি যে পরম ঐশ্বর্য থেকে আমাকে বঞ্চিত রেখেছেন, আমি তা দুহাত ভ'রে আমার সন্তানদের দিতে চেষ্টা করব।"

অভয়কুমারের প্রায়-অন্ধ চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

কুমারেশ: কাশী যেতে চান তো যাবেন। ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব। চোখ যদি সারাতে না চান, জোর ক'রে তা আমি কিছু করতে পারবো না! কিন্তু ভাববেন না আমি আপনার চলে যাবার প্রকৃত কারণ জানি নে, বুঝি নে। বিশ্বনাথের পদতলে

মৃত্যুকামনা আপনার নেই একথা বলছি না; কিন্তু যাবার জন্যে জেদ ধরেছেন সে জন্যে নয়। তার কারণ আলাদা। আপনার সারাজীবনের সঞ্চিত দারিদ্র্য এবং আর্ত-পীড়ন আপনি হারাতে রাজী নন। আপনার ও আমার মধ্যে বন্ধুত্ব হবার সুযোগ আপনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না।

কুমারেশের গলা ভারী হ'য়ে এল। তাড়াতাড়ি সে চলে গেল অন্দরে; অভয়কুমারের দু চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগল। মোছবার চেষ্টাও করলেন না। স্থির হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপরে এক সময় সুমিতা এসে কাছে দাঁড়াল।

সুমিতা: আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে খেতে আসুন।

অভয়কুমার ধুতির কোচায় চোখ মুছলেন।

বললেন, "খোকা খেয়েছে?"

সুমিতা: উনি তো বললেন শরীরটা ভালো নেই, এবেলা খাবেন না।

অভয়কুমার: শুয়ে আছে?

সুমিতা: আপিসে চলে গেলেন। বললেন, রাত্রে খাব, বাবাকে খাইয়ে দিও।

অভয়কুমার: তুমি যাও। আমি আসছি।

•

এ ঘটনাকে, বাবা, আমার নাটকীয় মনে হয়েছে প্রধানত দু'কারণে। তুমি সাক্ষাৎ আক্রমণে ভেঙ্গে দিয়েছিলে সে দুর্গটাকে যার মধ্যে সারাজীবন তোমার পিতা অভয়কুমার গুপ্ত নিজেকে সবার কাছ থেকে, তোমাদের কাছ থেকে, সরিয়ে সযত্নে রক্ষা করে এসেছিলেন। তোমার আক্রমণের অভাবে সে দুর্গ ভাংতো না, অভয়কুমার নির্ভয়ে বাকী জীবন সে আশ্রয়ে কাটিয়ে দিতেন, তোমাদের মধ্যে ব্যবধান ঘুচবার সম্ভাবনা তৈরী হ'ত না। ঘটনার পরে অভয়কুমার কাশী যাবার বাসনা স্থগিত রেখেছিলেন তিন বছর, সে সময়টাতে তোমাদের মধ্যে আদান-প্রদানের সেতু নির্মিত হ'য়েছিল। এ ঘটনার দ্বিতীয় নাটকীয় তাৎপর্যের সঙ্গে আমি জড়িত। তুমি যদি অমনি ক'রে তোমার বাবার দুর্গকে না ভাংতে, হয়তো-বা তোমাকে ঘিরেও একদিন একটি দুর্গ তৈরী হত, আমাকে থাকতে হত তার বাইরে, পিতামহ পিতা, বাবা-তুমি এই ধারাবাহিকতায় পিতাপুত্রের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের যে সংস্কৃতি তৈরী হয়েছিল, তোমার-আমার মধ্যেও তারই রাজত্ব বজায় থেকে যেতো। ভাগ্যিস তুমি সেদিন তোমার বাবার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলে ছেলের সঙ্গে ইয়ার-বন্ধুর সম্পর্ক হবে!

পিতা-পুত্রে বন্ধুত্ব সোজা নয়, তুমি আমি বিলক্ষণ জানি। সন্তান বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মাকে যেমন জড়িয়ে থাকে, তেমনি আঘাত দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে

নিজের স্বাতন্ত্র্য জাহির করতে চায়। বাবা-আর ছেলের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী প্রতিযোগিতা গড়ে ওঠে, একে অন্যকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। দুজনের সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসার সঙ্গে ঈর্ষা মিশে যায়। মা আর মেয়ের মধ্যেও তাই। তোমার আমার মধ্যে আজ যে বন্ধুত্ব আমাদের দুজনেরই সমান অর্জিত, তার পথ সুগম সহজ ছিল না, তাও আমরা দুজনেই জানি। তুমি আমাকে না আমি তোমাকে বেশি আঘাত করেছি সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারে যে নিরপেক্ষ বিচারক সে কোথায়? অনেক আঘাতের পরেও যে আমাদের বন্ধুত্ব টিকে আছে, বরং মজবুত হয়েছে, তার জন্যে দায়ী বোধকরি তুমিই বেশি। না, বাবা, বিনয় করছি না, বিনয় বৃদ্ধের ভূষণ, ওটা আমার একেবারে আসে না, আমার বরং কিছুটা উগ্র অহংকার পছন্দ, যার অভাবে আমরা সবাই স্তিমিত বংশবদের ভূমিকায় নিস্তেজ, কর্তার হ্যাঁ ও না-র বাইরে যাবার অধিকার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের অপ্রাপ্ত।

আমি অন্য পৃথিবীর মানুষ, এ যদি কল্পনা-বিলাসও হয় তবু আমার কাছে যেমন প্রিয় তেমনি প্রয়োজনীয়। প্রথম এবং প্রধান কথা: আমি জন্মেছি স্বাধীন ভারতবর্ষে। তোমরা, তোমাদের বাবা-ঠাকুর্দারা, জন্মেছ পরাধীন দেশে। স্বাধীনতা এবং পরাধীনতার যদি রাত-দিনের প্রভেদ থাকে, আছে বলেই তো তোমরা-আমরা সবাই সব দেশে ঘোষণা ক'রে থাকি, তাহলে তোমরা জন্মেছ রাত্রির অন্ধকারে, আমি দিনের আলোয়। আপাতদৃষ্টিতে পরিবর্তন অনেকের চোখে না পড়তে পারে, মনে হ'তে পারে স্বাধীন ভারতবর্ষের সঙ্গে পরাধীন ভারতবর্ষের অমিলের চেয়ে মিল বেশি, কিন্তু তা সত্যি নয়। যা সত্যি, এবং যা সবচেয়ে করুণ সত্যি, তা হ'ল তোমরা। যারা পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মেছ, বড় হয়েছ, এবং তারপরে একদিন স্বাধীন ভারতের প্রথম পংক্তির নাগরিকত্ব লাভ ক'রে বসেছ। তোমাদের মনে পরাধীন ভারতবর্ষের প্রভাব এত বেশি, তোমরা বুঝতে পারো নি স্বাধীন ভারতবর্ষে জন্মে আমরা আলাদা জীবনের আস্বাদের অধিকারী; তোমরা, তোমাদের জীবনের, পরাধীন জীবনের ছাঁদে আমাদের স্বাধীন জীবনকে তৈরী করতে চেয়েছ। তোমাদের কাছ থেকে পাই নি আমরা স্বাধীন দেশে জন্মে জীবন গঠনের আজ্ঞা নির্দেশ, তোমাদের জীবনসত্তার আসল অংশ পরাধীন, তোমরা আমাদের কেবল মেনে চলতে শিখিয়েছ, কেবল বাধ্য হ'তে, প্রতিবাদ না করতে, বর্জন না করতে, শিখিয়েছ কেবল কি ভাবে সংকীর্ণ চেনা-জানা পথে, গা বাঁচিয়ে, মান বাঁচিয়ে, দু পয়সা আখেরে গুছিয়ে নেওয়া যায়, শিখিয়েছ কি উপায়ে সবাইকে একসঙ্গে সন্তুষ্ট রেখে, কাউকে না চটিয়ে, কর্তাভজা সংস্কৃতির প্রাচীন গলিপথে সতর্ক পা ফেলে, মিথ্যা ব'লে, ভাবের ঘরে কারচুপি ক'রে সাকসেস নামক ভেজাল পুরস্কারের পেছনে ফেউ হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। আমরা যে স্বাধীন দেশের

প্রথমজাত সন্তান এ সত্যটা তোমাদের কাছে অচেনা, তাই আমাদের কাছেও অজানা অচেনা রাখতে তোমরা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে এসেছ।

জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে শিশু একান্ত মাতৃনির্ভর। পিতাকে সে আবিষ্কার করে বেশ একটু পরে। আবিষ্কার করে মার দখল নিয়ে শরিকানায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। বালক-শিশু অচিরে বুঝতে শেখে মাকে নিয়ে বাবা আর তার নিজের মধ্যে ভাগাভাগির লড়াই চলছে। সে মাকে পেতে চায় একান্ত রূপে, পুরোপুরি, বাবার সঙ্গে ভাগ ক'রে নয়। বাবা এই দখল-ক্ষেত্রে তার প্রথম ও প্রধান অন্যপক্ষ, প্রতিযোগী, শত্রু।

তোমার সঙ্গেও, বাবা, আমার প্রথম দ্বন্দ্বযুদ্ধ মাকে নিয়ে। তুমি মাকে ভালোবাসো, মা তোমাকে, শিশুকালে এ সত্য ছিল আমার কাছে দুঃসহ; তোমাদের দুজনকে একত্র ঘনিষ্ঠ দেখলে আমার দেহে-মনে একটা দুর্বোধ্য জ্বালা সৃষ্টি হত, তোমাদের দুজনকে আলাদা ক'রে দেবার দুর্বার বাসনা।

অথচ এরই সঙ্গে তোমাকে এবং মাকে একান্ত ক'রে পাবার দুরন্ত আকাঙ্খা। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব নিয়ে আমি বড় হ'য়েছিলাম, হ'তে হ'তে তোমাকে এবং মাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম, কেননা আমাদের 'সংসার'টা ছিল প্রধানত চারজনের, তুমি, মা, মিতু আর আমি, তোমরা আমাদের বাদ দিয়ে নিজেদের জীবন যাপন করো নি, অনেক বাবা-মা যেমন ক'রে থাকে, আমাদের বাড়ীতে আয়ার কাছে রেখে দীর্ঘরাত্রির পার্টি, অথবা লেট-নাইট সিনেমা, অথবা এখানে-ওখানে ঘোরা-ফেরা ছিল না তোমাদের জীবনে, এখানে তোমার বাবার সঙ্গে আমার বাবার মিল নেই একটুকু, তোমার বাবাকে তুমি পেয়েছ সামান্য, আমার বাবাকে আমি পেয়েছি অনেক, বুঝি বড় বেশি, তার জন্য আমাকে কোনও চেষ্টা করতে হয় নি, তুমি নিজেই অনেক-বেশি ক'রে উপস্থিত আমার জীবনে, যেমন ছিলেন তোমার বাবা তোমার জীবনে অনেক-বেশি অনুপস্থিত। তোমার সঙ্গে 'শত্রুতা' আমার বাড়তিমানসে তোমার বিশাল উপস্থিতি নিয়ে নয়, আমার, একান্ত আমার মাকে নিয়ে তোমার জুলুম নিয়ে।

এ সংঘাতে, ভাবতে অবাক লাগে, আজ এই এতগুলি বছরের ব্যবধানে, মিতু আমার মিত্রপক্ষ ছিল না। মিতুর সঙ্গে বয়সের ব্যবধান তো আমার মাত্র পনের মাসের, যার মানে আমি জায়গা খালি করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মার পেটে মিতু স্থান

পেয়েছিল, তাহলেও একেবারে শিশুকাল থেকেই মিতুর কাছে আমি ইয়া-মস্ত আস্ত একটা দাদা, ডাকত আমাকে দাদা বলে, আর কী মাস্তটাই না করত, এখনও নিউ ইয়র্কে মিতুর ফ্ল্যাটে ব'সে বছরে অন্তত দু'বার আমরা সেই পুরান দিনের স্মৃতিচারণ করে হেসে অস্থির হই। মিতু একেবারে শিশুকাল থেকেই মেনে নিয়েছিল, জেনে ফেলেছিল যে সব কিছুতে, এমন কি বাবা-মা'তেও, আমার দাবী আগে, ওর পরে। এ সত্যটাকে এমন উদার দার্শনিকতার সঙ্গে মিতু ছোটবেলা থেকে মেনে নিয়েছিল, এত কম হিংসা, দ্বেষ, রেশারেশি আর প্রতিযোগিতার সঙ্গে, এমন সুন্দর অনহমিকায়, যে অনেক সময় আমার মনে হ'ত, মিতুর দেহে মনে বুঝি উত্তাপের অভাব। আমার বিশ্বাস মিতু জন্ম থেকে কিছুটা বৈরাগী, ভালোবাসতে বেশি খুশি ভালোবাসিত হবার চেয়ে, অথচ মিতুর মনের সমস্ত প্রাঙ্গন জুড়ে ভালোবাসা পাবার আকাঙ্খা কি ভাবে স্তরে স্তরে জমে উঠেছিল বড় হবার মধ্যম পর্য্যায়ে বুঝতে পেরে দারুণ বিস্ময় আর ব্যথা লেগেছিল আমার, আজও স্পষ্ট মনে পড়ে।

মনে আছে, বাবা, তোমার সঙ্গে প্রথম দ্বন্দ্ব আমার মার বুক নিয়ে। শুনেছি, আমি যখন একান্ত শিশু, আমার স্তন্যপান দেখতে তুমি ভালোবাসতে। কথাটা মা বলেছিল একদিন কথায়-কথায়, তখন আমি অনেকটা বড় হয়েছি, স্কুলে যাই। তুমি একটা ক্যালেণ্ডার এনেছিলে, বড় একটা ছবি, মার খোলা বুকে শিশু স্তন্য পান করছে। স্কুল থেকে এসে বই পত্র রেখে খাবার ঘরে যাবার সময় লাউঞ্জের দেয়ালে ছবিটা দেখে আমি কেমন সম্মোহিত হ'য়ে গেলাম। হঠাৎ মনে হল আমার মার বুকও নিশ্চয় অমনই সুন্দর, আর আমিও নিশ্চয় এমনি ক'রে দুধ খেয়েছি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, মার মুখে নিশ্চয় এমনি তৃপ্তি, স্নেহ, মমতা আর অহংকার একসঙ্গে হাজার দীপ জ্বেলে দিয়েছে। কতক্ষণ ছবির পানে তাকিয়েছিলাম মনে নেই, মার ডাকে চমক ভাঙল, খাবার ঘরে টেবিলে ব'সে খেতে ইচ্ছে করল না।

মা বলল, "কি রে, খাচ্ছিস না যে!"

আমি প্রশ্ন করলাম, "লাউঞ্জের দেয়ালে ছবিটা কে আনল, মা?"

"বাবা এনেছে। নে, খেতে শুরু কর।"

আমি হঠাৎ বলে বসলাম, "মা, তোমারও তো অমনি দুদু আছে, না?"

মার ফর্সা মুখ রাঙা হ'য়ে উঠল। বলল, "তুই জানিস নে আছে কি নেই?"

"কৈ? আমাকে দেখতে দাও না কেন?"

মা যে বিব্রত বোধ করছে বুঝতে পারলাম সহজেই। কিন্তু মাকে সব সময় যা দেখেছি, একটু বিব্রত ভাব কাটিয়ে উঠে বেশ সহজ ভাবে বলল, "তুমি তো এখন বড় হ'য়েছ, বড় হয়ে মার দুদু ছেলেরা খায় না, দেখেও না।"

"ছোট্ট বেলা দেখতাম ?"

"নিশ্চয়। অবশ্যি, একটুখানি খাবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ বুজে আসত।"

"আর তুমি অমনি খুশি হ'য়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে ?"

"থাকতাম বই কি! সব মা-ই থাকে। তোমার বাবাও তোমার দুদু খাওয়া দেখতে ভালবাসত।"

কথাটা আমাকে ভীষণ আঘাত করল। রেগে উঠেই বললাম, "কেন? বাবা দেখত কেন?"

"বাঃ, দেখবে না? ছেলে দুধ খাচ্ছে, বাবার দেখতে ইচ্ছে হবে না?"

"সব সময় দেখত ?"

"সব সময় দেখবে কি ক'রে? বাবার আপিসে কাজকর্ম ছিল না? কখন সখন দেখত।"

তবু ভাল। তাহলে এমন অনেক সময় ছিল যখন মা আর আমার মধ্যে বাবার ব্যবধান থাকতো না।

মা খাবার তাড়া দিতে, খেতে শুরু করলাম। একটু পরে বললাম, "আমার দুদু দেখতে ইচ্ছে করছে।"

মা এবার রেগে উঠল, "কেতু, দুষ্টুমি কোরো না। খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি।"

আমি বায়না ধরে বসলাম, "দুদু দেখব।"

মা মিষ্টি ক'রে অনেক কিছু বলল, যার কেবল একই অর্থ, আমি বড় হয়েছি, দুদু দেখার দিন আর আমার নেই।

এমন নিদারুণ নিষ্ঠুর সত্যকে আমি কিছুতেই সেদিন মানতে চাইলাম না। খাওয়া বন্ধ ক'রে কাঁদতে লাগলাম। "বড় হওয়া বিচ্ছিরি! চাইনে বড় হ'তে আমি।"

মাকে আমি ভীষণ বিব্রত আর নাস্তানাবুদ করেছিলাম সেদিন। মা অনেক বোঝাল, বেড়াতে নিয়ে যাবার লোভ দেখাল, শান্তিপথে গিয়ে আইসক্রীম খাবার, কিন্তু আমার মাথায় কি দারুণ খেয়াল চেপেছে, আমি মানলাম না, শেষ পর্যন্ত মা ঠাস ক'রে গালে চড় বসিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিতু তখন শোবার ঘরে নিশ্চিন্ত ঘুমুচ্ছে।

আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বসবার ঘরে ডিভানে, জেগে দেখি মিতু ব'সে আছে পাশে, বুঝি-বা আমার ঘুম ভাঙ্গার প্রতীক্ষায়।

মিতুকে দেখে আবার আমার মন বিগড়ে গেল।

"কি করছিস এখানে?" যেন মিতু দারুণ কোনও অপরাধ ক'রে বসেছে।

"দাদা, তোকে একটা কথা বলা হয় নি। শুনবি?"

"কি কথা ?"
"বাবা গাড়ী কিনছে।"
"জানি। ভারী নতুন কথা হল।"
"না রে তা নয়। বাবা গাড়ী পাচ্ছে।"
"জানি। পাবেই তো।"
"না রে তা নয়। বাবা এক্ষুনি গাড়ী পাচ্ছে।"
"এক্ষুনি ? আজই ?" এটা বড় খবর বটে।
"না রে, তা তো জানি না। মাকে বাবা কাল রাত্রে বলছিল।"
"কি বলছিল ?"
"কেতু-মিতুকে এখন কিছু বোলো না। গাড়ীটা নিয়ে এসে অবাক ক'রে দেব।"
"সত্যি ?"
"সত্যি নয়তো কি ?"
"কবে আসছে রে ?"
"তা কি ক'রে জানবো ?"
"আজও নিয়ে আসতে পারে বাবা ?"
"আজ বোধহয় আনবে না।"
"কি ক'রে জানলি ?"
"তাহলে মা তোকে মারতো না।"
"কাল আসবে ?"
"কি ক'রে জানবো ? বাবাকে জিজ্ঞেস করবি ?"
"বাবা আসুক।"
"মার খেলি কেন ? কি ক'রেছিলি ?"
"কিছু না।"
"বল না ! তোকে যে আমি গাড়ীর কথা বললাম !"
"দুদু দেখতে চেয়েছিলাম।"
"কেন ?"
"এমনি।"
"মা কি বলল ?"
"বড় হয়েছ, এখন ওসব দেখতে নেই।"
"তুই বুঝি কাঁদতে শুরু করলি ?"
"বাবা তো কতো বড়। বাবা তো রোজ দেখে।"

ততক্ষণে অবশ্য গাড়ী আসবার সম্ভাবনায় আমার মার-দুদু-দেখতে-না-পাবার দুঃখ কেটে গেছে। কিন্তু মার ওপরে দখল নিয়ে তোমার সঙ্গে লড়াই আমার অনেকদিন কাটে নি, অনেক দিন।

তোমাদের বালককালে, বাবা, মেয়েদের গা-ঢেকে রাখার বাড়াবাড়ি খুব কম ছিল। নীরদ চৌধুরী মশাই তাঁর একটি বইতে দেখিয়েছেন গ্রামীণ হিন্দু সমাজ পঞ্চাশ বাট বছর আগেও কি ভয়ানক 'অশ্লীল' ছিল। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ক বেশি ছিল কিনা কথাটা তা নয়, যদিও আমার পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে বাল অথবা যুবতি বিধবারা সারাজীবন পুরুষহীন থাকত, এবং পরভৃতিকারা কেবল স্বামীর গ্রামে ফেরার অপেক্ষায় দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়ে যেত। জীবনের কতকগুলি অমোঘ অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, যার আওতা থেকে মানুষের রেহাই সহজসাধ্য নয়। তোমার মুখে শুনেছি তোমাদের বাল্যকালে স্ত্রীলোকেরা 'মাসিকে'র সময় রক্তমাখা শাড়ি পরে নির্বিবাদে চলাফেরা করত, তোমরা কোনও রকম কৌতূহল পর্যন্ত অনুভব করতে না। ব্রা, ব্লাউজ, সেমিজ পরার রীতি তখনও চালু হয় নি ; যে বিবাহিতা যুবতী মা হয়েছে, তার লজ্জা সরম নিয়ে বাড়াবাড়ি আদিখ্যেতা মনে করা হত। তোমরা ছোটবেলা থেকে, অতএব, নারীদেহ দেখবার সুযোগ পেতে, অন্তত নারী দেহের উর্ধাঙ্গ নিয়ে বুঝি ভীষণ কিছু কৌতূহল তোমাদের ছিল না। অন্তত মার বুক দেখতে পাওয়া নিয়ে দাবী-দাওয়া তোমাদের বালককালে নিশ্চয় অবিশ্বাস্য ছিল। তুমি কি ভাবতে পার, বাবা, দশ বছরের বাল্যকালে দুদু-দেখব আবদার তুলেছ তোমার মার কাছে, আর তার পরিণতি ঘটেছে মার হাতে ঠাস ক'রে চড় খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ায় ?

আমার মা এ বিষয়ে তোমার মার একেবারে বিপরীত। শুনেছি আমি যখন একেবারে শিশু মা আমাকে ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে দুধ খাওয়াত। তোমাদের বাড়ীর সবাই, তোমার মা, কাকিমা, পিসিমা, বোনেরা এ নিয়ে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ করতে ছাড়েনি, কিন্তু, একমাত্র তুমি ছাড়া, অন্য কারুর সামনে ব্লাউজ-বডিস খুলে ছেলে-মেয়েকে দুধ খাওয়ান মার পক্ষে সম্ভব হত না। একটু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি আর মিতু আলাদা ঘরে শুতাম, তোমাদের ঘরের সংলগ্ন দ্বিতীয় শোবার ঘরে, আমাদের জন্যে দুটো স্পেশাল পালংক তৈরী করিয়েছিলে তুমি, যা এখনও তোমাদের কাছে সযত্নে রক্ষিত। পাঁচ বছর বয়সের পর মা আমাকে কখনও বুক স্পর্শ করতে দিত না, আমি ছুঁতে চাইলে রাগ করত, ছুঁয়ে দিলে তক্ষুনি হাত সরিয়ে দিত। মা কাপড় ছাড়বার সময় কাছে থাকা আমার বারণ ছিল, আমাকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে কাপড় ছাড়ত মা, অথচ তুমি বেশ ঘরেই থাকতে, মিতুও। এরকম অনেকগুলো ছোটখাট,

আমার কাছে অনেক বড়, পর্দা তুলে দিয়েছিল মা তার আর আমার মধ্যে, যার ফলে মা আমার কাছে রহস্যময়ী হ'য়ে গিয়েছিল, কৌতূহলের বস্তু, এক অভিনব অনন্ত বিস্ময়, এবং সঙ্গে সঙ্গে, তোমার সঙ্গে একটা কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্ম নিয়েছিল, আমার কাছে খুব কঠোর, যেহেতু আমি অন্যান্য সব বিষয়ে তোমার নিকটতম সঙ্গ কামনা করতাম, এবং এই একক প্রতিযোগিতায়, জানতাম, তুমি জিতছ, জিতবে, আমার পরাজয় সুনিশ্চিত।

এ জটিল পরিস্থিতি একটা বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। তুমি আর মা জানতে না যে আমিও এ অবস্থাটা ভাল করেই জানতাম। কিন্তু তোমাদের মতো, আমিও নিঃসহায় ছিলাম।

পাশের ঘরে তুমি এবং মা যখনই প্রেম করতে, তোমাদের চরম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসবার সময় আমি নির্ঘাৎ জেগে গিয়ে 'মা' বলে ডেকে উঠতাম।

কখন সখন নয়, প্রায়ই এ ঘটনা ঘটত।

তোমরা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে যা বলতে আমি তা শুনতে পেতাম।

মা বলত, 'কেতুটার কি এক রোগ হয়েছে, এ সময় জেগে যাবেই।'

তুমি বলতে, 'তোমাকে আর কেউ ভালোবাসে, ওর সহ্য হয় না।'

মা বলত, 'যত সব অদ্ভুত বাজে কথা.'

তুমি বলতে, 'ইডিপাস কমপ্লেক্সটা তো মিথ্যে নয়।'

মা বলত, 'কি ক'রে যে ও বুঝতে পারে কে জানে? গভীর ঘুমের মধ্যেও নির্ঘাৎ জেগে যায় আর আমাকে ডেকে ওঠে।'

তুমি বলতে, 'বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সেরে যাবে।'

তোমাদের এসব কথাবার্তা হত, মা আমার কাছে এসে আমাকে 'ঘুম পাড়িয়ে' চলে যাবার পর।

আমি জেগে উঠে ডাকবার সঙ্গে সঙ্গেই মা আসত না। আসত কিছুক্ষণ পরে। আর সে কিছুক্ষণ আমার কাছে অসহ্য সুদীর্ঘ সময় মনে হত।

মা এসে কখনও আমাকে একটুও বকত না। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলত, 'কি, কেতু, জেগে উঠলে কেন? স্বপ্ন দেখেছ? জল খাবে?'

আমি মাকে জড়িয়ে ধরতাম। "তোমার কাছে শোব।"

কখনও মা আমার পাশে শুয়ে পড়ত।

কখনও আমি আবদার করতাম, 'তোমাদের সঙ্গে শোব।'

আবদার মাঝে মধ্যে মঞ্জুর হত। আমি তোমার আর মার মাঝখানে শোবার লোভনীয় সুযোগ পেতাম। মিতু শুত মার পাশে। আর তখন আমি কি করতাম

তোমার কি মনে আছে, বাবা? তখন আমি মাকে ছেড়ে দিয়ে তোমার গা ঘেঁষে তোমাকে জড়িয়ে শুয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তাম।

বড়দের পৃথিবীতে তোমরা আমাদের নিয়ে আস, বাবা, অথচ কি প্রচণ্ড লড়াই না করতে হয় তোমাদের জগতে প্রবেশপত্র পেতে, কি কৃপণ কঠিন ব্যবস্থার দেওয়াল তুলে তোমরা আমাদের সে-পৃথিবীর বাইরে রেখে দাও। প্রতিটি শিশু, বালক, কিশোরকে এই মহা-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তোমাদের জগতের ছাড়পত্র পাবার ব্যর্থ সংগ্রাম। অথচ এমন ব্যাপক তোমাদের স্বৈরাচার যে তোমরা আমাদের শিশু, বালক, কিশোর জগতটাকে প্রতি মুহূর্ত খেয়ালখুশি অনধিকার প্রবেশে তচনচ ক'রে দাও, ছোট হয়েও স্বাতন্ত্র্যবোধের অধিকার আমাদের তোমরা দিতে চাও না।

আরও সহজ ভাষায় বলি: তোমাদের জগতে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। আমাদের জগতে তোমাদের প্রবেশ নিষেধ নয়, নিয়ম।

তোমরা দুএক, দুতিন, দুচার জন কথাবার্তা বলছ, আমরা কাছে গেলে একক বা সমবেত কণ্ঠের ধমক বেরোয়: 'তোরা কি কচ্ছিস বড়দের মধ্যে? যাঃ বেরো!'

আমরা দুই, তিন বা ততোধিক শিশু একত্র হলে, তোমরা নির্ঘাৎ আমাদের পৃথিবীকে ভেঙে চুরে তচনচ ক'রে দাও; 'কি করছিস রে তোরা ওখানে বসে! কি সলাপরামর্শ গুজগুজ হচ্ছে!'

আমাদের তোমরা একটুকুও বিশ্বাস করো না, শ্রদ্ধা করো না, মানো না। তোমরা কেবল চাও আমরা একটানা নিরেট ভাবে তোমাদের শ্রদ্ধা করবো, মানবো।

অথচ, বাবা, তোমাদের বড়দের কিন্তু নিজেদের ওপরেই বিশ্বাস নেই, অথবা শ্রদ্ধা। তোমরা জানো প্রাপ্তবয়স্ক জীবন ছলনা, প্রতারণা, জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যা, লোভ, লালসা, হিংসা, হত্যা, জিঘাংসা, ঘৃণা আর পারস্পরিক দুষমনীর জঙ্গল। এ জঙ্গলের পরিচয় আমরা যাতে সহজে না পাই তার জন্যে তৎপরতার সীমা থাকে না তোমাদের। তোমাদের গল্প-সল্পে, রসিকতায়, আনন্দ-আহ্লাদে নিশ্চয় এত বেশি ভেজাল যে আমাদের সামনে তা বেআব্রু করবার সাহস তোমাদের নেই। অথবা, ভেজাল মাল সম্ভোগে এমনই সর্বগ্রাসী লোভ তোমাদের যে আমরা তার ধারে কাছে থাকি তাও তোমাদের অসহ্য।

অথচ, কি ছেলেমানুষিই না তোমরা ক'রে থাক আমাদের নিয়ে, আমাদের খোলা চোখের সামনে। তোমরা ভাব আমরা শিশুরা বুঝি অতি সরল, অতি বোকা, অতি পবিত্র। জানতেও পার না, জ্ঞান হবার পর থেকে তোমাদের ছলচাতুরি ঢাকঢাক লুকোলুকির সঙ্গে পাল্লাভাড়া ক'শে আত্মরক্ষা আর আত্মবর্ধন করতে কতটা বুদ্ধি আর চাতুরি ব্যবহার করতে হয় আমাদের।

একশটা পাঁচ-বছরের শিশুকে যদি সত্যি কথা বলাতে পার দেখবে একশজনই বলবে তারা জানে তাদের বাবা-মা লুকিয়ে লুকিয়ে রাত্রির অন্ধকারে কি করে।

তোমরা আমাদের বেত হাতে ক'রে 'প্রথম ভাগ' মুখস্ত করাও, অথবা তারই অন্য কোনও আধুনিক সংস্করণ, মানে না বুঝতে পেরেও; আমরা টিয়াবুলির মত উচ্চারণ করি, সদা সত্য কথা বলিবে; এবং তোমরাই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হুকুম দাও, 'লোকটাকে বলে দাও বাবা বাড়ী নেই,' বাবা বাড়ী থাকা সত্ত্বেও।

তোমাদের জগতের মিথ্যা, অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, অনাচার, যা হয় তোমাদের সৃষ্টি, নয় যা তোমরা মাথা পেতে গ্রহণ করো, প্রতিবাদ করার কথা ভাবতেও পার না, তার সঙ্গে শিশুকাল থেকে আমাদের জুড়ে দাও, যাতে আমরাও মানি, প্রশ্ন করি না, প্রতিবাদ করিনা, বর্জন করবার মত ধৃষ্টতা, সাহস কদাপি হয় না আমাদের।

তোমাদের ঈশ্বর, আল্লাহ, তেত্রিশকোটি দেব-দেবী, তোমাদের মনসা-মঙ্গলচণ্ডী-শেতলা, তোমাদের নীতি নিষেধ-বিধি-বিধান আমাদের মাথা নীচু, মন ভীতু, প্রাণ ধুক-ধুক ক'রে রাখার এক মহাকায় ব্যবস্থা।

কি হাস্যকর তোমাদের পরস্পর বিরোধী শিশু-বালক-কিশোর শাসন বিধান। একদিকে তোমরা চাও আমরা কেবল একটানা 'ভাল ছেলে' 'ভাল মেয়ে' হ'য়ে থাকি। 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভাল হ'য়ে চলি।' সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ভাল-হ'য়ে-চলার মন্ত্র জপ। চলার পথ সুনির্দেশিত। 'আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে', তাই যেন আমি বিনা প্রশ্নে, সোৎসাহে একবাক্যে পালন ক'রে যাই। আমাদের সুশীল-সুবোধ-সুবাধ্য-সুবিনীত ক'রে তোলার আয়োজন কিছু কম নেই। যে সব নীতিকথা সারাজীবন তোমরা অমান্য কর, সেগুলোকে মুখস্থ এবং 'প্র্যাকটিস' ক'রে আমাদের যাত্রারম্ভ। অথচ এরই সঙ্গে আমাদের তোমরা দাও তোমাদের প্রাপ্তবয়স্ক কালচারের অন্য দিকটাও। সেক্স, ভায়লেন্স্‌, ক্রাইম, মার্ডার; এ-সব বিশ্বব্যাপী পণ্যের যে বিরাট সম্ভার বালকমন 'মজবুত' করবার জন্যে সমবেত, তার জন্মও তোমাদেরই মস্তিষ্কে, তোমাদের মেহনতে। তোমরা একদিকে আমাদের দূষিত করবার বিরাট ব্যবস্থা তৈরী রাখ, অন্যদিকে আমরা দূষিত হ'লে কুমীর কান্নার তোমাদের শেষ থাকে না।

আসল কথাটা, তাহলে, কি দাঁড়াল, বাবা? তোমরা প্রাপ্তবয়স্করা, বড়রা, তোমাদের, পৃথিবীব্যাপী তোমাদের, জীবনটাকে, এবং তার সঙ্গে গোটা পৃথিবীকে, বিস্বাদ, বিপন্ন ক'রে তুলেছ। সঙ্গে সঙ্গে বিপন্ন করে রেখেছ আমাদের বর্তমান, ভবিষ্যৎ। অথচ আমাদের নিয়ে তোমাদের বিলাপের শেষ নেই!

সংখ্যায় কিন্তু আমরা অনেক, বেশি তোমাদের চেয়ে। ভারতবর্ষেই, ধরো না

কেন, একশ'জন মানুষের মধ্যে বিয়াল্লিশজনের বয়স ষোল বছরের নীচে। একই অবস্থা চীনে, আমেরিকায়, রাশিয়ায়, এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার সব দেশে। আমরা তোমাদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি। তবু তোমরা আমাদের দাবিয়ে রেখেছ বহু হাজার বছরের সামাজিক, জৈবিক, সাংস্কৃতিক নিয়মে। জন্ম থেকে যে আমরা তোমাদের ওপর অসহায় নির্ভরশীল, এই প্রাকৃতিক সত্যের সম্পূর্ণ সুযোগ চিরদিন তোমরা নিয়ে এসেছ, আজ নিচ্ছ আগের চেয়ে অনেক বেশি। তুমি যদি পাশ্চাত্য পৃথিবীতে বাস করতে তা হলে আরও পরিষ্কার বুঝতে পারতে আমার নালিশের মানে, এ শুধু আমার নালিশ নয়, পৃথিবীর সমস্ত সমবেত বালক-যুবকদের নালিশ। য়ুরোপে আমেরিকায় তোমরা পিতারা কিভাবে সন্তানদের প্রতি 'কর্তব্যপালন' করছ তার দুচারটে নমুনা দি, আমার নালিশ পরিষ্কার হবে।

রাজনীতি নামক রণনীতির দুর্ব্যবহার করতে করতে তোমরা দুনিয়াটাকে বার বার দিয়েছ যুদ্ধের মুখে ঠেলে, শেষটা এমন সব মারণাস্ত্র তৈরী ক'রে বসেছ যার ব্যবহার হলে সভ্যতার আর কিছু বাকী থাকবে না, পৃথিবীর বেশি ভাগ পরিণত হবে মহাশ্মশানে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সায়ান্স আর টেকনলজির যুগ্ম বিপ্লবের সুযোগে তোমরা পিতারা হঠাৎ উচ্চ মধ্যবিত্তে পরিণত হয়েছ, তোমাদের শহরতলীতে বাড়ী হ'য়েছে, দুখানা গাড়ী, ঘরে ঘরে টেলিভিশন সেট।

তোমাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ পিতারা মধ্যবিত্ততার সন্ধান পেয়েছে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের কারখানায় চাকরী করে। যুদ্ধশিল্পকে ক'রে নিয়েছ তোমাদের সভ্যতার বলিষ্ঠতম স্তম্ভ। তাই মহাযুদ্ধ না চাইলেও তোমরা বেসরম দৃঢ়তার সঙ্গে চেয়ে আসছ পূর্ণতম যুদ্ধপ্রস্তুতি। পৃথিবীর কোণে কোণে জ্বালছ ছোট যুদ্ধের অনল—কোরিয়া থেকে ভীয়েৎনাম, লোকাল ওয়ার, লোকাল ওয়ার। এ সব যুদ্ধ ছাড়া তোমাদের রুজি-রোজগার বন্ধ। শান্তিপূর্ণ পৃথিবীকে তোমাদের সব চেয়ে বড় ভয়।

আমরা তোমাদের সভ্যতা সবে মাত্র বর্জন করতে শিখেছি। তোমাদের আর আমাদের মধ্যে আধুনিক কালের প্রথম জেনারেশন ওয়ার সবে মাত্র শুরু হয়েছে।

আমরা কেউ কেউ তোমাদের ওপর অভিমান ক'রে তোমাদের 'সভ্যতা' বর্জন ক'রে হিপি হয়েছি। নিউ ইয়র্ক শহরের 'ভিলেজে' গেলে একটা চমৎকার দৃশ্য চোখে প'ড়ে, তোমারও নিশ্চয় পড়েছে, বাবা। 'ভিলেজ' হল হিপিদের আড্ডা। হিপিদের দোকান, রেস্তোঁরা, 'পট'-খাবার আড্ডা, ঘুরে বেড়াবার, একত্র ব'সে গল্প জমাবার পল্লী। রোজ সন্ধ্যাবেলা, বিশেষ ক'রে সপ্তাহশেষের সন্ধ্যায়, হাজার হাজার বাবা-মা'রা 'হিপি কালচার' দেখতে ভিড় জমায় 'ভিলেজে', যেন তাদের কৌতুক পরিবেশনের

জন্মেই হিপিদের সবটুকু আয়োজন। এ ঘটনার মধ্যে যে একটা নিষ্ঠুর পরিহাস, কঠিন ব্যঙ্গ আছে বাবা-মা'দের তাও চোখে পড়ে না, মনে দাগ কাটে না।

কলম্বিয়া য়ুনিভারসিটিতে পড়বার সময় মাঝে মাঝে আমি 'ভিলেজ' চলে যেতাম সন্ধ্যার পরে, বেশ কয়েকটি হিপি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ-বন্ধুত্ব হ'য়েছিল আমার।

সাইকালেডিক আলো আর পোষ্টারে সাজান ছোট্ট একটা রেঁস্তোরায় বসে কয়েকটি হিপি আড্ডা জমাত। আমি গিয়ে ভিড়তাম ওদের সঙ্গে। ওরা গাইত, নাচত, 'পট' খেত, হাসত, প্রেম করত, বসে বসেই ঘুমিয়ে নিত, খিধে পেলে যা জুটত সামান্য পয়সায় তাই দিয়ে নিবৃত্তি করত, বার বার চা-কফি পান করত, এবং অনেক সময়, জীবন-নামক দুর্বোধ্য রহস্য নিয়ে আলোচনা করত, যা শুনে আমার কেমন নেশা ধ'রে যেত, মনে হত হঠাৎ চলে এসেছি অন্য এক জগতে, আর সঙ্গে ওয়ালষ্ট্রীট ম্যাডিসন এ্যাভিনিউ হোয়াইটহাউস পেন্টাগন জেনারেল মোটরস-জেনারেল-ডাইনামিক্‌স-NASA-জনসন-নিক্সন-ভীয়েৎনাম নিয়ে তৈরী মার্কিন সমাজ-সভ্যতার কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই, যেমন নেই সম্পর্ক কলম্বিয়া-হার্ভার্ড-এম.আই.টি-প্রিন্সটন-কর্ণেলের বুদ্ধিজীবি দুনিয়ার, যেখানে বছরের পর বছর জনসন নিকসন মার্কা সমাজ সভ্যতাকে মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে জাহির করবার প্রচণ্ড উদ্যোগ চলছে! মিলিটারী-ইনডাসট্রিয়াল-ইনটেলেকচুয়াল কমপ্লেক্‌স্, এখানেই বলে রাখি, বাবা—কেবল মার্কিন মুলুকেই সীমাবদ্ধ নয়, এর ব্যাপক দাম্ভিক দাপট আজ অনুভূত হচ্চে না এমন মনুষ্য সমাজ নেই, আমাদের গান্ধীবাদী ভারতবর্ষেও এর অস্তিত্ব আজ আর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির অন্তরালে নয়।

'ভিলেজে' যে রেঁস্তোরায় হিপিদের আড্ডায় আমি যোগ দিতাম তার নাম ছিল "তোর বাপের গোঁফ।" অনেকগুলো খসখসে টেবিল আর নড়বড়ে চেয়ার পাতা ছিল কার্পেটহীন মেঝেয়, লোকেরা, হিপি ও অহিপি সবাই, তাতেই বসত, চা কফির অর্ডার দিত, হিপি ছেলেমেয়েরা পরিবেশন করত, দাম নিত না, আগতদের কাছে 'দান' চাইত, তাতে যা পেত তা দামের কাছাকাছিও পৌঁছত না। ঘরটা বড় ছিল। এখানে ওখানে এক এক দল ছেলেমেয়ে কুণ্ডলী করে ব'সে মারিওয়ানা খেত, এক একটি মারিওয়ানা হাতের পর হাত ঘুরত, এক একজন হাতে পেলে এক, বা দুই, বড় জোর তিন টান মেরে পরের হাতে পাস ক'রে দিয়ে বুঁদ হ'য়ে বসে থাকত।

একদল হিপি গান করত। দুজন বাজাত গীটার, চার পাঁচ জন একসঙ্গে গাইত, অনেক সময় রেঁস্তোরার সব হিপি, অহিপি ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত গানে যোগ দিত। সে গান ছিল হয় প্রেমের গান, নয়তো ভীয়েৎনাম যুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে গান,

নয়তো সব রকম যুদ্ধকে গালি-দেওয়া গান। একদলের গান গাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে গীটর চলে যেত অন্য একটি দলের কাছে। গান, এ ভাবে, চলত অবিরাম, মধ্যরাত্রি পেরিয়ে।

"তোর বাপের গোঁফে" একটি ছেলে ও একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বেশ গভীর বন্ধুত্ব হ'য়েছিল। পিটর, আর ক্যাথী।

পিটরের বয়স একুশ। দীর্ঘ সুঠাম শরীর, ঘন কালো চুল, গভীর কটা চোখ, প্রশস্ত কপাল, চওড়া চোওয়াল আর তির্যক চিবুক, চোওয়াল-চিবুক ঢাকা পড়েছে একগাল দাড়িতে, মাথার চুল নেমেছে পিঠের মাঝামাঝি। পিটরকে দেখলে হঠাৎ চোখ ফেরান যেত না। অসামান্য বুদ্ধির আলো জমাট হ'য়ে আছে গভীর চোখ দুটোয় এবং সমস্ত মুখখানা জুড়ে একটি বেদনার ব্যঞ্জনা। পীটরের দেহে, মুখের আদলে, দৃষ্টির ভঙ্গিমায় এমন একটা রহস্য যা অতি সহজে মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে। পরণে পাঁচ-সাতছিদ্র জীন, মোটা সুতোর সার্ট, যার বর্ণ এককালে হয়ত হলুদ ছিল, বর্তমানে ধূসর ও ছাই-এর মিশ্রিত একটা বেরং। চওড়া মজবুত বুকে একরাশ ঘন কালো লোম, মনিবন্ধে ইলেকট্রিক টাইমেক্স ঘড়ি, কোমরে মোটা চামড়ার বেল্ট।

ক্যাথী, অর্থাৎ ক্যাথারীণ, দেখতে অনেকটা পীটরের বিপরীত। পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি দেহ কৃশ এবং অত্যন্ত শাদা, যেন রক্তহীন। মাথা ভরতি সোনালি চুল, পিঠে ঢেউ খেলান। ছোট্ট ছোট্ট গভীর দুটি চোখ, শরৎ আকাশের চেয়েও সুনীল। সরু ভ্রূদুটি প্রায় কান পর্যন্ত টানা। পাতলা ওষ্ঠাধর লালটুকটুক, হঠাৎ দেখলে মনে হয় দুটি গোলাপের পাপড়ি। নাক সামান্য চ্যাপটা, সামনের দুটি দাঁত একটু উঁচু, একটি সোনা দিয়ে বাঁধান। ক্যাথীর কৃশ ভীষণ শাদা দেহের মধ্যে যা সবার আগে চোখে পড়ে তা হল ওর চুল, অমন ঢেউখেলান সোনালি চুল নিউইয়র্কে খুব একটা দেখা যায় না। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় ক্যাথীর সমস্ত দেহটাই ঢেউ খেলান, এবং, পরিচয় হবার পরে বোঝা যায়, ক্যাথীর মনটিও তাই।

একদিন আমি বসেছিলাম রেস্তোঁরার এক কোণে, এক কাপ কফি নিয়ে, রাত্রি তখন দশটা বেজে গেছে, গীটার বাজিয়ে এক হিপি যুবক যুদ্ধ-বিরোধী গান গাইছে, অনেকে সুর মেলাচ্ছে তার সুরের সঙ্গে, ঘরটার আর এক কোণে পাঁচটি হিপি তরুণ তরুণী 'পট' সেবনে ব্যস্ত, হঠাৎ টের পেলাম একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে সরে এসে আমার পাশে বসল, আমি তাদের দিকে তাকাতে প্রথম মেয়েটি হাসল, তারপর ছেলেটি. এবং মেয়েটি বলল, "হাই, তুমি ভারতীয় ?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

"ছাত্র ?"

"হ্যাঁ। কলম্বিয়ায় এম. এ. পড়ছি।"

"ওয়াও! বয়স কত তোমার ?"

"একুশ।"

"দেখে মনে হয় উনিশ। আমার নাম ক্যাথী। আর এর নাম পিটর।"

"কেতু।"

"পিটর কলম্বিয়ার ছাত্র।"

এতক্ষণে পিটর কথা বলল, "ছিলাম।"

"মানে, তোমার পড়া হ'য়ে গেছে ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"না:। ছেড়ে দিয়েছি। ক্যাথী পড়ছিল সিটি কলেজে। ছেড়ে দিয়েছে।"

"কেন ?"

পিটর মুখ বিকৃত ক'রে বলল, "কি হবে পড়ে ?"

ক্যাথী গম্ভীর স্বরে বলল, "আমরা system-এ বিশ্বাস করি না। পাশ ক'রে তো ওদেরই একজন হ'তে হবে! তা হ'তে আমরা চাই না। তাছাড়া," থেমে পিটরের দিকে তাকিয়ে বোধহয় মৌন সম্মতি নিয়ে ক্যাথী বলল, "তাছাড়া, মাষ্টারগুলি সব চোর। সব অসৎ।"

"তোমাদের সমাজ তোমরা চেষ্টা করলে নিশ্চয় বদলাতে পারো, পারো না ?" আমি নিজের কণ্ঠস্বরের কাতরতায় বিব্রত বোধ করলাম।

পিটর ঠোঁট দুটোকে একত্র ক'রে একটা বিশ্রী আওয়াজ তুলল। "সম্ভব নয়। ওরা ভীষণ শক্তিমান, ভয়ানক শয়তান।"

"তাহলে ?"

এবার ক্যাথী বলল, "আমরা কেবল ওদের বর্জন করতে পারি। দেখিয়ে দিতে পারি আমরা ওদের মানি না, ওদের মূল্যবোধ, রীতিনীতি, জীবনদর্শন, আমরা মানি না।"

"লাভ ?"

"প্রতিবাদ। বর্জন। এইটুকু মাত্র।" বলল পিটর।

"তাতে সমাজ বদলাবে ?"

ক্যাথী বলল, "বোধহয় বদলাবে না। কিন্তু কি করা যাবে বলো ? আমার বাবা একটা কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট। কি কোম্পানী, জানো ? প্যাকিং বাক্স-কোম্পানী। তাঁর পুরো ব্যবসা পেন্টাগণের সঙ্গে। ভীয়েৎনামে যুদ্ধের রসদ পৌঁছানর জন্যে বাবার কোম্পানী চব্বিশ ঘণ্টা কাজ ক'রে যাচ্ছে। বাবার কত টাকা বোধহয় সে নিজেই জানে না। চারটে কারখানায় পাঁচ হাজার লোক কাজ করছে। বাবার কি নেই ? লং আইল্যাণ্ডে গেছ ? ওখানে ব্রুক হ্যাভেনে সমুদ্রের ওপর বিরাট বাড়ী। নিউ ইয়র্ক শহরে ফিফ্‌থ এ্যাভিনিউতে বিরাট এ্যাপার্টমেন্ট, রকেফেলার যে বাড়ীটায় বাস করে তার পাশের বাড়ীটায়, বাবার নিজস্ব এরোপ্লেন আছে, হেলিকপটার আছে, সমুদ্রে যাবার ষ্টীমার আছে, নদীতে বিহার করবার ষ্টীমবোট আছে। কি নেই বাবার ?" ক্যাথী হটাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল "কি নেই ?"

পিটর আস্তে বলল, "আত্মা।"

ক্যাথীর নীল চোখে আগুনের ফুলকি: "বাবার আত্মা নেই। ভীয়েৎনামে আমরা যা করছি তার জন্যে একফোঁটা লজ্জা নেই বাবার। 'প্রেসিডেন্টের চেয়ে বেশি আমি জানি না, বুঝি না ; প্রেসিডেন্ট যদি বলেন এ যুদ্ধ প্রয়োজন, আমিও তাই বলব, এই হল বাবার যুক্তি। যুদ্ধ চলছে তাই পাঁচ হাজার লোককে আমি কাজ দিতে পেরেছি, যুদ্ধ না চললে এরা কাজ পাবে কোথায় ?' আমার একটা ভাই ছিল। পিটরের বয়সী। লেনার্ড যেদিন ড্রাক্‌ট কল পেল, ওর মুখে এক বিন্দু রক্ত ছিল না, কাগজের মত ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়েছিল ওর মুখ। ইয়েলে পড়ত। বাবাকে দারুণ ভয় করত ল্যারী। তবু সাহস ক'রে বাবাকে বলল, তুমি তো অনেক বড় বড় লোককে চেন, কিছু একটা করো যাতে আমি রেহাই পাই। বাবা কি বলল, জানো ? 'প্রেসিডেন্ট তোমাকে দেশের জন্যে যুদ্ধে ডেকেছেন, তোমাকে যেতেই হবে। আমি দুবার যে ডাকে উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিয়েছি, তুমি সে ডাক লঙ্ঘন করলে আমাদের সম্পর্ক এখানেই শেষ।' ল্যারী চলে গেল ভীয়েৎনাম। ছ মাস পরে তার মৃত্যুখবর এল। বাবার চোখে এক ফোঁটা জল দেখা গেল না। তার ভয়ে মা পর্যন্ত কাঁদতে পারল না।"

আমার মুখে কথা সরল না।

পিটর বলল, "আমাকেও ডেকেছিল! পেয়েছে? ড্রাফ্ট কার্ড সকলের চোখের সামনে পুড়িয়ে দিয়েছি।"

"পুলিশে ধরেনি তোমাকে?" আমার প্রশ্ন।

"কেস চলছে। একা কি আমি? হাজার হাজার ছেলে, আমার মত, আমার চেয়ে বড়, ছোট। আমরা কয়েদী হ'য়ে জেল খাটব, ওদের এই নোংরা বীভৎস যুদ্ধে যাব না।"

"ল্যারীর সাহস ছিল না", ক্যাথী বলল, "কোনও কিছুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার। আসলে ওর কোনও নিজস্ব আইডেনটিটি ছিল না, ল্যারী ছিল আমার বাবার ছেলে। অথচ, আমি জানতাম, মনে মনে কি ঘৃণা করত ল্যারী বাবাকে। বাবা ল্যারীকে বিজিনেস ম্যানেজমেন্ট পড়াতে চেয়েছিল। ল্যারী কিছুতেই রাজী হয় নি—ঐ একটা বিষয়ে সে নিজের স্বাতন্ত্র্য জাহির করেছিল। এ্যানথ্রপলজি পড়ত ল্যারী, আমাকে বলত, আমি কি করব জানিস বড় হ'য়ে? চলে যাব আফ্রিকার কোনও প্রাগৈতিহাসিক সমাজে, যেখানে আমাদের এই তথাকথিত সভ্যতা নেই, যেখানে মানুষ সরল, সহজ, অতি স্বাভাবিক। তা না হ'লে আমি বাঁচব না।' ল্যারী মরল সায়গন থেকে আশি মাইল দক্ষিণে একটা গ্রামে। যে 'সভ্যতা' থেকে পালাবার সংকল্প গোপনে মনে মনে পুষে রেখেছিল তার জন্যেই প্রাণ দিতে হল ল্যারীকে।"

পিটর বলে উঠল, "সভ্যতা না বুলশিট।"

ক্যাথীর উত্তেজনা তখনও বাড়ছে: "ল্যারীর মৃত্যু খবর পাবার পর বাবা কি করল, জানো? সারা বাড়ীতে ল্যারীর ছবি টানিয়ে দিল। কারখানায় কারখানায় ল্যারীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সভা বসল, গির্জায় গির্জায় ল্যারীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা হল। প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাবা জুটে। মেডেল পেয়েছিল সে মেডেল দুটোকে বুকে এঁটে ব্রুক হ্যাভেন চার্চে প্রার্থনা করতে গেল। প্রেসিডেন্টের সই নিয়ে চিঠি এল ল্যারীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ক'রে, তার 'বীরত্ব' আর 'দেশপ্রেম'কে প্রশংসা ক'রে, যুদ্ধবিজয়ে বাবার অবদানকে তারিফ ক'রে; সে চিঠির হাজার হাজার কপি বাবা তার কর্মচারীদের বিলি করল। সেদিন আমি আর সইতে পারলাম না।"

"কি করলে তুমি?" সম্মোহিত স্বরে আমি প্রশ্ন করলাম।

"কি আর করব? সম্পূর্ণ উলঙ্গ হ'য়ে গির্জায় গিয়ে হাজির হলাম।"

আমার গলা থেকে একটা বিচ্ছিরি শব্দ বেরিয়ে এল।

"এ ছাড়া আর কিছু করার ছিল না?"

এবার পিটর যোগ দিল, "রেভারেণ্ড ফাদার সবে মাত্র তার বচন শুরু করেছে।

গির্জার হলে একটা আসনও খালি নেই। মিস্টার ওয়াটসন বুকে দুই মেডেল ঝুলিয়ে প্রথম সারিতে মিসেস ওয়াটসনের পাশে বসে আছেন। হঠাৎ মিস ক্যাথারিন ওয়াটসন ঝড়ের মত হলঘরে ঢুকে তড়িৎবেগে হাজির হল একেবারে ফাদারের পাশে। তার গায়ে আলখাল্লার মত একটা পোষাক, ঘোর কালো। সকলের চকিত চোখের পাতা পড়বার আগেই মিস ওয়াটসন সে পোষাকটা খুলে রেখে একেবারে ন্যাংটো হ'য়ে দাঁড়াল। মুহূর্তের মধ্যে সবাই হায়-হায় ক'রে উঠল, ফাদার হ'য়ে গেল পাষাণ মূর্তি। মিস ওয়াটসন বলে উঠল, 'ল্যারীকে ওরা খুন করেছে, ঐ যারা ওয়াশিংটন ডি. সি তে বসে ভীয়েৎনামে নিষ্ঠুর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ল্যারীকে খুন করেছে আমার বাবা। আমি ল্যারীর খুনের প্রতিবাদ করছি। আপনারা বেরিয়ে যান। এখানে বসে ল্যারীকে অপমান করবেন না। ল্যারী যুদ্ধে যেতে চায় নি। বেঁচে থাকতে চেয়েছিল।'

আমি অবাক চোখে ক্যাথীকে দেখছিলাম। সে দৃষ্টিতে ক্যাথী রঙিন হ'য়ে উঠছিল।

পিটর বলে চলল, "কয়েক মুহূর্তের জন্যে গির্জার বিরাট জনাকীর্ণ হলটা এক স্থিরচিত্র হ'য়ে রইল। কারুর দেহ একটু নড়ল না। কারুর মুখে সরল না একটা কথা। তারপর মিস্টার ওয়াটসন ফেটে পড়ল। 'দূর হ' বেহায়া বজ্জাৎ মেয়ে, দূর হ'। চেঁচাতে চেঁচাতে মিস্টার ওয়াটসন ক্যাথীর সামনে হাজির হ'য়ে ক্যাথীর গালে দারুণ থাপ্পড় মারল, ক্যাথী সে থাপ্পড়ের টাল সামলাতে না পেরে উবু হ'য়ে পড়ল মেঝের ওপর, যারা এসেছিল সবাই তখন উঠে দাঁড়িয়েছে, দারুণ সোরগোল, গির্জার লোকেরা ইতিমধ্যে পুলিশকে ফোন করেছিল, হটাৎ একদল সশস্ত্র পুলিশ হাজির হল ঈশ্বরের মন্দিরে, ধ'রে নিয়ে গেল ক্যাথীকে, ক্যাথী তখনও উলঙ্গ।"

পিটর হাসতে লাগল। আমি নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম ক্যাথীর দিকে।

ক্যাথী বলল, "কি দেখছ ?"

পিটর জবাব দিল, "তোমাকে। কেতু নিশ্চয় ভাবছে উলঙ্গ তোমাকে কেমন দেখতে।"

এবার আমি লজ্জা পেলাম, "তাই তুমি হিপি হ'লে ?"

ক্যাথী বলল, "পুলিশ আমাকে একদিন আটকে রেখেছিল। বাবাই ওদের কাছ থেকে আমার রেহাই পাবার ব্যবস্থা করেছিল। ছাড়া পেয়ে আমি অবশ্যি বাড়ি ফিরি নি। চলে এলাম নিউ ইয়র্ক শহরের এই বিখ্যাত ভিলেজে। এখানে থাকা-খাবার অভাব হয় না। কেউ না কেউ তোমাকে থাকতে দেয়, আহারও জুটে যায়। এক সপ্তাহের মধ্যে বন্ধুত্ব হ'য়ে গেল পিটরের সঙ্গে। পিটর খুব ভাল ছেলে, খুব ভাল।"

ক্যাথী আর পিটর চুমু গেল। বসল জড়াজড়ি ক'রে।

"সমাজে ফিরবে না?" আমি প্রশ্ন করলাম ক্যাথীকে।

"ভীয়েৎনামে যুদ্ধও তো বেশ চলছে। প্রতিদিন মরছে ল্যারীর মত অনেক ছেলে।"

ক্যাথী শ্রাগ ক'রে বলল, "ফাক্ দেম্ অল। ফাক্ দ' ওয়ার।"

আমি বললাম, "মনস্তত্ত্বে নিজের ওপর আক্রমণ বলে একটা কথা আছে। মানুষ হতাশ হ'য়ে অনেক সময় নিজেকে ধ্বংস ক'রে ফেলে। তোমরাও কি তাই করছ না?"

পিটর বলল, "ওদের হাতে ধ্বংস হবার চেয়ে নিজের হাতে ধ্বংস হওয়া অনেক বাঞ্ছনীয়।"

আমি বললাম, "এ দুই বিকল্প ছাড়া আর কিছু নেই কি?"

দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল, "আছে। বিপ্লব।"

আমি বললাম, "তবে?"

পিটর বলল, "ও আমাদের কমযো নয়। বিপ্লব করবার জন্তে কালো আমেরিকানরা আছে। ওরা আমাদের চায় না। বিপ্লব করবে ওরা।"

আমি বললাম, "মনে হয় না। কালো আমেরিকানরা আসলে চায় শাদা আমেরিকানদের সমান হ'তে! শহরে শহরে সন্ত্রাশবাদ ক'রে বিপ্লব অসম্ভব।"

ক্যাথী বলল, "আমিও তাই বলি। বিপ্লবের একমাত্র পথ মাও-সে-তুং-এর পথ! গেরিলা যুদ্ধ। গ্রামে গ্রামে সামরিক ঘাঁটি তৈয়ার। আমেরিকায় গ্রাম নেই, একশ জনের মধ্যে মাত্র ছ'জন চাষী। তার মধ্যে আবার চারজনের অবস্থা ভাল, টু পার্সেন্ট গরীব চাষীরা বিপ্লব করবে কি ক'রে?"

পিটর বলল, "আমেরিকা ফ্যাসিস্ট হ'য়ে যাচ্ছে দ্রুত, বুঝলে? বিপ্লব তো হবেই না, প্রতিবিপ্লব এদেশে ভীষণ প্রবল।"

আমার তখন পিটরের কাহিনী শোনবার দারুণ আগ্রহ! অথচ কৌতূহল গোচ্চারে প্রকাশ করা এদের সমাজে অশালীন।

ভাগ্য ভাল, ক্যাথী আমার সাহায্যে এগিয়ে এল। হয়ত আমার আগ্রহ টের পেয়েছিল। মেয়েরা এমন অনেক কিছু আলগোছে টের পেয়ে যায়।

ক্যাথী বলল, "পিটর চেষ্টা কিছু কম ক'রে নি। কলম্বিয়ায় ছাত্ররা যা-কিছু সংগ্রাম করেছিল পিটর তার সব কিছুতে যোগ দিয়েছিল। কালো আমেরিকানদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিল হার্লেমে, একটা গুপ্ত সমিতির সভ্যও হ'য়েছিল। কিন্তু শেষ

পর্যন্ত কালোয়া ওকে তাড়িয়ে দিল। বলল, তোমার গায়ের চামড়া শাদা, তুমি আমাদের লোক নও, আসলে তুমি শত্রুপক্ষের। অতএব স'রে পড়ো। না সরো, তোমাকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব আমরাই।"

আমি বললাম, "শাদাদের মত কালোরাও সমান রেশিয়ালিস্ট।"

"আমি ওদের দোষ দি না," পিটর বলল উদারতা দেখিয়ে। "ওরা সবে মাত্র নিজেদের আবিষ্কার করছে। বুঝতে শিখেছে ওরা একেবারে দুর্বল নয়। এখন ওরা নিজেদের বলে যদি কিছু করতে পারে ওদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে।" একটু থেমে আবার বলল, "তা ছাড়া, দুশ' বছর আমরা যা ওদের নিয়ে করেছি তারপর ওরা যদি আমাদের বিশ্বাস না করে তাতেও ওদের দোষ নেই।"

আমি বললাম, "বিদেশীর চোখে আমি কি দেখতে পাচ্ছি বলব? দেখতে পাচ্ছি, শাদায়-কালোয় যা সংঘাত চলছে তাতে দুপক্ষের ক্ষতি, তাতে সমাজ ঢেলে সাজানো অসম্ভব। তোমাদের দেশে শতকরা পঁচিশ জন দরিদ্র। এদের মধ্যে কালো, শাদা, তামাটে সব আছে। শাদা পুরুষ, স্ত্রীলোককে আমি নিউ ইয়র্ক শহরে ডাষ্টবিন থেকে খাবার কুড়িয়ে খেতে দেখেছি অনেকবার। সব দরিদ্রদের একত্র ক'রে। আন্দোলন আর সংগ্রাম করলে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব, যদি তোমাদের মত মধ্য ও উচ্চবিত্ত ছাত্রছাত্রীরা এদের সঙ্গে হাত মেলাও। তা না ক'রে তোমরা অনেক ছোট ছোট পরস্পরবিরোধী দলে ভাগ হ'য়ে পড়ছ, তাতে কোনও আন্দোলনই দানা বেঁধে উঠতে পারছে না।"

ক্যাথী বলল, "খুব বড় রকমের অর্থনৈতিক সংকট ছাড়া তুমি যা বলছ তা এদেশে হবার সম্ভাবনা নেই। জানো তো আমাদের ওয়ার্কিং ক্লাস পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল। ভীয়েৎনাম যুদ্ধের প্রধান সমর্থক তো শ্রমিকরাই। পিটরের বাবা তো এক শ্রমিক নেতা!

পিটর দুই ঠোঁট একত্র ক'রে আবার সেই তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ করল।

"তোমার বাবা বুঝি ইউনিয়ন লীডর?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ।"

"কাদের ইউনিয়ন?"

"লংশোরমেনস্।"

"নিউ ইয়র্কে?"

"ফিলাডেলফিয়ায়।"

"পিটরের গল্প শুনবে?" ক্যাথী প্রশ্ন করল।

"ওকে 'বোর' কোরো না," বলল পিটর।

"ক্যাথীর কাহিনী শোনবার পর থেকে তোমার কাহিনী শোনবার আগ্রহ চেপে আছি।"

পিটরের কাহিনী শোনাল ক্যাথী। বাপ বেনিটো এ্যানটিওনি, ইতালি থেকে চলে এসেছিল আমেরিকায় লোটাকম্বল সম্বল ক'রে চল্লিশ বছর আগে। স্কুলের উঁচু ক্লাসেও পড়েনি পিতৃভূমিতে, মার্কিন মুলুকে এসে জাহাজের খালাসির কাজ চেয়েছিল পিটরের বাবা, এই নিউ ইয়র্ক বন্দরেই। কয়েক বছর যেতে না যেতে এল তিরিশের সর্বনাশ, ইংরেজীতে যার নাম দ' গ্রেট ডিপ্রেশন। বেনিটো এ্যানটিওনির কাজ ছুটে গিয়েছিল, না ছিল শোবার ঘর, না দুবেলার আহার; গির্জার লঙ্গরখানায় একবেলা যা জুটত তাতেই মেটাতে হত পেটের ক্ষুধা। সে দুর্দিনও একদিন কাটল, বেনিটো এ্যানটিওনি সেই থেকে ফ্র্যাংলিন ডেলানো রুজভেল্টের ভক্ত, এবং দৃঢ়মন ডেমোক্র্যাট। ডিপ্রেশনের বছরগুলিতে রুজভেল্টের নিউ ডীলের সমর্থনে বেনিটো এ্যানটিওনি খালাসিদের সমবেত করেছিল, সেই থেকে তার লংশোরমেনস্ ইউনিয়নে হাতেখড়ি। সর্বনাশের দিনগুলি কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত কাজকর্ম যখন আবার জুটল, বেনিটো বিয়ে করল তার প্রতিবেশী একটি গ্রীক তরুণীকে যে তার চেয়ে ছিল তের বছরের ছোট, এবং সুন্দরী। অল্পদিনের মধ্যে য়ুরোপে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। বেনিটো এ্যানটিওনি ছিল মুসোলিনীর প্রশংসক; লংশোরম্যানদের অনেকেই ইতালিয়ান, তাদের একত্র ক'রে সে গ'ড়ে তুলল আন্দোলন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের য়ুরোপীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধে। অথচ জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা যখন অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল, বেনিটো অ্যানটিওনি সবার আগে নৌবাহিনীতে যোগ দিয়ে লড়তে চলে গেল প্রশান্ত মহাসাগরে। যুদ্ধের চার বছরে যুদ্ধ জাহাজ থেকে স্থানান্তরিত হল টর্পেডোতে, বীরত্বের জন্যে পুরস্কৃত হল তিনবার, ক্যাডেট থেকে প্রমোশন পেয়ে হল লেফ্‌টানেন্ট। যুদ্ধের পরে বেনিটো এ্যানটিওনি ইচ্ছে করলে নৌবাহিনীতে থেকে যেতে পারত, কিন্তু ফিরে এল নাগরিক জীবনে, এবং অনেকটা যুদ্ধকালীন বীরত্বের জন্যে, পেয়ে গেল লংশোরমেনস্ ইউনিয়নে মাঝারি ধরনের একটা চাকরী। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী খরচে ভর্তি হল স্কুলে। পাঁচ বছরে বেনিটো এ্যানটিওনি দস্তুরমত শ্রমিক ইউনিয়ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠল। এই বছরগুলির এক সময়ে জন্ম নিল পিটর এ্যানটিওনি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মার্কিন দেশে যে বিরাট টেকনলজিকাল বিপ্লব ঘটে গেল, সারা ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অর্থনৈতিক রাজধানী হ'য়ে উঠল ওয়াশিংটন, বিধ্বস্ত পশ্চিম য়ুরোপকে পুনর্গঠিত করবার সুযোগ পেয়ে ফেঁপেফুলে উঠল মার্কিন শিল্পরাজ্য। তার প্রভাবে বেনিটো এ্যানটিওনির মত মজদুরদের সামাজিক অবস্থা একেবারে পালটে

গেল। দশ পনেরো বছরে মজতুর শ্রেণী পরিণত হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে। বড় বড় শহরগুলির সাবার্বে গ'ড়ে উঠল নতুন নতুন উপসহর, শ্রমিকরা তৈরী করতে পারল নিজেদের বাড়ীঘর ব্যাংক থেকে সহজলভ্য ধার নিয়ে, অনেকের বাড়ীতে এল দুটি মোটর গাড়ী, দুটি টেলিভিশন সেট। ক্যাথী বলল, "মার্কিন ধনতন্ত্রবাদ এক বিস্ময়কর অবস্থার সৃষ্টি ক'রে তুলল। শ্রমিকরা হ'য়ে গেল বুর্জোয়া। পশ্চিম য়ুরোপে সমাজতান্ত্রিক দলগুলি যুদ্ধের পরে রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়ে ধনতন্ত্রবাদকে সংশোধন ক'রে প্রতিষ্ঠা করল ওয়েলফেয়ার ক্যাপিটালিজম। আমেরিকায় কিন্তু সে রকম সামাজিক পরিবর্তন ঘটল না। মহাযুদ্ধে য়ুরোপ বিধ্বস্ত, আমেরিকার দেহে আঁচড়টুকু পর্যন্ত লাগেনি একমাত্র পার্ল হারবার ছাড়া, এবং 'শীতল যুদ্ধে'র আশীর্বাদে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র-কারখানাগুলি তাড়াতাড়ি পুরো উদ্যমে চলতে লাগল, বুঝতেই পারছ, গোটা দুনিয়ার দুর্দশা একসঙ্গে মঙ্গলকর হ'য়ে দাঁড়াল আমেরিকার পক্ষে। ভেবে দেখ, প্রায় সমস্ত পশ্চিম য়ুরোপে ওয়েলফেয়ার সোসাইটি যখন তৈরী, তখনও সেই ষাট দশকের প্রারম্ভে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের চিকিৎসার জন্যে সরকারী সাহায্য চালু করতে গিয়ে জন কেনেডীকে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা যদি আক্রান্ত হত, যেমন হয়েছিল ফ্রান্স, বেলজিয়ম এবং রাশিয়া অথবা আকাশ-থেকে ইংলণ্ড, যদি আমাদের বাড়ীঘর গ্রামশহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হত, তাহলে হয়ত আমাদের দেশের লোকেরা বাকী পৃথিবীর দুর্ভাগ্য হৃদয় দিয়ে বোঝবার ক্ষমতা লাভ করত। আসলে অবস্থাটা দাঁড়াল একেবারে উল্টো। আমরা এ্যাটম বোমা মেরে জাপানকে কাবু করলাম, যুদ্ধের পরের পৃথিবীতে মার্কিন ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না কেউ, ফলে একমাত্র ক্ষমতার দৃষ্টি দিয়েই আমরা দুনিয়ার সমস্যাগুলিকে দেখতে লাগলাম, যার নিদারুণ পরিণাম ভীয়েৎনাম।"

বেনিটো এ্যানটিওনিরও সামাজিক অবস্থা পালটে গেল। য়ুনিয়নে প্রমোশন পেয়ে সে বদলি হল ফিলাডেলফিয়ায়। শহরের উপকণ্ঠে তৈরী হল তার ছবির মতন নতুন বাড়ী। দুখানা গাড়ী। পিটরের জন্যে আলাদা টেলিভিশন। দেখা গেল লংশোরমেন্স্ ইউনিয়ন যুদ্ধ, অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে মার্কিন হস্তক্ষেপ, কোল্ড ওয়ার এসবের অন্ধ সমর্থক। "তার কারণ কি জানো?" ক্যাথী আমায় বুঝিয়ে দিল, "পিটর তখন গীটরে গাওয়া গানের সঙ্গে তাল দিচ্ছে, অথচ শুনছেও ক্যাথীর কথা, "যুদ্ধ, তা ঠাণ্ডাই হোক আর গরমই হোক, আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথে একান্ত প্রয়োজনীয় হ'য়ে দাঁড়াল; আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যদি না বাড়ে, লংশোরমেনদের রোজগারে টান পড়বে। একটা দ্বিতীয় কারণও আছে। লংশোরমেনদের অধিকাংশ ইতালিয়ান অথবা গ্রীক অথবা আইরিশ অথবা ইষ্ট য়ুরোপীয়ন—অর্থাৎ এমন সব জাতের লোক,

যারা মার্কিন সমাজে বহুদিন অন্ত্যজ থেকে গেছে, আজও যারা ঠিকমত জাতে ওঠে নি। এসব শ্রেণীর লোকেরা অনেক বেশি প্রতিক্রিয়াশীল।"

চলছিল বেশ বেনিটো এ্যান্টিওনি ভাগ্যচক্র, যতদিন না একমাত্র ছেলে পিটর বড় হল। হাই স্কুলে পড়বার সময়ই তার মতিগতি ভাল নয়। পড়াশোনায় অসাধারণ মেধাবী, ক্লাসে প্রতি বছর প্রথম, কিন্তু তাহলে কি হবে, ছেলের মানসিক গতিবিধি দেখে বাপ-মায়ের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। রবিবারে গির্জায় যাওয়া ছেড়ে দিল, অনেক রাত্রিতে বাড়ী ফেরে. নানারকম ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাব, মাঝে মাঝে কোথাও উধাও হ'য়ে যায় দুতিন দিনের জন্যে, ফিরে এসে বলে, 'বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে এলাম' নিউ ইয়র্ক, বষ্টন, পিটস্‌বার্গ। বেনিটো এ্যানটিওনি দিনরাত নিজের কাজে এবং অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত, ছেলেকে দেখবার সময় নেই তার, ক্লাসে প্রথম হওয়া ছেলেকে খানিকটা সমীহও সে করে, মা সেকেলে সামান্য শিক্ষিতা মেয়েমানুষ, ছেলে কি করছে না করছে তার সাধ্য নেই বুঝে ওঠার।

"এবার আমাকে বলতে দাও", পিটার নিজের কাহিনী নিজের ভাষায় ব্যক্ত করতে এগিয়ে এল। "বাবা সেদিন তার কয়েকটি বন্ধুকে রাত্রে ডিনার খেতে ডাকল। তোরা সবাই ইউনিয়নের নেতা। মা সারাদিন ব্যস্ত রান্না নিয়ে, তাকে সাহায্য করবার জন্যে বাবা একটি 'মেড' ভাড়া ক'রে আনল। সন্ধ্যা হ'তেই নিমন্ত্রিত বন্ধুরা এসে হাজির, মদ চলল অনেক, তাদের আলোচনাও গভীর হ'য়ে উঠল। কথাবার্তার অনেকখানিই আমি শুনতে পেলাম। আলোচনা হচ্ছিল প্রধানত তিনটি বিষয়ে। এক, ইউনিয়নে একটা দল গ'ড়ে উঠছিল যারা নেতাদের সঙ্গে চলতে রাজী নয়, যারা আসলে কম্যুনিস্ট এবং রাশিয়ার এজেন্ট, যারা চায় মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক পরিবর্তন, রাশিয়ার সঙ্গে কোল্ডওয়ারের অবসান, এবং যাদের লক্ষ্য প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ ধ্বংস ক'রে আমেরিকায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। দুই, নিগ্রোরা বন্দরের কাজ চাইছে, চাইছে য়ুনিয়নে প্রবেশের অধিকার, এতে ক'রে একটা গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে লংশোরম্যানদের মধ্যে, যার সমাধান প্রয়োজন। তৃতীয়, ভীয়েৎনামে যুদ্ধকে তাতিয়ে তুলে প্রেসিডেন্ট জনসন এক শ্রেণীর লোকেদের বিরাগভাজন হ'য়েছে, লংশোরমেন্স য়ুনিয়ন কি ক'রে তাঁকে সমর্থন জানাতে পারে। আলোচনার মধ্যে দেখতে পেলাম, বেনিটো এ্যানটিওনি, আমার বাবা, সবচেয়ে বেশি উগ্রপন্থী, সে কিছুতেই নিগ্রোদের য়ুনিয়নে ঢুকতে দিতে রাজী নয়, 'কম্যুনিস্ট এজেন্ট'দের বিরুদ্ধে সে চায় কঠোরতম ব্যবস্থা, এবং জনসনকে সমর্থনের জন্যে তার দাবী য়ুনিয়ন কর্তৃক শহরে শহরে 'ভীয়েৎনাম মার্চ।' বেনিটো এ্যানটিওনিকে সে রাত্রিতে আমার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। বার বার আমি তাকে দেখতে লাগলাম, সে তো আমার বাবা,

খুব চিনি আমি তাকে, কিন্তু সে রাত্রে মনে হল তাকে আমি চিনি না, ভারী, চওড়া, ঈষৎ মাতাল স্বরে সে যা বলছে তা বীভৎস, তাকে মনে হল ভয়ানক একটা দৈত্য, অত্যন্ত নিষ্ঠুর, যার মধ্যে মানবিকতার নামগন্ধ নেই। ঘুমুতে গিয়েও বেনিটো এ্যানটিওনির দৈত্য-চেহারা আমাকে ছাড়ল না, বার বার ভয় দেখাতে থাকল, শেষকালে যখন ঘুমিয়ে পড়লাম, স্বপ্নে সে আমাকে তাড়া করল, আমি অনেক কষ্টে পালিয়ে একটা বস্তিতে ঢুকে পড়লাম, সে বস্তিটা নিগ্রোদের।"

"পরের দিন আর সইতে না পেরে বেনিটো এ্যানটিওনির সঙ্গে বোঝাপাড়া করবার সংকল্প নিয়ে রাত্রিতে সে যখন পাব থেকে ফিরল তার সামনে গিয়ে হাজির হলাম।"

"বেনিটো এ্যানটিওনি অবাক হ'য়ে তাকাল। এ ভাবে কোনওদিন আমি তার সামনে উপস্থিত হই নি। আমিই অগ্রসর হয়ে বললাম, দুএকটা কথা ছিল, তোমার কি সময় হবে ?

'তুমি কিছু বলতে চাও আমাকে ? নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

আমি ভনিতা না ক'রে বললাম, 'নিগ্রোদের তোমরা য়ুনিয়নে স্থান দিতে চাও না কেন ?'

অবাক হয়ে বেনিটো এ্যানটিওনি বলল, 'তুমি এ খবর কোথায় পেলে ?'

'কাল রাত্রে তোমাদের কথা শুনছিলাম।'

'অ। নিগ্রোরা ভাল কাজ জানে না।'

'কাজ করবার সুযোগ না পেলে শিখবে কি ক'রে ?'

'লংশোরম্যানদের কাজ কমে আসচে। বন্দরের অনেক কাজ এখন মেশিনে হ'য়ে থাকে। শ্রমিকরা সপ্তাহে তিন দিনের বেশী কাজ পায় না। নিগ্রোরা ঢুকে পড়লে শ্রমিকদের কাজ থাকবে না একেবারেই।'

'তোমরা নিগ্রোদের নেবে না, কন্‌স্ট্রাকশন ওয়ার্কাররা নিগ্রোদের নেবে না, তাহলে ওরা যাবে কোথায়, কাজ পাবে কি ক'রে ?'

'ওরা ওদের মাতৃভূমি আফ্রিকায় ফিরে যেতে পারে। এটা ওদের দেশ নয়।'

"এটা তোমারও দেশ নয়, বাবা। তুমিও তাহলে ইতালি ফিরে যেতে পার।"

বেনিটো এ্যানটিওনি এবার ফেটে পড়ল। "তুমি একরত্তি শিশু, বাপের সঙ্গে কথা বলতে জান না ! এ শিক্ষাই কি দেয় আজকাল তোমাদের স্কুলে ? এমন নিগ্রো-দরদী হয়ে উঠলে কেন ? কোনও নিগ্রো মেয়ে তোমাকে যাদু করেছে ?"

আমি শুধু বললাম, "তোমার মতবাদ অতি জঘন্য।" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

"বেনিটো আর পিটর এ্যানটিওনির গৃহযুদ্ধ শুরু হল। কিছুদিন পরেই ফিলাডেলফিয়ায় নিগ্রোদের সঙ্গে শাদা লংশোরম্যানদের একটা সংঘাত ঘটে গেল। য়ুনিয়ন নিগ্রোদের বন্দরে কাজ করতে দিতে রাজী নয়, কিছু নিগ্রো কাজ করবার সংকল্প নিয়ে বন্দরে একদিন হাজির, সংঘাত লাগল তাই নিয়ে। সবাই ভয় করতে লাগল, বড় রকমের মারপিট দাঙ্গা শুরু হ'য়ে যাবে শহরে। বেনিটো এ্যানটিওনি শাদা শ্রমিকদের জঙ্গী নেতা। পিটর এ্যানটিওনি ভিড়ে গেল নিগ্রো ছেলেদের সঙ্গে, আরও কিছু শাদা ছেলের মত। গৃহযুদ্ধ বেড়েই চলল। স্কুল জীবনের শেষ বছরে পিটর এ্যানটিওনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করে এক নিগ্রো পল্লীতে একখানা ঘর ভাড়া ক'রে বাস করতে লাগল।"

কাহিনীর বাকী অংশ শেষ করল ক্যাথী। মেধাবী ছাত্র পিটর ভাল ভাবে স্কুল ফাইনাল পাশ ক'রে কলম্বিয়ায় ভর্তি হতে পারল স্কলারশিপ পেয়ে, চলে এল নিউ ইংর্ক। আসার সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল ছাত্র আন্দোলনে। হার্লেম তাকে টানল, বন্ধুত্ব চাইল সে নিগ্রো পল্লীতে। পেল না। নিউ ইয়র্ক তো আর ফিলাডেলফিয়া নয়। পিটর দেখতে পেল নিগ্রোরা তাকে বিশ্বাস করে না, তাকে নিজেদের একজন ব'লে গ্রহণ করতে রাজী নয়। এদিকে ছাত্র আন্দোলনও বিশেষ এগোতে পারল না, বার বার হোচট খেয়ে থুবড়ে পড়তে থাকল। এসবের সম্মিলিত চাপ থেকে পালিয়ে পিটর এ্যানটিওনি শেষ পর্যন্ত ভিড়ল গিয়ে 'ভিলেজে'। হয়ে গে'ল হিপি।

"আমরা বেশ আছি", ক্যাথী বলল। "আমরা সুখী।" পিটরের মুখের কাছে মুখ নিয়ে, "আমরা সুখী নই, পিটর?"

পিটর, ক্যাথীর ঠোঁটে আলতো ঠোট রেখে, "নিশ্চয়।"

"তোমাদের চলে কি করে?" আমি তখনও কৌতূহলী।

"দরকার হলে আমরা কাজ করি। পয়সার প্রয়োজন কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্যে। আমরা একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি, যার অংশীদার আর একটি হিপি যুগল। চারজন আমরা একখানা ঘরেই থাকি। পয়সা ফুরিয়ে এলে যা-জোটে-তাই একটা কাজ নিয়ে নি। কিছু টাকা রোজগার হলে কাজ ছেড়ে দি।"

"চারজন একটা ঘরে বাস করো, তোমাদের অসুবিধা হয় না?"

"অসুবিধা হবে কেন?" ক্যাথী প্রথমে আমার প্রশ্নের মানেই যেন বুঝতে পারল না। পরে, বুঝতে পেরে, হেসে বলল, "ও, তুমি প্রাইভেসির কথা বলছ? ওসবে আমাদের প্রয়োজন হয় না। প্রাইভেসি মানুষের নকল সভ্যতার কপট আবিষ্কার। আমাদের ভালোবাসার প্রাইভেসির প্রয়োজন নেই।"

এবার পিটর যোগ দিল, "প্রাইভেসি, প্রাইভেট প্রপার্টি, পারশোনাল পজেসন: এ

সবই মানুষকে অমানুষ করার যন্ত্র। আমরা ওসবে বিশ্বাস করি না। ক্যাথীর, আমার, নিজস্ব বলতে কিছুই নেই। আমরা একেবারে মুক্ত।"

"কিন্তু তোমরা পলাতক," আমি তখনও নাছোড়বান্দা।

"আপাতত," বলল পিটার। "চিরদিন আমরা পলাতক থাকব এমন প্রতিজ্ঞা ক'রে বসি নি। যদি যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে, আমরা ভিড়ে পড়ব তার সঙ্গে। তুমি যদি ডেমোক্রাটিক পার্টির কনভেনসনে শিকাগো যাও, আমাদের নিশ্চয় দেখতে পাবে। ক্যাথীর কি ইচ্ছে জান? ক্যালিফোর্ণিয়ায় ক্ষেতমজুরদের নিয়ে একটা আন্দোলন গ'ড়ে উঠছে, তোমাদের গান্ধীর পথ ধরে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। হাজার হাজার ক্ষেত মজুর—শাদা, কালো, তামাটে—বছরের পর বছর অবিশ্বাস্য দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করছে, বড় বড় জমিদার কর্পোরেশনগুলি তাদের যে-ভাবে শোষণ করে তার নজির অন্য কোনও অগ্রসর দেশে তুমি দেখতে পাবে না। ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করে অহিংস সংগ্রাম শুরু হ'য়েছে আমেরিকায় এই প্রথম। ক্যাথীর ইচ্ছে আমরা এই সংগ্রামে ভিড়ে পড়ি। আমারও অনিচ্ছা নেই।"

"প্রকৃত সমস্যাটা কি জানো?" ক্যাথী আমাকে না বুঝিয়ে ছাড়বে না, "প্রকৃত সমস্যা হল কি ক'রে নিজের স্বত্বাটুকু বাঁচিয়ে, মাঝে মধ্যে স্পন্দিত হয়ে, এই সমাজে বেঁচে থাকা সম্ভব। সমাজ আমাকে কিছুতেই বাঁচতে দেবে না, যদি-না আমি তার নিয়ম মেনে চলি, আরও দশজনের মত সে আমাকে যা দেয় তাতে সন্তুষ্ট থাকি। তুমি সমাজের মধ্যে থেকে তাকে পরিবর্তনের কথা বলেছিলে। তা যদি সম্ভব, তবে তো কথাই নেই। কিন্তু আজকালকার যান্ত্রিক সমাজে পরিবর্তন আনা একেবারে সহজ নয়। যারা শাসক, তাদের ক্ষমতা এত বেশি, এমন সব দারুণ দারুণ অস্ত্র তাদের হাতে, তাদের কাবু করা সহজ নয়, নয়, নয়। তাহলে? তা'হলে তুমি কি মাথা পেতে মেনে নেবে যা তুমি মানতে চাও না, না-কি তুমি বিফল ব্যর্থ 'সংগ্রাম' ক'রে শাসকদের জেলে গিয়ে বছরের পর বছর কাটাবে, না-কি তুমি পালিয়ে যাবে, সমাজ থেকে দূরে, যদিও সমাজেরই মধ্যে, পালিয়ে গিয়ে কোনও মতে নিজের সত্বাটুকুকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, যদিও তুমি জানো বেশিদিন পালিয়ে বাঁচা যায় না, হয় ফিরে আসতে হয়, নয়তো একটু একটু ক'রে গলে পচে যেতে হয়, তবু, অন্য দ্বারা হত হবার চেয়ে আত্মহত্যার স্বাধিকারটুকুও অনেক সময় মূল্যবান অধিকার বলে মনে হ'তে পারে, পারে না কি?"

ক্যাথীর প্রশ্ন জবাব চায় নি আমার কাছে, চায় নি ঈশ্বর অথবা কার্ল মার্কসের কাছে, প্রশ্ন ক্যাথী করেছিল নিজেকে, জবাব পায় নি নিজের কাছ থেকে, মানুষের কোনও বড় প্রশ্নের শেষ জবাব কি কেউ কোথাও কোনওদিন দিতে পেরেছে? আমি

কিন্তু সেদিন রাত্রিতে দেখছিলাম কেবল দুটি তরুণতরুণীকে নয়, দেখছিলাম তথাকথিত সভ্য, অগ্রসর সমাজের এক বিরাট পিতৃহীন সন্তানশ্রেণীকে, যারা পার্থিব প্রাচুর্যের মধ্যে শেষপর্যন্ত বিষকুম্ভ আবিষ্কার করেছে, অথচ যাদের মধ্যে অমৃতের ক্ষুধা সাড়া দিচ্ছে, অমৃত কোথায়, বাবা, মানুষের জন্যে ? ক্যাথী বিরাট ধনী পিতামাতার একমাত্র কন্যা, ভাইএর মৃত্যুর পর, প্রচুর ধনসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, পিটর মেধাবী ছেলে, চলতি, অনুমোদিত পথে এগিয়ে গেলে তার জীবনে সাফল্য অবধারিত ; অথচ এরা দুটি তরুণ-তরুণী সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সমাজ সভ্যতার ওপর দারুণ গোসা ক'রে, পালিয়ে এসেছে নিউইয়র্ক শহরের 'ভিলেজে', এদের পরণে নোংরা ছেড়া পোষাক, দুবেলা ভাল ক'রে খেতে পায় না প্রতিদিন, মজে আছে ম্যারিওয়ানা আর হাশিশের আমদানী মৌতাতে, আর সঙ্গীতের তরঙ্গিত আনন্দে। এদের আশা নেই যে সমাজ বদলাবে, প্রগতি সভ্যতার কোমলতায় হবে সহনীয়, ক্ষমতা এবং প্রতাপ পরদেশীয় ঘরবাড়ি গ্রামশহর জ্বালিয়ে দেবে না নৃশংস অহমিকার নির্লজ্জ দাপটে, জীবন হবে না কেবল প্রলম্বিত অন্ধ অনুসরণ দৈহিক সার্থকতার, বেঁচে থাকার আনন্দ দেহমনের স্নায়ুতন্ত্রীতে সূক্ষ্ম সুর তুলবে যখন তখন, তবেই না বেঁচে থাকা অর্থপূর্ণ পরিশ্রম ! এরা পরাজয় মেনে নিয়েছে, এবং নেয়নি, কারণ, এরা এখন লড়ছে, এদের এই স্বকৃত নির্বাসনের মধ্যেও. এরা ঘোষণা করছে এদের পিতাদের কাছে, তোমরা যা গড়েছ, তা আমরা চাই না, তোমরা দানবীয় অসভ্যতার বিশ্বব্যাপী সমারোহ সাজিয়ে তুলেছ, আমরা তোমাদের মানছি না, তোমাদের সঙ্গে আমরা নই। এদের লড়াই নিশ্চয় বাঞ্ছিত সুফল আনবে না, কিন্তু তবু এরা যে লড়ছে, মেনে নিচ্ছে না অবনত মানসে, সেটুকু পর্যন্ত আমরা মনে রাখছি না, যখন আমরা দেখতে পাই বড়চুল, নোংরা, ছেঁড়াজামাকাপড় পরা, গায়ে-মাথায়-উকুন ড্রাগ-এ্যাডিক্ট হিপিদের আমাদের শহরে, ওদের নিয়ে মজা করি যেন ওরা সার্কাসের ক্লাউন, ধিক্কার দি, যেন ওরা পচা আবর্জনা, ওদের মনে করি দুষ্ট উপদ্রব, আমাদের যুবক-যুবতিদের চোখের সামনে অবাঞ্ছিত উদাহরণ। আমরা, ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েরা, পিতাদের সামাজিক, ব্যৈক্তিক উচ্চাশার চাবুক খেয়ে দম বন্ধ ক'রে উর্ধ্বশ্বাসে স্কুল কলেজের সিঁড়ি পেরিয়ে চাকরীনামক আদর্শ উপত্যকায় উপনীত হবার প্রচেষ্টায় আশৈশব নিযুক্ত, আমরা বিয়ে করি যৌতুক নিয়ে, হয়ত নগদ টাকার বদলে একশ একটি ঘর-সাজানোর সামগ্রী, আমরা শ্বশুর বেছে নি ভালো চাকরী অথবা সুলভ পদোন্নতির সহজ হিসেব ক'রে, আমরা কি ক'রে বুঝব এসব ছেলেমেয়েদের জীবন-বেদ, এদের প্রতিবাদ, এদের পরিবর্জন ? তোমরা, আমাদের বাবারা, আমাদের যে দিনরাত নিদারুণ লোভী ক'রে তুলছ, কেবল শিখিয়ে যাচ্ছ কি ক'রে যে-কোনও উপায়ে কতখানি বেশি কেড়ে নিতে পারি আমরা

সুখসম্ভোগসম্পদের অপর্যাপ্ত ভাণ্ডার থেকে, কত তাড়াতাড়ি উপনীত হতে পারি সেই বাঞ্ছিত বার্ধক্যে যার অন্য নাম সাকসেস।

ক্যাথী আর পিটর যে আমার বন্ধু হ'তে পারে না, আমি যে ওদের লোক নই, ওদের সঙ্গে যে আমার অনেক প্রভেদ, বুঝতে একটুও কষ্ট হয় নি, সময় লাগে নি সেদিন আমার। ওরা বিয়ে না ক'রে সহবাস করছে, বিবাহে ওদের আস্থা নেই, ওরা গির্জায় যায় না, ঈশ্বরে ওদের বিশ্বাস নেই, ওরা কার্ল মার্কস মানে না, মাথা নত করে না চেয়ারম্যানের মাওয়ের কাছেও, ওরা নয় সহজে চিনতে পারার মত বিপ্লবী। ওরা হয়ত একটা বিরাট পরিহাস তোমাদের তৈরী সভ্যতার। এ পরিহাস ওদের বাবারা আজ বুঝতে পারছে না, কিন্তু বুঝতে হবেই আগামী কাল অথবা পর্শু, অথবা তার পরের দিন।

ইতিমধ্যে আমরা? আমরা আখের গুছিয়ে নেবার ঘর্মাক্ত প্রচেষ্টার মধ্যে দেখতে পাব আমাদের পিতাদের গলিত অবক্ষয়। তোমরা ধারাবাহিক ধাপ্পা দিয়ে চলেছ, কি রাজনীতি, কি সমাজ এবং অর্থনীতিতে, আমরা হয় তোমাদের গলায় মালা পরাচ্ছি, নয়তো রাজপথে মিছিল নামিয়ে চীৎকার তুলছি, তাতে তোমাদের প্রাচীন সিংহাসন টলছে না। তোমরা সমাজতন্ত্রের আওয়াজ তুলে গড়ে যাচ্ছ কুৎসিৎ শোষক সমাজ, যা পশ্চিমের ধনতন্ত্রের চেয়েও বিষাক্ত।

তোমরা উদারনৈতিক আওয়াজ তুলে জাতিভেদকে পাকা-পোক্ত করছ, এক সামান্য অংশের বিচিত্র সুখসম্ভোগের জন্যে দেশের অর্ধেক লোককে উপবাসী রেখে তৈরী হচ্ছে তোমাদের "নতুন" সমাজ, তোমাদের কথায় এবং কাজে মিল নেই, অথচ তোমরা দাবী করছ, কি জবরদস্ত তোমাদের দাবী, তোমরা দাবী করছ তোমাদের নীতিকে বাহবা দিয়ে অনুগমন করি আমরা পুত্ররা, তোমাদের পতাকা বহন করে তোমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে।

তোমাদের দাবী না মেনে এখনও উপায় নেই আমাদের। আমরা জানি তোমরা কি করছ, তোমাদের ছেড়ে আসতে চাই, কিন্তু, গায় প্রাচীন সমাজ, তখুনি টের পাই, ছাড়তে গেলে ব্যথা বাজে।

বাবা, তোমরা বাধ্য, অনুগত অবনত জীবনের স্তিমিত অনুশীলন ক'রে এসেছ বলে আমাদের কাছেও তোমাদের দাবী বাধ্যতার, আনুগত্যের। আমরা ঠিক ভারতবর্ষের প্রথম অবাধ্য অনানুগত জেনারেশন নই। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এখনও বাধ্য, অনুগত। তথাপি তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এক্ষেত্রেও একটা গুণগত তফাৎ এসে গেছে। তোমাদের বাধ্যতা আনুগত্য দাবী করার মত সমাজের কিছুটা দাপট ছিল; তোমাদের পিতৃকুল স্বস্থানে অনেকবেশি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যে-সব সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক অবস্থা, এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, সমাজের মানুষগুলিকে বাধ্য, অনুগত, শান্ত, সুশৃঙ্খল ক'রে রাখে, তারা সতেজ হ'তে পারে, হ'তে পারে নিস্তেজ, তাদের মধ্যে জীবনের জলন্ত আগুন থাকতে পারে, আবার থাকতে পারে মৃত্যুর তুহিন শীতলতা, সেগুলো তোমাদের কালে ছিল, তাই তোমরা মানতে, আমাদের কালে তারা দুর্বল, জীর্ণ, অনেকস্থানে ভেঙ্গে-পড়া, তাই আমাদের মধ্যে নেই সে বাধ্যতা, সে আনুগত্য। আমরা যখন মানি, মাথা নত ক'রে তোমাদের পথে চলি, সে-কেবল আমাদের অন্য পথ জানা নেই বলে, তোমাদের পথে বিশ্বাস করি বলে নয়।

তুমি বলবে, কথাটা সত্যি নয়, তোমরা যদি বাধ্য হ'তে, মেনে নিতে, বিদ্রোহ-বর্জন না করতে, তাহ'লে ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ত না, তোমরা অত বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে ভারতের মাটি থেকে অপসরণে বাধ্য ক'রে তোমাদের বর্জন-ক্ষমতার চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়েছ, যার ধারে কাছেও আমাদের অবাধ্যতা পৌঁছতে পারে নি, অতএব আমাদের বর্জন কেবল একটা শূন্য আন্দোলন, তার ভেতরে সার নেই, বাইরে যতই থাকুক না বুদ্ধির চাকচিক্য।

কিন্তু, বাবা, তোমরা কি সত্যি সাম্রাজ্যবাদকে বিদ্রোহ-বর্জনে দেশ থেকে উৎখাত করেছ?

না কি সাম্রাজ্যবাদের চরম সংকট সময়ে তার সঙ্গে একটা বিরাট ও ব্যাপক "ব্যবস্থা" তৈরী ক'রে তোমরা স্বাধীনতার সৌধ বানিয়েছ, যার মধ্যে যেটুকু সার আছে তার ভাগাভাগি হ'য়ে গেছে তোমাদের একটা ছোট্ট অংশের মধ্যে, বাকী আর অনেকে পেয়েছ তোমরা ছিটে ফোঁটা, যারা পায়নি কিছুই, অথবা সামান্য, তারা দেশের সংখ্যাহীন মানুষ, যারা মাঠে চাষ ক'রে এবং একবেলা খায়, যাদের আমি, আমরা চিনি নে, কোন সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পাই, তারা দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক, অথবা

তারও বেশি! আজও, এই শতাব্দীর সাত দশকে, তারা মাসে পঁচিশ টাকা কামায়, যদিও তারা নির্বাচনে অন্ধ ভোট দিয়ে তোমাদের কর্তৃত্ব বহাল রাখে।

১৯৪৭ সালে যে ঘটনার দিন কয়েক আগে আমি জন্মেছিলাম, তাকে স্বাধীনতা বলতে আমার বুকে যেমন একটা তীব্র স্পন্দন হয়. কিন্তু আমি তো আরও দু'একটা স্বাধীনতার সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়েছি, তাই আমি জানি, তোমরা সেদিন স্বাধীন করেছিলে ভারতবর্ষের হয়তো একশ জনের মধ্যে পাঁচ সাত বড়জোর দশজনকে, যার মধ্যে ছিলে তোমরাও, বাকী মানুষদের নয়, এবং আজও তারা পরাধীন, তোমাদের অধীন. তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম বোধকরি আজও শুরু হয় নি, কিম্বা-সবে হয়েছে শুরু। তোমরা সাম্রাজ্যবাদকে 'বর্জন' করে সাম্রাজ্যবাদ শক্তির সঙ্গে ধ্যানধারণার, ভাবের, বুদ্ধির, অন্তরের পাকাপোক্ত মিতালি স্থাপন করেছিলে, করো নি কি?

তুমি পলিটিশিয়ান নও, স্বদেশী ক'রে জেলে যাও নি, তুমি সাধারণ বুদ্ধিজীবি বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, তোমার নিজের ঘটনাটাও বিশ্লেষণ ক'রে দেখ না. বাবা, আমি যা বলতে চাইছি তার মানে কিছু আছে কি নেই!

তোমার ঠাকুর্দা এক ধরণের স্বদেশী ছিলেন! ১৯০৫ সালের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের স্বদেশী। হঠাৎ সেদিন বাঙ্গালী আত্মচেতনায় উন্মাদ হ'য়ে গানে, মননে, ভাবায়, সাহিত্যে, ধর্মে একসঙ্গে ফেটে পড়ছিল। তোমার ঠাকুর্দার মাধ্যমে তোমাদের সেই পুববাঙ্গলার দূরস্থ প্রাচীন গ্রামেও নতুন প্রাণের উত্তাপ গিয়ে পৌঁচেছিল।

একই সঙ্গে তোমার ঠাকুর্দা ছিলেন ইংরেজের নিরেট ভক্ত! তোমার মুখেই শুনেছি, তিনি বলতেন, ইংরেজের মত মানুষ নেই পৃথিবীতে, সবার সেরা জাত ইংরেজ।

তোমার বাবা ছাপোষা শিক্ষক ছিলেন, রাজনীতির ধার ধারতেন না। তবু তাঁর তীক্ষ্ণ আকাঙ্ক্ষা ছিল তুমি ইংরেজের কাছে লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পাও. তাই তুমি যখন জলপানি পেয়ে আই, এ, পাশ করলে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে, উত্তীর্ণদের তালিকার শীর্ষে নাম বেরুল তোমার, দরিদ্র স্কুল শিক্ষক হ'য়েও, বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে অতিরিক্ত স্কলারশিপের লোভ কাটিয়ে তিনি তোমায় ভর্তি ক'রেছিলেন স্কটিশচার্চে, যাতে ইংরেজ অধ্যাপকদের সঙ্গলাভে তুমি ধন্য হ'তে পার।

আর তুমি? ছাত্রকালে তুমি সাম্যবাদের প্রভাবে এসেছিলে, রাজনীতিও একেবারে করো নি তা নয়, কর্মজীবনে তুমি সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবি গ্রন্থকার, রাজনৈতিক চেতনা তোমার ক্ষুরধার, তুমি সমাজবাদে বিশ্বাসী! তুমি এবং আমাদের মা তোমরা আমাকে আর মিতুকে ভর্তি ক'রে দিলে নয়া দিল্লীর সেরা মিশনারী স্কুলে, যার পরিচালনা করেন আইরিশ ব্রাদার্স, যাতে আমরা ছোটবেলা থেকে ইংরেজী বলতে পারি অনায়াস পরিচ্ছন্নতায়, সাহেবদের ছেলেমেয়েদের মত।

শুধু তো তুমি নও, বাবা, তোমরা সবাই। প্রধান মন্ত্রী থেকে নিচের দিকে যতটা সম্ভব তাকিয়ে তো একই চেহারা দেখতে পাই! যাদের সঙ্গতিতে কোনও রকমে সুযোগের নাগাল মেলে তারা পড়াতে চায় ছেলেমেয়েদের শাদা চামড়া মানুষ পরিচালিত মিশনারী স্কুলে। প্রথম কনভেন্ট, তারপর সবচেয়ে ভাল দিশী স্কুল।

আমার আজও মনে আছে তুমি যেদিন আমাকে কনভেন্টে নিয়ে গিয়েছিলে ভর্তির উদ্দেশ্যে। গোল ডাকখানার সংলগ্ন সেন্ট কলম্বা স্কুল, লাল ইটের বাড়ীটার ফাটক পেরিয়ে ঢুকতেই মেরী মাতার প্রস্তর মূর্তি, তারপর গির্জা, বাঁদিকে সেন্ট কলম্বা, ডান দিকে জীসাস-মেরী।

স্কুলের বাড়ীটার হলঘরে শ'পাঁচেক পিতামাতা তাদের সন্তানদের নিয়ে সাহেব প্রিন্সিপালের দর্শনপ্রার্থী। কে কি ক'রে কাকে ডিঙিয়ে আগে দর্শন পাবে তার জন্যে কি দারুণ নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা!

আমি ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম!

বলেছিলাম, 'আমি পড়ব না এ স্কুলে।'

তুমি বলেছিলে, 'পড়বার সুযোগ পাবে ব'লে মনে হচ্চে না!'

তখন এক মহিলা, ববছাট চুল, চোখে চশমা, ঠোঁটে লাল রং, তাঁর পাঁচ বছরের ছেলেটাকে এক রকম ছুড়ে দিয়েছেন প্রিন্সিপালের কোলে, আর বলছেন তারস্বরে চেঁচিয়ে, 'ফাদার, এ ছেলে আমার নয়, আপনার, আপনি ওকে না নিলে কে আর নেবে বলুন!'

প্রিন্সিপাল ও'কনারের শৃঙ্খলা রাখবার ক্ষমতা ছিল না। সেদিন শ'পাঁচেক পিতামাতাপুত্র পরিবৃত তাঁকে দেখে আমার মনে হচ্চিল এখুনি বুঝি তাদের ভারে তিনি মাটিতে পিষে যাবেন।

তুমি বলে উঠেছিলে, "অসম্ভব। এখানে তোমার পড়া হবে না। প্রিন্সিপালের কাছাকাছিও আমি যেতে পারব না।"

কিন্তু তুমি গিয়েছিলে। সেদিন নয়, সেদিন আমাকে নিয়ে তুমি তখুনি বাড়ী ফিরে এসেছিলে। মাকে বলেছিলে, আমার দ্বারা সম্ভব হব না কেতুকে সেন্ট কলম্বাতে ভর্তি করা।

সম্ভব হয়েছিল। তিনদিনের মধ্যেই প্রিন্সিপাল ও'কনার সাহেবের সঙ্গে তাঁর খাস দপ্তর ঘরে তোমার দেখা এবং কথাবার্তা হ'য়েছিল। চতুর্থ দিন আমি সেন্ট কলম্বাতে ভর্তি হ'য়েছিলাম। বড় স্কুলে নয়। করোলবাগে স্কুলের নতুন ব্রাঞ্চ খোলা হ'য়েছিল। সে ব্রাঞ্চ স্কুলে।

মিতুকে কনভেন্ট অব জীসাস অ্যাণ্ড মেরীতে ভর্তি করাতেও তোমাকে কষ্ট করতে হয় নি। তোমার দপ্তরের চাপরাশী শেষরাত্রে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল কনভেন্ট স্কুলের আপিসের সামনে ভর্তি-প্রার্থীদের লাইনে। ফর্ম নিয়ে এসেছিল। ফর্ম ভর্তি ক'রে তুমি গিয়েছিলে স্কুলে মিতুকে নিয়ে। মিতু সোজা গিয়ে বসেছিল কিণ্ডার গার্ডেন ক্লাসের নিম্নতম শ্রেণীতে।

মনে আছে, তোমাকে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম কি ক'রে তুমি আমাকে ভর্তি করলে!

তুমি বলেছিলে, 'আমরা এমন একটা ব্যবস্থা তৈরী করেছি যাতে ধরাধরি না করলে, কলকাঠি না নাড়লে কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। ভাল স্কুলের সংখ্যা সামান্য, চাহিদা অনেক। অতএব, এই নিদারুণ প্রতিযোগিতার কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। যার যেটুকু প্রতিপত্তি, ক্ষমতা আছে তার ব্যবহার না করলে প্রতিযোগিতায় হার হবেই।"

"তুমি কি ক্ষমতা ব্যবহার করেছিলে বাবা?"

"দিল্লীর বিশপের সঙ্গে কোনও সূত্রে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁকে অনুরোধ করতে তিনি ও'কনারকে বলেছিলেন। ও'কনারকে ফোন করতেই সাক্ষাৎকারের নিমন্ত্রণ এসে গেল। বাকীটা হয়ে গেল খুব সহজে।"

"তুমি আমাকে মিশনারী স্কুলে ভর্তি করলে কেন?'' প্রশ্ন করেছিলাম।

"শিক্ষা ভাল হয়, তাই।"

"তুমি তো পড়ো নি মিশনারী স্কুলে!"

"না। আমি গ্রামের স্কুলে প'ড়েছিলাম। শেষ দুবছর আমাদের হেডমাষ্টার ছিল না। ইংরিজী পড়াবার শিক্ষক আর কেউ না থাকায় ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে ওটা স্কুলে পড়ানই হয় নি।"

"তুমি তো তিনটে বিষয়ে 'লেটার' পেয়ে পাশ করেছিলে!"

"তখনকার দিন অন্য ছিল। তোমরা যখন বড় হবে তখন দেখবে তীব্র প্রতিযোগিতা। ভাল স্কুল থেকে ভাল পাশ না করলে ভাল কলেজে ভর্তি হ'তে পারবে না। ভাল চাকরী পাবে না।"

"কিন্তু ইংরিজী কলেজে প'ড়ে দশজনের একজন হতে পারব না। সবার কাছ থেকে আলাদা হ'য়ে যাবো না কি আমি? দেশের ক'টা ছেলেমেয়ে ইংরিজী স্কুল কলেজে পড়তে পারছে?"

"একশ' জনের মধ্যে একজনও নয়।"

"তবে?"

"বাকী নিরানব্বুই জন আমার ছেলে নয়। তুমি আমার ছেলে। মিতু আমার মেয়ে।"

"অতএব আমরা বাকীদের থেকে আলাদা!"

"নও কি! এদেশে ক'জন লোকের গাড়ী আছে! বাড়ীতে টেলিফোন!"

"মানে, আমরা আলাদা হ'য়ে জন্মেছি! আমাদের রেহাই নেই।"

"মানে, আমরা আর তোমরা এক নই। আমি দরিদ্র বাবা-মা'র ছেলে। আমার বাবা বড় হ'য়ে আমি কি করব কোনওদিন ভেবে দেখেন নি, প্ল্যান করা তো দূরের কথা। সন্তান জন্ম নিত ঈশ্বরের ইচ্ছায় ও নির্দেশে, বেঁচে থাকত অথবা ম'রে যেত, বেঁচে থাকলে নিজের নিয়মেই বড় হ'ত, স্কুল কলেজ পাশ ক'রে কোনও মতে একটা চাকরী পেয়ে গেলে জীবন সার্থক হ'ত। চাকরীই বা ক'টা ছিল! অতিশয় প্রতিভাবান ও তারও চেয়ে ভাগ্যবান ছেলেরা আই. সি. এস হ'ত। তারপর বি. সি. এস,, নয়তো স্কুল কলেজে মাষ্টারী, তা নইলে সরকারী অথবা বেসরকারী কেরানী। আমার সঙ্গে যারা পড়ত তাদের মধ্যে কত মেধাবী তুখোড় ছেলে ছিল, তারা কে কোথায় ভেসে গেছে, বেঁচে আছে জীবনের নামহীন নেপথ্যে, আমি জানিও নে। শুধু দু'এক জন নিতান্ত ভাগ্যের জোরে নেপথ্য থেকে মঞ্চে এসে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছে। আমাদের সাফল্য এক একটা এ্যাকসিডেন্ট, হ'য়ে গেছে তাই হয়েছে, হবার কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ ছিল না। তোমাদের জীবন অন্যরকম হবে। বিত্তবান না হলেও তোমরা গরীব ছেলেমেয়ে নও। অনেক কিছু তোমরা ছোটবেলা থেকে পাচ্ছ যা দেশের বিপুল জনসংখ্যার সন্তানরা পায় না, বহুদিন পাবেও না। তোমাদেরই মধ্যে জীবনের ভালটুকুর জন্যে কঠিন প্রতিযোগিতা চলবে। তোমাদের ভবিষ্যৎ আমরা প্ল্যান করবার সুযোগ পাব। তুমি যদি ইন্‌জিনীয়র বা ডাক্তার বা বৈজ্ঞানিক হ'তে চাও, তার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। যদি বিদেশে গিয়ে পড়তে চাও তারও সুযোগ পাবে, ভাল স্কুল কলেজ য়ুনিভারসিটি থেকে ভাল পাশ করতে পারলে। যদি গভর্ণমেণ্টে যোগ দিতে চাও—"

আমি বলে উঠেছিলাম, "না আমি কোনদিন গভর্ণমেণ্টে চাকরী করব না।"

তুমি বোধহয় আমার প্রতিক্রিয়ার তীব্রতায় আশ্চর্য হ'য়েছিলে।

কিন্তু কোনওদিন তুমি আমাদের তীক্ষ্ণ অনুভূতিগুলিকে নিষ্পেষিত করতে চাও নি, তাই তোমার বিস্ময় না-প্রকাশ ক'রে কেবল বলেছিলে, "তোমরা যখন বড় হবে তখন সরকারী কাজকে স্বর্গীয় মনে করবার প্রয়োজন থাকবে না। সরকারের বাইরে এমন অনেক কিছু করণীয় থাকবে যাতে জীবনে পূর্ণতার আস্বাদ পাবে।"

আমি জোর দিয়ে বলেছিলাম, "তোমার মত আমিও লেখক হব।"

"আমার চেয়ে অনেক বড়, অনেক ভাল লেখক হবে তুমি।"

"কি ক'রে জানলে ?"

"তা না হ'য়ে লেখক হ'য়ে লাভ কি ?"

"তোমার চেয়ে বড় কিছু হব ভাবতে গেলে ভয় ক'রে আমার, বাবা।"

তুমি হেসে উঠেছিলে।

"সত্যি বলছি। অনেক সময় অনেক কিছু হবার কথা ভাবি। যাই ভাবি দেখি বিরাট তুমি সামনে দাঁড়িয়ে।"

"একদিন দেখবে আজকের বিরাট ছোট্ট হ'য়ে গেছে।"

"কেন হবে ?"

"আর একটা বিরাট মাথা তুলে দাঁড়াবে বলে।"

"না, বাবা, তোমার চেয়ে বড় হ'য়ে আমার ভাল লাগবে না। আমি অনেক বড় হব, কিন্তু তোমার চেয়ে নয়।"

"বেশ তো। আমার চেয়ে একচুল কম। খুশি ?"

মিশনারী স্কুলে পড়তে একটুও ভাল লাগত না আমার অথবা মিতুর। স্কুলে যেতেই ইচ্ছে করত না আমার, তা তুমি বিলক্ষণ জান। রোজ সকালে মার সঙ্গে এক রীতিমত গেরিলাযুদ্ধ। কি ক'রে কোন অছিলায় দেরী করে দিয়ে বাস 'মিস' করা যায় তার অক্লান্ত চেষ্টা। ভোর না হ'তে মা ডাকতে শুরু করত আর জেগে গেলেও আমার ঘুম ভাঙতো না কিছুতেই। মিতু বাথরুমে চলে যাবার পরও আমি জেগে জেগে মরার মত ঘুমুচ্ছি। মাকে এসে অগত্যা বিছানা থেকে টেনে তুলতে হ'ত, পাইখানা আমার আর হ'তেই চায় না। স্নানের ঘরে যতটুকু পারি দেরী ক'রে নি। তারপর খাওয়া। গলা দিয়ে কিছুতেই খাদ্য ঢুকতে চাইত না। কখনও কখনও বেপরোয়া হ'য়ে মা ডাকত তোমাকে। তুমি এসে বসতে খাবার টেবিলে। তখন গলা আমার খুলতে বাধ্য। তোমার কাছে প্রতিরোধ ছিল না, অনেক বড় হবার আগে, সুদান হার্ডির সঙ্গে প্রেমে পড়ার আগে। সে কথা বলবার সময় এখনও আসেনি।

স্কুলে গিয়ে স্যার আর মিসদের দেখলেই আমার স্নায়ুগুলি বিগড়ে যেত। লাল ঠোঁট দিশী মিসরা দাঁত চেপে চওড়া গলায় ইংরিজী বলত, তাদের মধ্যে না ছিল মমতা না সহানুভূতি, তারা আমাদের ভাল বাসত না, আমাদের সামনে রাগে তারা ঘর্মাক্ত হত, আমরা যেন ছিলাম তাদের এক এক পাল শত্রু। আজ বুঝতে পারি, তাদের বিদ্যেবুদ্ধি ছিল সামান্য, কোনও মতে বাঁধাধরা পথে তারা এক একটা বিষয় যেত পড়িয়ে, ইতিহাস থেকে সমাজকল্যাণ পর্যন্ত, আমরা কতটুকু বুঝলাম, আদৌ পাঠ্যবিষয় আমাদের প্রাণস্পর্শ করল কিনা এ নিয়ে একটুও মাথা ঘামাত না তারা। ক্লাসে কথা বল্লে আমরা

মার খেতাম, পড়া না পারলে বেশি মার, হোম ওয়ার্ক না নিয়ে গেলে আরও বেশি। আমাদের মেরে স্যার আর মিস্-রা কেমন একটা হিংস্র আনন্দ পেত, যেন নিজেদের জীবনের অনেকবেশি গ্লানি আর পরাজয় হিংস্র রাগের মধ্য দিয়ে গেল বেরিয়ে, যেন তাদের পদানত মনুষ্যত্বের খানিকটা সাময়িক বিজয় ঘটল, নিজেদের পৌরুষ দেখে খানিকটা বাহবা পেল নিজেদের কাছেই।

শাদা চামড়ার মিশনারীরা যাই বলুক না কেন, বাবা, তাদের পরিচালিত স্কুলে যিশুর প্রভাব যতটা তার চেয়ে অনেক বেশি পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের, এতে আমার একটুও সন্দেহ নেই। দিশী স্যার ও মিস-দের সঙ্গে শাদা পাদরী শিক্ষকদের যা সম্পর্ক তার মধ্যে আর যাই থাক মানুষের সঙ্গে মানুষের সততা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা খুব একটা থাকে না। দিশী শিক্ষকদের কোনও ভূমিকা নেই স্কুল পরিচালনায়, তাঁরা কেবল শাদা পাদরীদের আদেশ মেনে চলেন মাত্র। এবং যেহেতু খৃষ্টান হ'লেই এসব স্কুলে চাকরী পাবার সম্ভাবনা আগে, তাই যোগ্য লোকের পরিবর্তে অনেক অযোগ্য লোক এসব স্কুলে স্থান পায়, এবং এরাই ছাত্র পেটায় সব চেয়ে বেশি। অবশ্য সেন্ট কলম্বাতে আমাদের সময় আইরীশ ব্রাদার্সরাও ভীষণ ছাত্র পেটাত, আমাদের মেরে তাদের কি যে আত্মতৃপ্তি হত তা হয়ত তারা নিজেরাই জানত না ভাল ক'রে। বাইবেলের পাতায় পাতায় যীশুর অনেক কথামৃত, কিন্তু কোথাও তিনি মাষ্টারদের বারণ করে যান নি ছাত্রদের পিটিয়ে আনন্দ পেতে, অতএব আমাদের দেহগুলি ছিল ব্রাদারদের এবং দিশী মাষ্টারদের দেহচর্চার বিষয়, মাথায় তারা কিছু দিতে পারুক আর না পারুক আমাদের দেহসেবায় তাদের উৎসাহের শেষ ছিল না।

ক্লাস সেভেন পর্যন্ত স্কুল থেকে আমি বলবার মত কিছু পেয়েছি মনে করতে পারি নে, বাবা। আমার একমাত্র প্রকৃত শিক্ষক ছিলে তুমি। তোমার কাছে একদিনও স্কুল কিতাব পড়িনি। কিন্তু সকালে তোমার সঙ্গে একঘণ্টা হাঁটতে যাবার সময় অথবা রাত্রে তোমার ও মার সঙ্গে গল্প করার সময় মিতু আর আমি যা শিখেছি, স্কুলের 'শিক্ষা'র বিরাট অপচয় তাতে অনেকখানি কেটে গেছে, সন্দেহ নেই।

প্রথম যে শিক্ষক আমার মনে অনির্বচনীয় অনুভূতি আনলেন তাঁর নাম ব্রাদার অ্যাশ। বাংলায় বলতে হয় 'ছাই-ভাই'। আমি যখন ক্লাশ এইটে পড়ি 'ছাই-ভাই' আমাদের স্কুলে বদলি হ'য়ে এলেন দার্জিলিং থেকে, এবং আবির্ভূত হলেন আমাদের প্রধান শিক্ষক হিসেবে। প্রথম দিন রোল কলের সময় সাইত্রিশ জনের ক্লাসে পাঁচটি বাঙালী ছেলেকে খুঁজে পেয়ে ব্রাদার অ্যাশের মনে এক বিচিত্র কোমল রসের উদ্রেক হল। প্রত্যেকটি বাঙালী ছেলের নাম উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আদেশ দিলেন। "কীপ ষ্টানডিং।"

সব ক্লাস বসে আছে, আমরা পাঁচজন দাঁড়িয়ে, ছাত্ররা বুঝতে পারছে না ব্রাদার অ্যাশ তামাশা করছেন না কি অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে তাঁর, তারা হাসতে গিয়েও পারছে না হাসতে, একটা নকল নীরবতা তাই বিরাজ করছে ক্লাসে।

আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে ব্রাদার অ্যাশ একটা বইতে মনোনিবেশ করলেন। আমরা পাঁচজনে এ ওর সঙ্গে চোখাচোখি করলাম। পুলক বসু আমার দিকে তাকিয়ে চোখ দিয়ে প্রশ্ন করল, ব্যাপার কি? আমি চোখ দিয়ে জবাব দিলাম, যীশু জানেন।

তিন চার মিনিট চলে গেল।

এবার আমি বসলাম।

ব্রাদার অ্যাশ বিদ্যুতের মত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রথম বাক্য।

'এই ছেলে, কি নাম তোমার?'

'আমাকে বলছেন, স্যর?'

"হ্যাঁ, তোমাকে। তুমি বসলে কেন? তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছি না!"

'আমার মনে হল আমাদের বসতে বলতে আপনি ভুলে গেছেন।'

'খুব চালাক জবাব! কেন মনে হল আমি ভুলে গেছি?'

'রোল কলের সময় দাঁড়াতে বললেন। রোল কল শেষ হ'লে আমাদের কিছু না ব'লে বই পড়তে লেগে গেলেন, আমরা দাঁড়িয়েই রইলাম। তাই মনে হল ভুলে গেছেন।'

ব্রাদার অ্যাশ অন্য চারজন তখনও দাঁড়িয়ে বাঙ্গালী ছাত্রদের প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদেরও তাই মনে হচ্ছিল?'

তিনজন বলল, না। কেবল পুলক বলল, 'আমারও অনেকটা তাই মনে হচ্ছিল, স্যর।'

'তুমি ব'সে পড়ো নি কেন?'

'সিওর হ'তে পারি নি, স্যর।'

ব্রাদার অ্যাশ আমার সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। দেহের সমস্ত তেজ চোখ দুটোতে জড়ো ক'রে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

আমি একবার তাঁর চোখের পানে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে মেঝের ওপর রাখলাম।

ঠাস ক'রে চড় মারলেন ব্রাদার অ্যাশ আমার গালে। অতবড় চড় এর আগে কখনও খাই নি। হটাৎ মাথাটা একদম ঘুরে গেল। দাঁড়িয়েছিলাম, বসে পড়লাম।

'আমি দাঁড়াতে বললে থাকবে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ না বসতে বলি, বুঝেছ বাঙ্গালী ছেলে!'

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, একশ' বার বুঝেছি।

'পুরো ক্লাস তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে,' হুকুম করলেন ব্রাদার অ্যাশ।

এর পর তিনি আমাদের পাঁচ জনের পরিচয় নিতে লাগলেন। আমাদের নাম কি? বাবার নাম কি? কি করেন তিনি। বেঙ্গলে কোথায় আমাদের বাড়ী? শেষ কবে বাড়ী গেছি, এই সব প্রশ্ন। আমাদের পাঁচজনের মধ্যে একজন, দীপক চক্রবর্তী, ভারত সরকারের এক সেক্রেটারীর ছেলে। শুনে ব্রাদার অ্যাশ ঠোঁট ওল্টালেন।

'তোমার বাবা তাহলে একজন টপ-ব্র্যাস। ভি-আই-পি। আই-সি-এস। হেভেন বর্ণ সার্ভিস। স্টিল ফ্রেম। অ্যাঁ।' তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। দীপকের কান লাল হ'য়ে উঠল। দুজনের পিতৃদেবরা ডেপুটি সেক্রেটারী। শুনেই ব্রাদার অ্যাশ এমন ভাব দেখালেন যে তাঁদের সম্বন্ধে অতিরিক্ত কৌতূহল অবান্তর। এবার এল পুলক বসুর পালা।

'তোমার বাবা আছেন?

'আছেন।'

'কি করেন তিনি?'

'বিজনেস একজিকিউটিভ।"

'কোন কোম্পানী?'

"লয়েডস্ ব্যাংক।"

'লাভলি!' চেঁচিয়ে উঠলেন ব্রাদার অ্যাশ। 'ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বেতনভুক কর্মচারী। বিউটিফুল।

এবার আমি।

'তুমি কে?'

'আমার নাম কেতু।'

'তোমার বাবা কি কাজ করেন?'

'লেখেন।'

'ও আই সী। তুমি একজন রাইটারএর ছেলে। কি লেখেন?'

'বই।'

'বটে। কি রকম বই?'

'ইংরাজীতে রাজনৈতিক। বাংলায় উপন্যাস।'

'তিনি কংগ্রেসী?'

'না। তিনি বলেন, আমি রাজনীতির ছাত্র।'

'তাঁর নিজস্ব কোন রাজনৈতিক মতামত নেই?'

'আছে বৈকি।'

'তুমি জান ?'

'কিছুটা। তিনি নিজেকে ডেমোক্রাট বলেন!'

'তোমার বাবা কম্যুনিষ্ট নন ?'

'না। বাবা বলেন, কম্যুনিষ্ট মানে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মী। তিনি তা নন। তিনি কোনও রাজনৈতিক দলে নেই। মার্কসবাদে তিনি অনেকখানি বিশ্বাস করেন।'

'তুমি ?'

'আমি কার্ল মার্কস পড়িনি এখনও। বড় হ'য়ে পড়ব।'

'তুমি জান কাল মার্কস ধর্মে বিশ্বাস করতেন না ? বলতেন, ধর্ম জনগণের আফিং ?'

'শুনেছি।'

'তবু তুমি মার্কস পড়বে ?'

'কেন পড়বো না ? বড় হ'য়ে আমি গীতা উপনিষদও পড়ব। আমার বাবাও পড়েছেন।'

'ব্লাডি ব্র্যাট্।'

সমস্ত ক্লাস চমকে উঠল। ব্রাদার ক্লাসে ছাত্রদের সামনে 'ব্লাডি' বলবেন, আমাদের কান গরম হ'য়ে উঠল।

মুহূর্ত পরে সমস্ত ক্লাস একসঙ্গে হেসে উঠল।

ব্রাদার অ্যাশ বললেন, 'তোমরা পাঁচজনই আমাকে নিরাশ করেছ। তোমাদের বাবাদের মধ্যে একজনও বিপ্লবী নন! দার্জিলিং-এ আমার তিনটে ছাত্র ছিল, তাদের বাবারা বিপ্লবী। আসল টেররিষ্ট। দুজন ছিলেন সূর্য সেনের দলে। সূর্য সেনের নাম শুনেছ ? শোন নি ? চিটগঙ্গ আর্মারী রেডের গল্প জান ? জান না ? তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত! আজই বাড়ী গিয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস কোরো! আমি আমার তিনটি ছাত্রের বাড়ী গিয়ে তাদের বাবাদের সঙ্গে আলাপ করেছি। ওঁরাই তো ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন! নট ইওর মহাট্মা গান্ধী। বাট বেঙ্গলস্ সুভাষ বোস!'

আমরা ক্লাসের ছাত্ররা তখন বিস্ময়ে একেবারে হতবাক।

ব্রাদার অ্যাশ বলে চললেন, "বেঙ্গল! বেঙ্গল! ভারতবর্ষে ঐ একটা জাত আছে, যারা ইংরেজকে মানে নি, মেরেছিল। রীয়েল গ্রেট।"

তারপর আমাদের আরও অবাক ক'রে দিয়ে ব্রাদার অ্যাশ বিশুদ্ধ বাংলায় আবৃত্তি ক'রে চললেন:

> তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা।
> এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।

ব্যাঘাত আসুক নব নব—আঘাত খেয়ে অচল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ্খ॥

আবৃত্তি শেষ ক'রে বললেন, "কার কবিতা বলতে পার?"

পুলক বলে উঠল, "টাগোর।"

ব্রাদার অ্যাশ বললেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

কি জানি কেন আমার দুচোখ তখন জলে ভ'রে গেছে।

ব্রাদার অ্যাশের সঙ্গে বছর খানেকের মধ্যে আমার যে সম্পর্ক তৈরী হল তাকে প্রাচীন ভারতীয় মূল্যায়নে বলা যায় গুরু-শিষ্য সম্পর্ক। বত্রিশ বছরের এই আইরীশ ভদ্রলোক পাদ্রী হয়েছিলেন প্রধানত পারিবারিক প্রভাবে; ঠাকুর্দা ছিলেন পাদ্রী, এবং পিতাও, "অতএব ছোটবেলা থেকে ধ'রে নেওয়া হয়েছিল আমিও পাদ্রী হব।" স্কুলজীবনেই ধর্মীয় শিক্ষার আরম্ভ, স্কুল শেষ হ'তে হ'তে ক্যাথলিক চার্চের ডিভিনিটি স্কুলে ভর্তি, এবং পাদ্রী জীবনের প্রস্তুতি। "ধর্ম নিয়ে আমার কোনও আপত্তি নেই," বলতেন ব্রাদার অ্যাশ, "শুধু এটুকু ছাড়া যে কেউ ধর্ম মানে না, কোনও চার্চই না, পৃথিবীর কোথাও। আসলে দেখা যায় ধর্মের সঙ্গে রাজশক্তির গলায় গলায় মিতালি, ধর্ম সমাজকে নতুন ক'রে গড়বার বদলে পুরাতন ক'রে রাখবার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।' আইরীশ ব্রাদার্স মিশন থেকে ব্রাদার অ্যাশ ভারতবর্ষে আসার আগে পড়িয়েছিলেন লাতিন আমেরিকার একুওডোরে, আফ্রিকার নাইজিরিয়ায়। "ওখানে কি শিখেছি, জানো? শিখেছি, খৃষ্টান চার্চের পুরো সহায়তা না পেলে প্রাচ্য সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্য সৃষ্টি করতে পারত না। আমার মনে একটুও সন্দেহ নেই যে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে খৃষ্টান চার্চ, ক্যাথলিক এবং প্রটেষ্টান্ট, এখনও প্রধান।" এবং সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, "তোমাদের দেশে নতুন সমাজ তৈরীর সবচেয়ে বড় বাধা হিন্দুধর্ম।" বুঝিয়ে বলতেন, "ধর্ম মানে তো কতগুলি নীতি উপদেশ নয়, ধর্ম মানে একটা গোটা সমাজ ব্যবস্থা। হিন্দুধর্ম মানে তোমাদের হিন্দু সমাজ, তার জাতিভেদ, জন্মান্তরবাদ, অদৃষ্টবাদ সব কিছু নিয়ে গোটা সামাজিক শাসন। তোমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণ যতদিন জাত মানবে, অদৃষ্টবাদ আর জন্মান্তরবাদ মানবে ততদিন যে কোনও শাসকদল অনায়াসে তাদের কনট্রোল করতে পারবে।"

ব্রাদার অ্যাশের রক্তে ছিল টগবগে আইরীশ জাতীয়তাবাদ। এবং ইংরাজের প্রতি রোষ ও ঘৃণা। যা তিনি একেবারে সইতে পারতেন না, তা হল ভারতবর্ষের জাতীয় মানসে গভীর ইংরাজপ্রীতি। "তোমরা এক বিচিত্র জাতি। ইংরেজকে রাজনৈতিক শাসন থেকে সরিয়ে বুদ্ধি আর মননের শাসক বানিয়ে নিয়েছ। তোমাদের

মানসিক স্বাধীনতা একেবারে নেই। চিন্তায়, মননে, আইডিয়ার সন্ধানে, তোমরা এখনও ইংলণ্ডের দুয়ারে দীন প্রার্থী। ইংরেজের যে সবচেয়ে দর্পিত দাবী—তার সাম্রাজ্যবাদ এক নতুন ভারত সৃষ্টি করেছে—সে দাবী প্রতিদিন প্রমাণ ক'রে যাচ্ছ তোমরা। অবশ্যি তোমাদের একার দোষ নয় এখানে। আমরাও দোষী। ভেবে দেখ 'ইংরেজী' সাহিত্যে আয়র্লাণ্ডের প্রভাব। জর্জ বার্নার্ড শ', ইয়েটস, জয়েস: এদের বাদ দিলে আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের রইল কি? অথচ একমাত্র জয়েস ছাড়া আইরীশ ভাষা পর্যন্ত অন্য কোনও আইরীশ লেখক ব্যবহার করে নি। এবং জয়েসও তাঁর 'ইউলিসিস' লিখেছেন ইংরেজীতে, যার ফলে ইংরেজ তাঁকে বগলদাবা ক'রে নিয়ে গেছে আমাদের কাছ থেকে।"

একদিন ব্রাদার অ্যাশ ক্লাসে ঢুকেই প্রশ্ন করলেন, "তোমাদের মধ্যে কে কে এই স্কুলে কিনডারগার্ডেন থেকে পড়েছ?"

অনেকগুলো হাত উঠল, বোধহয় চারপাঁচ জন ছাড়া সবারই।

"তাহলে তোমরা এই বইগুলো পড়েছ, পড় নি কি? ব্রাদার অ্যাশ তিনখানা ইতিহাস ও ভূগোল বই আমাদের চোখের সামনে রাখলেন। খুব পরিচিত বই আমাদের, সাহেবদের লেখা, সাহেব কোম্পানীর ছাপা, বছরের পর বছর এ বইগুলো প'ড়ে আমাদের মত ছেলেরা মিশনারী স্কুলের নিম্নতম চৌকাট পেরিয়ে ধাপে ধাপে উঁচু ক্লাসে উত্তীর্ণ হ'য়ে থাকে।

"তোমরা পড়েছ এই বইগুলো, আজ তোমাদের ছোট ভাইবোনেরা পড়ছে, কাল তাদের ছোট ভাইবোনেরা পড়বে, তাই না?"

আমরা সমবেত স্বরে বললাম, ইয়েস স্যার।

"কি লেখা হয়েছে এ বইগুলিতে মনে আছে তোমাদের?" এক একটা বইএর পাতা উল্‌টিয়ে ব্রাদার অ্যাশ পড়ে গেলেন। "ভারতবর্ষের লোকেরা এখনও ইট তৈরী করে রৌদ্রে শুকিয়ে। ...চীনের মানুষরা নানা প্রকার কীটপতঙ্গ খেয়ে জীবনযাপন করে।...ইংরেজী শিক্ষা ভারতীয়দের মনের প্রাচীন অন্ধকার দূর করেছে...ভারতবর্ষের অনেক অসভ্য কুসংস্কার দূর করেছেন ইংরেজ শাসকরা...১৯৪৭ সালে ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষে ও অন্যান্য উপনিবেশগুলিকে স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন...আফ্রিকার লোকেরা আদিম অসভ্য ছিল, পশ্চিমের সভ্যতা তাদের আধুনিক যুগের আলোর সন্ধান দিয়েছে।" বইগুলো টেবিলের ওপর রেখে ব্রাদার অ্যাশ কয়েক মিনিট চুপ রইলেন।

তারপর বললেন, "তোমাদের বাবারা কখনও এ বইগুলি দেখতেন প'ড়ে?"

কেউ কেউ বলল, দেখতেন। তার মধ্যে ছিলাম আমি।

ব্রাদার অ্যাশ আমাকে ধরলেন, "তোমার বাবা পড়তেন বইগুলো ?"

"প্রত্যেকটা।"

"কি বলতেন ?"

"আমাকে দেখিয়ে দিতেন, বুঝিয়ে দিতেন বইগুলি কারা লেখে কি উদ্দেশ্যে কাদের জন্যে। বলতেন, খুব দুঃখের কথা এসব বই তোমাদের পড়তে হয়।"

"এর বেশি কিছু নয় ?"

"তখন ব্রাদার ও'কনর ছিলেন প্রিন্সিপাল। বাবা তাঁকে একটা চিঠি লিখেছিলেন।"

"জবাব পেয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ। প্রিন্সিপাল ও'কনর লিখেছিলেন, তিনি জানতেন বইগুলোতে অনেক আউট-ডেটেড তথ্য আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ছোটদের জন্যে ইংলিশ টেক্সটবুকের দারুণ অভাব, নেই বললেই হয়। তাই এসব বই না পড়িয়ে উপায় নেই।"

ব্রাদার অ্যাশ শুধু বললেন, "তোমাদের বাবারা আসলে সাম্রাজ্যবাদের বন্ধু। তা নইলে এত সব সাম্রাজ্যবাদী মিথ্যে তাঁদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে গ্রহণ করছে এ তাঁরা সহ্য করতেন না।"

পুলক বলে উঠল, "আমরা এর কিছুই গ্রহণ করি না স্যার।"

ব্রাদার অ্যাশ বললেন, "তোমরা জান না এসব বই তোমাদের কী ক্ষতি করছে। জানলে একথা বলতে না। দোষ তোমাদের নয়। তোমাদের পিতাদের। তাঁরা তো ল'ড়ে স্বাধীনতা আদায় করেন নি, ইংরেজের হাত থেকে গ্রহণ করেছেন মাত্র। একটা কথা তোমাদের বলি, বড় হ'য়ে তার মানে ঠিক বুঝতে পারবে। যাঁদের স্লোগান হল Continuity and Change তাঁরা আসলে Continuityতে বিশ্বাস করেন Change-এ নয়।"

আমরা জানতাম ব্রাদার অ্যাশ বেশিদিন স্কুলে টিকতে পারবেন না। আমার মত কয়েকটি ছেলে, যারা তাঁর শিষ্য হ'য়েছিল, আমাদের তিনি প্রায়ই বলতেন, চার্চের সঙ্গে তাঁর বনিবনাও হচ্ছে না, পাদ্রী জীবন থেকে একদিন তিনি কেটে পড়বেন। "কি করতে চাইনে তা আমি বেশ ভালই জানি এখন, বুঝলে ? কি করতে চাই, তা যেদিন জানব সেদিনই কেটে পড়ব চার্চ লাইফ থেকে।" প্রায়ই বলতেন, স্বদেশে ফিরে যাবেন। "বাবার মৃত্যুর দিন গুনছি। তেরাশি বছর হয়েছে, আমি চার্চ ছেড়ে দিয়েছি জানলে বড্ড কষ্ট পাবেন। কিন্তু অনেকদিন আর অপেক্ষা করতেও পারব না।"

এক নাটকীয় ঘটনার মধ্যে ব্রাদার অ্যাশকে আমাদের স্কুল ছাড়তে হল। সে বছর আমরা সিনিয়র কেমব্রিজের ছাত্র, অর্থাৎ স্কুলে আমাদের শেষ বছর।

ভারত সরকারের এক জবরদস্ত মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর কাছাকাছি যাঁর প্রভাব ও ক্ষমতা, ছেলেকে পড়াচ্ছিলেন সেণ্ট কলম্বায়, সে ছেলে পড়ত আমাদের সঙ্গে, একই সেকসনে। পড়াশোনায় মন ছিল না তার, সব বিষয়ে পাশের নীচে নম্বর পেত, ব্রাদার অ্যাশ প্রায়ই তাকে পেটাতেন, কথা শোনাতেন কড়া-কড়া, কিন্তু তাতে সে একটুও আহত হয়েছে মনে হ'ত না। সিনিয়র কেম্ব্রিজের আগে স্কুল সিলেকশন টেষ্টে সে যথারীতি ফেল ক'রে বসল। স্কুলের প্রাচীন নিয়ম ক্লাসে টীচারের অনুমোদন ছাড়া কাউকে প্রমোশন দেওয়া হয় না, এক্ষেত্রে ব্রাদার অ্যাশ মন্ত্রীপুত্রকে ফেল করিয়ে দিলেন, অর্থাৎ সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষার জন্যে সে মনোনয়ন পেল না।

মন্ত্রী প্রথম লোক পাঠালেন প্রিন্সিপালের কাছে, পরে ফোন করলেন, শেষে নিজেই এলেন দেখা করতে। ছেলের জন্যে বিদেশে টেকনিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে, ইংলণ্ডের ক্রাইসলার মোটর কোম্পানী তাকে নেবে শিক্ষানবীশ ক'রে, পাশ তাকে করতেই হবে। মন্ত্রী মহাশয় এজন্যে উপযুক্ত গৃহশিক্ষক রেখে দেবেন, স্কুলের তিনজন মাষ্টারের সঙ্গে কথাও হ'য়ে গেছে, এখন তাঁর চাই শুধু সিলেকশন। এটুকু তাঁর জন্যে করতেই হবে, অনুরোধ জানালেন ব্রাদার ও'ডানিয়ালকে।

ও'ডানিয়াল বললেন, "এ স্কুল থেকে আজ পর্যন্ত কেউ ফেল করেনি। আপনার ছেলে পাশ করবে এমন ভরসা আমাদের নেই।"

মন্ত্রী বললেন, "আমি কথা দিচ্ছি সে পাশ করবেই।" একটু পরে বললেন, "কারুর কাছে কোনও অনুগ্রহ চাইবার প্রয়োজন আমার হয় না, অভ্যাসও নেই। আপনার কাছে অনুগ্রহ চাইছি। এর চেয়ে বেশি আর বলতে পারছি না। যদি আমার কথা রাখেন, খুব মনে থাকবে আপনার অনুগ্রহ।"

ব্রাদার ও'ডানিয়েল মন্ত্রীর কথার মানে বুঝলেন। যদি আমার অনুরোধ না রাখেন তাহলেও খুব মনে থাকবে।

বললেন, "ব্রাদার অ্যাশ আপনার ছেলের ক্লাস টীচার। তাঁর অনুমোদন ছাড়া ওকে আমি সিলেকশন টেষ্টে পাশ করাতে পারি না। আমাদের স্কুলের এই নিয়ম।"

"ব্রাদার অ্যাশকে আপনি বলুন, তাহলেই তিনি অনুমোদন করবেন।"

"আপনি তাঁকে চেনেন না। আমি হয়তো বলব, কিন্তু তার আগে আপনাকে বলতে হবে।"

"বেশ তো। তাঁকে ডেকে পাঠান এক্ষেত্রে।"

"তিনি ক্লাস করছেন। আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে।"

বেয়ারা একটা স্লিপ নিয়ে আমাদের ক্লাসে ঢুকল, স্লিপ প'ড়ে ব্রাদার অ্যাশ মুখ বিকৃতি করলেন। আমরা তখন ইংরিজী শব্দের 'পান' অভ্যাস করছিলাম, পুলক একটা

'পান' ক'রে ক্লাস শুদ্ধ সবাইকে হাসিয়ে তুলেছিল 'পান'টা হল Brothers Marry Nun, ব্রাদার অ্যাশ নিজেও হেসে পুলকের বুদ্ধির তারিফ করছিলেন, হটাৎ বলে উঠলেন, "তোমরা একটু বিশ্রাম নাও, আমি আসছি।"

পাঁচ মিনিট পরে যখন ক্লাসে ফিরে এলেন তাঁর মুখ ভীষণ গম্ভীর, ভীষণ লাল।

ঘটনাটা জানাজানি হ'তে দেরী হল না।

ব্রাদার অ্যাশ কিছুতেই মন্ত্রীপুত্রকে সিলেকশন টেষ্টে পাশ করাতে রাজী হলেন না।

প্রিন্সিপাল অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন। অত বড় মন্ত্রীকে চটালে স্কুলের, এমন কি মিশনের, ক্ষতি হ'তে পারে। এদেশে মিশন চালাতে হ'লে একটু আধটু নিয়মভঙ্গ করতেই হবে। দিল্লীর বিশপের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। বিশপও মনে করেন ঐ মন্ত্রীকে চটান মোটেই উচিত হবে না।

ব্রাদার অ্যাশ শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন, একটি মাত্র শর্তে। মন্ত্রীপুত্রকে পাশ করালে অন্য যারা ফেল করেছে প্রত্যেককে পাশ করাতে হবে। 'এই ছেলেটা সব চেয়ে নিকৃষ্ট। তাকে পাশ করালে আর কাউকে আটকান যাবে না। অন্য ছেলেগুলির বাপেরা মন্ত্রী নয় বলে শাস্তি পাবে তা হ'তে পারে না।'

ব্রাদার ও'ডানিয়েল মহা বিপদে পড়লেন। মন্ত্রী হয়ত তিন চারজন গৃহশিক্ষক রেখে ছেলেকে পাশ করিয়ে নেবেন। অন্য ফেল-করা ছেলেদের বাবারা তা পারবে না। তাদের সার্টিফিকেট পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়ার মানে অন্তত কয়েকটি নিশ্চিত ফেল। সেন্ট কলম্বা'র ইতিহাসে যা ঘটেনি ব্রাদার ও'ডানিয়েল তা কি ক'রে ঘটতে দেন?

একটিমাত্র পথ তার খোলা ছিল। ব্রাদার ও'ডানিয়েলকে সে পথই নিতে হল শেষ পর্যন্ত।

তিনি ব্রাদার অ্যাশকে দিল্লী থেকে অন্য কোনও স্কুলে বদলি করিয়ে নিলেন। নিজেকে করলেন, তাঁর বদলে, আমাদের ক্লাস টিচার। মন্ত্রীর ছেলে সিলেকশন পেল। ব্রাদার অ্যাশ আমাদের কাউকে কিছু না বলে, কারুর কাছ থেকে কোনওরকমের বিদায় না নিয়ে, হঠাৎ একদিন চলে গেলেন।

আমরা একদিন সকালে ক্লাসে হাজির, পড়াতে এলেন প্রিন্সিপাল ও'ডানিয়েল। আমাদের মুখে বিস্ময় লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'ব্রাদার অ্যাশ তোমাদের আর পড়াবেন না। তিনি কাল রাত্রে অন্যত্র বদলি হ'য়ে গেছেন। আজ থেকে আমি তোমাদের ক্লাস টীচর।'

পড়া শুরু করার আগে একটি ছেলের নাম উচ্চারণ ক'রে তাকে দাঁড়াতে বললেন। উঠে দাঁড়াল সেই মন্ত্রীপুত্র।'

ব্রাদার ও'ডানিয়েলের মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

বললেন, 'আজ থেকে স্কুল শেষ হলে রোজ তুমি দু'ঘণ্টা ক্লাসে ডিটেন হবে। আমি তোমাকে কাজ দেব। সে কাজ শেষ ক'রে আমাকে দেখিয়ে তারপর বাড়ী যাবে।"

ব্রাদার ও'ডানিয়েল রিস্ক নিতে রাজী নন। যাকে নিয়মের বাইরে সিলেকশন টেস্টে পাশ করিয়েছেন, সে যাতে আসল পরীক্ষায় ফেল না ক'রে বসে সে দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন।

সেদিনটা, তোমার হয়ত মনে পড়বে, বাবা, আমার বড় বিষণ্ণ কেটেছিল। তোমাকে বার বার প্রশ্ন করেছিলাম, ব্রাদার অ্যাশ আমাদের কাউকে কিছু না বলে, একবার বিদায়টুকু পর্যন্ত না নিয়ে, এমন হটাৎ কেটে পড়লেন কেন? আমরা যে তাঁকে কত ভালবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম তা তো তিনি জানতেন। তবে কি তাঁর কাছে আমাদের ভালবাসা-শ্রদ্ধার কোনও মূল্য ছিল না। আমাকে তো তিনি 'বন্ধু' বলতেন! কত রবিবার তাঁর সঙ্গে পুরো অপরাহ্ণ কাটিয়েছি কত গল্পে! একবারও কি তাঁর মনে হ'ল না আমরা দুঃখ পাব?

তুমি আমার প্রশ্নগুলির জবাব দাও নি। শুধু বলেছিলে, লোকটার সত্যিকারের আর্ট সেন্‌স্ আছে। যদি কোনওদিন গল্প লিখিস, কেতু, দেখতে পাবি কি সুন্দর আর্ট-সেন্‌স্ নিয়ে ব্রাদার অ্যাশ তোদের কাছ থেকে সরে পড়েছিলেন। আমরা জীবনে অনেকেই কিছু কিছু গল্প ফেঁদে বসতে পারি। সুন্দর ভাবে শেষ ক'রে উঠতে পারি খুব কম।

তোমার কথার একটা মানে আমি সেদিন ধ'রে নিয়েছিলাম, জানিনা সেটাই সত্যিকারের মানে ছিল কিনা।

তিন বছর পরে, তখন আমি সেন্ট স্টীফেন্‌স্ কলেজের ছাত্র, আমরা গিয়েছিলাম সিমলা পাহাড়ে। তুমি হটাৎ খবর পেয়ে গেলে ওখানকার সেন্ট কলম্বা স্কুলে ব্রাদার অ্যাশ আছেন। বেশ উত্তেজনার সঙ্গেই খবরটা আমাকে দিলে, এবং বললে, 'দেখা করতে যাবে তো তুমি। আজই যাবে?'

আমি চুপ ক'রে রয়েছিলাম।

'আজ যাবে? আমরা আসব তোমাদের সঙ্গে?'

আমি বললাম, 'কি হবে দেখা ক'রে?'

তুমি বুঝলে। ব্রাদার অ্যাশের প্রসঙ্গ আর উঠল না আমাদের মধ্যে।

তারপর অনেক বছর কেটে গেল, বাবা, অনেক মানুষের অনেক বছর। একদিন, বছর খানেক আগে, নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সে একটা খবর চোখে পড়ল। নর্থ আয়ার্ল্যাণ্ডে

ক্যাথলিকদের সঙ্গে ইংরেজদের এক খণ্ড যুদ্ধে রবার্ট জনসন অ্যাশ নামে একজন ক্যাথলিক স্কুল শিক্ষক মারা পড়েছে। এককালে মিশনারী স্কুলে শিক্ষকতা সে করেছিল ইকোয়েডরে, নাইজিরিয়ায়, ইণ্ডিয়ায়। ক্যাথলিক চার্চ ত্যাগ ক'রে আয়ার্ল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে শিক্ষকতা করছিল এবং বর্তমান ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। "Robert Ashe belonged to the extremist wing of the anti-British Catholic movement."

বাবা, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তোমাদের মধ্যে অনেক মিথ্যে, অজস্র ফাঁকি, অসংখ্য গোঁজামিল আর অগুণতি অসততা আবিষ্কার করি, এবং বুঝতে পারি, এই বিশ্বব্যাপী মিথ্যে ফাঁকি গোঁজামিল অসততা থেকে রেহাই নেই, নেই রেহাই আমাদের; তোমরা নিজেদের পটের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরী করছ সন্তানদের, হাত ভ'রে তুলে দিচ্ছ যে উত্তরাধিকার, তার নিবিড় অন্তঃসারশূন্যতা তোমাদের মুখকে বিন্দুমাত্র লজ্জায় ম্লান করছে না; প্রচণ্ড অহমিকার দাপট মিশিয়ে গরলকে তোমরা অনায়াসে চালিয়ে দিচ্ছ অমৃত বলে, সে গরল পান ক'রে আমরা অমৃতের সন্তান, ভেজালের পতাকা হাতে ক'রে আমরা শাশ্বত আদর্শের অনুগামী।

যে অতিকায় আধা সত্য, আধা মিথ্যা, পূর্ণ মিথ্যার সমাজ সভ্যতা তোমরা তৈরী করেছ, তার মধ্যে যে আদিম, প্রবল, প্রচণ্ড ব্যাপারটাকে তোমরা সবচেয়ে বেশি মিথ্যা দিয়ে ঘিরে রেখেছ, ক'রে রেখেছ নোংরা, কুৎসিৎ অথচ দুর্দম্য প্রলোভনীয়, যাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ ক'রে তারই পেছনে অহর্নিশি তোমরা হাতড়ে বেড়াচ্ছ, এবার, অনুমতি করো, সে প্রসঙ্গে আসি। আমি যে বড় হ'তে শুরু করেছি, বাবা!

এ প্রসঙ্গের ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই, যা আমি খুশি মনে গ্রহণ ও ব্যবহার করতে পারি।

সেক্স-এর বাংলা কি, বাবা?

'যৌনবোধ?' আমার মুখে শব্দটি বিস্বাদ। কেমন যেন নোংরা।

ভেবে দেখলে আমার কেমন অবাক লাগে, বাবা। স্ত্রী পুরুষের লিঙ্গ নিয়ে, দেহের গোপনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে, আমাদের ঘরে ঘরে, বৈঠকে আড্ডায় কৌতূহল, কথাবার্তা, আলোচনার বিন্দুমাত্র অভাব নেই। কিন্তু শব্দগুলি যা আমরা সচরাচর ব্যবহার ক'রে থাকি তা প্রায়ই ইংরেজি, বাংলা নয়। আমরা বলি, 'প্রাইভেট পার্টস্', বলি

'পেনিস', বলি 'ব্রেষ্ট', অথচ এসব শব্দের নিশ্চয় সুখশ্রাব্য বাংলা আছে, সংস্কৃত তো আছেই, কবি জয়দেব, তাঁর অনেক আগে মহাকবি কালিদাস, ভাগ্যিস ইংরেজি জানতেন না!

আসলে আমি যা বলতে চাইছি, তা হল: 'সেক্স' শব্দ উচ্চারণ করতে অথবা লিখতে আমাদের বাধে না, আমরা বুঝি শব্দটার কি মানে, এবং অভিব্যক্তি। অথচ 'যোনি' কিম্বা যৌনবোধ' আমাদের কোনও বোধকেই উজ্জীবিত ক'রে না। অন্তত আমার নয়, আমার মত আরও অনেকের নয়।

আমার সেক্স-লাইফ, অর্থাৎ আমার যৌনচেতনার উন্মেষ, অভিব্যক্তি, বিকাশ, বিকৃতি, কামনা, রতিপ্রয়াস এবং রতিবিলাস; আমার এই চব্বিশ বছর বয়সের যা বোধকরি সবচেয়ে গভীর, ব্যাপক, উদ্বেলক, ভয়ানক এবং সুন্দরতম ধারাবাহিক ঘটনা; যার মধ্যে বার বার লক্ষ বার আমি নিজের অজ্ঞাত রহস্যে সম্মোহিত; যার মধ্যে আমার অনেক পৃথিবীর বিচূর্ণ ধ্বংসাবশেষ এবং আরও অনেক পৃথিবীর স্বপ্নালু সম্ভাবনা; যার মধ্যে আমি সৃষ্টির প্রথম এবং শেষ, আরম্ভ ও সমাপ্তি; যেখানে আমি কুৎসিৎ, হিংস্র, নিষ্ঠুর, নীচ এবং অতিশয় সুন্দর, কোমলকান্ত, ফুলের মত নরম, আকাশের ন্যায় উদার, সমুদ্রের চেয়েও মহান, সূর্যের মত দিকপ্লাবিত পৌরুষ আমার তার সঙ্গে, হে ভগবান, তারও সঙ্গে তোমরা, পিতা-মাতা কি ভীষণ ভাবে বিজড়িত, সেখানেও আমার স্বকীয় স্বাধীনতা অতিশয় সামান্য, সেখানেও আমরা পুত্ররা তোমরা পিতাদের সঙ্গে কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা!

কোনও কোনও বৈজ্ঞানিকদের মতে, যেমন ধরো জুরিখের অটো র‍্যাংক (Otto Rank), প্রত্যেকটি মানুষের যাবতীয় মানসিক সমস্যার মূলে রয়েছে birth trauma, জন্মের বিপর্যয়কারী অভিজ্ঞতা, পৃথিবীর সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়ের মীমাংসাহীন সংঘাত। তোমরা ভালোবেসে, অথবা দেহসঙ্গমের অমার্জিত অভ্যাসে, পিতা ও মাতা একসঙ্গে এক একটি সন্তানের সৃষ্টি কর; আমরা জন্ম নি তোমাদের কৃত্রিম পৃথিবীর ভেজাল সভ্যতায়, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইমোশনাল প্রব্লেমগুলি ধার্য হ'য়ে যায়, আমরা বন্দী হ'য়ে অবতীর্ণ হই তোমাদের উত্তরাধিকারের শৃঙ্খলে। ভাবতে গেলে মুখ বিস্বাদ না হ'য়ে কি উপায় আছে, বাবা!

না হয় Otto Rank এর birth trauma থিয়োরী নাই মানলাম, একথা তো আজ আর কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করবে না যে আমাদের পরিণত জীবনের ভাবাবেগগুলি ছোটবেলার অভিজ্ঞতা দ্বারাই বহুলাংশে নির্ধারিত হ'য়ে থাকে; আমাদের সঙ্গে পিতা এবং মাতার সম্পর্ক, তাঁদের প্রতি আমাদের, আমাদের প্রতি তাঁদের, আকর্ষণ বিকর্ষণই মোটামুটি আমাদের মানস-জগৎটাকে তৈরী ক'রে দেয়, যে

মানস-পরিধির বাইরে কদাচ আমরা প্রাপ্ত বয়স্ক জীবনে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করতে পারি ? এরিখ এরিখসন বাই না প্রমাণ ক'রে থাকুন মার্টিন লুথার আর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জীবন নিয়ে মনোবিকল-বিশ্লেষণে, পৃথিবীতে কটা জন্মায় কোন কালে লুথার আর গান্ধী, বুদ্ধ আর লেনিন, অথবা মাও সে তুং ? সন্তান বাপ মায়ের স্নেহের আধিক্য অথবা কার্পণ্য, বাবা-মায়ের আদর এবং শাস্তি : এসব থেকে নিজের মানস গঠনের উপাদান সংগ্রহ করে ; অনেক কিছু অনুভূতি, প্রতিক্রিয়াকেই শিশুমন প্রকাশ হ'তে দেয় না, দাবিয়ে রাখে, কিন্তু তার সামান্যই তার স্মৃতির বাইরে চলে যায় ; এসব অবদমিত অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে তৈরী হয় তার অবচেতন মন, চেতনার অগভীর গহনে তাদের দলিত স্মৃতিগুলি একদিন তাণ্ডব নৃত্য ক'রে ওঠে। অবচেতন মন থেকেই তো আমাদের প্রকৃত সৃষ্টিশীলতার উদ্ভব ; শুধু চেতন মনটুকু নিয়ে মানুষ যদি জীবিত থাকত, এমন বিচিত্র বৈভবময় কি হ'তে পারত তার সৃষ্টি ও সভ্যতা ? কিন্তু অবচেতন মনের নানা পরস্পর বিরোধী অনুভূতির সংঘাতকে সৃষ্টিশীলতার উর্বর পথে উত্তীর্ণ করতে পারে ক'জন ; আমাদের অধিকাংশ সে সংঘাতের কাছে পারি নে দাঁড়াতে, তারা আমাদের কাবু করে অথবা অকাল বৃদ্ধ, আমরা ঠিক জনিতেই পারি নে বেঁচে থাকার প্রকৃত অর্থ, আদিম মাদকতা, আমরা ভালোবাসি, ঘৃণা করি, গ্রহণ এবং বর্জন করি কথামালার মূল অনুসরণ ক'রে, নিজেদের কাজ থেকে পালিয়ে, আসলে নিজেদের আসল পরিচয় পেয়ে ভীত আতংকে বেসামাল হ'য়ে যাই, তাই পরিচয়কে অস্বীকার ক'রেই কোনমতে জীবন যাপন করাকে আমরা বেঁচে থাকা মনে ক'রে আত্মরতিতে অন্ধ হ'য়ে থাকি।

বাবা, গোটা পৃথিবীতে আমরা হচ্চি প্রথম জেনারেশন যারা সেক্স নামক অতিকায় দৈত্যের সঙ্গে সমানে সমানে মুখোমুখি লড়াই ক'রে তাকে কিছুটা সহজ, সরল স্বাভাবিক, সুন্দর এবং গ্রহণীয় ক'রে আনতে পেরেছি। তোমরা মানো আর নাই মানো, আমরা বহু শত বছরের একটা বিরাট রূপকথার দৈত্যকে তার প্রকৃত চেহারায় দেখতে শুরু করেছি। দেখতে শুরু ক'রে জেনেছি, তোমরা, সারা পৃথিবীর পিতারা, সব দেশ, সব সমাজ, সব সভ্যতার পিতা-মাতারা সেক্স নিয়ে যে একটা বিশাল অলীক কুৎসিৎ শিল্প তৈরী ক'রে ব'সে আছ, তার সমাধি না হওয়া পর্যন্ত, মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সুন্দর সরল সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা অবর্তমান।

তোমাদের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যে সংঘাত, তার অনেক খানি হল তোমাদের তৈরী সেক্স-নীতিবাদের সঙ্গে। সেক্স নিয়ে তোমরা গ'ড়ে তুলেছ বিশ্বব্যাপী এক সীমাহীন দুর্নীতি। তার সঙ্গে আমরা লড়ছি, আমরা এই বিশ শতকের শেষ-চতুর্থাংশের পুত্র কন্যারা, সব দেশে, সব সমাজে, সব সভ্যতায়।

আমার মনে নেই ঠিক করে, কোন বয়সে প্রথম মনে এবং স্নায়ুতে সঞ্চারিত হ'য়েছিল সেক্স-অনুভূতি। তবে এটুকু মনে আছে যে তা আমার দৈহিক পরিবর্তনের বেশ কিছু আগেই। অর্থাৎ আমার গলার মিহি স্বর ভেঙে মোটা হবার আগেই, বগলের মধ্যে এবং তলপেটের নীচে চুল গজাবার আগেই, নাকের নীচে গোঁফের প্রথম রেখা পড়বার আগেই, আমার মধ্যে এক বিচিত্র জাগরূক অনুভূতি আমি টের পেতাম, যার তখন কোনও ভাষা ছিল না, যা ছিল নিজেকে নিয়েই নিজে বিস্মিত, চমৎকৃত, সম্মোহিত; যা গোপনে নিজের দেহের মধ্য থেকে উঠে এসে দেহের মধ্যেই বিলীন হ'য়ে যেত এক কোমল-উষ্ণ মূর্ছনায়, এবং হঠাৎ মনে হ'ত পৃথিবী কি ভীষণ এবং সুন্দর, মাকে জড়িয়ে ধ'রে চুমু খেতে ইচ্ছে হ'ত, মায়ের বুকে ইচ্ছে করত হাত রাখতে, তোমাকেও জাপটে ধ'রে তোমার মধ্যে মিশে যাবার ইচ্ছে হ'ত, আবার ইচ্ছে হ'ত নিজেকে জড়িয়ে ধরে চুমুতে আদরে ভালোবাসায় ভ'রে দি, ভ'রে দি।

আমি জানতাম, জানত মিতুও, যে তুমি এবং মা অনবরত প্রেম করতে।

তোমাদের অনেক দেহরতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল। সাধারণ দেহরতিও তোমরা অনেক সময় আমাদের কাছে লুকোতে চ.ইতে। পারতে না।

তোমাদের লুকোচুরি আমাদের কৌতূহল তীব্র করত।

কৌতূহল মেটাতে খুব একটা কষ্ট করতে হ'ত না আমাদের।

হঠাৎ তোমাদের ঘরে ঢুকে পড়েছি। মা বলে উঠল, "ছাড়ো, ছাড়ো, কি করছ কি? ওরা দেখতে পাবে না?"

তুমি ছেড়ে দিতে।

আমরা দেখতে পেতাম।

তবু, শিশু মনের কুটিল হিংসায়, প্রশ্ন করতাম, "বাবা কি করছিল, মা?"

মা লজ্জায় লাল হ'য়ে পবিত্র শিশুমনের ভিতরে কৌতূহল মেটানর প্রচেষ্টায় বলত, "কিছু না।"

"তবে তুমি অমন ক'রে চেঁচিয়ে উঠলে কেন?"

"কে আবার চেঁচিয়ে উঠলাম?"

"বা রে চেঁচালে না? বললে না, ওরা দেখতে পাবে যে?"

"ছাখ কেতু, তুই ভীষণ অসভ্য হ'য়েছিস।"

"বা রে, আমি কি করলাম? আমি শুধু জানতে চাইলাম তুমি চেঁচিয়ে উঠলে কেন।"

এবার তোমার পালা।

তুমি বললে, "দেখবে, বাবা, মা তোমার কেন চেঁচাচ্ছিল? আমি মাকে আদর করছিলাম।"

"কি আদর করছিলে ?"

"চুমু খাচ্ছিলাম, জড়িয়ে ধরছিলাম, যেমন তোমাকে আর মিতুকে আদর করি।"

"আমরা তো চেঁচিয়ে উঠি না। ভয় পাই না।"

"তোমরা যে ছোট্ট! ছোট্টরা আদর করলে ভয় পায় না।"

"বড়রা পায়।"

"ভীষণ ভয় পায়। চেঁচিয়ে ওঠে। পাছে কেউ দেখে ফেলে।"

মা তখন বলে বসেছে, "খুব শিক্ষা দেয়া হচ্চে ছেলেকে।"

মিতু কিন্তু তার কৌতূহল নিয়ে তোমাদেব এমন উপদ্রব করত না।

একে তো, মেয়ে কিনা তাই, মিতুর সেক্স ফিলিং এসেছিল আমার অনেক পরে, তা ছাড়া মিতু ছিল অনেকখানি নরম শান্ত, তা ছাড়া, অনেক বেশি তোমরা যাকে বলবে শালীন, তা ছাড়া তোমাদের ভয় করত মিতু অনেক বেশি আমার চেয়ে। এবং তা ছাড়া, মিতুর কৌতূহল মেটাবার একটা সহজ উপায় ছিল, তা হল, আমি। আমি যা দুরন্ত অভিযানে, দুর্গম গিরি কান্তার মরু অতিক্রমে আহরণ ক'রে আনতাম, মিতুকে তার অংশ না দিলে আমার আত্মাভিমান পরিপূর্ণ হ'ত না, তাই মিতুর কৌতূহল জন্মাবার আগেই অনেক কিছু জানা হ'য়ে গিয়েছিল, এবং তাতে ক'রে বালিকা কালেও মিতুকে অনেক সময় রীতিমত বিজ্ঞ মনে হ'ত আমার, অনেক বিষয়ে আমি নিজেই মিতুর শরণাপন্ন হতাম।

আমরা জানতাম, রাত্রে তুমি আর মা কি কর, মা কেন অমন চাপা, নিঃশ্বাস আটকান আওয়াজ ক'রে, কেন তোমাদেব পালংকে, বিছানায় ঐ রকম আওয়াজ হয়, আমরা জানতাম, আমরা জানতাম আগে আমি, পবে মিতু।

অনেক সময়, একেবারে শিশুকাল থেকে, তোমাদের ঐ সময়ে আমি হটাৎ কেঁদে উঠতাম, হয়তো ঘুমের মধ্যেই অথবা জাগরণে, তোমাদের সঙ্গমসম্ভোগের সঙ্গে আমার আর্ত সংযোগ স্থাপিত হ'ত।

আরও অনেক বালকের মত, আমারও জানতে ইচ্ছে হ'ত সন্তান মা'দের পেটে কি ক'রে আসে, পেট থেকে কোন উপায়ে বেরিয়ে এসে জন্ম নেয়।

মিতু যখন মা'র পেটে তখন আমি কয়েক মাসের শিশু; মিতু যখন জন্মায় তখন আমার বয়স মাত্র দেড় বছর, তার পরে মা'র পেটে আর বাচ্চা আসে নি, মাকে প্রশ্ন ক'রে জেনে নেবার সুযোগ আমার ঘটে নি।

অতএব স্বলতা পিসিমাকে ধরতে হ'য়েছিল।

বিরাট পেট নিয়ে স্বলতা পিসিমা এসেছিল তোমাদের কাছে, বাচ্চা বিয়োতে। আমি তাঁকে ডাকতাম ফুলপিসি। কয়েকদিন ধরে অদম্য কৌতূহল নিয়ে ফুলপিসিকে

আমি লক্ষ্য ক'রে এসেছি, তোমাদের কাছে শুনেছি তাঁর বিরাট পেটের মধ্যে বাচ্চা আছে, এবং একদিন, কিছুদিনের মধ্যেই, সে বাচ্চা জন্ম নেবে। ডাঃ সেনের নার্সিং হোমে ফুলপিসির বাচ্চা-হবার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে, এখবরটা তুমি আর-মা-ই আমাকে দিয়েছ।

সুতরাং একদিন ফুলপিসিকে পাকড়াও ক'রে বসা গেল।

শীতের দুপুর। মাকে নিয়ে তুমি গেছ দোকান করতে, দিনটা সেদিন রবিবার। মিতুকে সঙ্গে নিয়েছ তোমরা। ফুলপিসি বাইরে লনে ব'সে রোদ পোহাচ্ছেন।

আমি গিয়ে বসলাম তাঁর পাশে।

ফুলপিসি, আমাকে আদর করলেন। স্কুলের কথা জেনে নিলেন খানিকটা। এবার আমি আমার প্রসঙ্গে এলাম।

"ফুলপিসি, তোমার পেটে কি আছে?"

ফুলপিসি লজ্জায় যেন কুঁকড়ে গেল।

"কি আছে ফুলপিসি? বাচ্চা?"

এবার ফুলপিসি মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।"

"কটা?"

ফুলপিসি কেমন রেগে উঠল: "ক'টা আবার?"

"একটা?"

"তবে কি পাঁচটা? আমি কি বিড়াল না কুকুর?"

"মানুষের তো দুটো, তিনটে, চারটে বাচ্চা একসঙ্গে হ'য়ে থাকে, তুমি জান না বুঝি? আমার বড় মাসিমার তো একসঙ্গে দুটো বাচ্চা হ'য়েছিল। থাইল্যাণ্ডে একটি মার পেট থেকে একসঙ্গে চারটে বাচ্চা বেরিয়েছিল।"

এবার ফুলপিসি জোর দিয়ে বললেন, "না। আমি ওরকম নই। আমার পেটে একটাই বাচ্চা।"

"আচ্ছা ফুলপিসি, বাচ্চা পেটে কি ক'রে তৈরী হয়?"

ফুলপিসি আমার মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না।

"বলছ না যে? বাচ্চা কি ক'রে তৈরী হয়?"

"ভগবান তৈরী ক'রে দেন।"

"কি ক'রে?"

"মন্ত্র দিয়ে, যেমন তিনি সব কিছু তৈরী করেন, তেমনি।"

"ভগবান মন্ত্র বলে দেন আর মা'দের পেটে বাচ্চা তৈরী হ'য়ে যায়?"

"হ্যাঁ।"

"তবে যাদের বিয়ে হয় না তাদের পেটে ভগবান বাচ্চা তৈরী করেন না কেন ?"

"বিয়ে না হ'লে মা হ'তে নেই, তাই।"

"কেন হ'তে নেই ?"

"ভগবানের তাই নিয়ম।"

"কিন্তু তা তো নয়! মাতা মেরীর তো বি'য়ে হয় নি, কিন্তু ভগবান তাঁর পেটে যীশুকে তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন।"

"মাতা মেরীর বিয়ে হয়েছিল।"

"আচ্ছা, ফুলপিসি, তোমার পেট থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসবে কি ক'রে ?"

"ডাক্তার বার করে আনবে।"

"পেট কেটে বার করবে ?"

"তা আমি কি ক'রে বলবো ?

ফুলপিসি, তোমার পেটে হাত দিয়ে দেখব বাচ্চাটা কি করছে ?"

ফুলপিসি রেগে মেগে উঠে পড়লেন, "তুমি কিন্তু ভীষণ অসভ্য হ'য়েছ, কেতু! যাও, পড়া করো গে।"

তোমরা ফিরে এলে ফুলপিসি মাকে অনেকক্ষণ ধ'রে কি সব বললেন, মা'র থমথমে মুখ দেখে অনুমান করতে কষ্ট হল না, নালিশটা আমার অসভ্যতা নিয়ে। অথচ মা আমাকে একটা কিছুও তিরস্কার করল না। রাত্রে, যেমন অনুমান করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা উঠল। ঘুমের ভান ক'রে আমি তার অনেকখানি শুনে নিলাম।

মা বলল, "কেতুটাকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। সুলতাকে কি সব প্রশ্ন করেছে আজ দুপুরে!"

তুমি বললে "বুঝেছি। বাচ্ছা নিয়ে নিশ্চয়।"

মা বলল, "তবে আর কি নিয়ে? পাকামির চূড়ান্ত।"

তুমি বলেছিলে, "কৌতূহলটা বেশি। জানতে চায়। ওকে জানতে দেওয়া দরকার।"

"জানবার একটা বয়স আছে তো!" মার গলা, একটু উঁচু পর্দায়, "জানে তো সবাই। কারুর কি কিচ্ছু অজানা থাকে ?"

"তা থাকে না। প্রায়ই সবাই জানতে পায় চুরি ক'রে, ধাক্কা খেয়ে; যে ভাবে সহজে, সুন্দর ক'রে জানতে পারা উচিত, তার ব্যবস্থার অভাব। কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলিতেও।"

"তাহলে তোমার মতে সব বাচ্চাদের জন্যে 'জানবার ক্লাস' খোলা উচিত!"

"নিশ্চয়। স্কুলে যদি সেক্স-এডুকেশনের ব্যবস্থা থাকত, অনেক কৌতূহল ছেলে-মেয়েদের সহজ স্বাভাবিক উপায়ে মিটতে পারত?"

"যত সব আজগুবি কথা। সুলতার কাছে লজ্জায় মরি।"

"কেন? কি জানতে চেয়েছিল কেতু?"

"কি নয় আবার? কেন বাচ্চা হয়, কি ক'রে বাচ্চা পেটে আসে, বিয়ে না হলে বাচ্চা পেটে আসে না কেন, পেট থেকে কি ক'রে বাচ্চা বেরিয়ে আসে, কি জানতে চায় নি? শেষ পর্যন্ত সুলতার পেট দেখতে পর্যন্ত চেয়েছিল।"

আমার বিছানা থেকে তোমার হাসি শুনতে পেলাম।

মা রেগে উঠল: "তুমি হাসছ?"

তুমি বললে, "বেচারা কেতু। তোমার পেটে আর একটা বাচ্চা এলে ওকে মাসি পিসি-কাকী-মামীদের দ্বারস্থ হ'তে হত না।"

মা খানিকক্ষণ চুপ। পরে বলল, "আমি কিন্তু ওকে সত্যিকথা বলতে পারতাম না। সুলতা যা বলেছে আমিও তাই বলতাম।"

"সুলতা নিশ্চয় ভগবান ইত্যাদির ওপর ঘটনাটা চাপিয়ে দিয়েছে।"

"দেবেই তো। তা ছাড়া, একটা নতুন প্রাণের জন্ম দেওয়া তো মানুষের কাজ নয়। ভগবানের ইচ্ছে না হলে কি সন্তান সৃষ্টি হ'তে পারে মা'র পেটে?"

"নাস্তিক হলেও জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, এই তিন ঘটনার দায়িত্ব আমি ভগবানের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। মানুষের জীবনে এই তিন ঘটনার দায়িত্ব নেবার মতো মনের জোর মানুষ এখনও আয়ত্ত করতে পারে নি।"

একটু পরে তুমি বলেছিলে, "কেতুকে আমি বুঝিয়ে দেব। ওর কৌতূহল আমরা যদি না মেটাতে পারি, নিজেই মেটাবে। তার ফল তোমার কাছে প্রীতিকর নাও হ'তে পারে।"

সপ্তাহ পরেই তুমি আমাকে নিয়ে রীতিমত সেক্স-এডুকেশন ক্লাস খুলে ব'সেছিলে। সংগ্রহ করেছিলে বই, ম্যাগ্যাজিন, ছবি, চার্ট, আমার আজও মনে আছে তোমার সেই প্রশংসনীয় উদ্যম। তোমার কাছে সেই থেকে আমার সংকোচ, সংশয়, ভয় ও লজ্জা অনেকখানি কেটে গিয়েছিল।

মিতুকেও তুমি আমাদের 'ক্লাসে' আনতে চেয়েছিল। মা রাজী হয় নি। মিতুও গরজ দেখায় নি।

মিতু জানত ওকে আমি সব বলব। যা আমি জানছি, তার অনেকখানি আমার কাছ থেকে মিতুও জানবে।

মা বলেছিল, "মিতুকে যখন যা বলবার আমিই বলব।"

তুমি বলেছিলে, "বেশ তো! ঠিক-ঠিক বোঝো কিন্তু!"

মা বলেছিল, "মিতুকে কি বলতে হবে না-হবে আমার ওপর ছেড়ে দাও।"

তুমি আপাতত তাই করেছিলে।

তোমার সেই 'ক্লাসে'র কথা আজও আমার পরিষ্কার মনে আছে।

তুমি বলেছিলে, "মানুষই একমাত্র প্রাণী যার সচেতন, অবচেতন মন আছে। মন বাদ দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব নেই। মানুষের সেক্স কেবল দৈহিক নয়। তার অনেক, অনেকখানি মানসিক। ফ্রয়েড পড়বে তুমি বড় হ'য়ে। পড়লে জানতে পারবে সেক্স কিভাবে, কত গভীর এবং জটিল ভাবে, মানুষের গোটা ব্যক্তিত্বকে অধিকার ক'রে আছে।"

তুমি বলেছিলে, "সেক্স সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে গায়ে-গায়ে মিশে আছে। যে কোনও সমাজে, স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সমাজ-ব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত হ'য়ে থাকে। আমরা যাকে মরালিটি বলি তাও সমাজ-ব্যবস্থা। এর মূল কথাটা খুব সহজ। সমাজের যারা কর্তা, যারা শাসক, ন্যায়-নীতির নির্ধারক তারাই। তারাই মরালিটির সূত্র বেঁধে দেয়, সবাইকে তা মেনে চলতে হয়। যে সমাজ ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সবদেশে চালু, তাতে পুরুষের প্রাধান্য। মরালিটি, অতএব, পুরুষের নির্ধারিত। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ককে সহজ সরল হ'তে দেওয়ার একটা বড় অন্তরায় হল নারীর ওপরে পুরুষের সামাজিক অধিকার ও শাসন। স্ত্রীলোককে ভোগের সামগ্রী ক'রে রাখার প্রয়োজনে তৈরী হয়েছে অনেক নীতি, অনেক অনুশাসন, তৈরী হ'য়েছে দুটো অতিকায় বিশ্বব্যাপী শিল্প, একটি সেক্স, অন্যটি বিউটি-কে কেন্দ্র ক'রে।"

তোমার কথাগুলির অর্থ বুঝতে অনেক বছর কেটে গিয়েছিল।

তোমার অমন অভিনব সেক্স-ক্লাস সত্বেও আমাকে নিয়ে তোমাদের, বিশেষ ক'রে মার, সমস্যার কিছুমাত্র সুরাহা হয় নি। সমস্যার শুরু হ'য়েছিল মাত্র।

নিজের দেহ থেকে নিজের সামান্য চেষ্টায় কি ক'রে রতিসুখ লাভ করা যায় তা আমাকে কেউ শেখায় নি, আমি নিজেই আবিষ্কার করেছিলাম। মা একদিন আমার বিছানার চাদরে কতগুলি দাগ দেখে দারুণ গম্ভীর হ'য়ে গেল। স্কুল থেকে ফিরে এসে খাবার সারবার পর মা আমাকে অনেক ভাল ভাল কথা বলল, অনেক বোঝাল। আমি চুপ ক'রে শুনে গেলাম। মা আমার কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা চাইল, আমি মাথা নেড়ে প্রতিজ্ঞা দিলাম। কদিন পরে মা আবার আমার বিছানায় দাগ দেখতে পেল। আবার আমাকে অনেক কিছু বলল। আমি আবার মাথা নেড়ে প্রতিজ্ঞা করলাম। বিছানায় আবার দাগ লাগল।

তুমি আমাকে বিকেল বেলা স্কুলে ক্রিকেট খেলবার ব্যবস্থা ক'রে দিলে।

এই সময় আমি প্রথম ভালবাসলাম। তখন বয়স আমার তের।

যার সঙ্গে আমার গভীর ভালবাসা হল তার নাম সোমা। সোমা আমার চেয়ে তিন বছরের বড়।

তোমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু পরিতোষ দাদার মেয়ে সোমা। আমাদের দু পরিবারে বন্ধুত্ব গভীর, অনেকদিনের।

সোমার কথা বলতে গেলে এখনও আমার মনে অপূর্ব একটা সম্মোহন এসে যায়। আমার তের বছরের মনকে সোমা শরতের আকাশের চেয়েও বিরাট অসীম ক'রে দিয়েছিল। সোমা প্রথম মেয়ে যার দৃষ্টি আমার হৃদয়ে লেগেছিল।

সোমা ঠিক ঠিক তাই ছিল যা আমার কাছে পরম রমণীয়, গভীর আকর্ষণীয় মনে হত। সোমা ক্লাসে প্রথম হ'ত, আমি অনেক চেষ্টা ক'রেও প্রথম দশের মধ্যে আসতে পারতাম না।

সোমার একটুও অহংকার ছিল না। সোমা ছিল হাওয়ার মত সহজ। গল্প বলবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল সোমার। সোমা ছিল রাস্তার মত সোজা। তার মনে কোথাও বাঁকা কিছু ছিল না। সোমা ছিল সব সময় হাসিখুশি। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ত সোমা। সোমা গাইত, ক্লাসিকাল হিন্দী গান, সোমা নাচত, সোমা খেলত। এমন কোনও গুণ নেই যা সোমার ছিল না, তোমরা সবাই সোমাকে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করতে। তোমার ও মার স্নেহের পাত্রী ছিল।

অথচ সোমাকে ভালবেসে আমি নাকি ভীষণ একটা অন্যায় করে ব'সেছিলাম।

আমাদের ভালবাসায় কিন্তু কাঁঝ ছিল না একেবারে। আমি পড়তাম স্কুলের মধ্যম পর্যায়ে, সোমা পড়ত লেডী আরউইন স্কুলের উঁচু ক্লাসে। তোমরা পরিতোষ কাকাদের বাড়ী না গেলে, কিম্বা ওঁরা আমাদের বাড়ী না এলে, সোমার আর আমার তো দেখাই হত না। দু' পরিবারের মধ্যে যাতায়াত মাসে বড় জোর দু তিন দিন হ'ত। যখন হত সোমা আর আমি তোমাদের কাছ থেকে স'রে গিয়ে হয় কোনও একটা ঘরে বসে গল্প করতাম, নয়তো চলে যেতাম ছাতে। তবু, কত অল্প, কৃপণ সুযোগ সময়েও আমি সোমাকে ভালবেসেছিলাম এবং, শুনতে যতই অবাক লাগুক, সোমাও আমাকে।

আমরা দুজনকে লুকিয়ে চিঠি লিখতে শুরু করেছিলাম। আমাদের পাড়ার একটি মেয়ে পড়ত সোমার সঙ্গে। সে ছিল আমাদের ডাকপিয়ন।

আমি যত চিঠি লিখতাম তার অনেকগুলিই সোমাকে পাঠিয়ে উঠতে পারতাম না। আমার লেখা অনেক চিঠি জমা হ'য়ে থাকত আমারই কাছে।

এমনি কতগুলি চিঠি, এবং সোমার লেখা কয়েকখানা, একদিন মার হাতে পড়ল।

স্কুল থেকে এসে সেদিন মার কাছে প্রথম ভীষণ বকুনি, পরে মার খেলাম।

মা কেবল প্রশ্ন ক'রে গেল, "লুকিয়ে চিঠি লিখেছ কেন তুমি? লুকোতে শিখলে কি ক'রে? লুকোচুরি করতে শুরু করলে এটুকু বয়স থেকে?"

এ প্রশ্নের জবাব আমার ছিল, মুখ দিয়ে বেরুল না। তাই মার খেলাম।

পরে শুনেছিলাম, চিঠিগুলি পেয়ে তোমার কাছে রাত্রে মা কেঁদেছিল।

সন্ধ্যাবেলা তোমার পড়ার ঘরে ডাক পড়ল আমার।

সেদিন সত্যি তোমার কাছে যেতে ভীষণ ভয় করছিল, বাবা। অনেক পরে আর একবারও খুব ভয় হয়েছিল তোমার মুখোমুখি হ'তে। কিন্তু সেদিন জীবনে আমি সত্যি প্রথমবার তোমাকে দারুণ ভয় করছিলাম।

তুমি আমাকে বসতে বলেছিলে, আমি দাঁড়িয়ে পলকহীন স্থির চোখে তোমার দিকে তাকিয়েছিলাম।

তুমি প্রশ্ন করেছিলে, "সোমাকে তুমি চিঠি লিখেছ?"

আমি নিজের অজান্তেই ঘাড় নেড়ে স্বীকার করেছিলাম।

"সোমাও তোমাকে চিঠি লিখছে?"

আমি পুনরায় ঘাড় নেড়েছিলাম।

তুমি এবার ইংরিজীতে প্রশ্ন করেছিলে, "তোমরা দুজন দুজনকে ভালবাসো?"

আমি ঘাড় নাড়তে গিয়ে দেখলাম ঘাড় নড়ল না।

তুমি সিগারেট টেনে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিলে, "আমি এতে কিছু খারাপ দেখতে পাচ্ছি না।"

আমি অবাক হ'য়ে তোমার মুখে স্থিরচোখে তাকিয়ে।

তুমি আবার বলেছিলে, "তোমরা কিছু খারাপ কাজ করছ না, বুঝলে? এবার বসো। কয়েকটা কথা তোমাকে বলব।"

আমি বসলে, তুমি প্রশ্ন করেছিলে, "লুকিয়ে চিঠি লিখছ কেন? ভ'য়ে?"

আমি ঘাড় নেড়ে বলেছিলাম, তাই।

"ভয় পেয়েই আমরা লুকোই, মিথ্যে বলি। যদি জীবনে ভয় না পেতে শেখ, লুকোচুরি আর মিথ্যের দেখবে প্রয়োজন হবে খুব কম।"

আমাকে চুপ দেখে তুমি বলেছিলে, "মা তোমাদের চিঠিগুলি পড়ে নি। মাকে তো জান? অতি সহজ, পরিষ্কার মানুষ, অত্যন্ত মর‍্যালিষ্ট। আমি কিন্তু পড়েছি। তোমার চিঠিগুলিতে বেশ বানান ভুল আছে।"

এতক্ষণে আমি হেসে ফেলে'ছলাম।

"চিঠিগুলি মন্দ নয়, ভালই। আচ্ছা, ধরো, তুমি যদি মাকে বলতে, আমি সোমাকে চিঠি লিখতে চাই, মা কি আপত্তি করত ?

এতক্ষণে আমি কথা বলতে পেরেছিলাম : "লাভ-লেটার হ'লে নিশ্চয় করত ?"

"মা তো দেখতে চাইত না তুমি কি লিখছ ? হয়ত বলত, এটুকু বয়সে চিঠি লেখালেখি করতে নেই। আসলে তোমার যেমন মাকে ভয়, সোমারও তাই। তোমরা একজনও তোমাদের মা'র কাছে এই রকম একটা সাধারণ বিষয়ে সহজ, ভয়হীন হ'তে পারো নি। তাই না ?"

"ইভা কাকিমা জানতে পারলে সোমাকে নিশ্চয় মারত। আমাদের আর মিশতে দিত না।"

"একেবারে অসম্ভব নয়। আবার না-ও হ'তে পারত। তোমরা চান্স নিতে চাও নি, কি বল।"

আমাকে চুপ দেখে তুমি আমাকে বলেছিলে, 'তা ছাড়া ছেলেমেয়েরা বাবা-মাকে লুকিয়ে ভালবাসার চিঠি লিখবে, কোনও তৃতীয় ব্যক্তির মারফৎ, এ-যেন একটা বই-এ লেখা প্রথায় দাঁড়িয়েছে। আমিও করেছি তোমার বয়সে, তুমিও করছ।"

আমি হেসেছিলাম তোমার কথা শুনে।

"তোমার মাকে কাল রাত্রে আমি তাই বলছিলাম। এতে ভয়ংকর কিছু ঘটে নি, অনেকেই এই বয়সে এ-ধরনের এ্যাডভেঞ্চার ক'রে থাকে। আমার কেবল দুঃখ হচ্ছে যে আমি না হয় ভয় পেয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক কিছু করেছি, নিজের অনেকখানি লুকিয়ে রাখা আমার অভ্যাস হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু কেতু কেন তাই করবে। কেতুর তো এত সহজে ভয় পাবার কথা নয়।"

আমাকে নীরব দেখে তুমি হেসে বলেছিলে, "তোমার মা কিন্তু কখনও কাউকে প্রেমপত্র লেখেনি। আমাকে ছাড়া।"

তারপরে তুমি গম্ভীর স্বরে যা বলেছিলে, বাবা, তা আমি কোনওদিন একটুও ভুলি নি, একবর্ণও ভুলব না।

তুমি বলেছিলে, "এ ঘটনাটা ছোট হ'লেও আমি তোমার সঙ্গে একটা কথা খুব স্পষ্ট ক'রে বলে নিতে চাই। তুমি আমার ছেলে, আমি তোমার বাবা। তুমি জীবনে যাই করো না কেন, যত অন্যায়, যত খারাপ কাজই তা হোক, আমি শেষ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকব, পেছনে অথবা সামনে দাঁড়াব। কিন্তু আমার কাছে পরিষ্কার ক'রে তোমাকে সব বলতে হবে। আমি নিজে অনেক অন্যায় করেছি, করব, বহু দুর্বলতা, পদস্খলন আমার ঘটেছে, ঘটবে। অনেক কিছু আমি সারাজীবন সবার কাছ

থেকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছি, কখনও পেরেছি, কখনও ধরা পড়ে গেছি। আমি কাউকে বিচার করতে চাই নে, তোমাকে আমি কখনও বিচার করব না। আমি বুঝতে চাইব তুমি কেন করেছ, যদি খারাপ কিছু ক'রে থাক, তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করব, বিচার ক'রে শাস্তি দেব না। যদি তুমি আমার কাছে নির্ভীক পরিষ্কার হ'তে পার, আমিও হয়তো পারব তোমার কাছে পরিষ্কার হ'তে, আমাদের দুজনের সম্পর্কে লুকোচুরি থাকবে না, আমরা সত্যিকার বন্ধু হ'তে পারব। এমন কোনও বন্ধু আমার নেই যার কাছে আমি সাহস ক'রে আমার সব কিছু বলতে পারি, বিচারের ভয় না ক'রে, মুখোস খুলে যাবার ভয় না ক'রে। তোমাকে আমি এরকম ক'রে পেতে চাই। তুমি পারবে ?"

তোমার কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার শরীর পাথর হ'য়ে গিয়েছিল, বাবা।

পাথুরে গলায় বলেছিলাম, "পারব।"

সোমাকে ভালবেসে আমার অনেক ভাল হ'য়েছিল।

সোমা ক্লাসে প্রথম হ'ত, তাই আমিও পড়াশোনায় অনেক বেশি মন দিয়ে একবার ক্লাসে তৃতীয় স্থান অধিকার ক'রে বসেছিলাম।

সোমার চেয়ে তিন বছরের ছোট হ'য়েও আমি যে অন্তত তার সমকক্ষ তা প্রমাণ করতে গিয়ে আমি খেলাধুলায় মন দিয়েছিলাম, অনেক বই পড়েছিলাম, অনেক কিছু বুঝতে পেরেছিলাম।

সোমাকে ভালবাসতাম বলে অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে ভালবাসা হ'তে পারে নি আমার স্কুল ছেড়ে কলেজে যাবার আগে।

তুমি, পরিতোষকাকা, মা আর ইভাকাকিমা কি সব আলোচনা ক'রে সোমাকে আর আমাকে মত দিয়েছিল তাকে স্বাভাবিক রকমে চিঠিপত্র লিখতে। সোমা কিন্তু আমায় বলে দিয়েছিল, "চিঠিতে ভালবাসার কথা কিচ্ছু লিখবিনে, মা নিশ্চয় লুকিয়ে আমার চিঠি পড়বে।"

আমি বলেছিলাম, "তুই লিখিস, আমার মা কখনও আমার চিঠি পড়বে না।"

"অত শিওর হোস নে। যদি পড়ে ?"

"পড়লে কি হবে আর ? ওরা তো জানেই আমাদের কথা।"

"তোর খুব সাহস হয়েছে, না ?"

"তবে কি ? ভয়টয় করতে ভাল লাগে না, জানিস ? ভয় করলেই মিথ্যে বলতে হয়। মিথ্যে বলতে আমার ভীষণ বিশ্রী লাগে।"

আমি যখন স্কুলে উঁচু ক্লাসে, সোমা তখন কলেজে। মাঝে মধ্যে তখন সোমা

চলে আসত কলেজ থেকে আমাদের বাড়ী, আমিও একাই যেতাম সোমাদের বাড়ী। দুজনে বসে গল্প করতাম। একটু আধটু ভালবাসাবাসি করতাম। সোমা আমাকে মোটেই প্রশ্রয় দিত না। আমারও কেমন ভয় করত। ভয় করলে ভালবাসতে আমার ভাল লাগত না।

সোমা আর আমাকে নিয়ে তোমাদের অথবা পরিতোষকাকাদের কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না। তোমরা ধরে নিয়েছিলে আমাদের মধ্যে কিছু "ঘটতে" পারবে না। সোমা আমার চেয়ে তিন বছরের বড়। অতএব।

এই বয়সের ব্যবধান নিয়ে সোমার আমার কিন্তু কোনও প্রব্লেম ছিল না। অন্তত অনেকদিন না।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমার চেয়ে বেশ খানিকটা বয়সে বড় না হ'লে কোনও মেয়েকে আমি ভালবাসতে পারব না। আমার সমান বয়সী মেয়েদের মনে হত মিতু-মিতু, ছোটবোন-ছোটবোন।

বড় হ'য়ে বুঝতে পেরেছি, আমার মনের মধ্যে মা'র রাজত্ব অনেকখানি। প্রিয়-বান্ধবীর মধ্যে মার ছায়া না দেখতে পেলে আমি অতৃপ্ত। মাকে বাদ দিয়ে আমার ভালবাসার জগৎ অপূর্ণ।

তখন তো অতশত জানা ছিল না। সোমাকে মনে হত আমার সমকক্ষ। চোখ উঁচু ক'রে তাকান যেত সোমার মুখে, চোখে। যাকে চোখ উঁচিয়ে দেখতে পারব না, তাকে ভালবাসবো কি ক'রে?

স্কুলে পড়তেই সোমা অনেক সময় প্রশ্ন করত, "তুই যে আমাকে ভালবাসিস, আমি না তোর চেয়ে বড়।"

"তাতে কি হয়েছে? ভারী তো বড়।"

"তিন বছর, জানিস?"

"তোকে আমার বড় মনেই হয় না!"

"কী মনে হয়?"

"সমান-সমান।"

"আমি তোর চেয়ে উঁচু ক্লাসে পড়ি।"

"বেশ তো।"

"তুই ভেবে দেখেছিস, কেতু, কখনও ব্যাপারটা? আমার মত ধিঙ্গি মেয়েকে তুই কেন ভালবাসতে গেলি?"

"ভাববার কি আছে? তোকে ভালবাসতে আমার খুব ভাললাগে, ব্যস। মনে হয়, আমিও অনেক বড় হয়ে গেছি।"

"বাজে কথা।"

"সত্যি বলছি। মনে হয় আমি একটুও ছোট নই। অনেক, অনেক বড়। সব বিষয়ে। পড়ায়, লেখায়, চিন্তায়, সবকিছুতে আমি অনেক বড়। আচ্ছা, সত্যি বল্‌তো, আমাকে তোর ছোট মনে হয় ?"

"না। মাঝে মাঝে হয়।"

"কখন ?"

"যখন এরকম সব বাজে কথা বলিস।"

"কিন্তু বাজে কথা তো নয়। যা সত্যি মনে হয় তাই বলি। তোকে তো আমি মিথ্যে বলি নে কখনও।"

"জানি।"

"এবার তুই বল। আমাকে কেন তুই ভালবাসতে গেলি ?"

"কি জানি ?"

"না। বলতেই হবে তোকে। আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়ে তুমি বলবে না তা চলবে না।"

"আচ্ছা বলছি। একটু ভাবতে দে।"

"এবার বল।"

"তোকে আমার খুব 'সেফ্‌' লাগে।"

"মানে ?"

"জানিস, বড় হ'লেই পুরুষগুলি কেমন-ভয়ংকর হ'য়ে ওঠে। লোভী আর স্বার্থপর।"

"সবাই নিশ্চয় নয়। আমি কখনও হব না।"

"বড় হ'তে হ'তে মেয়েদের পুরুষের খপ্পরে পড়তেই হয়। না প'ড়ে উপায় নেই। কাকা মামা পিসে মেসো জামাইবাবু, বাবার বন্ধু এদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় কুৎসিৎ লোক, নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা। বয়স-ওয়ালা পুরুষের চেয়ে তুই অনেক ভাল। তোকে নিয়ে আমার একটুও ভয় নেই।"

"তোর চেয়ে দুচার ছ'বছরের বড়রা নিশ্চয় ওরকম নয়।"

"তাদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ কোথায় ? স্কুলে তো কেবল মেয়ে। কলেজে গেলে তখন দেখা যাবে।"

"তার মানে কলেজে গেলে আমাদের ভালবাসা থাকবে না ?"

ছাখ্‌, কেতু, নাক ফোলাস নে। কলেজে গিয়ে দেখবি তোরও অন্য মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে।"

"হ'তে পারে।"

"তবে ?"

"তবে কি ? বন্ধুত্ব হলেই ভালবাসা হবে ? আমি তোকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসব না।"

"কোনও দিন না ?"

"না—না।"

"রেগে যাচ্ছিস কেন ? চিরদিন তুই একটা কালো কুচ্ছিৎ ধিঙ্গি মেয়েকে ভালবেসে ব'সে থাকবি ?"

"তুমি মোটেই কুচ্ছিৎ নও।"

"কালো তো নিশ্চয়। না কি, তাও নই।"

"কালো তো কি হল ? আমার ভাল লাগলেই হল।"

"একটি ফর্সা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ভাব হলে তখন দেখবি।"

"ভাব হবেই না।"

"হবে। হ'তে বাধ্য। তুইও আর কাউকে ভালবাসবি, আমিও।"

"কেন হবে ?"

"তাই নিয়ম। কিন্তু জানিস, কেতু, যখন আমরা অন্যদের ভালবাসব তখনও যেন আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষুন্ন থাকে। আমি যতদিন বেঁচে থাকব তোকে অন্তত একটু ভালবাসব। তোর কাছে আমিও যেন তাই পাই। একটু ভালবাসা।"

সোমা সেদিন প্রথম আমার ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল।

সেদিনের আর আজকের মধ্যে অনেক বছরের ব্যবধান। সোমা আর কাউকে ভালবাসেনি, বিয়ের আগে। যাকে বিয়ে করেছে তার সঙ্গে বিয়ের আগে সোমার চেনা-পরিচয়, খানিকটা বন্ধুত্ব ছিল, ভালবাসা ছিল না। আজ তাকে সোমা ভাল-বাসে। নিশ্চয় ভালবাসে। তাকে সোমা ভালবাসে না একথা আমি ভাবতে পারি না। ভাবলে অসহ্য লাগে।

আমি কিন্তু সোমার পরে অনেক মেয়েকে ভালবেসেছি। তুমি তাদের প্রায় সবাইকে জান, বাবা। তবু, তুমি এ-ও জান, সোমাকে আমি এখনও 'একটু' ভালবাসি। এই 'একটু' ভালবাসা আমার আদৃত সঞ্চয়। আমি চাই নে হারাতে। আজ নয়। কোনও দিন নয়।

আমি যখন সেই ষ্টিফেন্‌স্‌ কলেজে ভর্তি হলাম, সোমা তখনও মিরাণ্ডা হাউসে, আমাদের দেখা সাক্ষাত মেলামেশার সুযোগ অনেক বেড়ে গেল। কফি হাউসে বসে অনেক সময় আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতাম, রীজের ওপরে ঘুরে বেড়াতাম,

স্যাগষ্টাফের সামনে প্রাচীরের ওপর ব'সে গল্প করতাম। আমার তখন আরও দু চারটি মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে, তাদের কাউকে নিয়ে কোনও দিন-বা সোমার ক্লাশে হাজির হতাম, সোমা কেমিষ্ট্রি অনার্স নিয়ে বি. এস-সি'র শেষ বছরের ছাত্রী, আমি ইংলিশ অনার্সের প্রথম বছরের।

সোমা একদিন বলেছিল, "তুই এখন কাকে ভালবাসছিস ?"

"এ প্রশ্নের মানে ?"

"ললিতাকে ভালবাসিস না তুই !"

"না তো।"

"সবাই যে বলে।"

"সবাই তো এ-ও বলে যে আমি তোকে ভালবাসি।"

"বাসিস।"

"তোর কি মনে হয় ?"

"কখনও মনে হয়, বাসিস। আবার অন্য সময় মনে হয়, বাসিস নে।"

"তুই।"

"কি জানি।"

"তুই আর কাউকে ?"

"না। কিছুতেই কাউকে ভালবাসতে পারছি নে। প্রথম যদি-বা একটু ভাল লাগে, ক'দিন পরেই মনে হয় ধ্যাৎ, আর ভাল লাগে না।"

"তবে যে তুই বলেছিলি বড় হ'য়ে অন্য কাউকে ভালবাসবি।"

"তাইত হওয়া উচিত ছিল। হচ্ছে কোথায় ?"

"চেষ্টা ক'রে যা, দেখবি একদিন হ'য়ে গেছে।"

"তুই ভাবছিস চেষ্টা করছি না আমি ? হচ্ছে কোথায় ? এদিকে মা বিয়ের কথা বলছে।"

"বিয়ে ? কার ?"

"কার আবার ? আমার কি একটা দাদা, দিদি আছে না কি ?"

"তোর বিয়ে ? তোর ?"

"তবে কি ? কুড়ি বছর বয়স হল। বামুনের ঘরের মেয়ে। এবার বিয়ে হবে না ?"

"বিয়ে করবি তুই ? রাজী হ'য়েছিস ?"

"বিয়ে তো করবই। সারাজীবন আইবুড়ো থাকব ?"

"এখুনি বিয়ে করবি ?"

"না। এখুনি, মানে আজই নয়। পরীক্ষার আগে তো নয়ই।"

"মানে পরীক্ষার পরেই। মানে, বছর খানেকের মধ্যে।"

"অসম্ভব নয়।"

"ভাল না বেসে কাউকে বিয়ে করতে পারবি ?"

"কেন পারব না ? দেশের শতকরা নিরানব্বুইটি মেয়ে যা পারছে, আমি তা পারব না কেন ?"

"বিয়ের পরে যদি ভালবাসতে না পারিস ?"

"তাহলে ব্যাপারটা খুব ভাল হবে না।"

"তোর বর ঠিক হ'য়ে গেছে ?"

"হ'লে কি তুই জানতে পারতিস নে ?"

"চেষ্টা চলছে, না ?"

"তা চলছে।"

"তাহলে ঠিক হ'য়ে গেল বলে। তোর মত মেয়ের বর ঠিক হ'তে ক'দিন লাগবে ?"

"হায়, হায়। বরদের মা-রা কেন তোর চোখ দিয়ে আমায় দেখে না, বলতে পারিস ?"

"আমার চোখ দিয়ে দেখে আমার কি লাভ হল। তুই ক'দিন পরে বিয়ে ক'রে বরের সঙ্গে প্রেম করবি।"

"তবে কি বিয়ে না ক'রে বসে বসে আঙুল চুষব।"

আমি তখন ভীষণ রেগে গেছি।

শুনে রাখ, সোমা। যদি তুই এমন কাউকে বিয়ে করিস যে তোর স্বামী হবার সত্যিকারের যোগ্য নয়, যাকে তুই গভীর ভাবে ভালবাসতে পারবি নে, বিয়ে ক'রে যদি তুই অসুখী হোস, আমি তোকে খুন ক'রে ফেলব, কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।"

সোমাকে ব্রীজের ওপরে প্রাচীরে একা ফেলে আমি হন হন ক'রে চলে গিয়েছিলাম, আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল, রাগে সর্বাঙ্গ কাঁপছিল, গলায় কি একটা দানা বেঁধে উঠছিল, সোজা চলে এসেছিলাম বাসষ্ট্যাণ্ডে, তারপর, ঘণ্টা দুই বাদে, বাড়ীতে। মা আমার চেহারা দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল কি হয়েছে আমার, শরীর খারাপ হয়নি তো ? বলেছিলাম, বাসে ভিড়ের মধ্যে ব'সে ব'সে শরীরটা কেমন বিশ্রী লাগছিল ; বমি বমি পাচ্ছিল ; সোজা গিয়ে আমার ঘরে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম।

মাথাটা ব্যথা করছিল, ঘুম এলে বেশ হত, অথচ চোখে ঘুমের নামগন্ধ নেই, মাত্র

প্রথম শীতের সন্ধ্যা, তুমি তখনও ফেরো নি দপ্তর থেকে, মা রান্নাঘরে ব্যস্ত, আমার মাথাটা ভারী পাথর, এমন সময় মিতু এসে বলল, "সোমাদি ফোন করেছিল।"

আমি লাফিয়ে উঠে বসলাম।

"কখন ?"

"আধ ঘণ্টা আগে।"

"কি বলল ?"

"জিজ্ঞেস করল তুই বাড়ী পৌঁছে গেছিস কি না।"

"তুই কি বললি ?"

"কি আবার বলব ? বললাম, না, এখনও আসে নি।"

"সোমা কি বলল ?"

"বলল, রেগে মেগে ছুটে চলে গেছিস ওর কাছ থেকে, তাই ভাবনা হচ্ছে।"

"আর কিছু বলল ?"

"বলল, কাল তোর জন্যে দু'টোর সময় কফি হাউসে অপেক্ষা করবে।"

"দুটোর সময় আমার টিউটোরিয়েল।"

"আমাকে জানিয়ে লাভ নেই।"

"তোকে জানাচ্ছি না। বলছি।"

"তোর একটু ভাল লাগছে এখন ?"

"না। একটুও না। ওরা সোমাকে জোরজার ক'রে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে।"

"বাজে বকিস নে, দাদা। আজকাল কোনও বাবা-মা-ই মেয়েকে জোরজার ক'রে বিয়ে দেয় না। সোমাদি'র মত না হলে পরিতোষকাকা কিছুতেই ওঁকে বিয়ে দেবেন না। পরিতোষকাকা সোমাদিকে কি রকম ভালবাসেন, জানিস না তুই ?"

মিতুর, বলেইছিতো, জ্ঞানগম্যি দেখে ছোটবেলা থেকে আমার বিস্ময়ের অন্ত থাকত না। আমি যেখানে অন্ধকার দেখতাম, মিতুর চোখ আলোর সন্ধান পেত অনায়াসে। সত্যিই তো! পরিতোষকাকা সোমা বলতে অজ্ঞান।

সোমা যাকে ভালবাসতে পারবে না, যাকে নিয়ে সুখী হবে না এমন কারুর সঙ্গে তার বিয়ে কিছুতেই দেবেন না। সোমাকে, অতএব, আমার খুন করতে হবে না।

রাত্রির খাওয়া দাওয়া শেষ হলে, বাবা, তোমার স্মরণ হ'তে পারে, তোমাকে বলেছিলাম, "একটু হাঁটতে যাবে ? আমার একটু খোলা হাওয়ায় হাঁটতে ইচ্ছে করছে।"

তুমি জানতে তোমার সঙ্গে জরুরী কোনও আলোচনা থাকতে আমি রাত্রে হাঁটতে যাবার প্রস্তাব নিয়ে হাজির হতাম।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা শান্তিপথ পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম।

সোমা আর আমাকে নিয়ে তোমাকে প্রশ্ন করার দরকার ছিল সেদিন রাত্রে। করেও ছিলাম।

বলেছিলাম, "বাবা, মনে আছে, তুমি একদিন বলেছিলে সোমাকে ভালবেসে আমি কিছু অন্যায় করিনি ?"

"মনে আছে।"

"তুমি আজও তাই বলবে ?"

"বলব। কেউ কাউকে ভালবেসে অন্যায় করে একথা আমি মানতে রাজী নই।"

"তুমি জান, আমি সোমাকে এখনও ভালবাসি ?"

"জানলাম।"

"সোমা অন্য কাউকে ভালবাসে না। চেষ্টা করেছে। পারে নি।"

"মাত্র কুড়ি বছর বয়েস। এখনও সময় আছে।"

"বাবা, সোমাকে আমি বিয়ে করতে পারি নে ?"

তুমি হঠাৎ একদম চুপ হ'য়ে গিয়েছিলে।

"কিছু বলছ না যে ?"

তুমি বলেছিলে, "তোমার বিয়ের বয়স হ'তে অনেক দেরী।"

"যদি আমরা দুজনে অপেক্ষা করি ?"

"একটু ভেবে দেখলে বুঝবে তা সম্ভব নয়।"

"সম্ভব নয়, আমিও জানি। কিন্তু কেন নয় ? তুমি বুঝিয়ে বল।"

তুমি বুঝিয়ে বলেছিলে। তোমার যুক্তিগুলি অকাট্য। আমি শুনছিলাম আর রাগছিলাম।

তুমি শেষ পর্যন্ত বলেছিলে, "সোমা বোধহয় তোমাকে বিয়ে করার কথা ভাবতেই পারে না।"

আমি রেগে প্রশ্ন করেছিলাম, "তুমি জানলে কি ক'রে ?"

"ঠিক বলেছি তো ?"

"তুমি তো ঠিকই বল, আর তার জন্যে মাঝে মাঝে আমি ঘৃণা করি তোমাকে।"

"সেজন্যে তোমাকে আমি দোষ দি নে, কেতু। সোমা তোমাকে বন্ধু হিসেবে দেখতে পারে, স্বামী হিসেবে কখনও দেখতে পারে না। আমাদের দেশে অনেক সংস্কার আছে, যা আমাদের মজ্জাগত, আমরা কেউ তাদের বাইরে নই। সোমার কাছে তুমি ছোট ভাই এবং বন্ধু। সোমা তোমাকে ভালবাসে, কিন্তু কোনওদিন তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হবে না।"

"আমি তিন বছরের ছোট বলে ?"

"অনেকটা তাই। তোমরা যদি বড় হ'য়ে একে অন্যকে জানতে, বয়সটা ব্যবধান নাও হ'তে পারত। ছোটবেলা থেকে তোমরা ঘনিষ্ঠ। সোমা তোমাকে ছোট বলে জেনে এসেছে। সমান বলে গ্রহণ করতে ওর বাধবে।"

"কিন্তু, জানো বাবা, সোমা আর কাউকে ভালবাসতে পারছে না।"

"পারবে। সবাই পারে। অন্তত অনেকেই। তুমিও পারবে।"

"আমি পারব। সোমা যদি না পারে ? কলেজে তিন বছরে কারুর সঙ্গে ভালবাসা হয়নি সোমার। পরিতোষ কাকারা ওর বিয়ের চেষ্টা করছেন। এমন কারুর সঙ্গে যদি ওর বিয়ে হয় যাকে সোমা ভালবাসতে পারল না। তাহলে ওর জীবনটা কী দুঃখের হবে। আমি ভাবতেও পারছি না তখন আমি কি করব।"

"তাই যে হবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। পরিতোষদা নিশ্চয় সোমার সম্পূর্ণ সম্মতি না নিয়ে ওকে বিয়ে দেবেন না।"

"বাবা, তুমি পরিতোষ কাকাকে বলো না, সোমাকে এম, এস-সি পাশ করতে দিন, তারপর ওর বিয়ে হোক। এতদিনে সোমা হয়ত কাউকে ভালবাসবে।"

"বলে দেখতে পারি। লেখাপড়ায় অত ভাল মেয়েটাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করতে দেওয়া উচিত। এম. এস-সিতে ভাল করতে পারলে কলেজে পড়াবার কাজ পেয়ে যাবে।"

"তুমি বলবে, বাবা ?"

"বলব। আমার বলায় কাজ না-ও হ'তে পারে, মনে রেখো। পরিতোষদা হয়ত ভাবছে দেখতে-ভাল নয় মেয়েকে কচি বয়সে বিয়ে দেওয়া সহজতর।"

"সোমা দেখতে ভাল নয় ? তুমিও বলছ ?"

"আমাদের দেশের রূপের মাপকাঠিতে তাই বৈ কি ? সম্বন্ধ ক'রে বিয়ে দেবার সময় পাত্রপক্ষের লোকেরা তোমার চোখ দিয়ে সোমাকে দেখবে এমন আশা করা বাস্তব হবে না।"

"সম্বন্ধ ক'রে বিয়ে ব্যাপারটা জঘন্য। আমি ঘৃণা করি এই সম্বন্ধ-করা বিয়েকে।"

"বেশ তো। তোমার স্ত্রী বড় হ'য়ে তুমিই বেছে নিও। তাতে আমাদের সম্পূর্ণ সম্মতি।"

"মিতু ?"

"মিতুর বেলাও তাই। মেয়ের জন্যে পাত্রের সন্ধান আমার দ্বারা কদাচ হবে না। কেউ দেখে বলবে আমাদের পছন্দ নয়, আমি সইতে পারব না।"

"বাবা, আমি কাকে বিয়ে করব ?"

"যাকে তোমার খুশি। যে-কোনও দেশের, যে-কোনও ধর্মের, যে-কোন ভাষার। শুধু একটা কথা মনে রেখো। ম্যারী ফর লাভ এ্যাণ্ড নাথিং এল্স্। যাকে স্ত্রীর ভূমিকায় পাবার মত ভালবাসতে পারবে তাকেই বিয়ে করো। আমরা তোমাকে বাধা দেব না।"

তোমার কথা শুনে সেদিন রাত্রে আমার মনে একটা গভীর শান্তি অনুভব করেছিলাম। মনে হ'য়েছিল ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে সংঘাতের সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা দূর হল! তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই নি। তুমি তা জানতে। আমিও। যদি কোনওদিন কাউকে বিয়ে করতে চাই, তুমি আর মা বাধা দেবে না তোমার এ আশ্বাসবাণী সতের বছরের আমাকে হঠাৎ যাদুবলে শান্ত করেছিল।

বাবা, তুমি তোমার কথা রাখতে পারো নি। বাধা দিয়েছিলে। তাতে তোমাদের সংগে আমার দারুণ সংঘাত ঘটেছিল। তোমরা বাধা না দিলে সুসান কোর্ড এতদিনে আমার স্ত্রী হ'ত।

আমি কোথায় ডুবে যেতাম তা ভেবেও আজ ভয় করে।

দিল্লী ভারতবর্ষের রাজধানী হ'লেও ভারতবর্ষ নয়, একথা সবাই জানে, অন্তত জানার ভান করে। ভান করে, এজন্যে বলছি, বাবা, যদি সত্যি সবাই জানত, এবং তাদের জ্ঞান কার্যে রূপায়িত হ'ত, তাহলে দিল্লীর সঙ্গে ভারতবর্ষের দূরত্ব এমনি বছরের পর বছর বেড়ে যেতো না, দিল্লীকে 'অভারতীয়' ক'রে তোলার ব্যাপক বেহায়া প্রচেষ্টায় বাধা পড়ত। দিল্লী বলতে আমরা অবশ্য রাজধানী নিউ দিল্লীকেই বুঝি, যাকে সাজিয়ে গুছিয়ে পৃথিবীর কাছে একটি 'সো-পিস' করে রাখা হয়েছে, যার নিজস্ব কোনও মানস নেই, যার মানসিকতা সরকারী দাপটে উত্তপ্ত, এবং যে মানসিকতার সঙ্গে ভারতবর্ষের রক্তের টান নেই, টান কেবল রাজশক্তির। শুধু আজ নয়, ভারত ইতিহাসের চিরন্তন দুর্ভাগ্য যে, দেশ থেকে, দেশের মানুষ আর সমাজ থেকে, দিল্লী চিরদিন দূরে। এ দূরত্ব ইংরেজকে সহায়তা করেছিল; বর্তমান শাসকরা ভাবছে, তাদেরও করবে—তাদের এবং ইংরেজদের মধ্যে যে ভীষণ মানসিক মিল! তোমার কাছ থেকে ছোটবেলা থেকে দিল্লীর দূরত্বের কথা শুনে শুনে আমি শৈশব থেকে নিউ দিল্লীর জলহাওয়ায় মানুষ হ'য়েও এ শহরটাকে কিছুতেই নিজের বলে গ্রহণ

করতে পারি নি। অথচ, ভেবে দেখো, বাবা, তোমার মত আমার মানসিকতা আঞ্চলিক নয়, আমি বাঙালী হ'য়েও বঙ্গদেশের সন্তান নই, কলকাতাকে আমি চিনি সামান্য, জানি আরও কম, বাংলা পড়তে, লিখতে, বলতে পারলেও বাঙালী মানসিকতা থেকে আমি নির্বাসিত। তুমি আমাকে সেন্ট কলম্বা স্কুল থেকে সদর রাস্তা পেরিয়ে ভর্তি করালে সেন্ট ষ্টিফেন্‌স কলেজে, আমি-সংযুক্ত হলাম সেই অতি ক্ষুদ্রাংশ ভারতীয় যুবকগোষ্ঠিতে যাদের অস্তিত্ব এক নকল বাস্তবে, যে বাস্তবের সঙ্গে আসল ভারতবর্ষের আত্মিক যোগাযোগ নেই, যারা এই অতি-দরিদ্র দেশে সংক্ষিপ্ত প্রাচুর্যের প্রাচীরে সীমাবদ্ধ, যাদের বাবারা হয় উঁচু স্তরের রাজপুরুষ নয়তো ধনী ব্যবসায়ী অথবা অতিকায় দেশী-বিদেশী কোম্পানীগুলির কর্তাপর্যায়ের লোক, যারা স্বাধীনতার পরেকার সমাজব্যবস্থার অনেকখানি বৈভব নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি ক'রেও পরিতৃপ্ত নয়, যাদের অনেক চাওয়া আর অনেক পাওয়ার ঝলসান আলোর সামনে কোটি কোটি মানুষের সামান্য চাওয়া আর প্রায়-কিছুই-না-পাওয়ার বিরাট অন্ধকার সত্যকে সহজে দেখতেই পাওয়া যায় না। আমি এই সংখ্যায় ক্ষুদ্র অথচ অহমিকায় অতি-স্ফীত সমাজের একজন, এ সত্য যতই মর্মান্তিক হোক না কেন, এ থেকে নেই আমার অব্যাহতি। অথচ, কি আশ্চর্য, আমি ভারতবাসী—আমি বাঙালী নই, যেমন নয় আমার বন্ধু পি. সদাশিবম তামিল, অথবা জ্যোতিপ্রকাশ শ্রীবাস্তব বিহারী।

কথাটা পুরোপুরি সত্যি হল না, সদাশিবমের মধ্যে তবুও কিছুটা তামিলত্ব আছে, মাদুরাই শহরের সন্নিকটে এক গ্রামে তার পিতৃপুরুষের বিরাট বাড়ী, বৃহৎ যৌথ পরিবারের সঙ্গে সদাশিবম একেবারে নিঃসংযুক্ত নয়। তার বাবা, পি. চিদাম্বরম, হোন না কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম সেক্রেটারী, এবং আই-সি-এস, তথাপি মনে প্রাণে তামিল ব্রাহ্মণ, যার প্রমাণ তাঁর উচ্চারণে, চালচলনে, জীবন-দর্শনে, এবং সুবিদিত তামিল-পোষণে: মিঃ চিদাম্বরমের হাতে চাকরী থাকলে তা নির্ঘাৎ যাবে কোনও তামিলের আয়ত্তে, এ বিষয়ে, সদাশিবমের ভাষায়, "বাবা অন্ধ, তাঁর কাছে, চাকরীর বেলায়, তামিলিয়ান ফার্ষ্ট, তামিলিয়ান সেকেণ্ড, তামিলিয়ান লাষ্ট।" সদাশিবম মোটেই তার বাবার মত তামিল নয়, সে-ও আমার সঙ্গে পড়েছে সেন্ট কলম্বায়, এবং সেন্ট ষ্টিফেন্‌স্-এ, মাদুরাই বা মাদ্রাজে গেলে তার দাম আটকে যায়, বাবা-মাকে লুকিয়ে সে মাছমাংস খায়,-আর কলেজে ঢুকেই সে বান্ধবী করেছে চণ্ডীগড়ের কন্যা অমৃত সিং নেগীকে, যার সঙ্গে তার বি'য়ে হল দুজনে এম. এ. পাশ করার পর, সদাশিবম সোজাসুজি বলল তার বাবাকে, মাকে: "তোমরা আমাকে তামিল-পথে মানুষ করো নি, তামিল সমাজ, সংস্কার আচার বিচার আমার কাছে অর্থহীন, আমি উত্তর ভারতের লোক, অমৃতকে ভালবাসি, তাকে বিয়ে করব, তোমরা রাজী হলে ভাল, না হলে আমি নিরুপায়।"

পুত্র, পি

অতএব, বাবা, সদাশিবম তামিল নয়, যদিও আমার বাঙালীদের চেয়ে তার তামিলত্ব বেশি, আমার তো কিছুই নেই, তুমি নও পশ্চিমবঙ্গের লোক, আমাদের পিতৃপুরুষের বাড়ীঘর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জ্বালায় নিশ্চিহ্ন, একমাত্র বাঙ্গালী মানসিকতা ছাড়া তুমিও আর বাঙ্গালী নও, আমি তো আরও দূরে। জ্যোতিপ্রকাশ শ্রীবাস্তব বিহারের দ্বারভাঙ্গা শহরের ছেলে, অথচ না দ্বারভাঙ্গা না বিহারকে সে চেনে অথবা জানে, তার পিতাজি করেন সার্ভিসের মাঝারি স্তরের অফিসর, অর্থাৎ রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হ'তে বছর পাঁচেক দেরী; জ্যোতিপ্রকাশ পড়েছে লণ্ডনে, দেরাদুনে, এবং সেন্ট ষ্টিফেন্‌স্‌-এ। আমি, সদাশিবম, জ্যোতিপ্রকাশ এবং আমাদের মত আরও কয়েক হাজার ছেলে, কয়েক হাজার মেয়ে, আমরা আর আঞ্চলিক নই, আমরা ভারতীয়, অথচ আমাদের ভারতীয়ত্ব মজবুত নয়, অনেকখানি দুর্বল ও নকল, কেননা এর পেছনে যে সব সামাজিক প্রভাব রয়েছে, যেমন আমাদের ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, যেমন আমাদের পিতাদের প্রভুত্ব ও সামাজিক সাকসেস, যেমন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও আদবকায়দার সঙ্গে আমাদের মিতালি, যেমন আমাদের জীবনযাত্রার ঢং, এগুলোর কোনওটাই আসলে ভারতীয় নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা যারা স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম 'ভারতীয়' যুবকগোষ্ঠী, আমরা যারা আঞ্চলিক নই, আমাদেরও ভারতীয়ত্বের উপাদান বহুলাংশে অভারতীয়।

এমন একটা অবিশ্বাস্য অবস্থা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বর্তমান আছে বলে আমার জানা নেই।

যখন আমি কলেজে পড়ি তখন একদিন একটা সচেতন অনুভূতি ভীষণ ধাক্কা মারল আমাকে। আমার হঠাৎ জ্ঞান হল, যে দেশের শতকরা পঁচানব্বুই জন গরীব এবং পঞ্চাশ জন অতি দরিদ্র, সে দেশের কোনও গরীবকে আমি সত্যিকারের চিনি না।

আমার খেয়াল চাপল। ক্লাসের আটচল্লিশজন ছাত্রকে আলাদা ক'রে প্রশ্নে প্রশ্নে জেনে নিলাম, শুধু আমি নই, আমরা কেউ কোনও গরীবকে সত্যিকারের চিনি না।

আমরা জানি ভারতবর্ষে বিস্তৃত সুগভীর দারিদ্র্য। আমরা শুনে থাকি, মানুষ, অনেক মানুষ দুবেলা খেতে পায় না, আমরা দেখতে পাই মানুষের পর মানুষ রাস্তায় বাস করে, রাস্তায় মরে; অথচ এদের কাউকে আমরা চিনি না, এরা আমাদের জীববৃত্তের একবারে বাইরে, এদের আমরা দেখি ছায়াচিত্রের ছবির মত, এরা আমরা দুই পৃথিবীর লোক, আমাদের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর, দুর্লঙ্ঘ্য, দুরপনেয়।

নিউ দিল্লীর রাস্তায় মানুষ বাস করে না। রাস্তায় কেউ মরে না। কিছু কিছু লোক ভিক্ষে চায়, আমাদের করুণার জন্যে হাত পাতে, তাতে আমাদের মনে সুড়সুড়ি

লাগে, আমরা জানি ওরাও মানুষ, জানি বৈ কি। জানি ওরাও ভারতবাসী। ওদের আমরা চিনি না।

একবার কলেজে পড়ার সময় কলকাতা গিয়েছিলাম। তোমার মনে পড়বে হয়ত: সেই প্রথম কলেজের একদল ছেলে একসঙ্গে আমরা 'দেশভ্রমণে' বেরিয়েছিলাম। সদাশিবম, জ্যোতিপ্রকাশ, আমি, প্রবীর শেঠ, অরবিন্দ চক্রবর্তী আর সুরিন্দর সিং। 'দেশভ্রমণ' মানে কলকাতা, পুরী, পাটনা, লক্ষ্ণৌ। তুমি খুব উৎসাহ দিয়ে আমায় পাঠিয়েছিলে। যাবার সময় দুশো টাকা বাড়তি দিয়ে বলেছিলে, বাজে খরচ কোরো না। একটু বেশি টাকাই সঙ্গে দিলাম, যদি আটকে যাও কিছুতে।'

কলকাতায় আমরা একদিন গ্র্যাণ্ড হোটেলে লাঞ্চ খেয়েছিলাম।

গ্র্যাণ্ড থেকে লাঞ্চ খেয়ে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে লিকলিকে হাত-পা একটা স্ত্রীলোক ছোট্ট একটা মেয়ের হাত ধ'রে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদোকেঁদো ক্ষীণ স্বরে বলেছিল, "দু দিন কিচ্ছু খাই নি, বাবা। দশটা পয়সা দাও, বাবা।"

সদাশিবম বলে উঠেছিল, "কি বিশ্রী তোদের এই শহরটা, কেতু। গ্র্যাণ্ড থেকে বেরবার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক ভিখিরি। ভাবতে পারিস এ রকম নোংরা ব্যাপার অশোকার সামনে? কিম্বা ইম্পিরিয়েলের সামনে?"

সুরিন্দর সিং যোগ দিয়েছিল, "ঐ ছাখ, গ্র্যাণ্ডের উল্টোদিকে রাস্তার ওপর কি হচ্ছে ছাখ।"

আমরা তাকিয়ে দেখেছিলাম চৌরঙ্গীর ওপর, গ্র্যাণ্ড হোটেলের ঠিক উল্টোদিকে, কয়েকশ' স্ত্রী পুরুষ নাইছে, দাড়ি কামাচ্ছে, রান্না চাপিয়েছে, খাচ্ছে, বসে জটলা করছে, অর্থাৎ দিব্যি বেঁচে থাকা মানুষের বহুদৃশ্যের নাটক খুলে বসেছে।

সুরিন্দর সিং বলেছিল, "গ্র্যাণ্ডের ব্যালকানি থেকে, বিভিন্ন ঘর থেকে, বিদেশীরা রাস্তায় তাকিয়ে এ দৃশ্যই তো প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছে। হোয়াট এ' শেম!"

জ্যোতিপ্রকাশ বলেছিল "শেমই বলিস আর যাই বলিস, এ দৃশ্যই তো ভারতবর্ষের বাস্তব। একদিকে গ্র্যাণ্ড হোটেল, এবং সেখানকার অতিথিবর্গ, আর এক দিকে, তার গায়ে গা লাগিয়ে অতি দরিদ্র মানুষ, রাস্তা যাদের বাড়ি ঘর, একমাত্র আশ্রয়।"

প্রবীর শেঠ মন্তব্য করেছিল, "একমাত্র কলকাতা শহরেই এ দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। আর কোথাও নয়। আমাদের শহরে কোথাও এ দৃশ্য দেখতে পাবি না।"

সদাশিবম আমাকে চুপ দেখে বলে উঠেছিল, "কি রে, চুপ মেরে গেলি কেন? বল্ কিছু তোর শহরের হ'য়ে?"

আমি শুধু বলেছিলাম, "কলকাতা আমার শহর নয়। আমি এখানে জন্মাই নি, বড় হই নি। আমি একে সামান্যই চিনি।"

অরবিন্দ বলেছিল, যা আমি জেনেও বলতে পারি নি, ইচ্ছে হয় নি।

অরবিন্দ বলেছিল, "কলকাতা শহরে কয়েকলক্ষ লোক রাস্তায় জীবন যাপন করে। এদের অধিকাংশ অবাঙ্গালী। যাদের তোরা রাস্তার ওপরে দেখেছিস তাদের বেশির ভাগই বাইরের লোক। আসে ইউ. পি. থেকে, বিহার থেকে, ওড়িষ্যা থেকে। গ্রামের লোক খেতে পায় না, কাজ নেই, চলে আসে কলকাতা। জীবিকার সন্ধানে। রাস্তায় আশ্রয় নেয়। ভারতবর্ষের তিনটে দরিদ্রতম রাজ্যের দরিদ্রতম মানুষের ভার দিনরাত বছরের পর বছর বহন করছে এই শহর। কলকাতার দারিদ্র্য, গোটা ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, বাঙ্গালীর দারিদ্র্য নয়। কলকাতা যে শ্রীহীন, তার জন্যে দায়ী সমস্ত ভারতবর্ষ। এটা সেন্টিমেন্টের কথা নয়। প্রমাণিত সত্য।"

আমি, আজও মনে আছে, ওদের কথায় যোগ দি' নি, কলকাতায় হ'য়ে ওকালতি করবার ইচ্ছে হয় নি আমার, আমার শুধু মনে হয়েছিল কি পরম বৈরাগ্যের সঙ্গে আমরা গরীবদের নিয়ে আলোচনা করতে পারি, পারি তো শুধু এজন্যে যে আমরা নিজেরা গরীব নই, ওরা কেউ নয় আমাদের, একেবারে পরিপূর্ণ অনাত্মীয়, ওরা এবং আমরা যে একই দেশ ও সমাজের মানুষ এ সত্যের তাৎপর্য বোঝবার প্রয়োজন নেই আমাদের।

সেদিন আমি আমার স্মৃতির তলদেশ পর্যন্ত খুঁজে দেখেছিলাম, কোথাও কোনও দরিদ্র মানুষের আঁচড়টুকু পর্যন্ত খুঁজে পাই নি।

হটাৎ নিজেকে ভীষণ দরিদ্র মনে হ'য়েছিল আমার।

ছোটবেলা থেকে গরীব বলতে কাউকে ঠিকমত জানবার চেনবার অবকাশ ঘটে নি, অথচ যে সমাজে আমার জন্ম, তার একশ জনের মধ্যে নব্বুই জন নিতান্ত গরীব।

বাড়ীতে ঝি চাকর অনেক দেখেছি, তাদের কাউকে ঠিক চিনি জানি একথা বলবার সাহস আমার কোথায়?

মনে আছে একদিন, আমি স্কুলের নীচু ক্লাসে পড়ি, তুমি গাড়ী ধোয়াচ্ছিলে পাড়ার একটা চাপড়াশীকে দিয়ে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে, তার নাম ছিল লছমন সিং, পাড়ার এক ভদ্রলোকের ফ্ল্যাটের চাকরদের ঘরে সে থাকত সপরিবার, তাঁর সংসারের যাবতীয় কাজ কর্ম করত, এবং আরও কয়েকটা পরিবারের টুকরো কাজ, যেমন গাড়ী ধোওয়া, বাগান দেখা, রেশনের চাল-গম-চিনি এনে দেওয়া, সকাল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা পরিশ্রম ক'রে তাকে স্বামী স্ত্রী আর পাঁচটি সন্তানের ভরনপোষণ করতে হত, সেই লছমন সিং এর সঙ্গে তুমি টুকরো-টুকরো কথা বলছিলে, আর আমি ছিলাম তোমার পাশে, দাঁড়িয়ে, মনে মনে ক্রিকেট কমেন্টারী ক'রে যাচ্ছিলাম, ওটা আমার একেবারে ছোটবেলা থেকে আয়ত্ত অভ্যাস, এমন সময় আমারই বয়সের

একটি ছেলে এসে নমস্কার ক'রে দাঁড়াল তোমার সামনে; তুমি জিজ্ঞেস করলে, কি চাই?

সে দুহাত জোড় ক'রে বলল, বাবুজি, আমি আপনার গাড়ী সাফ করতে পারি?

তুমি অবাক হলে। বললে, কেন? গাড়ী সাফ করতে চাস কেন?

ছেলেটা তখনও হাত জোড় ক'রেই আছে। বলল, আমার কিছু টাকার দরকার, তাই কাজ খুঁজছি।

তুমি প্রশ্ন করলে, থাকিস কোথায়?

উত্তর শুনে বললে, সে তো অনেক দূর! প্রায় চার মাইল হবে। রোজ কি ক'রে আসবি এত দূর গাড়ী সাফ করতে?

ছেলেটা বলল, তা আমি পারব, বাবুজি।

তুমি জানতে চাইলে, টাকার এত দরকার কেন?

ছেলেটা বলল, তার বাপ ম'রে গেছে, মা আর ছোট ভাইকে নিয়ে সে বাস করে ভোগলের এক বস্তিতে, তিন বছর হল সে স্কুলে যাচ্ছে, স্কুল ছাড়বার ইচ্ছে নেই, মাইনে লাগবার কথা নয়, তবু শিক্ষক মশাইকে মাসে এক টাকা চার আনা না দিলে স্কুলে গেলেও পড়ান না তিনি, তা ছাড়া, বাপ ম'রে যাবার পর, তার কিছু রোজগার করা ছাড়া উপায় নেই, মা মজদুরী ক'রে যা পায় তাতে তিনটে মানুষের একবেলা আহার অসম্ভব।

আমি তাকিয়ে দেখছিলাম ছেলেটাকে, আমারই মত বছর বারো বয়স হবে তার, রং ময়লা, চুলগুলি তেলহীন রুক্ষ, চোখ দুটো হলদে, ঠোঁট শুকনো-বেগ্‌নী, গায়ে আধময়লা সার্ট আর পায়জামা, অথচ সব কিছু নিয়ে ছেলেটার মধ্যে কি-যেন একটা আকর্ষণ, আমার হঠাৎ ইচ্ছে হল ওর সঙ্গে খেলা করি, প্রশ্ন ক'রে বসলাম, তুমি ক্রিকেট খেলতে পার? ছেলেটা এবার আমার চোখে চোখ রেখে, হাত জোড় করে বলল, 'না, সাহেব, ক্রিকেট খেলতে আমি পারি না।'

আমি ভীষণ রেগে গেলাম, বলে উঠলাম, তুমি বুদ্ধু!

ছেলেটা জোড়হাতে মৃদু হাসল।

তুমি আমায় তিরস্কার করলে : কেতু! এমনি ক'রে কথা বলতে আছে কারুর সঙ্গে!

তখন আমার রাগ আরও বেড়ে গেছে, ইচ্ছে করছে ছেলেটার সঙ্গে মারামারি করতে, মেরে ওকে মাটিতে শুইয়ে দিতে, বুঝতে পারছি না তুমি কেন ওর সঙ্গে কথা ব'লে যাচ্ছ, তোমার স্বরে মমতা।

তুমি জানতে চাইলে, নাম কি তোর?

ছেলেটা বলল, ভজন সিং।

তুমি বললে, তোর পড়বার খুব ইচ্ছে ?

ছেলেটা বলল, জি, হুজুর।

তুমি বললে, ঠিক আছে। তুই প্রতি মাসের দু'তিন তারিখে আসিস। আমি তোকে পাঁচটা টাকা দেব।

ছেলেটা বলল, গাড়ী সাফ করবো তো বাবুজি ?

তুমি বললে, না। অত দূর থেকে এসে তোকে গাড়ী সাফ করতে হবে না। তোর পড়ার জন্যে আমি মাসে পাঁচ টাকা দেব। এসে নিয়ে যাস।

সেই থেকে প্রতি মাসের প্রথমে ভজন সিং এসে হাজির হত, তোমার কাছ থেকে পাঁচ টাকা নিয়ে যেত। মিতু আর আমি ওকে দেখতাম, আমাদের দেখে জোড় হাতে নমস্তে করত, মাথা নিচু ক'রে থাকত দাঁড়িয়ে। তুমি হয়ত বাথরুমে, অথবা কোনও কাজে ব্যস্ত যখন ভজন সিং এসে হাজির, আমরা কেউ যদি ওকে লাউঞ্জের চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলতাম, ও যেন কুঁকড়ে যেত, বসত না, দরজার বাইরে থাকত দাঁড়িয়ে। তুমি এলে নীচু হ'য়ে প্রণাম করত, দুহাত পেতে টাকা নিত, তুমি প্রশ্ন করতে, স্কুলে যাচ্ছিস তো ?

বলত, যাচ্ছি, হুজুর।

তুমি জানতে চাইতে, পড়াশোনা হচ্ছে ?

ঘাড় নেড়ে জবাব জানাত, হচ্চে।

এমনি করে চার বছর কেটে গেল। প্রতি মাসে ভজন সিং একদিন সকালে এসে দরজার সামনে দাঁড়ায়, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, চলে যায়। ওকে আমি আর বিশেষ লক্ষ্যও করি না, ভজন সিং নামক মাসে-একদিনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাতে আমরা অভ্যস্ত। কোনও মাসে ওর আসতে দেরী হলে মিতু কৌতুক ক'রে হয়ত তোমাকে বলে, এমাসে তো বাবার দ্বিতীয় ছেলে এখনও এল না! আমরা সবাই হাসি। মিতুর সবদিকে নজর তীক্ষ্ণ, মন ছোটবেলা থেকে সংবেদনশীল। হটাৎ একদিন মিতু বলে বসল, দেখেছিস, দাদা, ভজন সিং-টা কেমন বড় হ'য়ে গেছে! তোর চেয়েও বড় দেখায় ওকে! আমি ঠোঁট উলটে বললাম, সবাই তো বড় হয়, ভজন সিং-কি মাসে মাসে ছোটে হ'য়ে যাবে ?

চার বছর পর ভজন সিং একদিন সকালে এ'সে মিতুকে অবাক ক'রে দিয়ে বলল, মাতাজির দর্শন পেতে পারি ? এতগুলি মাস সে কখনও আমাদের মার সঙ্গে বোধহয় কথাই বলে নি, তার একমাত্র কারবার ছিল তোমার সঙ্গে, আমাদের বাকী তিনজনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল কেবল জোড়হাত নমস্কারের, কেবল নিচু-চোখ দাঁড়িয়ে থাকার।

মিতু মাকে ডেকে আনতে ভজন সিং একটা থলি থেকে কাগজে মোড়া একটা জিনিষ বার ক'রে বিনীত হাসির সঙ্গে মার হাতে তুলে দিল।

মা বলল, কি এটা!

ভজন সিং বলল, আপনার জন্যে সামান্য কিছু। আমার নিজের হাতে তৈরী।

কাগজ খুলে মা বিস্মিত আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল।

ঝিনুক আর পুঁতি দিয়ে তৈরী আশ্চর্য সুন্দর একটি মহিলাদের হ্যাণ্ড-ব্যাগ।

মার অনেক উত্তেজিত প্রশ্নের জবাবে স্বল্পভাষী ভজন সিং নিবেদন করল, সে যে স্কুলে পড়ছে সেখানে লেখাপড়ার সঙ্গে নানারকম হাতের কাজ শেখান হয়। দু বছর হল সে লেডিস ব্যাগ বানানো শিখেছে। এখন প্রতি মাসে আট দশটা ব্যাগ সে তৈরী করে থাকে। প্রত্যেক ব্যাগের জন্যে দু'টাকা তার প্রাপ্য হয়।

মা ব্যাগের দাম দিতে চাইল।

ভজন সিং জোড় হাতে বলল, এটা আমি আপনার জন্যে তৈরী করেছি। দাম নিতে পারব না।

মা বলল, তোমার জিনিষপত্র অনেক খরচ হয়েছে।

ভজন সিং বলল অনেকগুলো ব্যাগ থেকে মালপত্র বাঁচিয়ে এটা তৈরী ক'রেছি। মালপত্র কিনতে হলে কি আর তৈরী করতে পারতাম?

মা শোবার ঘর থেকে নিয়ে এল আমার জন্যে নতুন কেনা সার্ট। ভজন সিংকে দিয়ে বলল, এটা তোমার গায়ে ঠিক হবে। তুমি তো কেতুরই বয়সী।

আমার রবিবারটা কেমন বিস্বাদ হ'য়ে গেল। ভজন সিং এর সামনে মা আর মিতু ব্যাগটা নিয়ে কত উচ্ছ্বাস দেখাল আমি কেমন রেগে যেতে লাগলাম। মা যখন আমার নতুন সার্টটা দিয়ে দিল ভজন সিংকে তখন আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না বারান্দায়, চলে গেলাম পেছনের বাগানে, আমার দুচোখ ফেটে জল ঝরতে লাগল।

ভজন সিং চলে যাবার পর মার ওপর আমার রাগ ফেটে পড়ল।

"আমার নতুন সার্টটা কেন দিয়ে দিলে ওকে?"

মা কত বোঝাল আমাকে, আমি কিছুতেই শান্ত হ'তে চাইলাম না।

শেষে মা রেগে গেল।

"তুই তো দারুণ ছোটলোক হয়েছিস কেতু!"

"আমি ছোটলোক বই কি? যত ভালো ছেলে তোমাদের ঐ ভজন সিং!"

"তুই ঐ গরীব বাপ-হীন ছেলেটাকে হিংসে করিস?"

"কেন করবো না। ও কি একদিনও আমার সঙ্গে কথা বলেছে একটা? চুপ ক'রে এসে জোড় হাত ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, আর বাবা কি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ওর

সঙ্গে। তুমি ওকে আমার নতুন সার্টটা দিয়ে দিলে। আমি কতদিন বলেছি আমার সঙ্গে খেলতে। গ্রাহ্যই ক'রে নি।"

মিতু বলে বসল, "তুই আবার কবে বললি ওকে খেলা করতে! তুই তো ওর ধারে কাছেও যাস না।"

আমি মিতুকে তেড়ে মারতে গেলাম, "তুই সব জানিস, না? আমি বলেছি, অনেকবার বলেছি।"

এ ঘটনার দুবছর পর এক রবিবার সকালে ভজন সিং হাজির।

আমার নাইন থেকে টেনে ওঠবার ফাইনাল পরীক্ষা আসন্ন।

তুমি ভজন সিংকে টাকা দিতে জোড়হাতে গ্রহণ করে বলল, "বাবুজি, অপরাধ না নেন তো একটা কথা বলি।"

"বল্।"

"আমি একটা চাকরী পেয়েছি। আগামী মাস থেকে আমার টাকার দরকার হবে না।"

"চাকরী পেয়েছিস? কোথায়? কি চাকরী?"

'একটা হ্যাণ্ড-ব্যাগ তৈরীর কারখানায়। ফরিদাবাদে।"

"মাইনে কতো?"

"সব নিয়ে একশ' সত্তর টাকা।"

"আর পড়বি নে?'

"না, বাবুজি। ম্যাট্রিকটা পাশ করলে ভাল হত। ইচ্ছেও ছিল। কিন্তু আরও পুরো দেড় বছর লাগবে। চাকরীই তো আসল। পরে যদি না পাই।"

"তা ঠিক।"

"বাবুজি, আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন। চিরকাল আপনাকে আমার মনে থাকবে।"

তোমাকে প্রণাম ক'রে ভজন সিং চলে যাচ্ছিল। তুমি ওকে দাঁড়াতে বলে আমাদের সবাইকে ডাকলে। ওর চাকরীর সুখবর শোনালে আমাদের। মা খুশিতে উচ্ছল হল। মিতুও প্রায় তাই।

আমি বলে বসলাম, "তাহলে তোমার পড়া শেষ হল, ভজন সিং, তাই না?"

ভজন সিং আমার চোখে চোখ রেখে বলল, "গরীবদের কি আর পড়া হয় ভাই-সাব।"

তুমি ভজন সিংকে বললে, মা-ও তোমার সঙ্গে স্বর মিলাল, "মাঝে মধ্যে এসো। তোমাকে দেখলে খুশি হব।"

ভজন সিং ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

তার পরে কোনওদিন সে আর আসে নি আমাদের বাড়ীতে।

দিল্লীর রাস্তায়, বাজারে পাড়ায়, পাড়ায়, কতো লোককে দেখেছি, কতো চেনা-অচেনা মানুষ।

ভজন সিংকে দেখিনি কোথাও, এক দিনও।

আমাদের জীবন থেকে নিঃশব্দে সে সরে পড়ল, যেমনি একদিন সবিনয়ে জোড়-হাতে এসেছিল, তেমনি কেটে পড়ল।

ভজন সিং-কে নিয়ে আমাদের পরিবারে মাঝে মধ্যে আলোচনা হত। তুমি বলতে, ছেলেটার অসাধারণ মোটিভেশনের কথা। জীবনে দাঁড়ানোর দৃঢ় সংকল্প না থাকলে এমনিভাবে একমন হ'য়ে কেউ লক্ষ্যের দিকে এগোতে পারে না, একদিন তুমি বলেছিলে। 'বিদেশে জন্মালে ছেলেটা অনেক দূর পৌঁছতে পারত···আমার আপসোষ পড়া ছেড়ে দিয়ে রোজগার শুরু করল। ভালই করেছে বোধহয়, ম্যাট্রিক কিম্বা বি. পাশ করেও এর চেয়ে বেশি মাইনের কাজ পেত না।'

মা প্রশংসা করত ভজন সিং-এর সুবিনীত স্বভাবের। তার সীমিত ভদ্র আচরণের। "এমন নম্র ভদ্র সভ্য ছেলে ভদ্রলোকদের পরিবারেও খুব একটা চোখে পড়ে না। হাতের কাজও কিন্তু খুব নিপুণ। দেখো ওর অনেক হবে।"

মিতুর সেনস্ অব হিউমার মজ্জাগত। বলে বসল, "দেখব কি ক'রে? বাবাও জানে না ভজন সিং কোথায় থাকে।"

মা তাকাল বাবার পানে।

তুমি বললে, "না। কখনও জিজ্ঞেস করি নি। বলেও নি কখনও।"

মিতু প্রশ্ন ক'রে বসল, "কেন জানতে চাওনি বাবা?"

তুমি বললে, "জেনে কি হত? আমরা কি কখনও যেতাম ভজন সিংএর বাড়ীতে?"

আমি বললাম, "তুমি খুব খুশি কেননা ভজন সিং 'ফরেন এড'-এর সদ্ব্যবহার করেছে। তাই না?"

মিতু বলল, "দাদা ওকে কোনওদিন পছন্দ ক'রে নি।"

তুমি আস্তে বললে, "সামহোয়াট স্ট্রেন্‌জ্, দো।"

মা বলল, "কেতুটা আসলে ভীষণ হিংসুটে। ওর বাপ আর কারুর দিকে সামান্য নেক নজর দিলেও ওর হিংসে হয়।"

আমি উঠে পড়ার ঘরে চলে গেলাম।

তোমরা ভজন সিংকে একটুও চেন নি, বাবা। তুমি ওকে দেখেছ ভিক্ষাপ্রার্থী

একটি দরিদ্র ছেলে হিসেবে, যে শুধু হাত পেতে পয়সা চায় নি তোমার কাছে, মেহনত ক'রে রোজগারের আবেদন জানিয়ে এক মুহূর্তে তোমার হৃদয় জয় করেছিল। বাল্যকাল তোমার অভাবের সংসারে কেটেছে, অর্থের অনটনে তুমি আকাঙ্খা মত পড়তে পারো নি, তাই, আমরা সবাই জানি, কেউ লেখাপড়ার জন্যে অর্থ সাহায্য চাইলে তুমি তাকে ফিরিয়ে দাও না। ভজন সিং অবশ্য তোমাকে জানত না, দৈবাৎ সৌভাগ্যক্রমে তোমার কাছে সে এক রবিবারের সকালে এসে দাঁড়িয়েছিল, মাসে পাঁচ টাকা সাহায্য তার জন্যে নির্ধারিত হ'য়ে গেল। তুমি খুব সুখী হলে যখন বছরের পর বছর এক ক্লাস থেকে পরের ক্লাসে উত্তীর্ণ হ'তে লাগল ভজন সিং। কিন্তু বাবা তুমি তো ওকে কোনওদিনও ঠিক রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে গ্রহণ করো নি। তুমি জানতে চাও নি ও কোথায় থাকে, একটা ছায়ার মত মাসে ভজন সিং এসে দাঁড়াত তোমার দাক্ষিণ্যের জন্যে, হাত পেতে দাক্ষিণ্য পাবার সঙ্গে সঙ্গে কুর্নিশ জানিয়ে বিদায় নিত, এর বেশি তুমি ওকে চিনতে না, প্রয়োজন বোধ করো নি। ভজন সিংকে তুমি দেখেছ যে দৃষ্টিতে তাকে আমি বলব 'সোস্যাল কলোনিয়ালিজম', সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ। এ দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দেশের বড় জাতের, ভাল অবস্থার মানুষ চিরদিন ছোটজাত দরিদ্রদের দেখে এসেছে, বড় মানুষদের রাজনৈতিক মতবাদ যাই হোক না কেন, তিনরং, গেরুয়া, লাল, তাতে কিছু প্রভেদ ঘটায় নি। আমি শুনেছি, চোখে দেখি নি, কিন্তু বিশ্বাস না করবার কারণ নেই, শুনেছি আমাদের দেশের সাম্যবাদী কৃষক নেতা যদি ব্রাহ্মণ হন (উঁচু জাতের লোক তো তাঁরা বটেই), গ্রামের কৃষককর্মী তাঁকে গড় হ'য়ে প্রণাম করে—তিনি কম্যুনিষ্ট বলে নয়, ব্রাহ্মণ বলে, এবং সে প্রণাম তিনি স্মিত ঔদার্যে গ্রহণ করেন।

বাবা, ভজন সিং-এর আরএকটা চেহারা আছে, যা তোমরা দেখনি, দেখেছি আমি। সে তোমার কাছে হাত পেতেছে, আমার সঙ্গে একদিনও একটা কথাও বলে নি। আমি তার চোখে দেখেছি জলন্ত ক্রোধ আর পরিষ্কার বর্জন। যে সমাজ তাকে এবং আমাকে একসঙ্গে পয়দা করে, আমার কোনও কিছুর অভাব নেই, তার অভাব সব কিছুর, সে সমাজ ভজন সিং শ্রদ্ধার চোখে দেখেনি তার বাল্যকাল থেকে, তাই সে আমার সঙ্গে পরিচিত হবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায় নি, অনেকবার আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, প্রবল ইচ্ছা নিয়ে তাকে বন্ধু হিসেবে পেতে, ভজন সিং একবার আমার দিকে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখে নি। তোমার সামান্য দান তার উপকারে লেগেছে, যদিও সে চেয়েছিল পরিশ্রম ক'রে উপার্জন, কিন্তু তার সাধ্যের বাইরে গিয়েও সে ঋণ শোধ করেছে মাকে অমন সুন্দর ভ্যানিটি ব্যাগ উপহার দিয়ে, চাকরী পাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে জানিয়েছে, সাহায্যের আর

প্রয়োজন নেই তার। ভজন সিং কোনওদিন ভুল ক'রেও ভাবে নি আমরা তার আপনার লোক, সে জানত আমরা অন্য দুনিয়ার মানুষ, তার সঙ্গে আমাদের আসল সম্পর্ক সংঘাতের, সম্মিলনের নয়। আমি দেখেছি, দেখনি তোমরা, ভজন সিংএর চোখে ঘৃণা, বিদ্বেষ, ভয় এবং বর্জন। দেখে তাকে আমার বন্ধু হিসেবে পাবার আগ্রহ বেড়েছে, কিন্তু সামান্যতম গ্রহণ সংকেত ভজন সিং জানায় নি আমাকে কোনওদিন। আমার বাড়ীতে এসে বার বার নিঃশব্দে তোমাদের অগোচরে ভজন সিং আমাকে অপমান ক'রে গেছে, আমাকে তো নয়, আমাদের মত সব 'বড়' পরিবারের ছেলেদের। জানিয়ে গেছে, আগামী কোনও একদিন তোমাদের আমরা দেখে নেব; তোমার বাবার কাছে হাত পাতছি অন্য উপায় নেই ব'লে, তোমাদের কাছে আমরা হাত পাতব না। তোমাদের সঙ্গে হবে আমাদের হাতাহাতি অথবা তোমাদের সন্তানদের সঙ্গে আমাদের সন্তানদের, হবেই একদিন, এবং জিতব আমরা, কারণ আমরা অনেক, অনেক, তোমরা সামান্য, আমাদের হৃদয়ে জ্বালা আছে, তোমাদের নেই।

অনেক বছর পরে নিউ ইয়র্ক শহরে আমার এক ভয়াল অভিজ্ঞতা হ'য়েছিল, বাবা, যেদিন ভজন সিংকে মনে পড়েছিল।

আমি যে বছর আমেরিকায় পদার্পণ করি সেটা তখন নিগ্রোদের নিয়ে শাদা আমেরিকানদের ভীষণ সমস্যা: নিগ্রোরা হঠাৎ বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে, শাদাদের কাছ থেকে হাত পেতে দাক্ষিণ্য নেবার বদলে তারা চাইছে রাতারাতি সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন, যাতে তাদের দুশ' বছরের অপমান, নির্যাতন, শোষণ এবং দারিদ্র্য বদলে গিয়ে তারা পেতে পারে শাদাদের সঙ্গে সমান মানবিক অধিকার। মার্কিন মুলুকে নিগ্রো সমস্যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার স্থান নয় আমার এই নিবেদন, শুধু সোজা কথাটা জানিয়ে দিলেই চলবে, যা শাদাদের চিত্তে গভীর দুশ্চিন্তা আর বিরাট ভয় এনেছে। সেটা হল, নিগ্রোরা, বিশেষ ক'রে নিগ্রো যুবক যুবতিরা, আর দীর্ঘকাল অপেক্ষা ক'রে ধীরে আস্তে মন্থরগতি সামাজিক বিবর্তনের পথ ধ'রে শাদাদের দয়ায় দাক্ষিণ্যে, বড়জোর বিলম্বিত ঔদার্যে, একটু একটু ক'রে 'উন্নতি'র দিকে এগোতে রাজী নয়। তারা যে পথ নিয়েছে তা হল শাদাদের বর্জনের পথ, ধ্বংসের পথ, অপমানের বদলে অপমান, আঘাতের বদলে আঘাতের পথ। এ পথ যে কত দুর্গম, এ পথে সাফল্য যে অসম্ভব তা বুঝেও তারা স্বীকার করতে তৈরী নয়। ক্রোধ আর ঘৃণা তাদের অন্তরের রং চামড়ার রং এর মতোই কালো ক'রে দিয়েছে, তাদের কাছে দয়া, মমতা, সভ্য-ব্যবহার, সভ্য সমাজের রীতিনীতি সব শোষণ ও শাসনের অস্ত্র মাত্র।

মা আর তুমি জানতে না, আমি এ ধরনের কিছু কিছু নিগ্রোদের সঙ্গে মিশে

গিয়েছিলাম। মিতু জানত, এ নিয়ে তার দুর্ভাবনার শেষ ছিল না, কিন্তু আমি চাইনি বলে তোমাদের জানায় নি কখনও।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গা ঘেঁষে হার্লেম, নিউ ইয়র্কের বিস্তৃত নিগ্রো পল্লী, পৃথিবীর সব চেয়ে নোংরা, সব চেয়ে কদর্য, সব চেয়ে ভয়ংকর বস্তি। এই বস্তিতে দশ বিশটা খুন, জখম, রাহাজানি দৈনন্দিন ঘটনা। 'পট' আর 'ড্রাগে'র 'পুশার'রা পুলিশের তৃতীয় দৃষ্টির সামনে সব সময় বেচে চলছে নিজেদের মাল। বীয়র আর মদের বোতলে রাস্তায় পা ফেলা দুষ্কর। দারিদ্র্য ও অশিক্ষা যে কত ভয়াবহ এবং কুৎসিৎ হ'তে পারে হার্লেমে পা না দিলে তা জানা সম্ভব নয়। আমেরিকানরা যাকে 'ঘেটো' বলে, অর্থাৎ বস্তি, তার অভাব নেই কোনও মার্কিন বড় শহরে—শিকাগো, বষ্টন, ফিলাডেলফিয়া, ওয়াশিংটন ডি. সি. সব শহরেই বিস্তীর্ণ 'ঘেটো'—কিন্তু নিউ ইয়র্কে হার্লেম অনন্য, এখানে নিগ্রো জাতীয়তাবাদের 'রাজধানী', হার্লেম নিগ্রো বিদ্রোহের প্রধান ঘাঁটি, এখানে বিদ্রোহীরা তৈরী করে তাদের নীতি আর আদর্শ, পথ এবং লক্ষ্য, হার্লেম নিগ্রো সংস্কৃতি ও নিগ্রো মানসের পীঠস্থান। তাই না কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো যেবার ইউনাইটেড নেশনস্‌এ যোগ দিতে নিউ ইয়র্কে পদার্পণ করলেন, সালটা বোধহয় তিনি আবাস নিলেন হার্লেমে, মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রতিবাদকে সম্মান জানাতে।

নিগ্রো প্রতিরোধীদের সাংঘাতিক দুর্বলতা তাদের ঐক্যের অভাব। অনেক দল উপদলে তারা বিভক্ত। শহরবাসী 'শাম্পেন পাতি বুর্জোয়া অথবা প্রলেটারিয়েট' হ'লে যা হয়; নিগ্রোদের স্থান নেই শাদাদের একচেটিয়া ট্রেড ইউনিয়নে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হার্লেমের গায়ে হলে কি হবে, নিগ্রো ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুব কম, হাতে গোনা যায়। নিগ্রোদের সাধ্যি নেই কলম্বিয়ার ডাক সাইটে মাইনে দেবার, স্কুল থেকে বেরোবার সময় যে পর্যায়ের উৎকর্ষ দেখাতে পারলে কলম্বিয়ায় ভর্তি সম্ভব, তাও তাদের আয়ত্বের বাইরে। অতএব নিগ্রোদের ভিড় করতে হয় বিনা-বেতন বা সামান্য-বেতন কলেজগুলিতে, যেগুলো সিটি গভর্ণমেন্ট দ্বারা পরিচালিত। তথাপি যে নিগ্রো ছেলেটি আমাকে প্রথমবার হার্লেমে নিয়ে গিয়েছিল সে ছিল কলম্বিয়ারই ছাত্র।

নাম জুলিয়াস মিলটন। নিগ্রোদের নামের বাহার সহজেই লক্ষ্য করতে হয়। কারুর নাম জুলিয়াস, কেউ বা হোমার, কেউ বা ভিক্টর।

জুলিয়াসের মাধ্যমে আমার বেশ কয়েকটি নিগ্রো দল-উপদলের সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল। তাদের কোনটা বেশি উগ্র, কোনওটা কম। সবাই শাদার শাসন ও শোষণ বর্জন করতে দৃঢ়পণ। সবাই পথের সন্ধানী। অন্তরে জ্বালা। তার বাইরে

প্রকাশ হিংসাত্মক ব্যবহারে। এবং তার অনিবার্য ফল রাজশক্তির হাতে নির্যাতন। নির্যাতনের পরিণাম অন্তরের জ্বালার বৃদ্ধি। প্রত্যেকটি সচেতন নিগ্রো এই বিষময় বৃত্তে বন্দী।

ম্যানহাটান দ্বীপ নিউ ইয়র্ক শহরের প্রাণকেন্দ্র, এই ম্যানহাটানের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জুড়ে হার্লেম। সেন্ট্রাল পার্কের পশ্চিম অংশকে বলা হয় নিউ ইয়র্কের পশ্চিম ভাগ, পূর্বাংশকে পূর্বভাগ। রাস্তাগুলির নামও তেমনি ক'রে নির্ধারিত। যেমন West 125 Street রয়েছে সেন্ট্রাল পার্কের পশ্চিমে, East 125 Street, পুবে। West 125 Street যেখানে লিনকন এ্যাভিনিউর সঙ্গে মিশেছে সেটা হার্লেম পল্লীর প্রায় কেন্দ্রবিন্দু বলা চলে। সেখানে একটা নিগ্রো রেঁস্তোরা আছে, নাম 'ব্ল্যাক ইজ বিউটিফুল।' ডাক নাম 'ব্ল্যাক বিউটি।' এই 'ব্ল্যাকবিউটি' রেঁস্তোরায় সংগ্রামী নিগ্রো ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন একত্রিত হয়। গান করে ভীয়েৎনাম যুদ্ধকে গালমন্দ দি'য়ে, নিগ্রো সংগ্রামকে সুর আর ধ্বনিতে রাঙিয়ে; নাচে, নাচেও সংগ্রামী ছন্দ; আলোচনা করে; তর্কবিতর্কে 'ব্ল্যাক বিউটি' গুলুম হয়ে ওঠে; সঙ্গে সঙ্গে 'পট' খায়, নেশায় একজন আর একজনের সঙ্গে অঙ্গবদ্ধ হয়। এদের অনেক আসরে আমি উপস্থিত থেকেছি, অনেককেই আমি চিনি, এদের সঙ্গে বসে ব্ল্যাক কফি পান করেছি, এক-আধটু মারিওয়ানাও খেয়ে দেখেছি, হাশিশও খেয়ে ছিল'ম একবার, কিন্তু কোনও আলোচনায় যোগ দিইনি, এরাও আমাকে টানেনি নিজেদের মধ্যে, উৎসাহী ঔৎসুক বিদেশী হিসেবে আমাকে উপস্থিতি দিয়েছে, যদিও।

প্রেসিডেন্ট জনসনের ভীয়েৎনাম নীতির বিরুদ্ধে মার্কিন জনমত দানা বেঁধে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিবাদের প্রধান কেন্দ্র। প্রতিবাদীদের মধ্যে নিগ্রোদের স্থান আলাদা। তারা ভীয়েৎনামবাসীদের স্বাধীনতার সঙ্গে নিজেদের মুক্তিকে সংযুক্ত ক'রে নিয়েছে। যে কঠোর নৃশংস মূল্যবোধ মার্কিন রাষ্ট্রকে ভীয়েৎনামে লক্ষ লক্ষ টন বোমা বর্ষণে উদ্বুদ্ধ করে, সে মূল্যবোধেরই আভ্যন্তরীণ রূপায়ণ, নিগ্রো যুবক যুবতিদের কাছে, তাদের শোষণ আর অপমানের কারক।

নিগ্রোরা সমাজের সঙ্গে একত্র হ'য়ে সংগ্রামের পথ বর্জন করতে শুরু করেছে। তাদের পথ আলাদা। লক্ষ্য আলাদা। শাদা লিবারেলদের আর তারা বিশ্বাস ক'রে না। জুলিয়াস মিল্টন একদিন আমায় বলেছিল, "লিবারেলগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বড় শয়তান। গোঁড়াপন্থীদের সহজে বোঝা যায়। তারা আমাদের প্রকাশ্যে ঘৃণা করে। ধরো শিকাগোর বা নিউ ইয়র্কের পুলিশ। নিগ্রো দেখলেই পিস্তলে হাত পড়ে। কিন্তু লিবারেলদের সহজে চেনা যায় না। তারা আমাদের প্রকাশ্যে ঘৃণা করে না। খানিকটা গ্রহণ করে। কিন্তু সমান বলে মেনে নিতে তৈরী নয়। তারা আমাদের

নিজের হাতে যেটুকু দয়াদাক্ষিণ্য করবে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে আমাদের। লিবারেলরা আসলে ভীষণ গোঁড়া, অত্যন্ত চালাক গোঁড়া। ওরা আমাদের অনবরত ঠকাচ্ছে।"

আমেরিকায় পঞ্চাশ কি পচাত্তর হাজার ভারতীয় আছে, এখন হয়ত আরও পঞ্চাশ কি পচাত্তর হাজার বেড়েছে। এরা সাধারণত নিগ্রোদের সঙ্গে মেশে না। শাদাদের সঙ্গে সামাজিকতা করে, নিগ্রোদের চলে এড়িয়ে। নিগ্রোদের দেখে ভয়ের চোখে, তুচ্ছতা ও অবহেলার চোখে; শাদারা নিগ্রোদের সম্বন্ধে যা প্রচার করে ভারতীয় মানসে তা পাকা হ'য়ে বসে। আমি কখনও দেখি নি কোনও ভারতীয় ছেলের আছে নিগ্রো বান্ধবী, ভারতীয় মেয়েদের তো নিগ্রো দেখলেই বুক কাঁপে, হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে। আমেরিকার দক্ষিণ রাজ্যগুলিতে কখনও কখনও কোনও কোনও ভারতীয়কে গায়ের রংএর জন্য অপমানিত হ'তে হয়েছে, উত্তর বা পুব রাজ্যে এসব ঘটনা ঘটে না। কয়েক বছর আগেও নিউ ইয়র্ক শহরে মোটর চালাবার লাইসেন্সে মালিকের গায়ের রং উল্লেখ থাকত। ভারতীয় হ'লে বর্ণনা হত: হোয়াইট। এ নিয়ে গর্ব করতে শুনেছি একাধিক ভারতীয়কে।

একবার আমি ওয়াশিংটন ডি. সি. তে বাসে চড়ে শহর থেকে শহরতলীতে ফিরছিলাম। ওয়াশিংটন শহরে একশ জনের মধ্যে ষাটজন নিগ্রো, বাসেও, অতএব, শাদা মানুষের চেয়ে কালো মানুষ বেশি। আমি বসেছি এক শাদা ভদ্রলোকের পাশে। লোকটির বয়স ষাটের কাছাকাছি, মাথা জোড়া টাক, কপালে গভীর কুঞ্চন সমান্তরাল লাইন কেটেছে অনেকগুলি, দুপাটি নকল দাঁতের মধ্যে তিনটি সোনা দিয়ে বাঁধান। মার্কিন লোকেরা সাধারণত আলাপী, ভদ্রলোকও আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে বসলেন। কথায় কথায় বললেন তিনি এক অতিকায় নির্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠানে আরকিটেক্ট, বাস চলতে চলতে অনেকগুলি আকাশভেদী বাড়ী দেখিয়ে বললেন, ওগুলো তাঁদের প্রতিষ্ঠানের তৈরী। আমার ইংরিজী শুনে প্রথমেই অবাক হ'য়েছিলেন, যখন জানলেন আমি কলম্বিয়ায় ইংরিজী সাহিত্যে পি-এইচ. ডি. করছি, পুলকিত হলেন। তাঁর তিন ছেলের মধ্যে একজনও উচ্চশিক্ষার দিকে যায় নি, তাতে দেখা গেল ভদ্রলোকের কিছুটা মনোব্যথা রয়েছে।

হটাৎ বাসের যাত্রীদের ওপর একবার নজর ঘুরিয়ে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের দেশে কি কালার প্রব্লেম' আছে?"

আমি বললাম, "আমরা সবাই তো কালারড্।"

ভদ্রলোক বিব্রত হ'য়ে বললেন, "তোমরা কালারড্ নও। কালারড্ হচ্ছে ওরা।" ইংগিতে একটি নিগ্রো মহিলাকে দেখিয়ে দিলেন।

"আছে তোমাদের দেশে এ-জাতের সমস্যা ?"

আমি হেসে বললাম, "ঠিক এ জাতের নেই। তবে অন্য অনেক সমস্যা আছে। ধরুন—"

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "অন্য সব সমস্যার সমাধান আছে। কালারডদের নিয়ে যে সমস্যা তার সমাধান নেই। আমি প্রেজুডিস্‌ড্‌ নই। নিগ্রোরাও মানুষ, আমি মানি। কিন্তু কি হয়েছে আমাদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ তো ? এই শহরে সন্ধ্যের পরে কেউ নির্জন পল্লীতে পা বাড়াবার সাহস রাখে না। খুন খারাবি প্রতিদিনের ঘটনা। প্রতিদিন তিন চারটে রে'প হচ্চে। নিউ ইয়র্কের অবস্থাও তাই। এ সমস্যার সমাধান নেই।"

'ব্ল্যাক বিউটি'র আলোচনায়ও আমি বার বার ঐ একই কথা শুনতে পেতাম। "মিলে ঝুলে এ সমস্যার সমাধান হবে না, হ'তে পারে না। শাদারা আমাদের ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। কেবল সে-সব কালোদেরই বাঁচবার অধিকার যারা হাত পেতে যতটুকু পাবে তাতে সন্তুষ্ট, যারা সমান হবার দাবী তুলবে না, সমান অধিকার আদায় করতে চাইবে না প্রয়োজন হলে হিংসার মাধ্যমে। আমরা যারা না মেরে মরতে রাজী নই, না মার খেলেও মারতে চাই কেননা আমাদের পিতা পিতামহদের অপমান প্রতিশোধের অপেক্ষা করছে, আমাদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করাই শাদাদের একমাত্র নীতি।"

দুপক্ষের এই পরিপূর্ণ বিরোধী উগ্রতা মার্কিন মুলুকে নতুন এক গৃহযুদ্ধের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল কিছু কিছু নিগ্রো নেতারা দাবী করেছিল কালোদের জন্যে স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র, কয়েকটি রাজ্যকে আমেরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে।

একদিন আমি অপরাহ্ণে ক্লাস কেটে একা হাজির হ'য়েছি 'ব্ল্যাক বিউটি'তে। রেঁস্তোরায় ঢুকে দেখি একদল ছেলেমেয়ের ভিড়। তাদের প্রায় কারুর মুখই আমার চেনা নয়। মাত্র তিন চারটে মুখ দেখে মনে হল এদের এখানেই এর আগেও দেখেছি, আলাপ হয় নি!

আমাকে দেখে সবাই চুপ হ'য়ে গেল। থমথমে নিস্তব্ধতা এমন বেখাপ্পা লাগল যে আমার বুঝতে সময় লাগল না, বাতাবরণ প্রতিকূল।

বুঝতে পেরেও এমন ভাব দেখালাম যে আমি এখানকার পুরান, পরিচিত খদ্দের। রেঁস্তোরার ম্যানেজারের চেয়ারে বসেছিল যে বছর সাতাশ আঠাশের মেয়েটি, সে আমার চেনা, আলাপও ছিল, তার চোখে চোখ পড়তে আমি হাসলাম, কিন্তু আজ আর সে হাসি ফুটিয়ে স্বাগত জানাল না, গম্ভীর হ'য়ে চোখ সরিয়ে নিল।

আমি একটা টেবিলে আসন নিলাম। আরও তিনটি নিগ্রো ছেলে এবং একটি

মেয়ে সে টেবিলের চারধারে বসে ছিল, আমি বসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের করলাম, তারা বিব্রত হল, আড়ষ্ট স্বরে একজন বলল, "হাই", একটু পরে চারজনই উঠে অন্য টেবিলে চলে গেল।

পাঁচ সাত মিনিট কেটে গেল। মনে হল আধঘণ্টা।

অবশেষে একটি মেয়ে এসে কাছে দাঁড়াল। রেঁস্তোরার ওয়েট্রেস।

আমি বললাম, "কফি। ব্ল্যাক।"

মেয়েটি কি বলতে গিয়ে বলল না। ধীর পায়ে কাউন্টারের দিকে চলে গেল।

পাঁচ মিনিট চলে গেল। কফি আর আসে না।

সবাই হয় চুপ, নয় ফিস-ফিস কথা বলছে নিজেদের মধ্যে।

আমি একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছি।

শেষ পর্যন্ত একটা নিগ্রো ছেলে উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়াল।

আমি তাকিয়ে দেখলাম, সাড়ে ছ' ফুট লম্বা, পাতলা একহারা শরীর, মাথার 'কিংকি' চুল চামড়ার সঙ্গে ছাটা, চোখ দুটো ধবধবে শাদা, মোটা ঠোঁটে পাহাড় প্রমাণ গাম্ভীর্য।

বললাম, "হাই। আমার নাম কেতু।"

ছেলেটি বলল, "তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।"

আমি অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলাম, "কেন?"

"আমাদের তাই নিয়ম।"

আমি বললাম, "তোমরা কারা?"

"তাতে তোমার প্রয়োজন নেই। আমরা আমরা।"

"আমি এখানে প্রায়ই আসি। কেউ আমাকে চলে যেতে বলে নি। তোমরা কেন বলছ?"

"খুব সোজা কারণ। আমরা তোমাকে চাই নে। কথা বোলো না। কেটে পড়।"

"তুমি, তোমরা, বোধহয় ভুল করছ। আমি স্প্যানিশ নই। আমি ভারতীয়। তোমাদের বন্ধু।"

"তুমি ভারতীয় আমরা জানি। কেটে পড়।"

"কেন কেটে পড়ব?"

"কারণ তুমি ভারতীয়। তুমি জাতে ককেশীয়, তোমার দেহে শাদা মানুষের রক্ত। তুমি আমাদের নও, আমরা তোমাদের নই। আর বাড়িও না। মুস্কিলে পড়বে। আমাদের জরুরী কাজ আছে। এক্ষুনি কেটে পড়।"

আমার কি জানি কেন হঠাৎ মাথায় রক্ত চ'ড়ে গেল। বলে উঠলাম, "তুমি রেসিস্টদের মত কথা বলছ। গোঁড়া শাদারা যে ভাষা বলে তুমিও তাই বলছ।"

"বলছিই তো। ওরা শাদা রেসিস্ট। আমরা কালো রেসিস্ট। তুমি যাবে, না তোমাকে জোর ক'রে তাড়াতে হবে ?"

"আমি যাব না।"

ছেলেটা কেমন পাথর হ'য়ে গেল। আমি 'যাবো না" বলে শক্ত হ'য়ে বসব সে একেবারেই আশা করে নি। কয়েক মুহূর্ত সে আর আমি চোখের দৃষ্টিতে দুজনকে বন্দী ক'রে রাখলাম। তারপর আমাকে মারবার জন্যে সে হাত তুলল।

অন্য সবাই একটু দূর থেকে নাটক দেখছিল। তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, "ওকে মেরো না, ক্যাসিয়াস।"

ক্যাসিয়াস হাত নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এবার সবাই একসঙ্গে এগিয়ে এল আমার দিকে। ঘিরে দাঁড়াল আমাকে। সবশুদ্ধ জন বারো হবে। চারটি মেয়ে। বাকী সব ছেলে। কারুর বয়স বাইশ তেইশের বেশি নয়।

একসঙ্গে সকলে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম : "অল রাইট, আমি যাচ্ছি। আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতে চাই নে। তোমরা পুরো রেসিস্ট। শাদা রেসিস্টদের চেয়ে কোনও অংশে কম নও তোমরা। তোমাদের মনে বিষ। আমি তোমাদের সঙ্গ চাই নে।"

তীব্র বেগে আমি 'ব্ল্যাক বিউটি' থেকে বেরিয়ে এলাম। রাগে, দুঃখে, অপমানে আমার শরীর কাঁপছিল। সোজা রাস্তা ধরে হন হন ক'রে হাঁটতে লাগলাম।

১২৫ স্ট্রীট থেকে ১১৬ স্ট্রীট পর্যন্ত হাঁটবার পর একটা নির্জন গাছপালা ঢাকা পার্ক। তার অনেক উঁচুতে পাহাড়ের ওপর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লী। অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে হয় সে পল্লীতে। এ জায়গাটা এত নির্জন যে দিনের বেলাও কেউ একা এখানে আসতে চায় না। যদি সে কালো না হয়।

এই পার্কটায় পৌঁছবার কিছু আগে আমি টের পেলাম কে যেন আমার পিছু নিয়েছে।

তাকিয়ে দেখলাম, ক্যাসিয়াস।

আমার থেকে পনের কুড়ি পা পেছনে।

হটাৎ দারুণ ভয় পেয়ে বসল আমাকে।

ছেলেটা আমাকে মারতে আসছে। রেঁস্তোরায় দলের নেতার আদেশে মারতে

পারে নি। পিছু নিয়েছে। এবার ধ'রে ফেলতে পারলেই মেরে ফেলবে আমাকে। হাতে নিশ্চয় পিস্তল আছে, অথবা ছুরি।

আমি প্রাণপণ জোরে হাটতে লাগলাম। শরীর দিয়ে ঘাম ঝরছে। আমি যত জোরে হাটছি ক্যাসিয়াস তত জোরে এগিয়ে আসছে।

না দৌড়লে রেহাই নেই। অথচ দৌ'ড়ে আমি ওর কাছ থেকে মুক্তি পাব না। আমার চেয়ে অনেক লম্বা ক্যাসিয়াস। এক্ষুনি ধ'রে ফেলবে আমায়। দৌড়লে পেছন থেকে গুলী করবে।

এখন আমি সিঁড়িগুলির নীচে পৌঁচে গেছি।

হটাৎ মাথায় কি খেয়াল হল। দাঁড়িয়ে গেলাম।

আসুক ক্যাসিয়াস। দেখা যাক কি করে। পালানর পথ যখন বন্ধ, তখন মোকাবিলা হ'য়ে যাক দুজনে।

আমি দাঁড়িয়ে ক্যাসিয়াসের জন্যে অপেক্ষা করলাম।

দু'মিনিটের মধ্যে সে আমার কাছাকাছি চলে এল।

আমি বললাম, "তুমি আমার পিছু নিয়েছ কেন? মারবে?"

ক্যাসিয়াস আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

বলল, "না। তোমাকে মারবার জন্যে পিছু নিই নি। মারবার হ'লে অনেক আগেই মারতে পারতাম।"

"তবে! তবে কি চাও তুমি?"

"তুমি কিছু মনে কোরো না।"

"তার মানে।"

"তুমি বুঝবে না। আমরা লড়ছি। এটা যুদ্ধ। এখানে কোনও মানবিকতা নেই। কোনও কোমলতা নেই। কোমল হ'লে শত্রুকে ধ্বংস করা যায় না। ওরা আমাদের প্রতি কোমল নয়। আমরাও সব কোমলতা বর্জন করেছি।"

আমার মুখে কথা নেই।

ক্যাসিয়াস বলল, "তোমার কোনও দোষ নেই। তুমি আমাদের শত্রু নও। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি যে-নিগ্রো নয়, তার সঙ্গে আমাদের মিত্রতা হ'তে পারে না। তাই তোমাকে চলে যেতে বলতে হল আমাদের। তোমরা ভারতীয়েরা ককেশীয়ান, শাদাদের একজাত। তোমরা আমাদের মানুষ বলে মনে করো না।"

আমি এতক্ষণে ভাষা পেলাম। বললাম, "ভুল করছ। আমরাও অনেক অপমান, অনেক নির্যাতন, অনেক শোষণ ভোগ করেছি। আমি জানি কোথায় তোমাদের লাগছে। কি যন্ত্রণা তোমরা ভোগ করছ।"

ক্যাসিয়াস বলল, "একদিন, যদি আমরা জিততে পারি, তখন আবার আমরা কোমল হব। আবার আমাদের মনে মানবিকতা আসবে, সবাইকে গ্রহণ করব ভাইএর মত, সবাইকে ভালবাসব। আজ নয়। আজ আমরা ঘৃণা করতে শিখছি। আজ আমাদের মন্ত্র কেবল মারা। মারতে গিয়ে হয়ত আমরা মরেই যাব ওদের হাতে। তুমি কিছু মনে কোরো না।"

আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম ক্যাসিয়াসের দিকে।

আমার হাত এক মুহূর্তের জন্য জোরে চেপে ধরল ক্যাসিয়াস। তারপর যে পথে আমার পিছু নিয়েছিল সে পথে লম্বা লম্বা পা ফেলে কয়েক মিনিটের মধ্যে চোখের বাইরে চলে গেল।

আমাদের দেশে ভজন সিং-রা এখনও ক্যাসিয়াস হয় নি, কিন্তু, বাবা, একদিন হবে, যদি-না তোমরা, মানে তোমাদের জেনারেশন, মানে যারা দেশকে শাসন করছ এবং ভজন সিং-দের শোষণ, যদি-না তোমরা দুর্দান্ত ভবিষ্যতের ইংগিত এখনই বুঝতে পার, বুঝতে পেরে ঝড় যাতে না আসে তার ব্যবস্থা কর। করতে পারবে বলে আমার ভরসা নেই, কারণ তোমাদের ভাষণে আমাদের আস্থা নিঃশেষ, তোমাদের কর্মের চেহারা দেখে আমাদের আশা ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর।

আমরা, মানে তোমাদের পুত্ররা, এটুকু মোটামুটি বুঝেছি যে তোমরা শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়েছ। আমাদের বেশির ভাগ তোমাদের বাঁদর-গড়ায় হাত মিলিয়েছি, কম-ভাগ হাত না মিলিয়ে চুপ চাপ বসে আছি, দেখছি কিসে কি হয়, বাঁদর নাচ পঞ্চাশ কোটি মানুষকে কতদিন ভুলিয়ে রাখতে পারে।

এর মধ্যে যে উপলব্ধি আমাকে পীড়া দেয় তা হচ্ছে তোমার পুত্র হয়েও আমি আমার দেশের প্রকৃত বাস্তব থেকে অনেক দূরে রয়ে গেলাম, এক আলাদা কাঁচঘর ছোট দুনিয়ায়। ভজন সিং আর আমি : আমাদের মধ্যে সেতুবন্ধের পথ নেই। আমরা দুজন দুজনকে চিনি না। আজকের অপরিচিত আমরা আগামী দিনের পারস্পরিক দুষমন।

সোমার সঙ্গে আমার অনেক ভালবাসা চিরস্থায়ী 'একটু' ভালবাসায় পরিণত হল ওর বিয়ের পর।

পৃথিবীর মানুষের জীবনে যে-সব অলিখিত নিয়মে প্রতিদিন অনেক কিছু ঘটে থাকে, সে নিয়মেই সোমার একদিন বিয়ে হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে আমার আরও ক'টি বান্ধবী হয়েছিল। তাদের সবাইকে তুমি চেন, বাবা, কারণ কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় মামুলি পর্দার ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার অদম্য আকাঙ্ক্ষা হত তাকে তোমার কাছে নিয়ে আসতে। হয়ত-দেখতে

চাইতাম তুমি আমার বান্ধবীকে অনুমোদনের চোখে দেখছ কি না, তোমার অনুমোদন না পেলে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করাটাও আমার পক্ষে কঠিন হ'য়ে এসেছে। তোমার আমার দুস্তর ব্যবধানের ওপর যে শক্ত সেতু আমরা দুজনেই সমান প্রচেষ্টায় গ'ড়ে তুলেছি তার এর চেয়ে নিঃসন্দেহ প্রমাণ আর কি হ'তে পারে ?

আজ জবানবন্দী লিখতে গিয়ে কয়েকটি মেয়ের এবং মহিলার কথা মনে পড়ছে, বাবা। আমার স্মৃতির ফিল্মগুলিতে এদের ছবি এখনও টাটকা। এদের কেউ কেউ যৌবনের তপ্ত দিনেই হারিয়ে গেছে, কাউকে কাউকে পরিণত যৌবন পর্যন্ত আমি দেখে এসেছি। আজ অনেক কিছু অভিজ্ঞতা-অভিজ্ঞান নিয়ে যে আমি, তার মধ্যে এরাও আছে, এরা না থাকলে আজকের আমি অন্য-আমি হ'য়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না।

যে ক'টি খণ্ড কাহিনীর মন্তাজ চোখের ওপর ভাসছে, তার একটা মুখবন্ধ যদি আমাকে লিখতে হয় তাহলে বলব: আমি জোনাকি মানে জুনি মানে জুনুকে আবিষ্কার করার আগে কেবল সেরকম মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি যারা হয় আমার চেয়ে বয়সে বড়, না হয় তো তাদের একটা-না-একটা প্রচ্ছন্ন মানসিক সমস্যা তীক্ষ্ণভাবে বর্তমান অর্থাৎ আমার ইমোশনাল মন এমন কোনও মেয়ে দ্বারা আকৃষ্ট হয় নি যার মধ্যে কোনও না কোনও প্রব্লেম আছে। আজ মনোবিকলন শাস্ত্র পাঠ ক'রে আমি আমার যৌন-মানসিকতার একটা আধা-বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারি: 'আধা' বলছি এ-জন্যে যে মানুষের মনের অনেকখানি এখনও মনস্তত্ত্ববিদদেরও অজানা, এবং আমি মনস্তত্ত্ববিদ নই। আমার সেক্সুয়্যালিটির মধ্যে প্রবল আত্মপীড়নের আকাঙ্ক্ষা থেকে গেছে। যে-প্রেম সহজে লভ্য, যার মধ্যে আছে কুসুমের সৌরভ এবং চাঁদের আলো, অথবা যা নক্ষত্রের আলোকে স্নিগ্ধায়িত সুবাস অন্ধকার, তা কখনও আমাকে আকর্ষণ ক'রে নি।

সোমাকে দিয়ে যে আত্মপীড়িত প্রেমাভিজ্ঞার সুরু, সুসান ফোর্ড-এ তার দুর্দম্য পরিণতি।

তারপর জোনাকির জ্যোৎস্নায় আবগাহন।

আমাদের জীবন তো কখনই একক-ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত নয়, এক সঙ্গে অনেক ঘটনা, অনেক অভিজ্ঞতা ঘটে আমাদের জীবনে, তারা একে অন্যকে প্রভাবিত করে, অথচ অনেক সময় মনে হয় এক একটি ঘটনার বিকশিত দাপটে পড়ে গেছি আমরা, যার কাছে অন্য সব ঘটনা তুচ্ছ, ম্লান, গৌণ। কাউকে ভালবাসলে মনে হয় সে-ভালবাসাটাই একক ও প্রধান অভিজ্ঞতা, তারই সঙ্গে যুগপৎ যে আরও অনেক কিছু ঘটছে জীবনে তাদের তাপ বড় একটা লাগে না। সন্তান শোকের আঘাতে আহত

যে জননী স্বামীর প্রেম পর্যন্ত তার কাছে মিথ্যে মনে হয়। তার মানে, আমাদের মন, যা দেহের স্নায়ু-সিস্টেমের রহস্যময় সৃষ্টি, একটি অত্যন্ত জটিল ও সীমাবদ্ধ ব্যাপার, অনেক কিছু একসঙ্গে গ্রহণ করা তার সাধ্যের বাইরে, অথচ কোনও কিছুই সে ফেলতে পারে না, তার ব্যবহার, অতএব, অনেকটা সেই শিশুর মত যে অনেক রকম খেলনা হাতের কাছে পেলে যেটা মুহূর্তের জন্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় তাকে আঁকড়ে ধরে অথচ অন্যগুলির একটার প্রতিও উদাসীন নয়, কোনওটাই সে ছাড়তে রাজী নয়, যদিও একসঙ্গে একটার বেশি উপভোগ করবার ক্ষমতা তার নেই।

কিন্তু আমরা যখন অনেক ঘটনা-অভিজ্ঞতা পেরিয়ে কোনও এক নিঃসঙ্গ উপত্যকায় উপনীত, তখন অতীতের দিগন্ত অবধি তাকিয়ে দেখলে কি বিরাট এক ল্যাণ্ডস্কেপ দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে না? অপটু শিল্পীর আঁকা, যাতে গ্রাম আর শহর, পাহাড় ও সমতলভূমি, শ্যামল সবুজ এবং ধূসর মরু, মানুষ মানুষ মানুষ এবং মানুষ, ভাল মন্দ, ন্যায়অন্যায় একাকার হ'য়ে গেছে? সমকালীন শিল্পীরা এ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি আঁকে তা প্রধানত এজন্যেই: যে বস্তু এবং অভিজ্ঞতার ফটোগ্রাফিক রূপ তার প্রকৃত অর্থ বহন করতে অক্ষম, এবং শিল্পী নিজেই জানে না কোন ঘটনা, কোন অভিজ্ঞতার, কোন অভিজ্ঞানের প্রকৃত অর্থ কি? সমকালীন সাহিত্যও কি অন্তত কিছুটা এবং অনেকখানি নিজের মধ্যে লুকোন, পোপ, ড্রাইডেন, ডুক্কো নিয়ে আলোচনায় যদিও উপযুক্ত পরিমাণে মুখর, নিজের সম্বন্ধে সাধারণত নির্বাক। মধ্য-চল্লিশের দেহে ভাঙন লেগেছে অনেক-দিন, এবং সন্তোষ ভাটিয়া সুন্দরী ছিলেন না ভরা যৌবনেও, মাথার স্বল্প চুল অর্ধেকের বেশি শাদা, চোখ দুটি ছোট, যদিও তীক্ষ্ণ, নাক হ্রস্ব, দাঁত উঁচু, চোয়াল চওড়া, চিবুক অনুপস্থিত। অধ্যাপনে যশ এবং সার্থকতা অর্জন ক'রেও সন্তোষ ভাটিয়া কোনওদিনই দেহের শ্রীহীনতার লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, নিজের সম্বন্ধে নির্বাকতার এটাই ছিল বোধকরি প্রধান কারণ। আমার সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল বিনা উদ্যোগে, আমার মাষ্টার মশাই বিশ্বনাথ গাঙ্গুলির বাসায়, পোপ সম্বন্ধে কথা উঠতে আমি মন্তব্য করে-ছিলাম, যা সন্তোষ ভাটিয়ার কানে লেগেছিল, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পোপের Essay on Man নিয়ে আলোচনায় উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলাম, আমি বলতে চাইছিলাম পোপের "মানুষ" অনেকাংশে বর্তমান যুগের মানুষ, এবং আবৃত্তি ক'রে উঠেছিলাম:

Pleas'd to the last, he crops the flow'ry food,
And licks the hand just raised to shed his blood.
Oh blindness to the future! kindly giv'n,
That each may feel the circle mark'd by Heav'n:

Who sees with equal eye, as God of all,
A hero perish, or a sparrow fall.
Atoms or systems. into ruin hurl'd,
And now a bubble burst, and now a world,

সন্তোষ ভাটিয়া আকৃষ্ট হয়েছিলেন, আমাদের আলোচনা জমে উঠেছিল, আমার তখন যত-না জ্ঞান তার চেয়ে উৎসাহ অনেক বেশি এবং অতএব নতুন নতুন যুক্তি উত্থাপনে সংকোচের অভাব, অনায়াসে নতুন থিয়োরী প্রবর্তনে প্রগলভ আগ্রহ; শুনে সন্তোষ ভাটিয়া মৃদু হাস্যে বলেছিলেন, আরও গভীরভাবে চর্চা কর, দেখবে আজ যা বলছ তার অনেকখানি তোমার উৎসাহ প্রসূত, পোপকে অনেক বাড়িয়ে দিচ্ছ তুমি, যদিও একথা সত্যি যে পোপ রোমান্টিক কবিকুলের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তবদর্শী এবং বিদগ্ধ। এ ঘটনার সপ্তাহ না যেতেই যখন একদিন আমি সন্তোষ ভাটিয়ার ফ্ল্যাটে গিয়ে এক সন্ধ্যায় হাজির হলাম, বললাম, গভীর ভাবে পোপ পড়তে সাহায্য চাই, তিনি বিব্রত বোধ করলেও বিশেষ নিরুৎসাহ হ্যাবসট্রাক্ট না হ'য়ে পারে? আমি এখনও রবি ঠাকুরের 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' পড়তে পারি, কেননা তাতে বর্তমান যুগ মানসের সমগ্র-অভিজ্ঞতার কিছুটা অ্যাবস্ট্রাক্শন আছে, কিন্তু শরৎ চাটুজ্যের 'গৃহদাহ' পড়তে পারি নে, যদিও এক সময় পারতাম এবং ভাল লাগত, কারণ মহিম-সুরেশ-অচলার ত্রিভুজ সংকটকে দীর্ঘকালীন এবস্ট্রাকশনে উপনীত করবার ক্ষমতা আয়ত্তে ছিল না গ্রন্থকারের। আমি উপন্যাস লিখি নে কিন্তু ভাল উপন্যাস কি বস্তু তা আমার অজানা নেই: যে গান করে না সে কি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সমঝদার হ'তে পারে না? যারা বলেন উপন্যাসের মৃত্যু হয়েছে, তুমি তো জান অনেক সাহিত্য-সমালোচকদের তাই ধারণা, তাঁরা বর্তমান যুগের উপন্যাসে যুগ মানসের তেমন শিলায়ন দেখতে পান না যা দেখতে পান কবিতায়, অংকন শিল্পে, ভাস্কর্যে, ছায়া ছবিতে এবং সঙ্গীতে। পঞ্চাশ ষাট বছরে পিকাসো যে ভাবে বর্তমান যুগকে রূপ দিতে পেরেছেন তেমন কেন, তার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেন নি কোন ঔপন্যাসিক।

এ আপাত-অবান্তর প্রসঙ্গের উত্থাপনা শুধু এজন্যে যে আমি ঠিক জানি নে কি শৈলী ব্যবহারে আমার অভিজ্ঞানকে বাঞ্ছিত রূপ দিতে পারব। একের পর এক খণ্ড কাহিনীর বর্ণনা দিয়ে যে ধরনের উপন্যাস প্রতিদিন পয়দা হচ্ছে পৃথিবীর প্রতি দেশে তার পাণ্ডুর পুনরাবৃত্তি তো আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য সাম্প্রতিক পুত্র মানসের পরিচয় পৌঁছে দেওয়া সাম্প্রতিক পিতৃমানসের কাছে, যদিও জানি পরিচয় থেকে যাবে অনেকখানি অপরিচিত, দুই মানসের দুরন্ত ব্যবধানের দাপটে। আমাকে,

অতএব, আঁকবার চেষ্টা করতে হবে একটা বহুলাংশে এ্যাবস্ট্রাক্ট ল্যাণ্ডস্কেপ, ঝুঁকি নিতে হবে যে তোমরা পিতারা তার অনেকখানি হয়ত বুঝতে পারবে না, যেমন আমাদের অনেকখানি তোমরা পার না, পারতে চাও না, বুঝতে।

ইংরেজী সাহিত্যের অষ্টাদশ শতাব্দী নিয়ে আমার উৎসাহ যখন সোচ্চার তখন যে চল্লিশ-উত্তর অধ্যাপিকার সঙ্গে আমার খুব জমে উঠল তিনি আমাদের কলেজে পড়াতেন না, সেণ্ট্ সিফেন্স-এ আমাদের সময় না ছিল কো-এডুকেশন (এখনও নেই, সংক্ষিপ্ত একটি এক্সপেরিমেণ্ট একদা হ'য়েছিল) না কোনও অধ্যাপিকা। ইংরেজীর শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল, তিনি ছিলেন আজীবন কুমারী, ইংরেজীতে যাকে বলে স্পিন্‌স্টার, দেখান নি, আমি দেখতে পেয়েও দেখতে পাই নি, এবং তারপর থেকে অনেক সন্ধ্যা আমার কেটেছে সন্তোষ ভাটিয়ার সঙ্গে, তাঁর ছিমছাম ফ্লাটে, যেখানে তিনি একা বাস করতেন একটি পরিচারিকার সাহায্য নিয়ে, তাঁর পড়ার ঘরে হাজার দুই বই, শোবার ঘরে একখানা একজনের খাট, বসবার ঘরে সাধারণ সোফাসেট, পুরান হ'য়ে গিয়ে আপহোলষ্ট্রির রং উঠে গেছে, কোথাও কোথাও ফুটো হ'য়ে দেখা যাচ্ছে কালো তুলো পশুর শুকনো চামড়ার মত; অষ্টাদশ শতকের ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে করতে এমন কোনও বিষয় নেই যা আমি না তুলতাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি, ছাত্রদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা, বিভিন্ন শিক্ষকদের নিয়ে চলতি গুজব, এবং সেক্স; সন্তোষ ভাটিয়া প্রথম প্রথম কথা বলতেন সতর্ক হ'য়ে, প্রায়ই কেবল শুনতেন আর মৃদু হাসতেন, সেক্স সম্বন্ধে আলোচনা উঠলে কান গরম হত, দেখতে পেতাম মুখের রং গভীর হ'য়ে উঠেছে, অস্বস্তি বোধ করছেন। আস্তে আস্তে কিন্তু সন্তোষ ভাটিয়ার বিব্রত সংকোচ কেটে গেল অনেকখানি, আমাকে ক্রমে ক্রমে নিকটে আসবার সম্মতি দিলেন নিঃশব্দে, নিজের কথাও একটু একটু বলতে পারলেন, সেক্স সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের মনোভাব নিয়ে কিছু কিছু উৎসুক প্রশ্নও তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হল; আমি জানতে পারলাম সন্তোষ ভাটিয়া একদা একজনকে ভালবেসেছিলেন, লোকটি ছিল কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ, বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারে উচ্চপদের অধিকারী, তাঁদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছিল, সন্তোষ ভাটিয়া আশা করেছিলেন লোকটি তাঁকে বিবাহ করবে, করল না, বিবাহ করল এক পরমা সুন্দরী কাশ্মিরী যুবতিকে, এবং সন্তোষ ভাটিয়ার সংশয় রইল না তাঁর রূপহীনতার বেড়া ভেঙে তিনি কোনও প্রেমিককে স্বামীতে পরিণত করতে পারবেন না। সেই, অতএব, প্রথম এবং শেষ। তারপর সুদীর্ঘ সময় চলে গেছে অধ্যয়ন, গবেষনা, অধ্যাপনায়। পুরস্কার কম পান নি সন্তোষ ভাটিয়া, এবং, না, তিনি কখনও পুরুষের প্রয়োজন মনে করেন না দৈনন্দিন জীবন-কাটানয়, সেক্স তাঁকে 'বদার' করে নি কোনওদিন, কখনও। আমি অতি স্বাভাবিক

ভাবে প্রশ্ন করেছিলাম, তাঁদের সম্পর্ক শোওয়া-শুইয়িতে পূর্ণত্ব পেয়েছিল কিনা, সন্তোষ ভাটিয়া প্রথমে বিস্মিত অপমানে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, মনে হয়েছিল রাগে বুঝি ফেটে পড়বেন, কঠিন তিরস্কার ক'রে উঠবেন আমার অমার্জনীয় বেয়াদপির, কিছুক্ষণ তাকিয়ে আমার মুখে স্বাভাবিক নির্দোষ জিজ্ঞাসা ছাড়া আর কিছু দেখতে না পেয়ে, অবশেষে, চোখ নামিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, না, তখনকার দিনে যুবক-যুবতির ভাব অতদূর গড়াত না। আমি এই ঐতিহাসিক অসত্য মেনে নিয়েছিলাম, এবং খুশি হ'য়ে সন্তোষ ভাটিয়া স্বাভাবিক নির্দোষ জিজ্ঞাসায় জানতে চেয়েছিলেন আমাদের কালে ছাত্র-ছাত্রীদের বন্ধুত্বে সেক্স এসে গেছে কি না। আমিও বৈজ্ঞানিক বাস্তবপ্রীতিতে জবাব দিয়েছিলাম, দৈনিক সম্পর্ক এসে গেছে নিশ্চয়—আমরা ভাব হলে চুমু খাওয়া বা আদর করাটাকে স্বাভাবিক মনে করি, যদি এবং যখন সুযোগ ঘটে, এবং আমাদের কথাবার্তার মধ্যে সেক্স অপ্রধান নয়, অনেক মেয়েই অনায়াসে বলে বসবে: 'আই ওন্ট্ স্লীপ উইথ এ ম্যান বিফোর ম্যারেজ'। সেক্স নিয়ে কথাবার্তাটা সাধারণত ইংরেজিতে হয়, অবশ্য যারা ইংরেজী বলতে একেবারে অভ্যস্ত নয় তারা কি ভাষা প্রয়োগ করে আমার জানা নেই, আমি তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নই)। আরও বলেছিলাম, ছেলেমেয়েরা বিয়ের আগে শুতে পারে না (অতএব চায় না) প্রধানত দু' কারণে: পুরাতন মধ্যবিত্ত সংস্কারের প্রভাব এবং সুযোগের অভাব; সুযোগ যদি প্রচুর হত, সংস্কারের প্রভাব হত আরও স্তিমিত, অনেকখানি দাপট তার ইতিমধ্যে কেটে গেছে: সন্তোষ ভাটিয়া সংকোচের সঙ্গে আমার নিজের অভিজ্ঞতা জানতে চেয়েছিলেন, পরিষ্কার সত্যভাষণে আমার দ্বিধা হয় নি, এই দিনের ঘণ্টা দুই কথাবার্তায় আমাদের দূরত্ব অনেকখানি স'রে গিয়েছিল, এবং এর পরের সপ্তাহে সন্তোষ ভাটিয়ার ফ্ল্যাটে হাজির হ'য়ে দেখতে পেয়েছিলাম তাঁর শরীর সুস্থ নেই, তিনি আমাকে কিন্তু দেন নি চলে যেতে, ডেকে কাছে বসিয়েছিলেন, 'অসুস্থ হলে একা একা বিশ্রী লাগে, তুমি বরং আমার কাছে এসে বসো', কাছে বসে হালকা কথায় আমি তাঁকে আমোদিত করতে চাওয়ায় তিনি খুশি হয়েছিলেন, জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি কখনও কারুর মাথা টিপে দিয়েছ?', যে-প্রশ্নের উত্তরে আমি তাঁর মাথা, কপাল টিপে দিয়েছিলাম, তিনি আমার পুরুষ হাতের উষ্ণস্পর্শে ধ্বনিত হয়েছিলেন আঃ, বড় ভাল লাগছে,' তারপর আমার হাত তিনি নিজের হাতে নিজের গালে লাগিয়েছিলেন, এবং এক সময়ে অস্পষ্ট ধ্বনিত হ'য়েছিলেন 'বুকে কেমন একটা ব্যথা,' এবং আমার হাত তাঁর বুকে রেখেছিলেন, আমার হাত তাঁর স্তনদুটির করুণ সেবা করেছিল, এবং এক সময় তিনি অন্তিম ধ্বনিত হয়েছিলেন 'কেতু, একটু চেপে ধরবে আমাকে?' এমন কিছু বড় ঘটনা নয় এটা, উপবাসী মধ্যচল্লিশ সন্তোষ

ভাটিয়ার কুমারী দেহের এই ক্ষণিক আকুলতা, তাও শারীরিক সুস্থতার সাময়িক অনুপস্থিতিতে, এবং আমরা ছোটরা বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বড়দের অনেক লুকান ক্ষুধার শ্রীহীন প্রকাশ দেখতে পাই, কি পুরুষের কি নারীর, সন্তোষ ভাটিয়ার সাময়িক অসহায় আকাঙ্ক্ষার মধ্যে শ্রীহীনতা ছিল না, যা ছিল তা করুণ, এবং কমিক, যে সমাজ-সংস্কৃতি অবিবাহিত জীবনকে যৌন-উপবাসে বাধ্য করে তার নিষ্ঠুরতার এক পরিচিত প্রকাশ। এ ঘটনার পরে সন্তোষ ভাটিয়ার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হ'য়েছিল, তার মধ্যে দেহের উত্তাপ ছিল না, মনের উত্তাপ ছিল, সন্তোষ ভাটিয়া অনেক বার বলেছেন, 'তুমি আমার ছেলের বয়সী, যদি আমি মা হ'তাম, কিন্তু তোমার মত বন্ধু আর কেউ নেই আমার', তাঁর সঙ্গে বসে গল্প করবার সময় আমার বুকে চাপা একটা ব্যথা জমে উঠত।

এ-ধরনের অনুভূতি কখনও হয় নি আমার আর একজন অধ্যাপিকাকে নিয়ে, যার সঙ্গেও আমার সম্পর্ক ছিল মামুলি ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্কের চেয়ে গভীর। নীলম কাপাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলটন পড়াতেন, ত্রিশের এ-দিক ও-দিক চেহারা আশ্চর্য সুন্দর, স্বামীর সঙ্গে বনিবনাও না হওয়াতে তাঁদের ডিভোর্স হ'য়ে গিয়েছিল, বাস করতেন, অতএব, একাই, যদিও তাঁর জীবন একেবারেই একা ছিল না, ফ্ল্যাটে রোজ আড্ডা, হৈ-চৈ, অনেক অধ্যাপকরা জমা হ'তেন নীলম কাপাড়িয়ার আকর্ষণে, আকর্ষণ তাঁর প্রখর, কেবল দেহের সৌন্দর্য নয়, আরও অনেক কিছু: নীলম কাপাড়িয়া রান্না ক'রে খাওয়াতে ভালবাসতেন, এবং রান্না খুব একটা বিস্বাদ হ'ত না, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তাঁর উৎসাহ, ফ্ল্যাটে রেডিওগ্রামে অনবরত রেকর্ড বাজত, মিউজিক ছাড়া বেঁচে থাকতে পারতেন না নীলম কাপাড়িয়া, তাঁর জীবনে প্রয়োজন ছিল ধারাবাহিক উত্তেজনার, দল বেঁধে সিনেমা, পিকনিক, নাচগান, খেলা দেখা, রেসকোর্সে গিয়ে ঘোড়া নিয়ে বাজি রাখা, প্রতিদিন কিছু একটা উত্তেজক ঘটনা না হ'লে নীলম কাপাড়িয়ার চলত না; আমিও তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলাম এক উত্তেজক ঘটনার মাধ্যমে, আমাদের ইচ্ছে হল এলিয়টের একটা নাটক অভিনয় করবার, অভিনয়ে নীলম কাপাড়িয়ার উৎসাহ সুবিদিত, অতএব আমরা তিনজন ছাত্রছাত্রী একদিন তাঁর কাছে হাজির, তিনি তিন মিনিট আমাদের বক্তব্য শুনে 'রায়' দিলেন: এলিয়ট নয়, এলিয়ট সেকেলে, বর্তমান যুগের প্রতিধ্বনি পাবে না এলিয়টের নাটকে, তোমরা বরং লরকার "দি হাউস অব বার্নারডা আলবা" করো, এলিয়ট তো সবাই করে, তোমরা নতুন কিছু করো। আমাদের তিনজনের একজনেরও লরকার ঐ নাটকটি পড়া নেই, আমি কেবল "ইরারসা" পড়েছিলাম, অন্য দুজন তাও না, নীলম কাপাড়িয়া নিরুৎসাহ হলেন না, বললেন 'পড়ে নাও, পড়তে কতক্ষণ লাগবে?' এবং তক্ষুনি

নাটকের কাহিনীটি আমাদের কাছে ব্যক্ত করলেন এবং শোনালেন যবনিকার আগে বারনারডার তীক্ষ্ণ-করুণ আদেশ-আক্ষেপ : "Tears when you're alone! We'll drown ourselves in a sea of mourning. She, the youngest daughter of Bernarda Alba, died a virgin. Did you hear me? Silence, Silence, I said, Silence!" তাঁকে চুপ করাতে আমাদের সময় লাগল, আমরা অবশেষে বলতে পারলাম, 'বারনারডা আসবা' পুরুষ-ভূমিকা বর্জিত নাটক, আমাদের পক্ষে উপযুক্ত নয়, মিরাণ্ডা হাউসকে দিয়ে তিনি বরং ওটা অভিনয় করাতে পারেন। শেষ ঠিক হল আমরা এলিয়টই করব, তবে 'মারডার ইন দ' ক্যাথেড্রাল' নয় (যা ছিল আমাদের প্রস্তাব), আমরা অভিনয় করব 'দি ফ্যামিলি রিইউনিয়ন', নীলম কাপাড়িয়া আমাদের ডিরেক্টর হলেন, তাঁর ফ্ল্যাটে প্রায় প্রতিদিন আড্ডা, শেষ পর্যন্ত অভিনয় খুব খারাপ হল না, হ্যারীর ভূমিকায় আমার অভিনয় ছাড়া। কিন্তু খারাপ অভিনয় করেও নীলম কাপাড়িয়ার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা গ'ড়ে উঠল, আমি তাঁর ফ্ল্যাটে সান্ধ্য আড্ডায় মাঝে মাঝে হাজির হ'তে লাগলাম।

নীলম কাপাড়িয়াকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পেরে আমি প্রথম বুঝতে শিখলাম সময়ের ব্যবধানে কি আলাদা জীবন তৈরী হচ্চে আমাদের সমাজে, সমাজের সেটুকু সংক্ষিপ্ত অংশে যা পরিবর্তনের সূর্যালোকের সামনে উন্মুক্ত। সন্তোষ ভাটিয়া আর নীলম কাপাড়িয়ার মধ্যে বয়সের ব্যবধান পনের বেশি নয়, কিন্তু দুজনের জীবনশৈলী কি উগ্রভাবে আলাদা। সন্তোষ ভাটিয়ার রূপ ছিল না বলেই কি জীবন থেকে লোভনীয় যা কিছু তা তিনি তুলে নিতে পারেন নি? নীলম কাপাড়িয়া জাম্মু অঞ্চলের জমিদার বংশের মেয়ে, সুন্দরী এবং মেধাবী, অতএব ছাত্রকাল থেকে পুরুষের দৃষ্টি তাঁর ব্যক্তিত্বকে তীক্ষ্ণ করেছে, প্রগলভতাকে প্রখর। এম.এ. পাশ ক'রে লেকচারারশিপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে হল গুজরাটের মহেন্দ্র কাপাড়িয়ার সঙ্গে, অক্সফোর্ড থেকে ইতিহাসে ডক্টরেট নিয়ে এসেছিল মহেন্দ্র কাপাড়িয়া, বিয়ে টিকল না, সবাই তার জন্যে নীলম কাপাড়িয়াকে দোষ দেয়, একপুরুষে নাকি পরিতৃপ্ত নয় কখনও নীলম কাপাড়িয়া, ডিভোর্স হবার আগেই মহেন্দ্র ফিরে গেলেন ইংলণ্ডে, নীলম সেই থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে যাচ্ছেন, পাঁচ বছরে দুবার ঘুরে এসেছেন আমেরিকা, একবার অস্ট্রেলিয়া। তাঁর জীবনে ঘটনার অভাব নেই, বৈচিত্র্য এবং কোলাহল দৈনন্দিন সহচর। পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে তিনি সিনেমা যান, ডিসকোথেক যান, রেসকোর্সেও তাঁকে দেখা যায় প্রায়ই। নীলম কাপাড়িয়া নাটক করেন, নাচেন, পড়ান, প্রবন্ধ লেখেন, বক্তৃতা করেন। সন্তোষ ভাটিয়ার মত উপবাসী জীবন কাটাতে হয় নি তাঁকে, হবে না, তিনি নন নিজের মধ্যে সংকুচিত, নীলম কাপাড়িয়া প্রকাশিত, উচ্চারিত, উদ্বেলিত।

যদিও আমি মাত্র একটি উনিশ বছরের ছাত্র, হলামই বা বয়সের তুলনায় বড্ড বেশি পাকা, হাব-ভাব পরিপূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক, এবং মোটামুটি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সিরীয়স ছাত্র হিসেবে অধ্যাপক মহলে স্বীকৃত, নীলম কাপাড়িয়ার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার মধ্যে ছাত্র শিক্ষকের উঁচু-নীচু কায়দাকানুন অনুপস্থিত, আমি তাঁর কাছে একটি বাড়ন্তি-উঠতি পুরুষ, আমি জীবনের অনেক কিছু জানি এবং বুঝি, আমি তাঁর প্রশংসক কিন্তু নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকও বটে : কোনও কোনও সন্ধ্যায় যখন নীলম কাপাড়িয়ার উপযুক্ত সহচর অনুপস্থিত, আমরা দুজনে সিনেমা দেখেছি, খেয়েছি রেঁস্তোরায়, ফ্ল্যাটে বসে রেকর্ড শুনেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, উত্তেজিত মতবিরোধ নিয়ে আলোচনা করেছি মিলটন, এলিয়ট, কোলরিজ, আর রবার্ট ব্রাউন ; বাড়ন্তি-উঠতি একটি ছেলের মনে যত রকম কৌতূহল জমে উঠতে পারে তার প্রায় সবটুকুই খোলা ভাষায় বলতে পেরেছি নীলম কাপাড়িয়ার সঙ্গে, খোলা ভাষায় তিনি আমার খোলা প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। 'তোমাকে আমার বেশ লাগে, কেতু', একাধিকবার বলেছেন নীলম কাপাড়িয়া, "তুমি আমার ছোট ভাই এবং বন্ধু, তোমাকে আমি স্নেহ করি এবং ভালবাসি, তোমার কাছে আমি এক সঙ্গে বিস্ময়, শ্রদ্ধা, সন্দেহ, ভয়, লোভ ও ক্রোধের জিনিস, এতগুলি পরস্পরবিরোধী সেনটিমেন্ট কারুর চোখে এক সঙ্গে মিশ্র-বিকাশ পেতে এর আগে আমি দেখি নি, তোমাকে আমার বেশ লাগে।'

আমি বলেছিলাম, 'যে মেয়েটির সঙ্গে আমার প্রথম ভালবাসা, সে আমার চেয়ে তিন বছরের বড়।'

নীলম কাপাড়িয়া সকৌতুক হেসে বলেছিলেন, 'আমি তোমার চেয়ে অন্তত পনের বছরের বড়।'

আমি সভয়ে বলে ফেলেছিলাম, 'আমার কিন্তু মনে হয় না।'

উত্তর দিয়েছিলেন, 'সাহস তোমার একেবারে নেই বলব না। কিন্তু বেয়াদপি করার সাধ্য তোমার নেই। আসলে তুমি ছেলেটি ভদ্র এবং সভ্য। এক কথায়, ভাল ঘরের ছেলে।'

'আপনার সঙ্গে বেয়াদপি করা যায় না।'

'কারুর সঙ্গেই কোনওদিন বেয়াদপি করতে পারবে না।'

তারপর, একটু পরে, 'তোমার মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে আমাকে?'

"কেন?"

"তুমি আসলে মাতৃপ্রেমিক। ইডিপাস কমপ্লেক্স। যে মেয়ের মধ্যে মাকে দেখতে পাও না সে তোমাকে আকর্ষণ করে না।"

"আমার বাবাও তাই বলেন।"

"তোমার মা নিশ্চয় খুব প্রাণবন্ত মহিলা। তাঁর ভালবাসা নিশ্চয় একসঙ্গে ভীষণ গভীর ব্যাপক, এবং খানিকটা অনিকট।"

"মা আমার কাছে অফুরন্ত রহস্য।"

"কিন্তু, কেতুবাবু, বান্ধবীদের মধ্যে মাকে খুঁজতে যাওয়ার মধ্যে বিপদ আছে।"

"কিসের বিপদ?"

"প্রথম যৌবনে দেখবে বয়সে বড় না হ'লে মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'তে চাইবে না। পরবর্তীকালে ইডিপাস কমপ্লেক্স কেটে গেলে অন্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।"

"অন্তত এটুকু ঠিক যে বয়সে ছোট, এমনকি সমবয়সী, মেয়েদের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব হয় না। মনে হয় ওরা বড্ড কাঁচা, কথা বলবার লেভেল খুঁজে পাই নে।"

যেদিন সন্ধ্যায় এ কথাগুলি হচ্ছিল আমাদের মধ্যে, নীলম কাপাড়িয় শালকা অরেঞ্জ রংএর শিফন শাড়ি পরেছিলেন, তার গায়ে বড় বড় পাতলা সবুজ পাতা, তাঁর দেহ থেকে মৃদু সৌরভ আসছিল, তাঁকে বিশেষ সুন্দর দেখাচ্ছিল। কথার মধ্যে আমি তাঁর সুডোল ডিম্বাকৃতি মুখে বড় বড় নিবিড় কালো চোখে, ঝকঝক দাঁতগুলিতে পাতলা ওষ্ঠাধরে ও ত্রিকোণ চিবুকে, অনেকখানি অনাবৃত মসৃণ কাঁধে একটি সুন্দর ব্যঞ্জনাময় ব্যক্তিত্ব দেখতে পেয়েছিলাম, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাণবন্ততা, বেঁচে-থেকে-সুখ. নীলম কাপাড়িয়াকে কোনওদিন বেদনাক্লিষ্ট, ভেঙে-পড়া, সিঁটকে মুখ দেখিনি, কিন্তু সেদিন তিনি অচরাচরের চেয়ে বেশি প্রতিভাত, এক পশলা বৃষ্টির পর সূর্যের আলোর মত; রেডিয়োগ্রামে ওয়াগনার বাজছিল, আমি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তখন সামান্যই বুঝি, বিশেষত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের, তথাপি এটুকু বুঝতে পারছিলাম, নীলম কাপাড়িয়ার অন্তরে ওয়াগনারের সঙ্গীত লহরের ওপর লহর তুলছিল আনন্দের, তিনি সুস্থির হ'য়ে বসতে পারছিলেন না, বার বার উঠে এটা-ওটা করবার অছিলায় নিজেকে সামলে নিচ্ছিলেন, একটু বেশি যেন হাসছিলেন নীলম কাপাড়িয়া, হাসতে হাসতে চোখে জল এসে যাচ্ছিল, গানের গলা না থাকলেও মাঝে মাঝে গান গুঞ্জরিত হচ্ছিল তাঁর কণ্ঠে। এক সময় আমার পাশে সোফার বাহুতে বসে বলে উঠেছিলেন নীলম কাপাড়িয়া "কেতু, তুমি কখনও বিরাট আনন্দ আর ভীষণ দুঃখ অনুভব করেছ?"

আমি বলেছিলাম, না, করিনি।

"কোনও বিরাট আনন্দ আসেনি তোমার জীবনে?"

"বিরাট মানে কি তাই তো জানি নে।"

"অথবা ভীষণ কোনও দুঃখ?"

"আপনি যার কথা বলছেন মনে হচ্ছে তা ঘটে নি আমার জীবনে।"

"আমি কিসের কথা বলছি ?"

"আপনাকে দেখে মনে হচ্চে দারুণ কিছু একটা ঘটেছে আপনার জীবনে।"

"কি ক'রে বুঝলে ?"

"আপনাকে ভীষণ অস্থির মনে হচ্চে আজকে।"

"তুমি ঠিক ধরেছ, কেতু।" বলতে বলতে আরও অস্থির হ'য়ে উঠলেন নীলম কাপাড়িয়া। "আমি আমাকে সামলাতে পারছি না। মনে হচ্চে সমস্ত পৃথিবী আর আমি একসঙ্গে ফেটে পড়ব, চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যাব এক বিরাট বিস্ফোরণে।"

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "আপনার শরীর সুস্থ আছে তো ?"

"না, আমি সুস্থ নই। গায়ে হাত দিয়ে দেখ, আমার জর হয়েছে। দেখ।"

আমি নীলম কাপাড়িয়ার বাহুতে হাত রেখে দেখলাম, বেশ একটু গরম। তিনি আমার হাত টেনে গলায়, কপালে ছোঁওয়ালেন।

"জর হয়নি আমার ?"

"গা তো একটু গরম লাগছে।"

"এমন অবস্থায় পড়লে জর না হ'য়ে যায় ?"

"আমি জানতাম না খুব আনন্দে বা দুঃখে জর হয়।"

"তুমি তো বাচ্চা ছেলে, জীবনের কতটুকু জান এখনও ?"

"আপনি বরং শুয়ে পড়ুন। ডাক্তার ডেকে দেব কি ?"

হেসে উঠলেন নীলম কাপাড়িয়া।

"শোবার সাধ নেই আমার। তুমি জানো স্লিপিং পিল না খেলে আমার ঘুম হয় না! জেগে থাকতে খুব ভাল লাগে আমার। যতক্ষণ জেগে আছি, বেঁচে আছি, অনুভব করতে পারছি, ইন্দ্রিয়গুলি ভোগ করছে, পৃথিবী কি কঠিন-সুন্দর, জীবন কি কৃপণ-উদার। ঘুমকে আমি ভয় পাই। একান্ত না হলেই নয়, তাই পিল খেয়ে ঘুমুতে হয় আমাকে। আজকের যে জর দেখছ, তার কারণ তো সর্দি বা পেট খারাপ নয়, আমার জর হয়েছে কারণ আমি উত্তেজিত, খুব বড় একটা কিছু ঘটেছে আমার জীবনে, আমি একটু পরেই বেরুবো, কেতু ; তোমাকে এবার উঠতে হবে।"

আমার কেমন একটা শংকা হল নীলম কাপাড়িয়ার জন্যে।

বললাম, "আমি যাচ্ছি। কিন্তু আপনি জর নিয়ে বেরুবেন ?"

"ভাবনা হচ্চে আমার জন্যে, কেতু ? কোনও কারণ নেই। যার সঙ্গে বেরুবো, সে আমার জরের জনক। তুমি নিশ্চিন্তে হস্টেলে যেতে পার।"

আমি চলে যাচ্ছি, তখন নীলম কাপাড়িয়া বললেন, "তোমার সংযম আমার ভাল লাগে।"

"সংযম ?"

"তুমি তো জানতে চাইলে না কার সঙ্গে বেরুচ্ছি ?"

"অন্যের ব্যাপার থেকে স'রে থাকবার অভ্যেস আমার আছে।"

"তাকেই সংযম বলছিলাম। তুমি তাকে চেন। এখানেই কয়েকবার দেখেছ।"

"এখানে তো অনেককেই অনেকবার দেখেছি।"

"অনেকের সঙ্গে তার তুলনা ?"

"আমি আসছি আজ। কাল খবর নেব আপনার।"

"কাল তো আমি থাকব না এখানে ?"

"কোথায় যাবেন ?"

"বোম্বে। বাবার কাছে। আমার একটা বাবা আছে। বুড়ো হয়েছে। আমাকে খুব ভালবাসে।"

"মা নেই ?"

"মা নেই। অনেকদিন। সতের বছর হবে।"

"কবে ফিরবেন ?"

"দেখি কবে ফিরি। নাও ফিরতে পারি।"

হেসে বললেন নীলম কাপাড়িয়া। বুঝতে পারলাম পরিহাস করছেন।

"বিশ্ববিদ্যালয় তো খোলা।"

"তারজন্যে আমার জীবন তো বন্ধ নয়। সবচেয়ে বেশি খোলা আমার জীবন।"

"ক'দিনের জন্যে যাচ্ছেন ?"

"তিন দিনের জন্যে না চিরদিনের জন্যে তা নিজেই যে জানি নে।"

"আপনি হেঁয়ালি করছেন। জ্বরটা আশা করি কাল আর থাকবে না।"

"সেরে গেলে নিশ্চয় থাকবে না।"

আবার হেসে উঠলেন নীলম কাপাড়িয়া। ঢেউএর পর ঢেউ খেলান হাসি। আমি দরজা খুলতে, পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমার হাত ধরলেন।

"গুড বাই, কেতু। তুমি আমার সবচেয়ে তরুণ বন্ধু। অনেকদিন ভুলে গেছি তুমি আমার ছাত্র।"

আমি তাকিয়ে রইলাম নীলম কাপাড়িয়ার মুখে।

"তোমার দিদি আছে ?"

"না। একটি ছোট বোন আছে।"

"তোমার যদি দিদি থাকত, তুমি খুব ভাল ছোট-ভাই হতে।"

"কেন ?"

"তুমি কিছুটা বোঝ, অনেকখানি বোঝ না। তাই তোমার চোখে জ্ঞান এবং বিস্ময় একসঙ্গে। তুমি বেয়াদপ নও। তোমার বেহায়া ঔৎসুক্য নেই। তোমার প্রাণে সহানুভূতি আছে। তুমি ভালবাসতে চাও। ভালবাসা দাবী করো না।"

"আপনি জানেন না আমার দাবীর দাপট। আমি দারুণ ডিমাণ্ডিং।"

"তোমার নিজের কাছে, না অন্যের কাছে?"

'উভয় ক্ষেত্রেই।"

"তবে তো তুমি চমৎকার ছোট ভাই হ'তে পারতে। আচ্ছা, গুড নাইট। যদি ফিরি আবার দেখা হবে।"

আমি সতর্ক চোখে তাকালাম নীলম কাপাডিয়ার চোখে। তাঁর দুটি চোখ, সারা মুখ, হাসছে। হাসিতে চোখ দুটি ছলছল করছে!

নীলম কাপাড়িয়া আর ফিরে আসেন নি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বোম্বেতে তিনদিন পরে তিনি মরে গিয়েছিলেন।

ঘুমুবার সময় একসঙ্গে বাইশটি স্লিপিং পিল খেয়েছিলেন নীলম কাপাড়িয়া।

যে ঘুমকে তিনি ভয় পেতেন, যতক্ষণ সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখতে চাইতেন, সে ঘুমের মধ্যেই তাঁর জীবন শেষ হ'য়েছিল।

নীলম কাপাড়িয়াকে নিয়ে গুজব এবং কুৎসা এবং মুখরোচক আলোচনার ঝড় উঠেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। নানারকম চমকপ্রদ কাহিনী রচিত হ'য়েছিল তাঁর আত্মহত্যার কারণ বার করবার উদ্দেশ্যে। তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশি রটেছিল তা হল, নীলম কাপাড়িয়া জননী হ'তে যাচ্ছিলেন, এবং যে ব্যক্তির দ্বারা এ কর্ম সাধিত হ'য়েছিল সে তাঁকে বিয়ে করতে রাজী হয় নি, যার প্রধান কারণ সে নিজে বিবাহিত, এবং তিনটি সন্তানের জনক।

বাবা, তোমার মনে থাকবে নীলম কাপাড়িয়াকে নিয়ে তোমাতে আমাতে বেশ কিছু আলোচনা হ'য়েছিল। আমি তোমাকে বার বার বলেছিলাম, "যাই ঘটে থাকুক না কেন নীলম কাপাড়িয়ার জীবনে, তিনি নিজেকে দোষী, অপরাধী মনে করেন নি, পাপবোধ তাঁর ছিল না, তিনি বিরাট আনন্দ ও গভীর দুঃখের একসঙ্গে চাপ সইতে না পেরে ম'রে গেছেন, মরার আগেও নিশ্চয় তাঁর মুখে হাসি ছিল আর চোখে জল, পিলের চাপে ঘুমিয়ে পড়বার আগে নিশ্চয় তাঁর শেষ কথা ছিল, বেঁচে থাকা যেমন আনন্দের, ম'রে যাওয়াও তেমনি।"

তুমি মন্তব্য করেছিলে, "বড় রোমান্টিক শোনাচ্ছে না কি?"

আমি বলেছিলাম, "উনি বড্ড বেশি রোমান্টিক ছিলেন যে!"

তুমি বলেছিলে, "মহিলার প্রাণপ্রাচুর্য ছিল। অনেক জীবন আছে যা পাত্রের বাইরে উপচে পড়ে। রীতিনীতি নিয়মকানুন সমাজ সংস্কৃতি সবকিছু নিয়ে জীবনের পাত্র। যে-সব জীবন পাত্রে পরিমিত নয় তাদের নিয়েই যত মুস্কিল। তারা যদি বড় কিছু সাব্‌লিমেশনে না পৌঁছতে পারে তাহলে নিজেদের ধারাল জীবন দিয়ে তারা অন্য জীবনকে আঘাত দিতে থাকে, কেটে কুটিকুটি করে। এবং অনেক সময় শেষ পর্যন্ত নিজেকেও।"

তুমি নীলম কাপাড়িয়ার জীবনের ধাঁচটা ঠিকই ধরেছিলে, বাবা। পরে আমি তাঁর ক্রাইসিসটা জানতে পেরেছিলাম। অত্যন্ত গতমাফিক ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন অধ্যাপক ছিলেন,যার সঙ্গে নীলম কাপাড়িয়ার বন্ধুত্ব হ'য়েছিল। অধ্যাপককে আমি দেখেছি নীলম কাপাড়িয়ার ফ্ল্যাটে, অনেকবার; একসঙ্গে ওঁরা দুজনে প্রায়ই সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে যেতেন; একদিন সকাল বেলা একখানা বই ফেরৎ দিতে গিয়ে দেখেছি অধ্যাপক রয়েছেন নীলম কাপাড়িয়ার ঘরে, মনে হয়েছে রাত্রিতেও ছিলেন। অধ্যাপকের স্ত্রীপুত্রকন্যা বর্তমান ছিল, অন্য স্ত্রীলোকে তাঁর আকর্ষণ নিয়ে অনেক গুজব আমরা শুনতে পেতাম। নীলম কাপাড়িয়ার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব শেষপর্যন্ত গভীর পারস্পরিক ভালবাসায় পরিণত হ'য়েছিল। অধ্যাপক নিজের বিবাহ বিচ্ছিন্ন ক'রে নীলম কাপাড়িয়াকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। নীলম কাপাড়িয়া রাজী হন নি। 'আমার এক বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, দ্বিতীয় বিয়েও হয়ত ভেঙ্গে যাবে, শুধু শুধু আর একটি স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করতে আমি রাজী নই', বলেছিলেন নীলম কাপাড়িয়া। এই প্রেম এক সঙ্গে তাঁকে বিরাট আনন্দ ও ভীষণ দুঃখ দিয়েছিল, যার উত্তাল তরঙ্গ তিনি সইতে পারেন না। বেঁচে থাকা এবং মরে যাওয়ার মধ্যে ধারাবাহিক সমতার সন্ধান পেয়েছিলেন নীলম কাপাড়িয়া।

সন্তোষ ভাটিয়া এবং নীলম কাপাড়িয়া আমার বান্ধবী ছিলেন না, বাবা, দুজনেই অধ্যাপিকা, একজন আমার মা'র বয়সী, অন্যজনও বয়সে অনেক বড়, তথাপি আমি তাঁদের অনেক কাছে গিয়ে পৌঁচেছিলাম, যেখানে তাঁরা দুজনেই একান্তভাবে নিজস্ব, সেখানে স্থান হ'য়েছিল আমার। তোমরা অনেক সময় ভাব বড়দের সেক্স এবং ইমোশনাল জীবনে বাড়তি ছোটদের স্থান নেই, তোমরা, আগেই বলেছি, আমাদের দূরে সরিয়ে রাখ তোমাদের 'গহনগোপন' জীবন থেকে। অথচ আমরা তোমাদের অনেক কিছু জানি, জানতে পাই, ধরা দাও তোমরাই। এমন বাড়তি-উঠতি মেয়ে কমই আছে, বাবা, যাদের দেহে প্রাপ্তবয়স্ক প্রৌঢ় পুরুষ আত্মীয়দের সলোভ হাত কখন একেবারে পড়ে নি। কাকা-মামা-পিসে-মেসো-অমুকদা তমুকদারা পারেন না লোভ সামলাতে। আমরা বাড়তি-উঠতি ছেলেরাও অনেক মাসি-পিসি-কাকী-মামী অমুক-তমুক

দিদিদের হাতে অক্ষর পরিচয় লাভ ক'রে থাকি। আমরা বাড়তি-উঠতি ছেলেমেয়েরা, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'তুতো'-ভাইবোনেরা এক আধটু 'নেকিং' ক'রে ধরা পড়লে তোমাদের নীতিবোধের আকাশ ভেঙ্গে পড়ে, আমাদের শাসন শাস্তির কড়া জরিমানা দিতে হয়। কিন্তু তোমরা বড়রা যখন লোভী হাত বাড়াও আমাদের দিকে তখন আমরা একদিকে যেমন বিচিত্র উত্তেজনার আস্বাদে চমৎকৃত হই, অন্যদিকে তোমাদের ন্যাংটো মুখোসহীন পরিচয় পেয়ে হাসি, মজা পাই। আমার জীবনে এ অভিজ্ঞতা ঘটেছে, মিত্ও বাদ যায় নি, আমাদের সমবয়সীদের কাছে জেনেছি তাদের অধিকাংশও সম-অভিজ্ঞতার সামিল হয়েছে, অতএব, ধরা যেতে পারে, আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ জীবনের এ একটা অনুচ্চারিত অঙ্গ, যদিও আগেকার যৌথ পরিবার গেছে ভেঙ্গে, পরিবারগুলি আজকাল অপেক্ষাকৃত ছোট।

সন্তোষ ভাটিয়া ও নীলম কাপাড়িয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এঁদের কেউ লোভী হাত বাড়ান নি আমার দিকে: একজনের বেদনা, অন্যজনের আনন্দ-দুঃখের গোপনায় একটু অংশ, কেবল আমার জুটে গিয়েছিল। তাই আমার ইমোশনাল মানসে এঁরা দুজনেই আজও বিদ্যমান। সন্তোষ ভাটিয়ার দৈন্য ও নীলম কাপাড়িয়ার ঐশ্বর্য: এই দুই অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞানের পরিচয় আমাকে কমনীয় পূর্ণতা দিয়েছিল, যা আমি পরবর্তী জীবনে যুবতি মেয়েদের পেতে দেখেছি বয়সে অনেক বড় পুরুষের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক থেকে।

স্বদেশ সিন্হার কথা মনে পড়ছে। তুমি তাকে কিছুটা চেন।

বাপ বিশ্বেশ্বর প্রসাদ সিন্হা বিরাট ধনী। যদিও বিহারী, দ্বারভাঙ্গার লোক, কলকাতায় বিশাল শিল্পের মালিক হ'য়ে সারাজীবন কাটিয়ে অনেকটা বাঙ্গালী। স্বদেশ তাঁর একমাত্র মেয়ে।

বিশ্বেশ্বর প্রসাদ সিন্হাকে কাজের চাপে সর্বদা ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হয়, তাই স্বদেশ ছোটবেলা থেকে স্কুলের বোর্ডিং হাউসে বড় হয়েছে। পড়েছে দার্জিলিং-এ, দেরাদুনে, শান্তিনিকেতনে। বাবার কাছ থেকে দূরে থেকেছে, এবং ভাইবোনের সঙ্গ পায়নি, এজন্যেই স্বদেশ তার পরিবারের সংস্কৃতি থেকে অনেকটা আলাদা। বাপকে নিবিড় ভাবে ভালবাসে, কিন্তু সে বাপ তার অনেকখানি মন-গড়া, মানুষ যেমন নিজের ইমেজে দেবতা সৃষ্টি করে, স্বদেশও তেমনি নিজের ভাবরসে তার বাবাকে সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিল। তার সে নিজের হাতে গড়া বাবার সঙ্গে শিল্পপতি বিশ্বেশ্বর প্রসাদ সিন্হার পার্থক্য স্বদেশের অজানা ছিল না। তবু প্রথমকে সে আঁকড়ে থাকত, দ্বিতীয়কে বরদাস্ত করত মাত্র।

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় নিউ ইয়র্কে বেশির ভাগ সময় বাস করত স্বদেশ। তখন তার সঙ্গে আমার আলাপ। এবং বন্ধুত্ব।

সপসপে পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি দীর্ঘ স্বদেশ সিন্‌হার দৈহিক সৌন্দর্য নেই প্রচুর, দেহে মাংসের অভাব, রং ময়লা, কপাল ছোট, নাক একটু থাঁদা, ঠোঁট মোটা ধরনের, কিন্তু মুখে আদিম সারল্য ও প্রখর বুদ্ধির এমন এক সংমিশ্রণ যে অনেকের মধ্যেও তার উপস্থিতি উপেক্ষা করা কারুর পক্ষে সম্ভব হত না। স্বদেশকে দেখলে মনে হত, এ মেয়েটি সুন্দর নয়, কিন্তু এর চেয়ে আকর্ষণীয় মেয়ে সহজে চোখে পড়ে না।

তার ওপর সবাই জানত স্বদেশ সিন্‌হা কার মেয়ে। তার পেছনে কত ধনদৌলত, কত ঐশ্বর্য, মান, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি।

জানত না, জানলেও মানতে রাজী নয় শুধু একজন।

তার নাম স্বদেশ সিন্‌হা।

কখনও সে বাবার পরিচয় দিত না। কেউ যদি বাবার উদ্দেশ্য নিয়ে তার পরিচয় দিত, স্বদেশ রেগে যেত।

ফেলোশিপের টাকার বাইরে এক ডলারও খরচ করত না স্বদেশ। সময় পেলেই রোজগার করত। দেখা যেত কাজ করছে লাইব্রেরীতে, মেয়েদের ডর্মে, বইএর দোকানে, এমন কি রেঁস্তোরায়। টাকা জমাচ্ছে আমেরিকা ঘুরে দেখবে বলে, য়ুরোপে যাবার উদ্দেশ্যে। সাজত না কখনও। পোষাক-আষাকে বিলাসিতার নামগন্ধ নেই। শুধু একটিমাত্র বিলাসিতা ছিল স্বদেশের: নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতে ভালবাসত। সপ্তাহে অন্তত এক রাত্রি তার ঘরে কিছু লোক খেতই।

বন্ধুবান্ধব বাছাইএর কায়দাটাও ছিল অসাধারণ। শাদা আমেরিকান বন্ধু স্বদেশের খুব কম। তার বন্ধুরা কালো আমেরিকান, লাতিন আমেরিকান, আফ্রিকার নিগ্রো, আরব, জাপানী, কোরিয়ান। এবং কয়েকটি পাকিস্থানী।

ভারতীয় ছেলেমেয়ে মহলে স্বদেশ সিনহাকে নিয়ে একদিকে যেমন উৎসাহ অন্যদিকে তেমনি মন-জ্বালা। দিশী ছেলেরা স্বদেশকে অহংকারী ভাবত; সে কারুর সঙ্গে বড় একটা মিশতে চায় না, তাকে দেখা যায় নিগ্রো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রাস্তায়, থিয়েটারে; মুখ যদি বা মিষ্টি, ভীষণ শ্রেণী-সচেতন স্বদেশ সিন্‌হা, এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না কার মেয়ে সে, কে তার বাপ।

আমার সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হ'য়েছিল লিনকন সেণ্টারে। ইনগার বার্গমানের 'দি টাচ' ছবি দেখতে গিয়েছিলাম, সঙ্গে ছিল জুলিয়াস মিলটন আর ডায়ানা। জুলিয়াস কালো, ডায়ানা শাদা আমেরিকান। জুলিয়াসকে হটাৎ দেখলে মনে হয় আফ্রিকার কোনও যূথপতির ছেলে, দীর্ঘ ছ'ফিট চেহারা, চওড়া মজবুত মুখ, প্রশস্ত কপালে মোটা

মোটা শিরা ফুটে বেরিয়েছে, কিংকি কালো চুল মাথার ওপরে ধরেছে রাজছত্র। ছবি শেষ হলে লিনকন সেন্টারের ফোয়ারার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা আইসক্রীম খাচ্ছি, এমন সময় স্বদেশ সিনহাও এসে দাঁড়াল, তারও সঙ্গে একটি নিগ্রো ছেলে, একটি নিগ্রো মেয়ে এবং এক জাপানী মহিলা।

জুলিয়াস নিগ্রো ছেলেটিকে দেখে এগিয়ে গেল। দুজনে পরিচিত। আমরাও একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হলাম।

স্বদেশ এগিয়ে এসে আমাকে বলল, "আমার নাম স্বদেশ সিন্‌হা।"

"কেতু।"

"আপনি বাঙ্গালী ?"

"হ্যাঁ গুপ্ত। আপনাকে তো বিহারী মনে হচ্চে। বাংলা বলেন বুঝি ?"

"হিন্দীর চেয়ে বাংলাই বেশি বলি।"

"বুঝেছি। আপনারা হচ্চেন এমন এক বিহারী পরিবার যারা কয়েকপুরুষ আগে গৌড়দেশে অবতীর্ণ হয়ে গরীব লোকেদের জমিজমা কেড়ে নিয়ে দিব্যি বাঙ্গালী জমিদার হ'য়ে বসেছিলেন। তারপর কালক্রমে বিহারীত্ব ধুয়ে মুছে প্রায়-খাঁটি বাঙ্গালী হ'য়ে গেছেন।"

স্বদেশ হেসে বলেছিল, "অমনি কিছু একটা হবে। পিতৃপুরুষের ইতিহাসে আমার খুব একটা উৎসাহ নেই।"

"আমারও নেই। আমার পিতৃপুরুষ মানে পিতা। দুর্ভাগ্যবশতঃ তার সঙ্গে আমার বিশেষ সদ্ভাব।"

স্বদেশ হেসে প্রশ্ন করল, "দুর্ভাগ্য কেন ?"

"আউট্ অব স্টাইল। যে দেশে প্রবাস করছি সেখানে সন্তানরা বাপ-মা'র সঙ্গে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত। অথচ আমি কেমন সুন্দর সদ্ভাব রেখে চলেছি আমার বাবা-মা'র সঙ্গে।"

"এজন্যে কৃতিত্ব কার ? আপনার, না ওঁদের ?"

"নিঃসন্দেহে আমার।"

আমরা তখন ঠিক করেছি কোনও রেঁস্তোরায় ব'সে কফি পান করবো। জুলিয়াস বলল, ভিলেজে যাওয়া যাক। একদল কালো ছেলেমেয়ে একটা ঘরোয়া নাটক করছে। ব্ল্যাক পাওয়ার নিয়ে নাটক। তাতে দুটো 'ন্যুড' দৃশ্য আছে। শাদাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আঙ্গিক হিসেবে ন্যাংটো দৃশ্যের ব্যবহার। জুলিয়াস আর ডায়ানা একবার দেখেছে নাটকটি, ওদের প্রশংসা শুনে আমরাও উৎসাহিত হলাম। শুধু জাপানী মহিলা একটু ইতস্তত করতে লাগলেন।

স্বদেশ তাঁকে বলল, "আপনি একা ফিরতে পারবেন না মনে হচ্ছে। আমি আসছি আপনার সঙ্গে।"

মহিলা বিব্রত হ'য়ে বললেন, তাঁর পক্ষে একা ফেরা মোটেই কঠিন হবে না, বরং স্বদেশ যদি তাঁর জন্যে এখুনি ফিরতে বাধ্য হয় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হবেন।

স্বদেশ তাঁকে চাবি দিয়ে বলল, "আমার বেডরুমে আপনি শোবেন। আমি লিভিং রুমে শোবো। আমার খুব দেরী হবে না। দ্বিতীয় চাবি আছে আমার কাছে। আপনি শুয়ে পড়ুন গিয়ে, কাল সকালে বেরুতে হবে আপনাকে।

আমরা সাবওয়ের দিকে এগোলাম। স্বদেশ রইল জাপানী মহিলার সঙ্গে। আমরা যাবো ডাউন-টাউন, মহিলা আপ টাউন; স্বদেশ আমাদের একটু দাঁড়াতে বলে মহিলাকে ডাউন-টাউন সাবওয়ের মুখে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এল। আমাদের এবার বলল, "উনি মাত্র গতকাল নিউ ইয়র্কে পৌঁচেছেন। শহরটাকে চেনেন না।"

ডায়ানা প্রশ্ন করল, "জাপান থেকে এসেছেন?"

"খোদ নাগাসাকি থেকে।"

আমরা চুপ ক'রে রইলে, স্বদেশ বলল, "১৯৪৫ সালের এটম বোমায় এঁর স্বামী মারা যান, দুটি ছেলে একটি মেয়ের শরীর পুড়ে যায়, বছর খানেক ভুগে তাদেরও মৃত্যু ঘটে। মহিলা নিজেও র‍্যাডিএশনে আক্রান্ত হ'য়ে পাঁচ বছর ভুগেছেন।"

জুলিয়াস ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠল, "উনি মার্কিন স্বর্গে এসেছেন কেন?"

স্বদেশ বলল, "হার্ভার্ডে লিনাস প'লিংএর সঙ্গে ওঁর কাজ আছে। জাপানকে আণবিক শক্তিতে পরিণত করা একদল আমেরিকানের বিশেষ অভিপ্রায়। এই মহিলা জাপানে আণবিক বোমার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন অনেকদিন চলেছে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সে বিষয়েই এদেশে এসেছেন।"

ডায়ানা বলল, "দেখ, আমরা হয়ত ভীয়েৎনামে আণবিক বোমা নিক্ষেপ ক'রে বসব।"

স্বদেশের সঙ্গে যে কালো ছেলেটি ছিল তার নাম ম্যাক্সমিলিয়ান। তার কালো বান্ধবীর নাম হার্মিস। ম্যাক্স বলল, "জনসনকে বিশ্বাস নেই। মরীয়া হ'য়ে যা কিছু ক'রে বসতে পারে।"

হার্মিস বলল, "এটম বোমা নিয়েও ভীয়েৎনাম যুদ্ধ জয় করা যাবে না। মাও সে-তুং বলেছেন, এটম বোমা শহর নগর বিধ্বস্ত করতে পারে, যে মানুষ জেগে উঠেছে তার আত্মাকে হারাতে পারে না।"

আমি স্বদেশকে চুপি চুপি প্রশ্ন করলাম, "জাপানী মহিলার সঙ্গে আপনার সংযোগ হল কি ক'রে জানতে পারি কি?"

স্বদেশ বলল, "গত বছর নাগাসাকিতে বাৎসরিক এ্যাটমবোমা প্রতিরোধী সম্মেলন দেখতে গিয়েছিলাম। তখন পরিচয় হ'য়েছিল।"

সাবওয়েতে স্বদেশ জুলিয়াস আর ডায়ানার সঙ্গে বসল। আমি বসলাম ম্যাক্স ও হার্মিসের সঙ্গে। ওদের কথাবার্তা আমার কাছে আকর্ষণীয় লাগল না। ম্যাক্স ভীষণ উগ্রপন্থী। 'ব্ল্যাক পাওয়ার' বলতে বোঝে সহিংস আক্রমণ। হার্মিস কথায় কথায় মাও সে-তুং, ফিদেল কাস্ত্রো, হো চি মিন, চেগুয়েভারা আর গিয়াপ 'কোট' করে। আমার একটু পরেই বিরক্ত লাগল। আমি অন্যদিকে চোখ ও মন ফেরালাম। সাবওয়েতে বিচিত্র মানুষের ওঠানামা, ষ্টেশনে ষ্টেশনে। তাদের দেখেই সময় কেটে যায়। নিরাসক্ত লাগে না।

ভিলেজে পৌঁছে আমাদের নিরাশ হ'তে হল। নাটকটা বন্ধ হ'য়ে গেছে। গত রাত্রে পুলিশ এসে ধ'রে নিয়ে গেছে কয়েকজনকে, যাদের মধ্যে প্রযোজক, ডিরেক্টর এবং ন্যাংটো অভিনয়-অপরাধে অপরাধী দুটি ছেলেমেয়েকে। অশ্লীল নাটক অভিনয় অপরাধে।

আমরা গিয়ে একটা ডিসকোথেকে বসলাম। সাইকাডালিক আলোয় বেসমেণ্ট ঘরটা নানারং ঝলমল। একদল লোক রক মিউজিক বাজাচ্ছে। অনেকে নাচছে। আমরা কফির অর্ডার দিলাম।

কয়েক মিনিটের মধ্যে জুলিয়াস আর ম্যাক্সের তর্ক লেগে গেল। ডায়না জুলিয়াসের সঙ্গে, হার্মিস ম্যাক্সের। ম্যাক্স গলা চড়িয়ে টেবিলে হাত চাপড়ে বলতে লাগল, অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে না নামলে আমেরিকান নিগ্রোদের মুক্তি নেই। যে মুক্তি লড়াই-এর মাধ্যমে আসে না, আসে শত্রুর করুণা হ'য়ে, তা মুক্তি নয়, তা দাসত্বের রকমফের। ম্যাক্সের সপক্ষে হার্মিস মাও-হো ফিদেল গিয়াপ থেকে 'কোটেশন' আবৃত্তি ক'রে চলল। জুলিয়াসের বক্তব্য হল: বিপ্লব সস্তা জিনিষ নয়, প্রত্যেক দেশ ও সমাজ তার বিপ্লবের পথ নির্দেশ করে; যা চীন, কিউবা কিম্বা ভীয়েৎনামে সম্ভব হয়েছে তা আমেরিকায় সম্ভব হবে না কারণ আমেরিকা অন্য দেশ, তার সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজ, ইতিহাস সব কিছু আলাদা; আমেরিকার বিপ্লবকে নিজস্ব পথ খুঁজে বার করতে হবে। নিগ্রোরা অস্ত্র নিয়ে 'যুদ্ধে' নামলে শত্রুর হাতে কচুকাটা পড়বে, শত্রু সহজে সে যুদ্ধে জয়ী হবে। আর যুদ্ধে নিগ্রোরা যদি মরেই গেল তাহলে বিপ্লব ক'রে কি লাভ? বিপ্লব মানে ম'রে ভূত হ'য়ে যাওয়া নয়, নতুন ক'রে বাঁচা।

দুজনের বক্তব্যের সারমর্ম এক হ'লেও তর্কের পর্দা ক্রমাগত চড়ছিল, স্বদেশ এবং আমি তর্কের তপ্ত সীমানার বাইরে স'রে এসেছিলাম।

আমি স্বদেশকে বলেছিলাম, "আপনার কালো বন্ধুটির উৎসাহ যত বেশি বুদ্ধি তত প্রখর নয়।"

স্বদেশ হেসে সায় দিয়েছিল, "জানি। মেয়েটিকে কেমন লাগছে ?"

"মনে হচ্ছে গুটি পাঁচেক 'লিটল রেড বুক' মুখস্ত করে বসে আছে।"

স্বদেশ জোরে হেসে উঠল। "আপনার বন্ধুটির কিন্তু ব্যক্তিত্ব আছে।'

আমি বললাম, "তাতেই তো মুস্কিল। ও ভাবে যা কিছু বলছে তা নির্গত হচ্ছে এক বিরাট দায়িত্বপূর্ণ পুরুষের শ্রীমুখ হ'তে। যেন আন্দোলন ও সংগ্রামের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে ওর প্রতিটি প্রবচনের ওপর।"

"আর ওর বান্ধবীটির ?"

"একটি ম্যাটমেটে শাদা মেয়ে যে কালোদের ওপর শাদাদের দুশো বছরের অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত করতে বদ্ধ পরিকর, এবং যার বিশ্বাস প্রায়শ্চিত্তের বর্ত্তমান পথ হল এক একটি কৃষ্ণকায় পুরুষকে গুরু ব'লে গ্রহণ করা এবং তার সঙ্গে বিছানায় শোওয়া।"

স্বদেশ আরও জোরে হাসল। "আপনি সিনিকের মত বলছেন বটে, কিন্তু আসলে আপনি সিনিক নন।"

"আমার আসল পরিচয় পেতে সময় লাগবে। এখনও আপনি নকল পরিচয়ই পান নি বিশেষ।"

"একটু পেয়েছি। আপনার বাবার সঙ্গে খুব সদ্ভাব।"

"কি মনে হচ্ছে ? ওটা আসল না নকল ?"

"অতটা এখনও বুঝতে পারছি নে।"

"আপনার বাবা আছেন ?"

"আছেন !"

"মিত্র না শত্রু ?"

"দুটোই।"

"মা আছেন ?"

"না।"

"ভাই বোন ?"

"আপনি যে অর্থে প্রশ্ন করছেন, না।"

"সুপার্ব ! আপনি তো প্রায় মুক্তাঙ্গন !"

"প্রায়।"

"প্রতি সন্ধ্যায় অভিনয় হ'য়ে থাকে নিশ্চয়।"

"প্রতি সন্ধ্যায় নয়। মাঝে মাঝে।"

"বন্ধুর স্থান এক আধটি খালি আছে কি ?"

"কেন ? আবেদন করবেন ?"

"ভেবে দেখতে পারি।"

"আমিও আপনাকে ঐ ধরনের প্রশ্ন করার কথা ভেবে দেখছিলাম।"

"তাহলে আমার আবেদন এখনই পেশ করা হল।"

স্বদেশ বলল, "মঞ্জুর।"

আমি খুশি হয়ে বললাম, "ধন্যবাদ।"

স্বদেশ ও আমার বন্ধুত্বের সূত্রপাত হল। দুবছরে আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলাম।

স্বদেশকে যত বেশি জানলাম তত আমার বিস্ময় বাড়ল। এ রকম মুক্ত-অঙ্গন মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি। সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত কোনও না কোনও কাজে সর্বদা ব্যস্ত স্বদেশ। কত বিচিত্র মানুষের সঙ্গে ওর জানাচেনা, কাজের, ভাববিনিময়ের সম্পর্ক। কত বিচিত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওর পরিচয়। নিউ ইয়র্কে এমন কোনও অর্থপূর্ণ ঘটনা ঘটে না যা স্বদেশের না-জানা, না-দেখা। কনসার্ট, চিত্র প্রদর্শনী, নতুন ছায়াছবি, নতুন নাটক, নতুন বই :- স্বদেশ সবকিছুর খবর রাখে। এমন কোনও বড় ঘটনা নেই যা থেকে স্বদেশ বাইরে। ভায়েৎনাম শান্তির জন্যে বড় একটা মার্চ হল তো স্বদেশ তার সঙ্গে; মেয়র লিণ্ডসী ফিফ্‌থ এ্যাভিনিউ থেকে মোটরগাড়ী সরিয়ে দিয়ে তাকে পায়ে হেঁটে বেড়াবার রাজপথ ঘোষণা করলেন: হাজার খানেক লোক গাড়ীবিহীন ফিফ্‌থ এ্যাভিনিউ দিয়ে হাঁটল, তাদের মধ্যে স্বদেশ একজন। 'ব্ল্যাক পান্থার' দলের কয়েকটি নেতার বিচার বসল, বিচারালয়ে লোকের ভিড়, তার মধ্যে একজন স্বদেশ। নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্ পত্রিকায় একদা ভারতবর্ষে জন-বুভুক্ষা নিয়ে ছুটো রিপোর্ট ছাপা হল, সঙ্গে কয়েকখানা ছবি, যা আমাদের দৈনন্দিন চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা; সপ্তাহ পরে দেখা গেল স্বদেশ সিন্‌হার একখানা চিঠি, সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায়, নিউ ইয়র্ক শহরে শাদা এবং কালো গরীবেরা কী ক'রে রাস্তার ডাস্টবিন থেকে খাবার কুড়িয়ে খায় তার বর্ণনা, সঙ্গে দুটি ফটো। এবং বর্ণনার শেষে স্বদেশ সিন্‌হারক মন্তব্য: "ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ, প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে দরিদ্রতম; সে দেশে লক্ষ ল লোক উপবাস করবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে বিত্তশীল দেশ। এ দেশের লোকদেরও ডাস্টবিন থেকে খাবার কুড়িয়ে খেতে হয়, এটা কি খুব বিস্ময়কর নয়? ভারতবর্ষে যা হওয়া উচিত ছিল না, এবং হয়েছে, তা হল মুষ্টিমেয় বিত্তবান এবং অগুণতি দরিদ্রের মধ্যে বেড়ে-চলা ব্যবধান। কিছু লোকের প্রাচুর্যের সীমা নেই এবং বহু মানুষের দারিদ্র্য অপরিসীম: এমন একটা কুৎসিৎ সমাজব্যবস্থা ভারতবর্ষে তৈরী হয়েছে কেবল এজন্যে যে আমরা সমাজতন্ত্রের ধোঁকা দিয়ে ধনতন্ত্র তৈরী করেছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আমেরিকাই ভারতের পথ-প্রদর্শক।

ধনী ও দরিদ্রের তারতম্য যে কি ভীষণ কুৎসিৎ হ'তে পারে আমেরিকায় না এলে আমি বুঝতে পারতাম না।"

নিউইয়র্ক টাইম্‌স্‌-এ চিঠি ও ছবি ছাপার দিন সাতেক পরে স্বদেশের এ্যাপার্টমেণ্টে আমার উপস্থিতি।

"তোমার চিঠি নিয়ে তো দারুণ হৈ চৈ প'ড়ে গেছে!"

"তা কিছুটা পড়েছে। অনেকে 'কল' করেছে।"

"ও রকম একটা চিঠির প্রয়োজন ছিল।"

"আমার বাবা কিন্তু তা মনে করেন না।"

"কি ক'রে জানলে?"

স্বদেশ একটা টেলিগ্রাম বার ক'রে দেখাল: "এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে আমেরিকানরা চটতে পারে।"

"বিদেশে আছ," আমি বললাম, "উনি ভয় পাচ্ছেন, পাছে বিপদে পড়ো।"

"আমার বাবা ভয় পান না।"

"তোমার জন্যে দুশ্চিন্তা হয় তো।"

"এ কেব্‌ল্‌টা আমার জন্যে দুশ্চিন্তাপ্রসূত নয়।"

"তা হলে?"

"বাবার সঙ্গে আমেরিকান ক্যাপিটালিজমের গলাগলি বন্ধুত্ব।"

"ধনতন্ত্রবাদ বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংগঠন, তুমি তো জানই।"

"বাবা চটেছেন আমি ধনতন্ত্রবাদকে আক্রমণ করেছি বলে।"

"ঘরের শত্রু বিভীষণ। চটবেন তো বটেই।"

"মার্কস্‌ বলেছেন, ক্যাপিটালিজম নিজেই নিজের দুষমন পয়দা করে।"

"তোমাকে লক্ষ্য ক'রে মার্কস্‌ লেখেন নি এ কথা।"

"তা হোক। একটা কথা বল। আমার গায়ে কি লেখা আছে আমি একজন টাইকুনের মেয়ে?"

"শাড়ি-জামা দিয়ে গা ঢেকে রাখো, এ প্রশ্নের উত্তর দেবার মত ক্যাক্ট আমার কাছে নেই।"

"তুমি বড্ড পাজি হয়ে উঠছ। মনে রেখো আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়।"

"আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় এই পৃথিবী, এবং আকাশ, চাঁদ, সমুদ্র।"

"তো?"

"তবু তাদের প্রেমে আমি ডগমগ, তারা আমার কাছে নিরাবরণ।"

"কথার রাজা।"

"ধন্যবাদ। এই প্রথম তোমার মুখে সুখ্যাতি শোনা গেল।"

"এবার আমার প্রশ্নের জবাব দাও।"

"অন্যের কথা জানিনে। আমার কাছে তুমি কার মেয়ে তার দাম নেই কানা কড়িও। আমি তোমাকেই জানি। ব্যস।"

"মিথ্যে কথা। তুমি খুব ভাল ক'রে জান আমি বিরাট ধনালোকের একমাত্র সন্তান।"

"স্বদেশ, খুব ভুল করছ, সাবধান ক'রে দিচ্ছি।"

"কিসের ভুল।"

"আমি বিবাহের প্রস্তাব তুলছি না, তুলব না কোনও দিন।"

হো-হো ক'রে হেসে উঠল স্বদেশ।

"নিশ্চিন্ত করলে।"

"দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হচ্ছিলে টের পাই নি তো!"

"তোমাকে কি ক'রে 'না' বলব ভাবতে দুঃখ হচ্ছিল।"

"হাঁ বলার সুযোগ কোনওদিন পাবে না এ দুঃখের কাছে সে দুঃখ কিছুই নয়।"

"আর যাই করি বয়সে ছোট কাউকে বিয়ে করব না।"

"আমিও তাই।"

"তবে যে এক্ষুনি বললে।"

"স্বদেশ সিনহা, তুমিই ধরণীতে একমাত্র কন্যা নও যে আমার কিছু আগে আকস্মিক কারণে জন্মলাভ করেছিল।"

"তোমাকেও জানিয়ে রাখছি পৃথিবীতে পিতামহদের অভাব নেই।"

"যাঁরা নাতনি বয়সী কন্যাদের পেছন নিতে সর্বদা তৎপর, কি বলো?"

আমরা দুজনে এক সঙ্গে হেসে উঠলাম, ইতিমধ্যে স্বদেশ টেবিলে খাবার সাজিয়েছিল, ভাত, মুরগীর কারী, বেগুন ভাজা এবং আলু কপির তরকারী, আমরা দুজনে খেতে বসলাম, স্বদেশ কেমন আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে উঠল, ওর সদা খুশি মুখখানাকে আমি প্রথম বিষণ্ণ দেখলাম।

রান্নার প্রশংসা করেও যখন সে বিষণ্ণতা দূর করতে পারলাম না, তখন আমার সত্যি একটু ভয় হল।

বললাম, "যা বলতে চাও না তা জানবার কৌতূহল আমার নেই, তবু জিজ্ঞেস করছি, হটাৎ বিষণ্ণ হ'য়ে উঠলে কেন?"

স্বদেশ বলল, "কৈ? বিষণ্ণ হলাম কোথায়?"

'তার মানে, বলতে চাও না। অতএব আমার জানবার আগ্রহ নেই।"

স্বদেশ মুরগীর ঠ্যাং ভাংতে ভাংতে বলল, "জীবনটা খুব অদ্ভুত, না ?"

আমি আলু কপির তরকারি একরাশ মুখে পু'রে বললাম, "খুব।"

"এই ধরো আমাকে।"

"ধরলাম।"

"ইয়ার্কি করবে, না শুনবে ?"

"সত্যি বলার মত যদি কিছু বল তো শুনতে রাজী।"

"তোমাকে বলা যায়, কেতু। তুমি বন্ধু হিসেবে নির্ভরযোগ্য।"

"একথা প্রথম শুনছি না জীবনে, নতুন কিছু বলছ না তুমি আমাকে।"

"তোমার অহংকারটুকু বাদ দিলে ছেলে তুমি মন্দ নও।"

"সুকুমার রায়ের সুপাত্র গঙ্গারাম। কি বলছিলে বল।"

"বলছিলাম জীবনটা অদ্ভুত।"

"না বলছিলে তোমাকে ধরতে। কাছে আসবে, না আমি যাবো তোমার কাছে।

"আচ্ছা, বলছি। জানো, নিজেকে আমার মাঝে মাঝে বড্ড অদ্ভুত লাগে।"

'এ ভুল একা তোমার হয়না, আমাদের প্রায় সবারই হ'য়ে থাকে। আসলে আমরা সবাই সাধারণ।"

"সাধারণ বলে কি অদ্ভুত হওয়া যায় না ?"

"যায়, অদ্ভুত মানে যদি অসাধারণ না হয়।"

"তুমি জানো, আজ পর্যন্ত কোনও ছেলের সঙ্গে আমার প্রেম হয় নি ?"

"আমার সঙ্গে হয় নি, জানি।"

"কোনও ছেলের সঙ্গে নয়।"

"মেয়ের সঙ্গে ?"

"তাও না।"

"দুশ্চিন্তার বিষয়।"

"আমি বুঝতে পেরেছি, ছেলেদের আমার ভাল লাগে না। কেমন বোকা বোকা, স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব আর লোভী মনে হয়।"

"নেমন্তন্ন ক'রে বাড়ী ডেকে এনে এভাবে অপমান করার কথা তো ছিল না।"

স্বদেশ হেসে উঠল, "তুমি নও। তুমি ওরকম নও।"

"আবার অপমান। তার মানে আমি ছেলে নই।"

"তুমি আমার বন্ধু। আমার সঙ্গে প্রেম করতে চাও নি কখনও।"

"দেবতারাও স্ত্রী চরিত্র বুঝতে পারেন না, বলা হ'য়ে থাকে। কোনও কোনও স্ত্রীলোক পুরুষের চাওয়া টের পায় না।"

"নিতান্ত গবেট না হ'লে সব স্ত্রীলোক অন্তত ওটুকু টের পায়।"

"তুমি নিশ্চয় অনেক টের পেয়ে থাক ?"

"তা নেহাৎ মন্দ নয়। দুএকদিনের আলাপ জমলেই ছেলেগুলির লোভ ধরা পড়তে থাকে।"

"লোভনীয় দ্রব্যে লোভ স্বাভাবিক নয় ?"

"আমার ভয় করে। সন্দেহ হয়।"

"লজ্জা না হলেই হল !"

"কি মনে হয় জানো ? মনে হয় যৌবন নিজের সৌরভে উন্মত্ত, সে কেবল আদায় ক'রে নিতে চায়, তার একমাত্র জ্ঞান নিজেকে নিয়ে। যৌবন কেবল নিজেকে ভালবাসে, অন্যকে ভালবাসার নামে ভালবাসে কেবল নিজেকেই। মনে হয় যৌবন স্বার্থপর, অন্ধ, সে কেবল নিজেকে দেখতে পায়, সব কিছুর মধ্যে নিজেকে সন্ধান করে।"

"তোমার অনুভূতি মিথ্যে একথা বলবার সাহস নেই আমার।"

"আমার বাবার ইচ্ছে দিশী একটি সুপাত্রকে আমি বেছে নিয়ে বিয়ে করি। আমরা বিহারী হ'লেও অনেকখানি বাঙ্গালী, আমি তো বটেই, বাবা জানেন আমি জাত-কাৎ মানি নে, এও জানেন সম্বন্ধ ক'রে বিয়ে দিতে পারবেন না তিনি আমাকে। বাঙ্গালী হোক, হিন্দুস্থানী হোক, মাদ্রাজী হোক, এমন কি শিখ হোক, বাবার ইচ্ছে ভারতীয় কাউকে আমি ভালবাসি, বিয়ে করি।"

"ইচ্ছাটা পিতৃসুলভ। তোমাকে অনেকখানি স্বাধীনতা দিতে তিনি প্রস্তুত।"

"আমার বাবা মানুষটা আসলে মন্দ নয়। মন্দ তাঁর ধনতন্ত্রবাদ। যার সঙ্গে আমার বিরোধ।"

"তুমি যদি নেহেরুর মত সমাজতান্ত্রিক হও, তাহলে বিরোধের কারণ নেই।"

"কোনও মেকী জিনিষ আমার গ্রহণীয় নয়। নেহেরু-সমাজতন্ত্র মেকী।"

"অতএব অগ্রহণীয়। কিন্তু সব ভারতীয় পাত্ররাই মেকী নয়।"

"যাদের আমি চিনি, যাদের চোখে দেখতে পাই লোভ, দেহের উত্তাপ এসে স্পর্শ ক'রে আমাকে, তাদের বড্ড মেকী মনে হয়।"

"অভিযোগের কারণ ?"

"মনে হয় তারা সার্থকতা নামক বাসি লক্ষ্যের পানে অন্ধ-ছুট দিচ্ছে। সার্থকতার জন্যে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করেছে, চাকরী করছে, আরও ভাল চাকরীর খোঁজ করছে। সার্থকতা মানে টাকা, গাড়ী, দামী পোষাক, বড় বড় পার্টি, নানা রকম স্ফূর্তি। আর একটু বিদগ্ধ হলে যশ, সুনাম, সংবাদপত্রে বক্তৃতার

রিপোর্ট, বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের কাছে সম্মানলাভ। একে আমি মেকী সার্থকতা বলে থাকি। আমার বাবা অন্তত নিজের উদ্যোগে বিরাট বিরাট কারখানা তৈরী করেছেন। তাঁর কোনও কোম্পানীতে সাতাশ বছর বয়সে তিন হাজার টাকার মাইনেতে চাকরী ক'রে যে 'দারুণ' ছেলেটা নিজেকে সার্থক মনে করে, তার জন্যে আমার শ্রদ্ধার অভাব।"

"এবং সে যখন তোমার পানে লোভী দৃষ্টি হানে তখন—

"আমার গা ঘিন ঘিন করে।"

"অন্য সার্থকতার সন্ধানী কাউকে তুমি জানো না?"

"তুমি জানো? নিউইয়র্ক বা আমেরিকায় কত ভারতীয় ছেলেকে তো তুমি চেন, আমিও। এমন একটিও চেন যে বাসি সার্থকতার বাইরে অন্য কিছুর অনুসন্ধান করছে?"

"আমেরিকায় নেই বলে অমন ভারতীয় ছেলে ভারতবর্ষে নিশ্চয় খুঁজলে পাওয়া যাবে।"

"'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' আর 'আনন্দবাজারে' পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন দিয়ে তো এদের খোঁজ পাওয়া যাবে না, যদি এরা আদৌ থেকে থাকে। তা ছাড়া, আমার একটা মৌলিক পাপ রয়ে গেছে যে! আমি ধনী ক্যাপিটালিস্টের মেয়ে।"

"এবং ভারতীয় পাত্ররা সাধারণত পাত্রীর পিতার বিত্ত সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন।"

"যারা আমার প্রতি একটুও আকৃষ্ট হয়, আমি সন্দেহ করি তাদের আকর্ষণের প্রধান কারণ আমি নই, আমার বাবা।"

"তোমার সন্দেহ কোনও কোনও ক্ষেত্রে অমূলক হ'তে পারে।"

"যদি মেনেও নি তুমি যা বলছ, তাতে অবস্থার হেরফের হয় না। আমি জানি কিছু কিছু ছেলে আমাকে এড়িয়ে চলে শুধু এ জন্যে যে আমার বাবা ধনী। তাহলে কি এটাই দাঁড়াচ্ছে না যে ছেলেদের কাছে আমার চেয়ে আকর্ষণীয় হল আমার বাবার বিত্ত, প্রতিপত্তি, সামাজিক প্রভাব? অথবা, বাবার মেয়ে বলে আমি বর্জনীয়?"

"স্বদেশ, ভারতীয় ছাড়াও অনেক যুবক আছে। শাদা, কালো, হলদে।"

"আমার জন্যে নেই।"

"তুমি যে এতটা পিতৃভক্ত তা তো জানতাম না?"

"ভুল জানলে। বাবা আমার জীবনের দিগদর্শক নয়। এ দায়িত্ব আমি ঈশ্বরকে দিতেও অপ্রস্তুত।"

"আমিও।"

"আমেরিকান ছেলেগুলিকে আমার ভাল লাগে না।"

"কেন? বেশ তো ওরা। স্বাস্থ্য ভাল, রং গৌর, কর্মঠ এবং মুখর। বর্তমান মুহূর্তে অনেকে বিপ্লব-বিলাসী।"

"কেতু, আমেরিকান ছাত্রছাত্রীদের সমবেত ভূমিকাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তারা যেভাবে ভীয়েৎনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, এবং জনমনকে নীতি পালটাতে বাধ্য করেছে তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুব বেশি নেই। আমার সমস্যা সমষ্টি নিয়ে নয়।"

"অর্থাৎ তুমি আমেরিকান ইয়ুথকে শ্রদ্ধা করো, কোনও বিশেষ আমেরিকান যুবককে ভালবাসতে পারো না।"

"কে বলে তোমার বুদ্ধি কম?"

"কেউ বলে না। কিন্তু তোমার তাহলে রইল কি? দুনিয়ার সব যুবকদের বাদ দিয়ে তোমার তো দেখছি হাতে রইল শুধু পেন্সিল।"

স্বদেশের মুখখানা এবার হঠাৎ আশ্চর্য কমনীয় হয়ে উঠল। বড় বড় চোখ দুটি গভীর লাজে টলটল ক'রে উঠল।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

"স্বদেশ, সত্যি আমার বুদ্ধি কম। এতক্ষণ আমি বুঝতে পারি নি।"

মৃদু গুঞ্জনে স্বদেশ বলল, "এবার পেরেছ?"

"এই মুহূর্তে পারলাম। তুমি দশ লক্ষ শব্দে যা বলো নি, তোমার চোখ এক মুহূর্তে তা ঘোষণা ক'রে দিল।"

"কি ঘোষণা?"

"তুমি একজনকে ভালবাস। শুধু তাই নয়, সেও তোমাকে ভালবাসে।"

স্বদেশ নীরবে তাকিয়ে রইল। চোখ দুটি প্রথম প্রভাতের শিশির ভেজা কালো গোলাপ।

আমি তখনও চেঁচিয়ে যাচ্ছি: "এবং আমি জানি তাকে।"

কালো গোলাপ দুটি কেঁপে উঠল।

"তাকে তোমার সঙ্গে অনেক দেখেছি। তুমি যখন ডর্মে কাজ করো, সে বসে থাকে তোমার পাশে। তুমি যখন লাইব্রেরীতে ব'সে পড়, সেও তোমার পাশে বসে বই পড়ে।"

গোলাপ থেকে দু বিন্দু শিশির ঝরল স্বদেশের গালে।

"স্বদেশ তোমাকে আমি ভালবাসি, তুমি আমার অনেক দামের বন্ধু। তোমার কথা শুনে ভীষণ ভয় লাগছিল আমার। ভাবছিলাম, তাহলে কি হবে তোমার? এখন আমি খুশি। তোমাকে বিচার করা আমার কাজ নয়। তুমি সাধারণ মেয়ে

নও। তুমি যে ভালবাসতে পেরেছ, ভালবাসা গ্রহণ করতে পেয়েছ এটাই সবচেয়ে বড় কথা।"

স্বদেশ সরে এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে।

আমার কানের কাছে গুঞ্জন ক'রে উঠল, "হোক না বয়সে অনেক বড়, প্রায় আমার বাবার বয়সী, তবু আমি তাকে ভালবাসি, আর সে আমাকে ভালোবাসে। তার ভালবাসার মধ্যে স্বার্থপরতা নেই, দাবীর দাপট নেই, আছে দিগন্তব্যাপী ক্লান্ত ঔদার্য, তার ভালবাসা গোধূলির মত নরম সোনালি।"

একটু পরে স্বদেশ প্রশ্ন করল, "আমি কি খুব খারাপ কিছু ক'রে বসেছি, কেতু?"

সামাজিক পরিবর্তন তো একটা সহজ সাধারণ ঘটনা নয় যে তাকে সোজা ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব; সমাজ বদলায় অনেকগুলি মৌলিক প্রভাবের চাপে, যাদের চেহারা সব সময় আমাদের চোখে পর্যন্ত পড়ে না, এ প্রভাবগুলি তো আমরা মানুষেরাই সৃষ্টি করি, অথচ টের পাইনে তাদের দৈত্য-ক্ষমতার, শেষে একদিন দেখতে পাই তারা আমাদের প্রতিষ্ঠিত জীবনকে তচনচ ক'রে দিয়েছে, তারা আর আমাদের সামনে নেই, আমরাই তাদের সামনে। কার্লমার্কস দেখতে পেয়েছিলেন ধনতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে অন্তঃনিহিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব, এবং ঘোষণা করেছিলেন, এ প্রভাব থেকে ধনতন্ত্রের নিস্তার নেই, ইতিহাসের পথ যত দীর্ঘ হোক না কেন, যত সর্পিল এবং দুর্গম, একদিন ধনতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক রূপায়ণ নিতেই হবে। এ রূপায়ণ যে নিজের থেকে স্বতঃস্ফূর্ত বিবর্তনের পথে আসবে না তাও কার্লমার্কস বুঝতে পেরেছিলেন, এ রূপায়ণ আনবে মেহনতী মানুষ সংগ্রাম করে, নিজের বহু-প্রত্যাশিত মুক্তির তাড়নায়। আমার বাবা মার্কসবাদে মোটামুটি বিশ্বাস করেন, যদিও তিনি কম্যুনিষ্ট নন, আমি ছোটবেলা থেকে তাঁর কাছে শুনে এসেছি, পৃথিবী এবং মানুষ, জেনে শুনে কিম্বা অজান্তে, চলেছে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের দিকে, কিন্তু বড় হবার পর এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নি, কেননা রাজনীতিতে আমার উৎসাহ, আকর্ষণ কম, আমার স্বক্ষেত্র হল সাহিত্য, যদিও আমি সাহিত্যিক নই, কেবল সাহিত্যের ছাত্র। আমার বাবা পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মেছেন এবং বড় হয়েছেন বলেই রাজনীতি তাঁর মানসকে বড় বেশি অধিকার করে বসেছে, আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষে জন্মেছি, রাজনীতির বাইরেও আমাদের জীবন পরিব্যাপ্ত। অন্তত আমার তো তাই মনে

হয়। আমি প্রতিদিন খবরের কাগজ খুলে প্রথম পড়ি খেলাধুলার খবর : কোন রাজনৈতিক নেতা কি বাণী দিলেন, কার সঙ্গে কার কি নিয়ে সংঘর্ষ বাধল তাতে আমার রুচি সামান্য। আমাকে ক্রিকেট সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন ক'রে দেখ, গত পঁচিশ বছরে ক্রিকেট-দুনিয়ায় ছোট বড় এমন কিছু ঘটে নি যা নয় আমার নখদর্পণে, অথচ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ছাড়া অন্য মন্ত্রীদের নাম পর্যন্ত আমার মনে থাকে না। ভারত আর ওয়েস্ট ইণ্ডিস-এ সেবার টেষ্ট খেলা চলছে, টরন্টো শহর বরফে ঢাকা, কনকনে মাংস-কাটা হাওয়া বইছে, এবং অবিরাম ঝরছে বরফ, তবু আমি আর হরেনদা চলেছি কাঁপতে কাঁপতে রাস্তায় আছাড় খেতে খেতে দেড় মাইল দূরের একটি দোকানে, যেখানে বিলাত থেকে সংবাদপত্র আসে, তাতে পাওয়া যায় ক্রিকেটের খবর। অথচ ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ শহরে বেড়াতে এলে তাঁর দর্শকদের সংখ্যা বাড়াবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে হয় নি আমার।

তবু জানি রাজনীতিকে এড়িয়ে চলা অসম্ভব, এমন কি আমার পক্ষেও। এটুকু আমি বুঝি যে সামাজিক পরিবর্তনের মূল প্রভাব রাজনীতি। পরিবর্তন কোন পথে যাবে, তাতে লাভ হবে কার এবং কার হবে না, তার নির্ধারক রাজনীতি!

অতএব, ভারতবর্ষের সামাজিক পরিবর্তনের মূলে যে ভারতীয় রাজনীতি এ সত্য মানতে আমার দ্বিধা নেই। বিজ্ঞান, টেকনলজি সামাজিক পরিবর্তনের মাল-মসলা, তার নিয়োগকর্তা হল রাজনৈতিক নেতৃত্ব। স্বাধীন ভারতবর্ষে বহু কিছু ঘটা সত্ত্বেও সমাজের পরিবর্তন যে এমন অসহ্যভাবে ধীরগতি ও নিস্তেজ, তার কারণও ভারতীয় রাজনীতি। যাঁরা আমাদের শাসন করেন তাঁরা চান না সমাজের প্রতিষ্ঠিত ভারসাম্য দ্রুত বদলে যাক, যদি যায় তাহলে তাদের শাসন আর থাকে না। এটুকু, রাজনীতিতে উৎসাহ ছাড়াও, আমি বুঝতে পারি·

এবং বুঝতে পারি, চোখের সামনে দেখতে পাই, ভারতে সামাজিক অসমতা দিন দিন নিদারুণ হয়ে উঠছে। সংখ্যায় সামান্য কিছু লোককে দেখে মনে হয় ভারতবর্ষ বুঝি পঁচিশ বছরে পশ্চিমের সমকক্ষ কোনও দেশ। আমি এই সামান্য অংশের একজন। আমাদের জীবনে পরিবর্তনের যেন শেষ নেই। আমাদের বসবার ঘরে রেফ্রিজারেটর, রান্নাঘরে গ্যাস, শোবার ঘরে এয়ারকণ্ডিশনার ; আমরা চেষ্টা না পেলেও বীয়র খাই, বিলিতি নাচ নাচি, মাসে দুদিন রেঁস্তোরায় না গেলে আমাদের চলে না। আমরা দেশ-বিদেশে উড়ে বেড়াই, অথবা বেড়াবার স্বপ্ন দেখি, পৃথিবীটা আমাদের কাছে বড় বেশি ছোট হ'য়ে গেছে! আমরা ভারতবর্ষের জেট জেনারেশান।

বিরাট ভারতবর্ষ কিন্তু বদলায় নি, যেখানে ভারতবর্ষের শতকরা আশি জন লোকের বাস সেখানে পরিবর্তনের হাওয়া মন্দ, তার প্রভাব বিশেষ পড়ে নি

মানুষের জীবনে। বহুর এবং কয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। ভারতবর্ষের সামাজিক পরিবর্তনের এই হল প্রধান পরিচয়। আমার বাবাদের জেনারেশান দেশ গড়ার নামে সামান্য-সংখ্যা একটি গোষ্ঠির স্বার্থ গ'ড়ে ফেলেছে, আমরা যারা তাদের সন্তান বাঁধা পড়ে গেছি এই গোষ্ঠিস্বার্থের সঙ্গে, আর আমাদের বাইরে যে অগণিত জনমানুষ, তাদের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান কেবল বাড়ছে, বাড়ছে।

আমি সাহিত্যের ছাত্র: যে সমাজব্যবস্থায় মানবিকতা নেই তাকে আমি সম্মান করতে অক্ষম। যে সমাজব্যবস্থায় দেশের মানুষ এক বেলা খেতে পায় না এবং কিছু লোক অপর্যাপ্ত খাদ্য অনায়াসে অপচয় করে, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি নে। যে সমাজব্যবস্থা দূরের এক পরদেশের ওপর লক্ষ লক্ষ টন বোমাবর্ষণ সহ্য করে তার প্রতি একবিন্দু শ্রদ্ধা নেই আমার। মানুষের অধিকার নেই অন্য মানুষকে শোষণ করার, পদানত করার, অন্য মানুষের রক্তে হাত রাঙাবার। অথচ এ ব্যবস্থার প্রতিকার আমার দ্বারা সম্ভব নয়, আমি এর বিরুদ্ধে লড়ছি না, এরই সঙ্গে নানাভাবে মিতালি করে আমার আয়ু বাড়ছে, আমি এমনি ক'রেই একদিন যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ় হ'য়ে যাব, চুল পাকবে, ভুঁড়ি হবে, আমি সাকসেস নামক আফিং সেবন ক'রে বুঁদ হ'য়ে বেঁচে থাকব।

আমি বলে যাচ্ছিলাম, বলতে বলতে কেমন নেশা ধ'রে গিয়েছিল, হঠাৎ সুজান ফোর্ড তার বড় বড় চোখ তুলে অন্য প্রশ্ন ক'রে বসল, "তুমি কার জীবন বাঁচাচ্ছ? তোমার? না তোমার বাবার?"

আমি অবাক হবার পরমুহূর্তেই রেগে উঠলাম।

"বাবার জীবন বাঁচাতে যাব কেন? আমি বাঁচাচ্ছি আমার জীবন।"

সুজান ফোর্ড বাঁকা হাসল। ডিভানের ওপর উপুড় হ'য়ে শুয়েছিল, উঠে বসল।

ঝুলঝুল ড্রেস পরা ছিল সুজানের। ব্রা ছিল না। উঠে বসবার সময় আমি তার ছোট্ট শাদা স্তন দুটি পুরো দেখতে পেলাম।

সুজান একটু সলজ্জ হাসল।

বলল, "মনে হচ্চে না।"

"কি মনে হচ্চে না?"

"মনে হচ্চে না তুমি এখনও বাবার কব্জা থেকে মুক্তি পেয়েছ।"

"ননসেন্স্। আমার বাবা তেমনি লোক নন। কোনওদিন কব্জা করতে চান নি আমাকে।"

"অনেক মানুষ আছে যারা স্বেচ্ছায় কব্জাবন্দী হ'তে ভালবাসে।"

"আমি তাদের মধ্যে নই।"

"বলছ বটে, কিন্তু আমার সন্দেহ আছে। আচ্ছা দাঁড়াও," সুজান উঠে আলমারী থেকে হুইস্কির বোতল নিয়ে এল। "তেষ্টা পেয়েছে, তুমি খাবে ?"

"এখন নয়।"

"খাও তো !"

"কখনও সখন। অভ্যেস নেই।"

"বীয়র খাবে ?"

"আছে ? তাহলে তাই দাও।"

সুজান আমাকে বীয়র ক্যান বার ক'রে দিল। নিজে ঢেলে নিল খানিকটা হুইস্কি।

"সোডা নেই ?"

"আছে। আমার দরকার হয় না।"

হুইস্কির গ্লাসে ডুবার চুমুক দিয়ে সুজান বলল : "তোমার বয়স কত ?"

"বাইশ।"

"আমার বয়স কত জান ?"

"কত আর হবে ? চব্বিশ ?"

"আঠাশ।"

"দেখায় না কিন্তু।"

"ধন্যবাদ। মিথ্যে বলতে জান দেখছি। আমি তো আয়নার সামনে দাঁড়ালে বত্রিশ বছরের বৃদ্ধাকে দেখতে পাই।"

"তোমার চোখের ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত।"

"ঠিক বলেছ। বয়স হয়েছে, ভাল দেখতে পাই নে।"

"আমি তা বলি নি। বলছিলাম—"

"থাক। প্রশ্নের জবাব দেবে ?"

"নিশ্চয়।"

"তুমি বাবা মা'র সঙ্গে থাক কেন ?"

"তবে কোথায় থাকব ?"

"আমাদের ছেলেরা একটু বড় হ'লেই আলাদা থাকে। মেয়েরাও।"

"আমার দেশ ভারতবর্ষ। আমেরিকা নয়।"

"তুমি নিউ ইয়র্কে বাস করছ তো ?"

"রোমে গেলে রোমান হ'তে হবে এমন কোনও নিয়ম নেই।"

"না নেই। অন্তত নিউ ইয়র্ক শহরে। এখানে সব চলে। পৃথিবীর প্রধান স্বাধীন ও বহুরূপী শহর।

"তাইতো দেখছি।"

"তোমাদের পরিবারে ক'জন ? কে কে ?"

"চারজন। বাবা, মা, মিতু, আমি।"

"একসঙ্গে থাকো ?"

"থাকি।"

"তোমার শোবার আলাদা ঘর আছে ?"

"তা আছে। মাঝে মাঝে মিতু আর আমি একঘরে শুই। অতিথি এলে।"

"তোমার বান্ধবী আছে ?"

"তোমরা যাকে গার্ল ফ্রেণ্ড বলো, তা নেই।"

"একবছর কলম্বিয়ায় পড়ছ, বান্ধবী নেই ?"

"নেই।"

"বাবা পছন্দ করেন না বুঝি ?

"বরং উল্টো। বাবা এজন্যে দুঃখ করেন।"

"তাহলে ?"

"সময় পেলাম কৈ ? পড়ছিলাম দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে এসে এক বছরে এম. এ. পাস করতে হল। সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরীতে চাকরী। গার্ল ফ্রেণ্ড বানাবার মত না আছে সময়, না পয়সা।"

"পয়সা ? পয়সা লাগবে কেন ?"

"লাগবে না ? ডেট করতে গেলেই ডলার লাগে। সিনেমায় নিয়ে যেতে হয়, রেস্তোরায় খাওয়াতে হয়। টুকি টাকি উপহার কিনে দিতে হয়।"

সুজান হেসে গড়িয়ে পড়ল। হুইস্কির গ্লাস তখন শেষ হ'য়ে গেছে। পুনরায় গ্লাসে হুইস্কি ঢালল।

আমি বললাম, "তুমি এখুনি মাতাল হ'য়ে পড়বে।"

"একটু টিপ্‌সি লাগছে। খালি পেটে হুইস্কি খেলে যা হয়।"

"খালি পেটে কেন ?"

"আজ কিছু খাই নি। দেখছ না পেট একেবারে খালি।" সুজান পেটে হাত বুলিয়ে দেখাল।

"খাও নি কেন ?"

"ইচ্ছে হয় নি।"

"তাহলে আর হুইস্কি খেয়ো না।"

"তোমার কি ভয় করছে আমাকে টিপ্‌সি দেখে ?"

"ভয় করবে কেন?"

"তাহলে তোমার কোনও ডেট জোটেনি এখনও।"

"তুমি এমন ভাবে বলছ যে আমার মত বেচারা আর জগতে দ্বিতীয় নেই।"

"দুঃখের কথা তো বটেই।"

"গ্রাজুয়েট-পড়ছে মেয়েদের আমার ভাল লাগে না। বড্ড বেশি ইনটেলেকচুয়াল।"

"তাই বুঝি? আমি ও-জাতের কাউকে চিনি না। আমি যাদের ডিসারটেশন টাইপ করি তারা সব পুরুষ।"

"কেন?"

"খুব সহজ কারণ। আমি মেয়ে। মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের আমার ভাল লাগে।"

"আমি পুরুষ। পুরুষদের আমার খুব ভাল লাগে।"

"তোমার বিয়ে হয় নি?"

"না। শুনলে তো আমরা চারজন।

"বৌকে হয়ত দেশে রেখে এসেছ।"

"তা কেন করতে যাব?"

"তুমি নিজে ভালবেসে বিয়ে করবে, না তোমার বাবার পছন্দসই মেয়েকে বৌ বানাবে?"

"বাবা আমাকে দশ বছর আগে বলেছেন পৃথিবীর যে কোনও মেয়েকে ভালোবেসে আমি বিয়ে করতে পারি।"

"তুমি বিশ্বাস করেছ?"

"করব না কেন?"

"বাবা-মা'রা অনেক সময় ওরকম বলে থাকে। কাজের সময় দেখা যায় উল্টো।"

"আমার বাবা-মা সেরকম নয়।"

"তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে চাও? চুপ হ'য়ে গেলে কেন? মেনে নেবেন তোমার বাবা মা?"

"তোমার কথার কোনও মানে হয় না।"

"কেন?"

"তোমাকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি না। তুমিও না আমাকে।"

সুজান একটু গম্ভীর হ'য়ে গেল। মুখখানা একটু বিষণ্ণ।

"আমার কথার মানে তুমি ঠিকই বুঝেছ। ধরো যদি তুমি প্রেমে পড়ে যাও একটি মেয়ের সঙ্গে যে তোমার চেয়ে ছ' বছরের বড়, থাকে ভিলেজের একটা বাড়ীর

একখানা ঘরে একা, মদ খায়, পট খায়, যার মা আধ-পাগল অবস্থায় পড়ে আছে ব্রুকলিনে, যার ভাই নেই, বাপ নেই, যে পীস মার্চ ক'রে পুলিশের গুঁতো খায়, কালোদের সঙ্গে এক লাইনে দাঁড়িয়ে পুলিশের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধ করে, জীবিকার জন্যে যাকে রোজ আট দশ ঘণ্টা টাইপ করতে হয় ; যদি তুমি এমন কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে চাও, তোমার বাপ-মা খুশি হ'য়ে মত দেবেন ?"

"না।"

"তাহলে ?"

"তাহলে কি ?"

"বোকা ছেলে, তাহলে এই দাঁড়াল যে তুমি ততটুকুই স্বাধীন, যতটুকু স্বাধীনতা তাঁরা অনুমোদন করেন।"

"না।"

"তুমি দেখছি একেবারে স্বেচ্ছাবন্দী। তা থাক গে। এটা তোমার ব্যাপার। আমাকে তুমি ভালো বাসবে না, বিয়েও করতে চাইবে না। দেখতে পাচ্ছ, আমি বেশ টিপসি হ'য়ে গেছি। ঘুম পাচ্ছে। অবশ্যি ঘুম আসবে না। রাত্রে পিল খেয়ে আমাকে ঘুমুতে হয়। তুমি আজ বিদেয় হও। তোমার থিসিস আর্ধেকটা টাইপ হ'য়ে গেছে। এক সপ্তাহ পরে এসো। পুরো দিয়ে দেব।"

আমাকে বসে থাকতে দেখে, সুজান টানা টানা গলায় বলল, "নড়ছ না যে।"

"তোমার কিছু টাকা দরকার ?"

"না "

"ফ্রিজে কোন খাবার নেই।"

সুজান ধমকে উঠল, "কে বলল তোমাকে ?"

"কেউ না। আমি দেখতে পেলাম।"

"তাতে তোমার কি ?"

"কিচ্ছু না। টাকা আমি সঙ্গে এনেছিলাম। তুমি তো পাবেই : রেখে যাব ?"

"সঙ্গে এনেছ ? আচ্ছা। খুব ভাল ছেলে। পাঁচটা ডলার আমাকে দিয়ে যাও। ধন্যবাদ।"

"মাত্র পাঁচ ?"

"শুধু পাঁচ। তার বেশি নয়। আজকে রাত্রে আসবার কথা। টাকা পয়সা যা পাবে সব নিয়ে যাবে।"

"কে ?"

"জানো না ? জর্জ। আমার বয় ফ্রেণ্ড।"

"টাকা পয়সা নিয়ে যাবে কেন ?"

"ওর চাকরী নেই যে। এসেই খেতে চাইবে। তারপর শোবে। মাঝরাতে উঠে যা যেখানে আছে খুঁজে বার করবে, চলে যাবে। এই ওর স্বভাব।"

"তুমি সহ্য করো।"

"করি। তবু তো মাঝে মধ্যে আসে। তবু তো আমি একেবারে একা নই।"

"এর চেয়ে ভাল কিছু জুটল না তোমার ?"

"জর্জ খুব ভাল ছেলে। দেখলে বুঝবে।"

"আমি কিছু খাবার কিনে আনব ? তুমি তো বেশ মাতাল হ'য়ে উঠেছ। বেরুবে কি করে ?"

"তুমি এবার বিদেয় হও। জর্জ এসে পড়তে পারে।"

"জর্জের ভ'য়ে আমি পালাব ?"

"জর্জ ভীষণ হিংসুক। তোমাকে মারবে। তুমি পারবে না ওর সঙ্গে। হয়ত ছুরি বসিয়ে দেবে। তুমি কেটে পড়।"

"কিন্তু খাবার আনবে কি করে ?"

"যেমন ক'রে প্রায়ই আনি ! তুমি এবার যাও।"

কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটিতে পড়বার সুযোগ আমি কখনো পেতাম না, যদি না, বাবা, দুঃসাহসে তুমি আমাকে ও মিতুকে দিল্লী থেকে নিউ ইয়র্কে আমদানী করবার সিদ্ধান্ত না নিতে।

হঠাৎ একটা বই লিখবার জন্যে ফেলোশিপ পেয়ে তুমি চলে গেলে নিউ ইয়র্কে, তোমার সঙ্গে মা-ও; মিতু আর আমি রয়ে গেলাম দিল্লীতে, আমি হস্টেলে, মিতু ছোটকাকা-কাকীর কাছে গ্রীন পার্কে। তুমি চলে যাবার আগের মাসগুলিতে বোধহয় আমাদের সম্পর্ক সবচেয়ে নিবিড় হ'য়েছিল; আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল তোমার-আমার সম্পর্ক, যার মধ্যে আমরা খুঁজে পেতাম পৃথিবীর সব পিতা-পুত্রের সম্পর্ক। যেহেতু আমাদের মধ্যে নিবিড় একটা বন্ধুত্ব তখন গ'ড়ে উঠেছিল, এবং দুজনের দুজনার কাছে লুকোবার মত কিছু ছিল না, আমার তোমাকে বলতে বাধেনি যে তোমার ওপর আমি বড় বেশি নির্ভরশীল হ'য়ে গেছি, এবং কি ক'রে আমার এ নির্ভরতা কাটিয়ে আমি নিজের ব্যক্তিত্বে নিজের জীবনে রাজত্ব করতে পারি তা নিয়ে তুমি অনেক কিছু বলতে।

আমার চরিত্রের একটা বিশেষ, আমি যাকে বলি বিকৃত, রূপ তখনই আত্মপ্রকাশ করেছিল : কোনও স্বাভাবিক সহজে অনুমোদন-করা যায় মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হত না। আমি আকৃষ্ট হতাম কেবল তাদেরই প্রতি যাদের জীবনে অথবা চরিত্রে কিছুটা অস্বাভাবিক অসাধারণ সমস্যা দেখতে পেতাম। পর পর আমার 'ভাব' হয়েছিল, তোমার মনে থাকতে পারে, সীতা পরমেশ্বরমের সঙ্গে, যার বাবা ভারত সরকারের উঁচু অফিসার ছিলেন, থাকতেন সোনেরিবাগ রোডের একটি বিরাট মনোরম বাংলোয়, যার বাবা-মা'র মধ্যে গোলমাল ছিল গভীর এবং জটিল, সীতা তার বাবাকে দারুণ ঘৃণা করত, মাকে করুণা; একমাত্র সন্তান, তাই সীতা ছিল একেবারে একা, এবং পড়াশোনায় ভীষণ চৌখুস, প্রত্যেক পরীক্ষায় তার জন্যে প্রথম স্থান সংরক্ষিত। আমার মত সীতা পরমেশ্বরমও ইংরিজির ছাত্র, যদিও আমার এক বছরের সীনিয়র, এবং এক সঙ্গে সেমিনার করতে গিয়ে আমাদের প্রথম আলাপ, পরে বন্ধুত্ব; বাপকে ঘৃণা করত ব'লে সীতা পুরুষদের এড়িয়ে চলত, ওর স্বভাবে একটা আপাত কাঠিন্য ছিল রূঢ়তা, যা ছিল আসলে সযত্নে রক্ষিত মুখোস, আত্মরক্ষার বর্ম; ভিতরে ভিতরে সীতা ছিল স্নেহকাতর, ভালবাসার ভিখারী। য়ুনিভারসিটিতে সবাই সীতাকে জানত উদ্ধত অহংকারী, ছেলেদের এড়িয়ে চলত সর্বদা, অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিমিত ভদ্র ব্যবহারের সীমানা বাঁচিয়ে নিজের দূরত্ব রক্ষা ক'রে যেত। অথচ সীতা পরমেশ্বরের সঙ্গে আমার 'ভাব' হ'য়ে গেল, একটা ছোটখাট সংঘাতের মধ্য দিয়ে : আমরা দুজনকে আঘাত করতে গিয়ে, হটাৎ চোখাচোখি তাকিয়ে, থেমে গেলাম, হটাৎ জড়িয়ে ধরলাম দুজন দুজনকে।

সাত দিনের মধ্যে।

সেমিনারে পেপার পড়ল সীতা পরমেশ্বরম। বিষয় ছিল "ডিকেন্স্ ও কাফ্কা : শিশুর দৃষ্টিতে পৃথিবী।" সীতা দুই তুখোড় গ্রন্থকারের উপন্যাস থেকে তুলনামূলক তথ্য আহরণ ক'রে খুব প্রাঞ্জল ও সুন্দর ভাবে দেখিয়েছিল যে ডিকেন্স্ ও কাফ্কা দুজনের কাছেই তাঁদের বঞ্চিত, ব্যথিত বাল্যকাল বড় বেশী প্রভাবশীল ছিল, তাঁরা দুজনেই দেখাতে চেয়েছেন যে সমাজে শিশুরা দুঃখী, সে সমাজ সবচেয়ে নিষ্ঠুর। ডিকেন্সের ডেভিড এবং কাফ্কার গ্রেগর, দুজনেই পিতৃস্নেহ বঞ্চিত, ডেভিডকে তার সৎ বাপ অনবরত আঘাত করছে, গ্রেগর লাথি খাচ্ছে নিজের বাপের কাছেই : সীতা পরমেশ্বরম বলল, "ডিকেন্স ও কাফ্কার জীবনে তাদের ব্যথাতুর বাল্যকাল কখনও শেষ হয়নি। বার বার ফিরে এসেছে তাঁদের উপন্যাসে, গল্পে, নানা শিশু চরিত্রে। অত্যাচারিত নিপীড়িত ক্ষুধার্ত রাখাল শিশু মরছে, আর ডিকেন্স ও কাফ্কা আঙুল তুলে দেখিয়ে দিচ্ছেন সে নির্দয় নিষ্পেষক সমাজব্যবস্থাকে যা এই করুণ অপচয়কে সহ্য করে, চেয়েও দেখে না।"

সেমিনারের ছাত্রছাত্রীরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সীতা পরমেশ্বরমের পেপার শুনে গেল: বলা বাহুল্য তারা অভিভূত হল। আমিও সবার মতই অভিভূত হতাম যদি-না আমার দায়িত্ব থাকত পেপারের প্রথম সমালোচনার। সীতা পড়বার সময়েই বুঝতে পারলাম আমার কাজ কঠিন হবে, সীতার বক্তব্য এত সুন্দর, এত মর্মস্পর্শী যে আলোচনা করবার যোগ্যতা অথবা রুচি আমার থাকবে না। অত ভাল পেপার লিখবার জন্যে সীতার ওপর আমি রেগে যেতে লাগলাম। সীতা থামলে অধ্যাপক আমার নাম ডাকলেন, আমি বেশ নার্ভাস হ'য়ে পড়লাম। আমার ইচ্ছে হল বলি, সমালোচনার সাধ্য নেই আমার, সীতার পেপার চমৎকার হয়েছে, আমি নিজে এর কাছাকাছিও পৌছতে পারতাম না, কিন্তু সেমিনারের তা নিয়ম নয়, সীতার পেপারের দুর্বলতা আমাকে দেখাতেই হবে, এবং এ কাজে আমি যেন কোমর বেঁধে নেমে পড়লাম, সীতাকে আঘাত করবার জন্যে মরীয়া হ'য়ে উঠলাম। আমি বললাম সীতা ডিকেন্স ও কাফ্‌কার দুনিয়ার আসল পরিচয়টা এড়িয়ে গেছে: চার্লস্ ডিকেন্স ইংলণ্ডের গড়ে-ওঠা ধনতান্ত্রিক সমাজের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছেন শিশুদের জীবনের মাধ্যমে, কাফ্‌কা সেই একই সমাজের নগ্ন বর্বরতা আর নৈতিক শূন্যতা দেখিয়েছেন উপন্যাসে, গল্পে। সীতা উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের মেয়ে, বাস ক'রে নিউ দিল্লীর অভিজাত পল্লীতে, তাই শিশু হত্যার করুণ বর্ণনা দিতে গিয়ে সমাজের চেহারাটা দেখতে পায় নি। কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম সীতার মুখ টকটকে লাল, তাতে আমার রোখ বেড়ে গেল, আমি বললাম, যদি সীতা সমাজের চেহারাটা সত্যিকারের দেখতে পেত তাহলে দুটো ঘটনার উল্লেখ না ক'রে পারত না, প্রথম ঘটনা ডিকেন্স-এর উপন্যাস 'দি ব্লীক হাউস'-এর অভাগা বালক জো-এর মৃত্যু, দ্বিতীয় ঘটনা জো-কে উল্লেখ ক'রে রেভারেণ্ড চাডবাণ্ডের উদ্ধৃত উক্তি। আদালতে জো-র "বিচারের" পর রেভারেণ্ড চাডবাণ্ড বলছেন:

তুমি মানব-শিশু, বুঝলে, তুমি মানব-শিশু।

O running stream of sparkling joy
To be a soaring human boy.

এবং জো-এর মৃত্যুর পর ডিকেন্স-এর সেই মর্মন্তুদ অভিযোগ আদালতের সামনে: "Dead, Your Majesty. Dead, my lords and gentlemen. Dead, Right Reverends and wrong Reverends of any order. Dead, men and women, born with Heavenly companion in your hearts. And dying thus around us, every day."

আমি বললাম, "সীতা পরমেশ্বরম খুব সুন্দর পেপার লিখেছে। কিন্তু এ দুটি ঘটনা

তার পেপারে বাদ পড়ল কি ক'রে? আমার মনে হয় এ পেপারে সামাজিক সচেতনতার অভাব। মিস পরমেশ্বরম ডিকেন্‌স্ ও কাফ্‌কার শিশুদের প্রতি বড় বেশি তাকাতে গিয়ে সমাজটাকে প্রায় দেখতেই পান নি।"

তিনটার সময় কফি হাউসে গিয়ে দেখি সীতা একা বসে কফি খাচ্ছে।

আমি গিয়ে সামনের সীটে বসলাম।

সীতা আমার দিকে একবার তাকিয়ে আমাকে উপেক্ষা করল।

বললাম, "তোমার পেপার চমৎকার হয়েছিল।"

সীতা চুপ ক'রে রইল।

বললাম, "আমি মাপ চাইছি। তোমাকে আক্রমণ করা বাধ্যতামূলক ছিল।"

এবার সীতা বলল, "কোমরের নীচে আঘাত করা বাধ্যতামূলক ছিল না।"

বললাম, "আঘাত যদি করতেই হবে তাহলে ব্যথা দিয়েই করতে হয়।"

সীতা বলল, "আমার বাবা কি কাজ করেন, কোন পাড়ায় বাস করেন সে দায়িত্ব আমার নয়।"

বললাম, "নিশ্চয় নয়। কিন্তু তাতে যদি তোমার দৃষ্টিশক্তি সীমিত হ'য়ে পড়ে, সেটা উল্লেখ করা নিশ্চয় অবান্তর নয়।"

সীতা উষ্মার সঙ্গে বলল, "তুমিও তো ঠিক বস্তিতে বাস করো না।"

বললাম, "করি না-ই তো। তুমি আমি একই শ্রেণীর লোক। তুমি একটু ওপরে, আমি একটু নীচে। আমাদের দৃষ্টি সমাজের কতোটুকু দেখতে পায়?"

সীতার কণ্ঠে তখনও উষ্মা: "তুমি কি ক'রে আন্দাজ করলে আমি ধনতান্ত্রিক সমাজের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে উদাসীন?"

"করি নি তো! আমি শুধু বললাম, তোমার প্রবন্ধে এ দিকে যথেষ্ট দৃষ্টিপাতের অভাব।"

সীতা এবার হঠাৎ নরম হল, "তোমার সমালোচনাটা অন্যায় হয়নি। আমি ঐ দিকটায় আর একটু জোর দিতে পারতাম।"

"ঐ দুটো ঘটনা তুমি বাদ দিলে কি ক'রে? 'ব্লাক হাউস' এর ঐ অংশদুটো পড়ে আমার তো চোখে জল এসে যায়।"

সীতা বলল, "আমার চোখে জল আসে না। রাগে গা জলে যায়।"

বললাম, "একই প্রতিক্রিয়ার দুই বিকাশ।"

সীতা বলল, "অসুখী বাল্যকালের অভিজ্ঞতা আছে তোমার?"

বললাম, "নেই।"

সীতা বলল, "বাপের হাতে ঠ্যাঙানি খেয়েছ ছোটবেলা রোজ রোজ?"

"না।"

"বাপকে দেখে ভয়ে কুঁকড়ে গেছ?"

"না।"

"প্রত্যেকদিন বাবা মাকে লড়াই করতে দেখতে হয়েছে তোমাকে?"

"না।"

"তবে তুমি কি করে বুঝবে অসুখী বাল্যকাল কাকে বলে? তুমি ডিকেন্সের উপন্যাসে সমাজ দেখতে পাও। আমি দেখতে পাই আমাকে। বুঝলে? এবার আমাকে একা থাকতে দাও।"

সীতা ব্যাগ থেকে সিগারেট বার করে ধরাল।

আমি নিঃশব্দে উঠে বিদায় হলাম।

তবু ক্রমে ক্রমে সীতা পরমেশ্বরমের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হল।

আমাদের অধ্যাপক জিতেন্দ্র নারায়ণ এ জন্যে দায়ী: তিনি সীতা আর আমাকে একসঙ্গে একটা সেমিনার পেপার লিখতে বললেন। বিষয়বস্তু: "এলিয়টের অনীহা।" আমরা দুজনেই এলিয়টের উৎসাহী পাঠক। একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে সীতা আর আমি পরস্পরকে জানলাম। আমাদের প্রেম হল না: ভালোবাসাবাসির মধ্যে গেলাম না আমরা। কিন্তু ঘনিষ্ঠ হলাম। মনে, দেহে।

সোনারিবাগ রোড বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা এক খানি বাঁকা রাস্তা। জুড়েছে হেস্টিংস রোডকে গ্রেট প্লেস-এর সঙ্গে। রাস্তার দুধারে গুটি কয়েক বড় বড় বাংলো বাড়ী। বাস করেন মন্ত্রীরা অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চতম পদাধিকারী কর্মচারীরা। সীতার বাবা, যতদূর মনে পড়ছে, বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রকের কর্ণধার ছিলেন। প্রায়ই তাঁকে দিল্লীর এবং ভারতের বাইরে থাকতে হত। অত বড় বাড়ীতে বাস করত সীতা আর তার মা।

সীতার বাবাকে আমি মাত্র একবার দেখেছিলাম। দ্বিতীয়বার দেখবার ইচ্ছে হয় নি।

একদিন সন্ধেবেলা হাজির হয়েছিলাম সীতাদের বাড়ীতে। বেল টিপতে আর্দালি এসে দরজা খুলল। বসতে বলল বৈঠকখানায়। সেখানে সীতার বাবা একটা সোফায় বসে ফাইল পড়ছিলেন। আমার দিকে একবার তাকিয়ে ফাইলের উপর নজর রাখলেন। দ্বিতীয়বার তাকালেন না।

আমি মানুষের সব ব্যবহার সইতে পারি—কেবল উপেক্ষা ছাড়া। কেউ আমায় উপেক্ষা করছে দেখলে আমার রাগ হয়। অসহ্য লাগে।

মিনিট তিনেক অপেক্ষা ক'রেও যখন সীতার দেখা মিলল না, তখন আমি তার বাবাকে প্রশ্ন করলাম, "সীতা কি বাড়ীতে নেই?"

তিনি ফাইলে মুখ রেখেই বললেন, "আছে।"

আমি বললাম, "আমার আসার খবরটা পেয়েছে তো ?"

তিনি কিছু বললেন না।

আমি উঠে গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়ালাম !

তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন !

বললাম, "আমার নাম কেতু গুপ্ত। আপনি নিশ্চয়ই মিঃ পরমেশ্বরম ?"

তিনি আমার বেয়াদপি দেখে অবাক হলেন।

আমি বললাম, "আমাদের বাড়ীতে আমার বন্ধুরা এলে আমার বাবা তাদের সঙ্গে গল্প করেন। আমি সীতার সঙ্গে পড়ি না, এক বছরের জুনিয়র, কিন্তু আমরা দুজনে একসঙ্গে একটা সেমিনার পেপার লিখেছি। সে জন্যেই আমার আসা এখানে। যদি সীতাকে অনুগ্রহ করে খবর দেন তো বাধিত হই।"

মিঃ পরমেশ্বরম আর্দালিকে ডাকলেন।

সে এলে বললেন, "সীতাকে খবর দিয়েছ ?"

আর্দালি জানাল, সীতা স্নান করছে। এক্ষুণি আসবে।

মিঃ পরমেশ্বরম আমার দিকে না তাকিয়ে ফাইলে মন দিলেন।

আমি "থ্যাংক ইউ, স্যার" বলে চেয়ারে বসলাম।

মিনিট দশেক পরে মিঃ পরমেশ্বরম গাড়ী চেপে বেরিয়ে গেলেন। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সীতা এল।

কাজের মধ্যে সীতাকে বললাম, "তোমার বাবা আমাকে দেখতেই পেলেন না।"

সীতা বলল, "ভারত সরকারের সেক্রেটারিরা অনেক কিছু দেখতে পান না। তাঁদের চোখের সময় কম।"

একটু পরে, 'তা ছাড়া, বাবা আমার কোন বন্ধুকেই সহ্য করতে পারেন না। ছেলে বন্ধু তো আমার নেই, বাড়ীতে তুমিই আসবার অধিকার পেয়েছ, মেয়ে বন্ধুরাও বাবার পছন্দ নয়।"

"কেন ?"

"আসলে আমাকেই বাবা সহ্য করতে পারেন না। আমি না জন্মালে মাকে বাবা সহজে ত্যাগ করতে পারতেন। মা যে বাবাকে ছেড়ে যায় নি, আমার জন্যেই।"

"ওদের সম্পর্ক যদি এত খারাপ, তাহলে আলাদা থাকাই কি ঠিক না ?"

"যা ঠিক তা কি সবাই করতে পারে ? মার আলাদা থাকার মত সাহস নেই। মা খুব সহজ সরল সাধারণ স্ত্রীলোক। বাবা ভীষণ ডাইনামিক। দুর্দান্ত মানুষ।

ওঁদের বিয়েটাই অনুচিৎ হ'য়েছে। তার মধ্যে এসে গেছি আমি। মা এখন আঁকড়ে ধরে আছেন আমাকে। আমি বড় হ'য়ে চাকরী করে মাকে নিয়ে থাকব। কিন্তু আমি জানি যেদিন চাকরী পেয়ে মাকে বলব, চলে এসো আমার কাছে, মা আসবে না, আসতে পারবে না।"

"তোমারও তো বিয়ে হবে! তখন তোমার স্বামী যদি এঁকে রাখতে না চায়?"

"আমি শিগগির বিয়ে করছি না। বিবাহিত জীবনের যে চেহারা ছোটবেলা থেকে চোখের সামনে দেখে এসেছি তাতে বিয়ে নিয়ে আমার উৎসাহ নেই। পুরুষদের আমি বিশ্বাস করতে পারি নে, ওদের ওপর নির্ভর করতে পারি নে।"

আমি বোকার মত বলে ফেললাম, "আমাকেও না?"

সীতা হেসে বলল, "তুমি তো পুরুষ নও! তুমি আমার কাছে একজন মানুষ।"

শুনে আমি প্রীত হলাম। এমন সুন্দর কথা কেউ কখনও আমাকে বলে নি।

সীতা বলল, "আমাদের বাবাদের জীবন বড় গোলমেলে। ওঁরা একসঙ্গে আধুনিক ও প্রাচীন। ওঁদের চিন্তায়, ব্যবহারে সঙ্গতির অভাব। যা বলেন তা করেন না, যা করেন তার সঙ্গে যা বলেন তার গরমিল দেখিয়ে দিলে চটে যান। আসলে ওরা তিন চারটে দুনিয়ায় একসঙ্গে বাস করেন।"

"আমরা?"

"আমরা তা নই। আমাদের দুনিয়া একটাই। আমার স্বামীর সঙ্গে যদি বনিবনাও না হয় আমি নিশ্চয় আলাদা থাকব।"

"ডিভোর্স করবে?"

"নিশ্চয়।"

"আবার বিয়ে করতে পারবে?"

সীতা চট ক'রে জবাব দিল না। একটু পরে বলল, "ইচ্ছে বা প্রয়োজন হলে পারা তো উচিৎ।"

আমি বললাম, "আমাদের সমাজে বিয়েটা তো বিরাট এক বাজী খেলা।"

"তা নয়তো কি?"

"আসলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিয়ে। বিয়েটা সামাজিক, পারিবারিক প্রয়োজনে, দুটি স্বকীয় জীবনের দ্বৈত প্রয়োজনে নয়। অথচ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ভেঙ্গে যাচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী ক্রমান্বয়ে দুজনে একা হ'য়ে পড়ছে। এমন একটা পরিস্থিতি তৈরী হচ্ছে, যার জন্যে তারা তৈরী হয় নি।"

"কিন্তু ক'টা বিয়ে ভাংছে, বলো? সবাই তো বেশ সুখে আছে। আমার বাড়ীর মত অবস্থা তো আর দেখতে পাই নে।"

"আমরা কার কতটুকু খবর রাখি বলো ?"

সীতা প্রশ্ন করল, "তোমার বাবা-মা'র খুব প্রেম ?"

"মন্দ নয়। ঝগড়া কি আর হয় না! কিন্তু ভাবও আছে।"

সীতা চুপ ক'রে রইল।

আমি বললাম, "আমার মা খুব বুদ্ধিমতী। বাবাকে ভাল ক'রে চিনে নিয়েছে। অনেক লম্বা দড়ি দেয় বাবাকে। মার একটি আলাদা জগৎ আছে। বাবাকে নিয়ে দাবী দাওয়া কম। অথচ দুজনের মধ্যে একটা বোঝাবুঝি আছে। মমতা আছে। সেটাই বড় কথা, তাই না ?"

সীতা মাথা নীচু ক'রে রইল।

দেখতে পেলাম তার চোখের জল গাল বেয়ে নামছে।

আমি সীতাকে কাছে টেনে নিলাম।

কয়েক মিনিট পর সীতা বলল, "এসো কাজ করা যাক।"

আমরা ঘন্টাখানেক কাজ করলাম।

সেদিনের মত কাজ শেষ হলে বিদায় নেবার আগে সীতা বলল :

"তোমার মনে হয় আমি ফার্স্ট ক্লাস পাবো ?"

"আলবৎ।"

"পেতেই হবে আমাকে। তা নইলে এ বাড়ী থেকে আমার মুক্তি নেই।"

"একথা কেন বলছ ?"

"বাবা মাকে কোনও দিন মানুষ বলে গণ্য করে নি। আমাকেও বাবা চায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখতে। পারে না, কেবল আমার পরীক্ষার ফলের জন্যে। বি. এ তে ফার্স্ট ক্লাস পাবার সময় যদি বাবাকে দেখতে! আমার দিকে তাকাতেন বিস্ময়ে, রাগে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, মনে হ'ত আমার সাফল্য তাঁকে ভীত করেছে, সহ্য করতে পারছেন না তিনি! চেয়েছিলেন, আমার বিয়ে হ'য়ে যাক, পড়াশোনা ছেড়ে আমি একজন নামহীন ব্যক্তিত্বহীন হিন্দু গৃহিণী হ'য়ে যাই। দুএকটা বিয়ের প্রস্তাবও উত্থাপন করেছিলেন। একদিন আমার সঙ্গে সোজাসোজি কথা হল : সচরাচর আমরা কথাই বলি নে দুজনে। আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম, বিয়ে করব না, পড়ব, পাশের পর চাকরী করব, যদি তাঁর বাড়ীতে আমার আশ্রয় না জোটে, হস্টেলে থাকব। রেগে গেলেন, কিন্তু বাধা দিতে পারলেন না। আমার ঠাকুর্দা, মানে মার বাবা, আমার নামে কিছু টাকা রেখে গেছেন, বিশেষ কিছু নয়, তবু দু বছর হস্টেলে থেকে পড়ার পক্ষে যথেষ্ট। এখন আমাকে এম. এ. ফার্স্ট ক্লাস পেতেই হবে। না পেলে অহংকার আর আত্মসম্মান বজায় রেখে এ বাড়ী থেকে বেরুতে পারব না আমি।"

"য়ুনিভার্সিটির সবাই জানে, তুমি ফার্স্ট ক্লাস পাবে।"

"ভয় করে। পরীক্ষাটাতো অনেকখানি লাক্।"

"তা তুমি আমায় বলছ? আমি পরীক্ষায় কক্ষণও ভাল করি নে। দেখলে না বি, এ, তে সেকেণ্ড ক্লাস পেয়ে গেলাম। এম. এ. তেও তাই করব।"

"আমার নোটসগুলি সব নিয়ে নিও।"

"নিতেই হবে। যদি ততদিন আমাদের বন্ধুত্ব থাকে।"

"থাকবে না কেন?"

"কি জানি? তুমি যে রকম বদখেয়ালি মেয়ে, তোমাকে বিশ্বাস কি?"

"শোনো কেতু, তোমাকে যতদিন মানুষ বলে জানব, পুরুষ বলে নয়, ততদিন আমাদের বন্ধুত্ব থাকবে?"

"আমাকে, তার মানে, সতর্ক ক'রে দিচ্ছ।"

"দিচ্ছি।"

"সতর্ক থেকো তুমিও।"

"আছি, এবং থাকবো।"

তোমার মনে থাকতে পারে, বাবা, সীতা পরমেশ্বরমকে একদিন বিকেলে তোমার আপিসে নিয়ে এসেছিলাম। সহজে তোমার কাছে আসতে রাজী হয় নি সীতা, অনেক বুঝিয়ে আনতে পেরেছিলাম ওকে। তুমি আপিসের কাজ স্থগিত রেখে আমাদের দুজনকে কনট প্লেসে নিয়ে গিয়েছিলে কফি খাওয়াতে, ওয়েঙ্গারে বসে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম। সীতা বেশ কিছুক্ষণ আড়ষ্ট ও সংকুচিত বোধ করছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরেছিল অনেকখানি সহজ হ'তে। সন্ধ্যাবেলা তুমি-আমি সীতাকে সোনেরিবাগ রোডে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী ফেরার সময় তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কেমন লাগল সীতাকে?"

তুমি বলেছিলে, "খুব বুদ্ধিমতী আর মেধাবী মেয়ে।"

"নতুন কিছু বল।"

তুমি বলেছিলে, 'যে মেয়ে বাবার ভালবাসা পায় না, তার ইমোশনাল ভিত্তি নড়বড়ে হ'য়ে থাকে। মেয়েদের পক্ষে সুস্থ স্বাভাবিক ইমোশনাল ও সেক্সুয়াল জীবন যাপন করার জন্যে বাবার সান্নিধ্য, আদর, ভালবাসা বিশেষ দরকার। যে

মেয়ে ছোটবেলা—কিছুটা বড় হয়েও—বাবার গায়ে গায়ে থাকে, দেখা যায় ছবিতের সঙ্গে তার সম্পর্ক মজবুত। সীতা পরমেশ্বরম তার বাবাকে দেখে এসেছে প্রতিপক্ষের ভূমিকায়। পায় নি সান্নিধ্য, স্নেহ, ভালবাসা, আদর। তাতে ক'রে ওর ইমোশনাল মন অস্থির, দুর্বল। এখন পুরুষকে দূরে সরিয়ে রেখে, বর্জন ক'রে সীতা আত্মরক্ষা করছে। একদিন এ আত্মরক্ষা ভেঙে যেতে পারে। তখন ওর জীবনে সত্যিকারের ক্রাইসিস আসবে।"

"আসবেই ?"

"আসাই সম্ভব। সীতার সেভিং গ্রেস পড়াশোনায় মেধা এবং একাগ্রতা। সেটা ওকে অনেকখানি বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু কতখানি, এবং কতদিন, তা আমি বলব কি ক'রে ?"

তুমি, তোমার পরে মা, তোমরা দুজনে যখন নিউ ইয়র্ক চলে গেলে, মিতু তো খুব সাহস দেখিয়ে ছোটকাকার বাড়ী রইল, আমি, সাহস না দেখিয়ে রয়ে গেলাম হ'স্টেলে, তোমার যাবার সময় তুমি আর আমি দুজনেই কিন্তু খুব কেঁদেছিলাম পালাম বন্দরে, তিন মাসের মধ্যেই তোমাদের না থাকাটা আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় বাস্তবে পরিণত হল, সপ্তাহশেষে মিলিত হলে এ ছাড়া মিতু আর আমার বলবার প্রায় কিছুই থাকত না, অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা অতি অল্প সময়ে তোমাদের না-থাকাতে এসে ধাক্কা খেত; আমরা দুজনে কিছুই যেন একা একা উপভোগ করতে পারতাম না, মিতুর স্কুল কলেজী লেখাপড়ায় ছেলেবেলা থেকেই বিস্বাদ, এখন সে পড়াশোনা প্রায় ছেড়েই দিল, প্রথম পরীক্ষায় রেজাল্ট খুব খারাপ হল, রোগা হ'য়ে গেল, ছোটকাকা ছোটকাকীর যত্নের স্নেহের কোন ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও, অথচ মুখ ফুটে নালিশ করবার মেয়ে নয় মিতু; আর আমার অবস্থা কি হল তা আমিই জানি, আমার পৃথিবীর একটা নিবিড় আপনার অংশ বন্ধ হ'য়ে গেল, আমি নানা রকম দলে ভিড়তে লাগলাম, এমনকি রাজনৈতিক দলেও, আমরা কয়েকজন ছাত্রছাত্রী একদিন একটি "বিপ্লবী" পাঠচক্র খুলে বসলাম, গরম গরম আলোচনা হতে লাগল আমাদের পাঠচক্রে, আমরা এক বস্তিতে একটি স্কুল পর্যন্ত শুরু করলাম, যার মাধ্যমে বস্তিবাসীদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেবার প্ল্যান তৈরী হল, এক কথায়, পশ্চিমবঙ্গে এবং অন্যত্র ১৯৬৮ সালে যে নতুন বৈপ্লবিক আলোড়ন দেখা দিল, তার তপ্ত হাওয়া বয়ে গেল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়েও। কিন্তু বেশি দিন রইল না, কয়েকটি ছেলে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল বিহারে, অন্ধ্রপ্রদেশে, পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লবীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গ্রামের চাষীদের সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাবার সংকল্পে; যারা তা করল না, তাদের মধ্যে ভাঙন ধরল, পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল কয়েকজনকে, কয়েকজনের বাবারা তাদের নানা প্রকারে

ঠাণ্ডা করে আনল, এবং একদিন আমাদের পাঠচক্র উঠে গেল, তারপর স্কুলও; আমি তাতে আরও বেশি বিভ্রান্ত বোধ করলাম।

বিনা নোটিশে আমি হাজির হয়েছিলাম সীতাদের বাড়ী। খালি বাড়ীতে সীতা পরমেশ্বরম একা একা গ্লাস ভরতি হুইস্কি পান করছে। আমাকে দেখে সীতা একটু অপ্রস্তুত হ'য়েছিল। আমি তার চেয়ে অনেক বেশি।

না বলে পারিনি: "তুমি মদ ধরেছ বুঝি? কবে থেকে?"

সীতা বলেছিল, "হালে।"

বলেছিলাম, "না ধরে পারলে না?"

"না।"

"প্রায়ই খাও?"

"যখন খুব ইচ্ছে হয়।"

"ভাল লাগে?"

"হুম্‌ম্‌।"

"পড়াশোনা করছ? পরীক্ষা তো সামনে!"

"সেজন্যেই মদ খাচ্ছি।"

"সুবিধে হয়?"

"তা হয়।"

"বেশি খাও না তো?"

"মাতাল হই নি এখনও।"

"ওঁরা জানেন?"

"জানি না। বয়ে গেল জানলে।"

"মা কোথায়?"

"ভাগবদ গীতা পাঠ শুনতে গেছেন লোদি কলোনিতে।"

"বাবা?

"টোকিও-তে।

"একাই আজ তাহলে বাড়ীতে:"

"কিছুক্ষণ।"

"আর্দালিটা?"

"মার সঙ্গে গেছে।"

"ঝি?"

"এত খোঁজ নিচ্ছ কেন? কু-অভিসন্ধি আছে নাকি? ওকাজ এখনও শুরু করি নি।"

"আমি চলি। আর একদিন আসব।"

"আগে থেকে খবর দিয়ে এসো। তাহলে তোমার পছন্দমত পবিত্র মেয়ে হ'য়ে অপেক্ষা করব।"

আমার তখন কান্না পেয়ে গেছে। বললাম, "সীতা, আমার কাছে তোমার পবিত্রতা কোন দিন নষ্ট হবে না। আমি তো পুরুষের দৃষ্টিতে তোমাকে দেখি না। দেখি মানুষের দৃষ্টিতে। আমার বড় ভয় তোমার শরীর মন-নিয়ে। পবিত্র থাকবেই তুমি। কিন্তু সুস্থ না থাকলে ফার্স্ট ক্লাস পাবে না।"

সেদিন রাত্রেই তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম, বাবা। লিখেছিলাম, তোমাদের ছেড়ে মিতু আর আমি দেশে আর থাকতে পারছি না। লিখেছিলাম, নিজের মেধার জোরে বিদেশে গিয়ে পড়া হবে এমন আশা রাখি নে। তুমি রয়েছ নিউ ইয়র্কে, গবেষণা করছ আর বই লিখছ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, এ সুযোগে যদি আমিও ওখানে প'ড়ে পি এইচ-ডি ক'রে নিতে পারি তাহলে একটা অসাধ্য সাধিত হবে। লিখেছিলাম, তোমার আয়ে চারজনের খরচপত্র চালান কষ্টকর হবে জানি; কিন্তু মিতু আর আমিও সাধ্যমত রোজগার করব, মা-ও নিশ্চয় কাজ পেলে সানন্দে চাকরী করবে, আমরা চারজনে একসঙ্গে উদ্যোগী হলে নিশ্চয় অর্থের অভাব খুব প্রকট হবে না। সব শেষে লিখেছিলাম, "আর পারছি না থাকতে এখানে। সীতা মদ খাচ্ছে। আমার চারপাশের পৃথিবী যেন ভেঙ্গে পড়ছে। পাঠচক্র উঠে গেল। অবিনাশ পাণ্ডে বিহারে চাষীদের বন্দুক চালান শেখাচ্ছে। জগৎ শেঠকে পরশু পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। আমাদের স্কুলটাও উঠি উঠি। যতটুকু টিকে আছে কেবল মধু লালের জন্যে। এই সর্বব্যাপী দিকভ্রান্তির মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা, মন শক্ত আছে একমাত্র মধু লালের। কিন্তু তাকেও আমার অসহ্য লাগে। মধুলাল বড় ভাল মেয়ে। তাকে আমি সইতে পারি নে। সে আমাকে হিরো ওয়ার্শিপ করে। আমি সীতার বিদ্রূপ ও বর্জন যেমন সইতে পারি নে, তেমনি পারিনে মধু লালের ভক্তি। বাবা, তুমি আমাকে উদ্ধার করো।"

সুজান ফোর্ড নামক যে ঘটনা আমার প্রথম প্রদীপ্ত যৌবনের সঙ্গে বিস্ফোরণে মিলিত হয়েছিল, আগুন আর বারুদ যেমন মিলিত হয়ে থাকে, এবং যে ঘটনার মুকুরে, বাবা, আমি তোমার এক নতুন রূপ দেখতে পেয়েছিলাম, যে ঘটনা আমার কাছে প্রবীণ, নূতন ও প্রাচীনের দ্বন্দ্ব মিলন-তত্ত্ব প্রতিভাত করেছিল, তার পুনঃবিন্যাস করতে হলে আমাকে কিছুটা অতীত পরিক্রমণ করতে হয়। এমন কিছু অতীত নয় দেওয়াল পঞ্জিকার মাপে, মাত্র তো গোটা চার পাঁচেক বছর, কিন্তু মনে হয় যেন অনেক কাল আগের কথা, কাল কখনও কখনও এমনি শত্রুতা করে বসে আমাদের সঙ্গে; কখনও সে মন্থরগতি, কখনও দুরন্ত উদ্বেলতার প্রবাহ, কোনও কোনও অতীতের পদচিহ্ন

অনুসন্ধানেও অবলুপ্ত, প্রায়, আবার কোনও কোনও অতীত মৃত্যুহীন, যতদিন আমরা জীবিত। মানুষ তো স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার গোঁজামিল সমষ্টি, যা ঘটে গেছে, যা ইতিহাস, তার কতোটুকু সত্যি, কতোটুকু সৃষ্টি ? অতীতকে বার বার পুনঃনির্মিত করে না কেবল ঐতিহাসিক, করে থাকি আমরাও, যারা সাধারণ মানুষ, অথচ জীবন যাদের কাছে কিছুতেই একেবারে সাধারণ নয়, আমাদের অতীতকে আমরা বারবার ঢেলে সাজাতে চেষ্টিত হই, তাই না আত্ম-জীবনী অন্যের দ্বারা লিখিত জীবনী থেকেও অনেক সময় অধিক পুনঃনির্মিত ! আমি যখন আমার পঁচিশ বছরের অতীত আলো-আঁধারে অবগাহন করি, ঘটনার, মানুষের তীরভূমি কি বিচিত্র রহস্যে আমাকে ডাকে, বলে, একটিবার কিছুক্ষণ কাটিয়ে যাও আমাদের সঙ্গে,আমাদের বাদ দিয়ে তোমার বর্তমান পাংশু, ভবিষ্যৎ পাণ্ডুর। সুজান কোর্ড আমার অতীত সমুদ্রে (অথবা সরোবরে) এমনি একটি তীরভূমি যা আমাকে চিরদিন, অন্তত বহুদিন, ডাকবে, এবং তার ডাক আমি উপেক্ষা করতে পারব না।

তোমার অনুমতি ও অর্থের কল্যাণে মিতু আর আমি এপ্রিলে একদিন দশ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম সোজা নিউ দিল্লি থেকে নিউ ইয়র্ক। জ্যোতিষ দিয়ে যাত্রার দিন ঠিক করাই নি, তুমিও আজ পর্যন্ত করো নি কখনও, তাই বুঝি দেবতারা যাত্রাটাকে নিয়ে একটু নিষ্ঠুর রসিকতা করেছিলেন।

কথা ছিল লণ্ডন হয়ে নিউ ইয়র্ক যাবো, দুতিন দিন কাটিয়ে যাবো লণ্ডনে। ইংরাজী সাহিত্যের ছাত্র আমি, ইংল্যাণ্ড আমার স্বপ্নের দেশ, কতোবার আমি লণ্ডনের অতীত পথে চলে বেড়াতে দেখেছি সেক্সপীয়রকে, মিলটনকে, পোপ-ড্রাইডেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ-শেলী-কীটস-কোলরিজকে, তাঁদের চলার পথের ধুলোকে চুমু খেয়ে অমৃত আস্বাদের প্রলোভন কতোই না আমাকে উত্তেজিত করেছে। হায় ঈশ্বর, এরপর ফ্রান্সের বিমানপোত লণ্ডনে যেতেই দিল না আমাদের। নিয়ে তুলল ফ্রাংকফুর্টে। ভীষণ লালচে একটা লোক, যার ইংরাজী উচ্চারণ পাথর ভাঙার শব্দ, অর্থাৎ যে জাতিতে ডাচ্, আমাদের টিকিটদুটোর ওপরে এক-তৃতীয়াংশ সেকেণ্ড দৃষ্টি রেখে নিদয় ঘোষণা করল, "তোমাদের লণ্ডন যাওয়ার উপায় নেই। সোজা নিউ ইয়র্ক !"

মিতু আর আমি একসঙ্গে এমন ভয় পেয়ে গেলাম যে একটা কথাও নির্গত হল না আমাদের গলা থেকে।

যখন আমি কিছু বলার মতো সাহস সংগ্রহ করলাম, লাল লোকটা তখন একটি রূপসী যাত্রীর ওপর মনোযোগ উজাড় করে দিয়েছে ; আমরা তার কাছে স্রেফ অস্তিত্বহীন।

প্লেনে বসে মিতু বলল, "বাবা মা তো জানে আমরা লণ্ডনে তিনদিন থাকবো !

আমি রেগে উঠে বললাম, "থাকছি যে না, তার দোষ আমাদের নয়!"

মিতু বলল, "এদের দিয়ে বাবাকে একটা কেবল্ পাঠাতে পারলে না?"

আমি বললাম' "আগে বলিসনি কেন?"

মিতু বলল, "তুই সবকিছুর চার্জে নিজেকে বহাল করিস নি?"

করেছিলাম। রওনা হবার সময় মিতুকে বলেছিলাম, সর্দারী করবি না একদম। সবকিছুর চার্জে আমি। আমার কথা শুনে চলবি। সব সময় আমার গায়ে লেগে থাকবি। একমুহূর্তের জন্যে কাছছাড়া হবি নি। কিছু একটা ঘটে গেলে বাবা-মা আমায় আস্ত রাখবে না।

জীবনে সেই প্রথম, এবং শেষ, মিতু বিনা প্রতিবাদে আমার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল। হায়, সে নেতৃত্ব বারো ঘণ্টাও বেঁচে থাকছে না!

আমি চাপা গর্জনে ব'লে উঠলাম, "সবকিছু একটা লোকের সব সময় খেয়াল হয় নাকি? তুই বলে দিতে পারলি না?"

মিতু বলল, "এদের কাউকে বল্ না এখন?"

এরা মানে প্লেনের হোষ্টেসরা।

আমি বললাম, "লাভ নেই! দেখলি না, লাল লোকটার মেজাজ। এরা কিসস্যু করবে না।"

মিতু চুপ করে গেল। একটু পরে উঠল। আমি তখন একটা বই-এ মন দেবার ভান করছি, মনের মধ্যে ভয়, দুশ্চিন্তা, হতাশা, রাগ একত্র হয়ে দারুণ কাণ্ড করছে!

"কোথা যাচ্ছিস!"

"আসছি।"

মানে, বাথরুমে যাচ্ছে।

ফিরতে একটু দেরী দেখে আমি যখন শংকিত হয়ে উঠেছি, মিতু একটা জলজ্যান্ত স্টুয়ার্টকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল।

"একে লিখে দে কি মেসেজ পাঠাতে হবে বাবাকে। দেখিস্, ঠিকানা আর ফোন নাম্বার ভুল করিস নি!"

আমি হতভম্ব হবার সময় পর্যন্ত পেলাম না।

তোমার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার ও তার সঙ্গে আমাদের নিউ ইয়র্ক পৌঁছবার দিন ও সময় একটুকরো কাগজে লিখে স্টুয়ার্টের হাতে দিলাম।

আমাদের দুজনের হ'য়ে মিতুই তাকে মিষ্টি ভাষায় সঙ্গে একগাল হাসি মিলিয়ে "অনেক, অনেক, অনেক ধন্যবাদ" জানাল।

আমি মন্তব্য করলাম, "খুব স্মার্ট হয়েছিস্, না?"

মিতু প্রশ্ন করল, ঠিকানাটা ঠিক দিয়েছিস তো ?"

আমি গর্জে উঠলাম, "তবে কি ?"

"ডায়েরিটা দেখলি তো না।"

আমি বললাম, "কোনও নাম্বারই আমি ভুল করি না। তোর মতো না কি ?"

মিতু বলল, "নিশ্চয় না। কখনও না।"

ফ্রাংকফুর্টেই আমরা একটা নিদারুণ খবর জানতে পেরেছিলাম, সেনেটর রবার্ট কেনেডিকে কে-একজন গুলি করেছে, তাঁর অবস্থা আশংকাজনক। প্লেনে এই নিয়ে অনেকেই চাপা-উত্তেজিত আলোচনা করছিল। কাউকে প্রশ্ন করবার সাহস আমাদের হয়নি, শুধু কথাবার্তার বিক্ষিপ্ত অংশ আমাদের কানে আসছিল।

আটলান্টিক মহাসাগর পেরুবার মতো ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে বিমানযাত্রা দ্বিতীয় নেই। প্লেন চলছে তো চলছে তো চলছেই : এঞ্জিনের একটানা শব্দ শুনতে শুনতে মাথায় ঝিম ধরে যায়, ব'সে ব'সে পিঠ আর পা টনটন করে, একটু উঠে দাঁড়াবার, বা ঘুরে-বেড়াবার উপায় নেই, এক টয়লেট-যাত্রা ছাড়া। যাত্রীদের দেখে দেখেও আমরা দুজনে "থকে" গেছি। ভাগ্যিস এর মধ্যে দু'বার খেতে দিয়ে গেল, তাইতে তবু আমাদের একঘেয়েমির একটু লাঘব হল। দ্বিতীয়বার খাবার পর মিতুর বমি-বমি লাগতে শুরু করল। এবার আমি হস্টেসকে ডেকে একটা এ্যাভমিন চেয়ে নিলাম। জলের সঙ্গে বড়িটা গিলে মিতু বলল, "ধন্যবাদ।"

কেনেডি বন্দরে বিমান থেকে নামবার সময় আমি আবার মিতুকে সাবধান ক'রে দিলাম, "এক মুহূর্তের জন্যও আমার কাছ ছাড়া হবি না। এখানে প্রত্যেক মিনিটে একখানা প্লেন নামে। হাজার হাজার লোকের ভিড় হবে বাইরে। খুব সাবধান।"

মিতুর শরীরটা ঠিক ছিল না। আমার গা-ঘেঁষেই রইল। আমি তখন হঠাৎ দারুণ এনার্জি পেয়ে গেছি। একটু পরেই তো মা আর তোমার দেখা পাব।

ইমিগ্রেশনের বুড়ো মতো লোকটি পুরু চশমার ভেতর থেকে আমাদের যখন তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে, আমি প্রশ্ন ক'রে বসেছি, 'স্যার, রবার্ট কেনেডি কেমন আছেন ?"

লোকটা আমাকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, "মারা গেছেন।"

আমি হতবাক হ'য়ে গেছি, শুনছি, মিতু বলছে, "শু'নে আমরা মর্মাহত হলাম। তিনি একজন মানুষের মতো মানুষ ছিলেন।"

বুড়ো মতন লোকটা প্রশংসার চোখে মিতুকে দেখল।

এগিয়ে যেতে যেতে বললাম, "তুই অত বড় বড় কথাগুলি বললি কি ক'রে ?"

মিতু বলল "বলতে হয়।"

কাষ্টমস লাউঞ্জে শ'তিনেক লোক। কিন্তু পনের মিনিটের মধ্যে আমরা ছাড় পেয়ে গেলাম।

"কিছু ডিক্লেয়ার করার আছে আপনাদের ?"

"না।"

"খাদ্যদ্রব্য কিছু সঙ্গে আছে ?"

"না।"

"সিগারেট ? মদ ?"

"না।"

"চ'লে যান।"

চ'লে তো এলাম ! কাষ্টম্‌স্ লাউঞ্জের পরেই যাত্রীদের আত্মীয় বন্ধুদের ভিড়, বাইরে যাবার দরজা। আমাদের চার চোখ ভীত শংকিত প্রত্যাশায় চতুর্দিক তন্ন তন্ন ক'রেও তোমাকে আর মাকে দেখতে পেল না। প্রায় শ'খানেক লোক এসেছে যাত্রীদের নিয়ে যেতে। তোমরা আসো নি।

মিতু ঘোষণা করল, "বাবা-মা নেই এখানে।"

আমি ক্ষীণস্বরে ভরসা দিলাম, "দাঁড়া ভালো করে দেখে নি !"

মিতু বলল, "থাকলে এতক্ষণে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরতো আমাদের। ওঁরা তোর তার পায় নি।"

"তার পাঠিয়েছে কিনা তারই বা ঠিক কি ?"

মিতু বলল, "চল, এগিয়ে চল। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে ?"

দেখতে পেলাম একদিকে লেখা আছে : "ট্যাক্সি।" "রাস্তায় যাওয়ার পথ।"

এগিয়ে যেতে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেলাম।

পায়ের স্পর্শেই যে এদেশের দরজা খুলে যায়, হাত দিয়ে খুলতে হয় না, তা কি আমি জানতাম ?

আমি সত্যি সত্যি, লিটারেলি, হুমড়ি খেয়ে নিউ ওয়ার্লডে প্রবেশ করলাম।

পিছন থেকে মিতু বলল, "বোকা কোথাকার !"

বাইরে এসে'ও তোমাদের চিহ্ন খুঁজে পেলাম না।

কিছুক্ষণ পরে মিতু বলল, "এবার কি হবে ?"

আমার মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। "দাঁড়া, ফোন করা যাক।"

এনকোয়ারীস্ কাউন্টারে দেখলাম একটি মেয়ে ব'সে আছে।

সামনে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, "এখান থেকে ফোন করবো কি ক'রে ?"

মেয়েটি তর্জনী নির্দেশে দেখিয়ে দিল এক দিকে লেখা আছে "টেলিফোন্‌স্।"

দুজনে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম পাশাপাশি অসংখ্য টেলিফোনের সারি। প্রত্যেকটাই "ব্যস্ত।" প্রত্যেকটার জন্য লাইন লেগেছে। লক্ষ্য করলাম, লোকেরা কোনও একটা মুদ্রা স্লটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ডায়াল করছে।

আমার আগের লোকটিকে প্রশ্ন করলাম, "টেলিফোন করতে হ'লে কত পয়সা ঢালতে হয়?"

জবাব এল, "ডাইম।"

মিতু প্রশ্ন করল, "ডাইম আছে তোর কাছে?"

আমি উত্তর দিতে বাধ্য হলাম, "নেই।"

মিতু হঠাৎ লাইন থেকে বেরিয়ে সেই মেয়েটির কাছে চ'লে গেল। ফিরে এল দশটা ডাইম নিয়ে।

নম্বর তো আমি কদাচ ভুলি না; তবু মিতু যখন বলল, ডিরেকটরির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে, ওর কথা ফেলবার মতো সাহস হ'ল না।

সামনের লোকটাকেই প্রশ্ন করলাম, "টেলিফোন ডিরেক্টরি পাওয়া যাবে?"

বুঝল না।

মিতু বুঝিয়ে বলল। "আমরা একটা টেলিফোন নম্বর জানতে চাই। কি ক'রে জানা সম্ভব?"

লোকটা বলে উঠল, "ও! টেলিফোন বুকস? ঐ যে!"

চোখ পড়ল ডজনখানেক বিরাট বিরাট বই-এ, পাশাপাশি স্টীল-ফ্রেমে রাখা। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম ম্যানহাটান, ব্রঙ্কস্, ব্রুকলিন, ষ্ট্যাটেন আইল্যাণ্ড। এই সর্বনাশ! তোমরা কোথায় বাস করো? ম্যানহাটানে? ব্রুকলিনে? কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কোথায়?

ফিরে এলাম। আমার টার্ন এসে গেছে। মিতু ডাকছে। পেছনে চার পাঁচজন লোক।

ডাইম ঢুকিয়ে কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটিতে ফোন করলাম।

যে মহিলা আওয়াজ দিল তাকে তোমার নাম বলতে, জানতে চাইল কোন বিল্ডিংএ তোমার আপিস। জানা ছিল না, অতএব, তোমার ইন্‌ষ্টিটিউটের নাম করলাম।

"ওয়ান মোমেণ্ট প্লীজ।"

এবার ফোনে অন্য নারী-কণ্ঠ।

তুমি সেদিন স্কুলেই আসো নি!

আমি তখন বেপরোয়া! বলে ফেললাম, আমরা দুজনে কেনেডি এয়ারপোর্টে নেমেছি, নিউ ইয়র্কে এই প্রথম পদার্পণ, তোমাদের উপস্থিত না দেখে, বিপন্ন।

অন্তপ্রান্তে মহিলা বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, "তোমার বা মার বাড়ীর নম্বর দিচ্ছি। ওখানে কল্ করো।"

নম্বর তো আমার জানাই ছিল। দ্বিতীয় ডাইম স্লটে ঢুকিয়ে তোমার অথবা মার কণ্ঠস্বর শোনবার আশায় কয়েক সেকেণ্ড অধৈর্য অপেক্ষার পর, এক পাথর-ঘষা পুরুষ কণ্ঠ আওয়াজ করল, "হ্যালো।"

আমি তোমার নাম করলাম। সে বুঝল না। আবার তোমার নাম করলাম। এবারও সে বুঝল না। আমি তোমার নাম বানান করে বললাম। তথাপি সে বুঝল না। আমি মরীয়া হ'য়ে আর একবার তোমার নাম করলাম। এবার সে বুঝল।

এবং বলল, "দে' মুভড।" বলে টেলিফোন রেখে দিল।

মুভড্ মানে যে বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেছে, বুঝতে আমার এক মিনিট লাগল। ইতিমধ্যে লাইনের লোকেরা টেলিফোন ব্যবহারের জন্য অধৈর্য হ'য়ে উঠেছে।

মিতুকে টেনে নিয়ে লাইন থেকে সরে এলাম। বললাম, "কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। চল্ আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ী চ'লে যাই।"

ভারতসরকার দাক্ষিণ্যভরে আমাদের ষোল ডলার দিয়েছিলেন। তার মধ্যে দু ডলার খরচ ক'রে ব'সে আছি।

সুটকেশ দুটো এমনিতেই ভারী ছিল। এখন আরও অনেক ভারী মনে হল।

দুজনে দুটো স্যুটকেশ বহন ক'রে বাইরে এসে দেখতে পেলাম কয়েকটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। লাইনের প্রথমে যে ট্যাক্সি তার চালকের রং সাদা। মানে, সাহেব। বাঁচা গেল! নিউ ইয়র্কে এসেই নিগ্রো ট্যাক্সিওয়ালার খপ্পরে পড়তে হ'ল না, অনেক দুর্ভাগ্যের মধ্যে একরত্তি রূপালি রেখা।

লোকটা বলল, "কোথা যাবে?"

ঠিকানা বললাম।

লোকটা বলল, "অনেক দূর। কুড়ি ডলার লাগবে।"

আমি বুদ্ধি দেখিয়ে বললাম, "মিটারে যা উঠবে তাই দেব।"

সে বলল, "মিটারে পঁচিশ ডলার উঠবে। তোমাদের সস্তা করে দিচ্ছি। কুড়ি ডলার।"

মিতু বলে ফেলল, "অত টাকা নেই আমাদের কাছে।"

লোকটা দয়া দেখিয়ে বলল, "কতো আছে?"

মিতুকে থামিয়ে আমি বললাম, "বারো।"

লোকটা প্রথমে মুখ ভেংচালো। তারপর, দুটি বিপন্ন দরিদ্র ভারতীয় ছেলেমেয়েকে উদ্ধার করবার ঔদার্যে, ক্ষতি স্বীকার ক'রে ব'লে বসল, "তাই দিয়ো। চটপট ব'সে

যাও গাড়ীতে।" ব'লে নিজেই দুহাতে দুটো সুটকেশ তুলে নিয়ে গাড়ীর সামনের সীটে রাখল।

গাড়ী চলতে শুরু করলে লোকটা আলাপ জুড়ে বসল। আমরা ভারতবাসী জেনে সংক্ষেপে বলল, "ইণ্ডিয়া তো খুব গরীব দেশ! কতলোক না খেয়ে মরছে! তাই না?"

আমি দেশের বাইরে গিয়ে হঠাৎ দেশপ্রেমিক হ'য়ে উঠলাম। বললাম, "কতো লোক আমাদের দেশে তা জানো?"

জানেনা।

বললাম, "পাঁচশ মীলিয়ন লোক। প্রত্যেক বছর চৌদ্দ মীলিয়ন লোক বাড়ে। মানে, সারা অস্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা প্রতি বছর আমাদের লোকসংখ্যার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। তোমাদের দেশে এত লোক থাকলে তোমরাও দুবেলা খেতে পেতে না। তাছাড়া ইণ্ডিয়া তোমার দেশের তিনভাগের একভাগ। বুঝলে?"

লোকটা বুঝল কিনা কে জানে, তবে চুপ হ'য়ে গেল। অবশ্যি খানিক সময়ের জন্যে। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, "তোমরা স্বামী-স্ত্রী?"

মিতু জবাব দিল। "না। আমরা ভাইবোন।"

অবাক হ'ল লোকটা। চমৎকৃতও হ'ল।

"ভাইবোন? একসঙ্গে চ'লে এসেছ? খুব ভালো! আমাদের কালে এদেশেও এমনি ছিল। এখন আর নেই। ভাইবোনকে কদাচ একসঙ্গে দেখবে না। ভাইকে দেখবে তার 'গার্লে'র সঙ্গে; বোনকে তার বয়-ফ্রেণ্ডের সঙ্গে। আমার ছেলে মেয়ে সাতটা। তিন ছেলে, চার মেয়ে। কেউ কারুর সঙ্গে বেরুবে না। একত্র হলেই ঝগড়া।"

মিতু বলল, "ঝগড়া তো আমরাও করি!"

লোকটা বলল, "কিন্তু তোমরা একসঙ্গে ইণ্ডিয়া থেকে নিউ ইয়র্ক চলে এসেছ! বেড়াতে এসেছ বুঝি?"

এবার আমি বললাম, "না। আমাদের বাবা-মার কাছে এসেছি। পড়তে।

লোকটা শুনে খুব খুশি। "তোমাদের বাবা-মা বুঝি ইমিগ্র্যাণ্ট?"

আমি বললাম, "না, আমার বাবা কলাম্বিয়া ইউনিভারসিটিতে অধ্যাপনা করতে এসেছেন। আর, বই লিখতে। দুতিন বছর পরে দেশে ফিরে যাবেন।"

"তোমরা?"

"আমরাও পড়া শেষ হ'লে দেশে ফিরে যাবো।"

লোকটা একটু দুঃখিত হ'ল। "কেন? আমেরিকায় থাকতে ভালো লাগবে না?"

আমি বললাম, "সে জন্যে নয়। পড়বো এখানে। কাজ করবো নিজের দেশে।"

এবার আবার খুশি হ'ল লোকটা, "নিশ্চয়। ইণ্ডিয়ার খুব দরকার উচ্চশিক্ষিত যুবকযুবতির। তোমাদের দেশে তো বেশির ভাগ লোক নিরক্ষর!"

আমি বললাম, "একশ' জনের মধ্যে সত্তর জন।"

জিভ দিয়ে দুঃখসূচক শব্দ করল লোকটা।

"কি পড়বে তুমি?"

"প্রথম এম. এ. পড়ব। তারপর পি-এইচ-ডি।"

"তোমার বোন?"

"টেলিভিশন।"

"তার মানে তোমরা উচ্চশিক্ষিত পরিবার। আমার একটা ছেলে আর দুটো মেয়ে কলেজে পড়ছে। বাকীগুলি স্কুল পাশ ক'রে চাকরিতে লেগে গেছে।"

মিতু জানতে চাইল, "তোমরা সবাই এক সঙ্গে বাস করো?"

লোকটা বলল, "শুধু ছোট দুটো মেয়ে আমাদের সঙ্গে থাকে। বাকীরা সব নিজের ব্যবস্থা নিজে ক'রে নিয়েছে।"

লোকটা ব'লে চলল, "আজকাল বাপ-মা হওয়া কেবল হতাশা আর দুঃখ। ছেলে-মেয়েরা কেবল স্বাধীন নয়, ভীষণ স্বার্থপর। শুধু নিজেদেরটা চেনে, আমাদের সঙ্গে বছরে একবার দেখাও করতে আসে না। যারা কলেজে পড়ছে তাদের তো কথাই নেই। তারা সব বিগড়ে গেছে। একটা ছেলেকে ড্রাফ্‌ট করতে, সে কানাডা পালিয়ে গেছে। দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে পারলে আমরা বর্তে যেতাম। এই ছাখ, আমার পিঠে এখনও দাগ আছে। গত মহাযুদ্ধে তিনবার আমি আহত হ'য়েছিলাম। আর আমার ছেলেরা দেশের জন্যে লড়তে রাজী নয়। তারা বলছে, ভীয়েৎনামের যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ নয়। জনসনের যুদ্ধ। ভেবে দেখ! প্রেসিডেণ্ট কি প্রত্যেক নাগরিকের অনুমতি নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেবে? প্রেসিডেণ্টের যুদ্ধ মানেই তো জাতির যুদ্ধ, দেশের যুদ্ধ। বড় ছেলেটাতো কানাডা পালিয়ে গেছে! ছোটটা আজ মিছিল করছে, কাল পুলিশের গায়ে ইট ছুঁড়ছে। আর একটা মেয়ে কি ব'লে জানো? আমাকে বলে, ড্যাড, তুমি একটা ক্ষুদে হিটলার! শুনে এমন রেগে গিয়েছিলাম যে হাতে পিস্তল থাকলে নির্ঘাৎ গুলি ক'রে বসতাম! বাপ হ'য়ে আর সুখ নেই!"

ইতিমধ্যে আমরা বিরাট বিরাট বাড়ী আর অসম্ভব চওড়া রাস্তা পার হ'য়ে কোথায় চলেছি ঈশ্বর জানেন। মনে হচ্ছে আমাদের সামনে, পেছনে, ডাইনে, বায়ে, কাছাকছি, কিছুদূরে, বেশ দূরে লক্ষ লক্ষ মোটর গাড়ী চলছে চলছে চলছে;

অথচ একটাও হর্নের আওয়াজ নেই, শুধু ভীষণ শক্তিশালী এন্‌জিনের সমবেত শব্দ, মাথার মধ্যে তাই বাজছে, বাজছে, বাজছে। পথ-চলা মানুষ একটাও দেখতে পাই নি যতোক্ষণ না ট্যাক্সি শহরের মধ্যে ঢুকেছে। নিউ ইয়র্ক শহরে প্রথম পরিচয় আমাদের মুগ্ধ করে নি, বরং হতাশ করেছে। রাস্তা নোংরা। পথ-চলা লোকেদের মধ্যে বেশির ভাগই বুঝি কালো। শুধু একের পর এক বড় বড় বাড়ী। আকাশ-ছোঁয়া বাড়ী। আবার ছোট দোতলা তিনতলা বাড়ী। পার্ক নেই। নদী নেই। ঝরণা নেই। শুধু বাড়ী আর গাড়ী আর মানুষ আর দোকান আর মোটরের একটানা শব্দ!

এমনি করেই একসময় একটা রাস্তায় একটা বাড়ীর সামনে ট্যাকসি এসে থামল। চালক বলল, "এই তোমাদের বাড়ী।"

আমরা দুজনেই দেখতে পেলাম একটা লাল-ইটের ছোট্ট দোতলা বাড়ী, সামনে দরজায় ওপরে লেখা : ১৯৯৮! রাস্তার নাম য়ুনিভারসিটি এ্যাভিনিউ।

ট্যাক্সির চালক স্যুটকেস দুটো রাস্তায় নামিয়ে বারো ডলার নিয়ে বিদায় হ'য়ে গেল।

আমরা দুজনে কম্পিত বুকে বাড়ীটা দেখতে লাগলাম।

দরজায় তালা ঝুলছে। দেখে মনে হচ্ছে, এ বাড়ীতে বহুদিন বাস করেনি কেউ।

পরপর অনেকগুলি একই ধরনের একই সাইজের বাড়ী। অথচ একটা লোকও চোখে পড়ছে না।

আমি আর মিতু দুজন দুজনের দিকে তাকাচ্ছি।

কিছুক্ষণ পরে পাশের বাড়ী থেকে একটি বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ১৯৯৮ নম্বরে যারা ছিল তারা কোথায়?

বৃদ্ধ অবাক হলেন। বললেন, "এ বাড়ীতে তিন বছর তো কেউ বাস করছে না।"

আমাদের হতবাক আর বিপন্ন দেখে বৃদ্ধ জানতে চাইলেন, "তোমরা কারা? কোথা থেকে আসছ?"

আমাদের কাহিনী শুনে বৃদ্ধ নিজের বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেন। চেঁচিয়ে বললেন, "ওগো, দেখো এসে দুটি ইণ্ডিয়ান ছেলে মেয়ে বড় বিপদে পড়েছে।"

এক বর্ষিয়সী মহিলা বেরিয়ে এলেন। বৃদ্ধ তাঁকে আমাদের কথা বলতে, তিনি প্রথমেই বললেন, "ওদের ভিতরে নিয়ে এসো। বেচারারা ত্রিশ ঘণ্টা প্লেনে কাটিয়েছে, নিশ্চয় ভীষণ ক্লান্ত। ক্ষিদেও নিশ্চয় পেয়েছে খুব।" আমাদের বললেন, "ভয় পেও না। তোমাদের বাবা-মা'র সন্ধান করা কিছু কঠিন কাজ নয়।"

আমরা ভেতরে গেলাম। বৃদ্ধ বললেন, "আমার নাম ও'কনর। জন ও'কনর। আমার স্ত্রীর নাম সিলভিয়া।"

আমি আমাদের নাম বললাম।

একটি বছর ত্রিশের মহিলা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। একগাল হেসে আমাদের অভিবাদন করলেন। বললেন, "আমার নাম জ্যাকী।"

মিসেস ও'কনর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ট্রে-ভর্তি চা, কেক, বিস্কুট নিয়ে এলেন। কয়েক মিনিটে আমরা ওদের লোক হ'য়ে গেলাম। মিতু আলাপ জমাতে জন্ম থেকেই ওস্তাদ। মিসেস ও'কনর এক নজরে মিতুর প্রেমে প'ড়ে গেলেন। আমাদের কাহিনী শুনে ওঁরা তিনজনেই বললেন, "নিশ্চয় কিছু একটা ভুল হ'য়েছে। ঠিকানা অথবা টেলিফোন নম্বর। তোমাদের বাবা তো কলম্বিয়া য়ুনিভারসিটিতে কাজ করছেন। কাল তাঁকে খুঁজে পেতে মুস্কিল হবে না। ভুলে যেয়ো না, আজ শনিবার। এদেশে সপ্তাহে দু'দিন সব ছুটি।"

মিসেস ও'কনর তাঁর মেয়েকে বললেন, "তোমার ঘরে এই মেয়েটি শুতে পারবে তো?"

জ্যাকী ও'কনর জবাব দিলেন, "নিশ্চয়ই।"

মিসেস ও'কনর মিতুকে বাথরুমে নিয়ে গেলেন. "তুমি স্নান ক'রে নাও। তোমাকে বড্ড কাহিল দেখাচ্ছে।"

ইতিমধ্যে আমরা ও'কনর পরিবারের ইতিবৃত্ত জেনে গেছি। ওঁরা আইরীশ। জন ও'কনরের ঠাকুর্দা প্রথম চ'লে আসেন আমেরিকায়। জন ও'কনর অটমোবিল কারখানায় সারা জীবন কাজ ক'রে বছর পাঁচেক অবসর নিয়েছেন, তাঁর বয়স এখন সত্তর। মিসেস ও'কনর নার্স ছিলেন, এখন আর চাকরা করেন না। জ্যাকীও নার্স। নিউ ইয়র্কের একটা বিরাট হাসপাতালে নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট। ও'কনরদের দুই ছেলে। বড় ছেলে ইনসিওরেন্স্এ কাজ ক'রে, থাকে ক্যালিফোরনিয়ায়। দ্বিতীয় ছেলে পাদ্রী। সে এখনও বিয়ে করে নি। জ্যাকীও অবিবাহিত।

মিতু যখন বাথরুমে, জ্যাকী আমাকে নিয়ে বসলেন তোমাদের সন্ধান করতে। ব্রন্‌ক্সের টেলিফোনে তোমার নাম পাওয়া গেল। টেলিফোন নম্বর তো আমার জানাই ছিল। তবু চেক ক'রে দেখলাম। আর তক্ষুনি আমার নজর পড়ল বাড়ীর ঠিকানায়।

কি সর্বনাশ! তোমাদের বাড়ীর নম্বর ১১৯৮ তো নয়। ১৮৯১। অথচ আমি প্লেনেও দিয়েছি ১১৯৮। ট্যাক্সি-ওয়ালাকে বলেছি, ১১৯৮।

জ্যাকীকে বলতে তিনি হেসে অস্থির। "নেভার ট্রাষ্ট ইয়র মেমোরী ট্যু মাচ,"

বললেন জ্যাকী ও'কনর। "আমি তো কোনও নম্বর নিয়ে স্বাভিশক্তিতে নির্ভর করি নে।" সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "১৮৯৯ খুব কাছে। এক মাইলও নয়। এসো আগে ফোন ক'রে নি।"

আমিই ফোন করলাম। আবার সেই পাথর ঘষা গলার আওয়াজ হল। কিন্তু এবার সে আমার মুখে উচ্চারিত তোমার নাম বুঝতে পারল। এবং বলল, "ইয়র প্যারেন্ট্‌স্ কেম হিয়ার।" মানে, তোমাদের বাবা-মা এখানে এসেছিলেন।

আমার তখন মাথা ঘুরছে। আমি জ্যাকীকে ফোনটা দিয়ে বললাম, "লোকটা ভীষণ আজেবাজে বলছে। বুঝতে পারছি না। আপনি একটু চেষ্টা করুন।"

জ্যাকী ও'কনর বেশ কিছুক্ষণ লড়লেন। যা বুঝতে পারলেন তা হল : যে ভারতীয় স্বামী-স্ত্রী ঐ বাড়ীর একটা এ্যাপার্টমেন্টে বাস করতেন তাঁরা অন্য কোথাও চলে গেছেন। তাঁরা আজই এসেছিলেন তাঁদের ছেলেমেয়ের চিঠিপত্রের খোঁজ করতে।

ইতিমধ্যে স্নান সেরে শাড়ি বদলে ছিমছাম মিতু আমাদের সঙ্গে একত্রিত হ'য়েছে। মিতুকে দেখে আমার হটাৎ ভীষণ রাগ হ'ল। ও'কনরদের সামনে রাগ প্রকাশ অসম্ভব। শুধু কটমট ক'রে একবার তাকাতে পারলাম মিতুর দিকে। মিতু আমার দৃষ্টি গ্রাহ্যও করল না।

অনায়াসে সিদ্ধান্ত দিয়ে বসল; "চলো আমরা ওখানে গিয়ে হাজির হই।"

মিতু কি ভুলে গেছে আমাদের কাছে দু'টি ডলার অবশিষ্ট ?

জ্যাকী ও'কনর সায় দিয়ে বললেন, "মন্দ আইডিয়া নয়!"

এবার মিতু তার প্রস্তাবের সাংঘাতিক গুরুত্ব বুঝতে পারল। মিতুর মুখ ফ্যাকাশে দেখে আমি আত্মসুখ পেলাম।

জ্যাকী ও'কনর হাতঘড়ি দেখলেন। তিনটে ষোল।

আমার ঘড়িতে তখনও ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম। ঘড়ি মিলিয়ে নেবার পর, জ্যাকী বললেন, "আধঘণ্টার মধ্যে আমাকে বেরুতে হবে। তোমাদের আমি নামিয়ে দিতে পারি।"

মিসেস ও'কনর তাঁর ঘর থেকে, বোঝা গেল, সব শুনছিলেন। ব'লে উঠলেন, "না, না। আমি ওদের নিয়ে যাবো, তুমি চ'লে যাও। যদি ওখানে কারুর সন্ধান না পাওয়া যায়, ওরা ফিরবে কি ক'রে ?"

জ্যাকী আমাকে স্নান ক'রে নিতে বললেন। আমি কোনও গরজ অনুভব করলাম না। বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধু'য়ে এলাম। আধঘণ্টা পরে জ্যাকী বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। "একটু পরেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে," ভরসা দিয়ে গেলেন। বেরুবার

আগে মিসেস ও'কনরকে ব'লে গেলেন, "সাবধানে গাড়ী চালিও, মা। বেশি উত্তেজিত হ'য়ো না।"

জ্যাকী বেরিয়ে গেলেন গাড়ী মা'র জন্যে রেখে। মিনিট পনের পরে আমাদের দুজনকে নিয়ে মিসেস ও'কনরও পড়লেন বেরিয়ে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ১৮৯৯ নম্বরে পৌঁছে গেল গাড়ী। লাল ইটের নাতিবৃহৎ এ্যাপার্টমেণ্ট হাউস। ঢুকেই বেশ বড় একটা লবী, খুব একটা পরিচ্ছন্ন নয়। লবীর মাঝামাঝি একটা লোকের দর্শন মিলল।

মিসেস ও'কনর প্রশ্ন করলেন, "এ বাড়ীর সুপার কোথায় থাকে জানেন?"

লোকটা বেসমেণ্টের দিকে আঙুল নির্দেশ করল।

মিসেস ও'কনরের পিছু পিছু একধাপ পাতালে নেমে গেলাম মিতু আর আমি, দুজন দুজনের মুখ চাওয়াচাওয়ি ক'রে।

দেখা গেল একটা দরজার গায়ে লেখা "সুপার।"

মিতু আমাকে প্রশ্ন করল, "সুপার মানে কিরে, দাদা?"

আমি বললাম, "সুপারম্যান-ট্যান কিছু বোধহয় হবে।"

দরজা খুলল, সুপারম্যান নয়, সুপারওম্যান। অত মোটা এবং অমন মাংসল স্ত্রী-লোক আমি আগে আর দেখি নি। লম্বায় অনেকখানি, অতএব বিরাট এক স্তূপীকৃত মাংসের পর মাংসের উঁচু পাহাড়। চিবুক থেকে, গাল থেকে, পিঠ, কাঁধ, বুক, বাহু, কোমর, পেট, জংঘা থেকে, এমন কি হাতের আঙুলগুলি থেকেও, মাংস ঝুলে ঝুলে পড়ছে। স্তনের ভারে একটা পাঁচ বছরের শিশুর মুহূর্তে নিঃশ্বাস আটকে মরতে হবে।

সুপারওম্যানকে দেখে মিসেস ও'কনরও ঘাবড়ে গেলেন, দেখতে পেলাম তাঁর মুখ ভীষণ শাদা। কিন্তু তাঁকে কিছু বলতে হল না। আমাদের ওপর নজর পড়া মাত্র সেই মাংসের পাহাড় থেকে জলপ্রপাতের মত শব্দ নির্গত হ'তে শুরু করল।

"হে যীশু! হে ঈশ্বর! হে মা মেরী! এই তো সেই ইণ্ডিয়ান ছেলে আর মেয়ে! গরু! গরু! মোষ! ছাগল! তোমরা নয়। তোমরা নয়। জন! জন! একেবারে গরু। একদম মোষ। আমার স্বামী! কি হতভাগ্য আমি! এই তো এসেছিল! তোমাদের মা ও বাবা! কী ভালো লোক ওরা! এসে বলল, ছেলে মেয়েদের চিঠিপত্র আছে! নেই! শুনে কি দুঃখ! কিন্তু আমি গরু নই। মোষ নই। বললাম, চিঠি নেই! কিন্তু তোমাদের ছেলেমেয়ে এ'সে গেছে! এসে গেছে! জনটার একরত্তি বুদ্ধি থাকলে এখানেই পেয়ে যেতে। কোথায় তারা? তোমার বাবা মার প্রশ্ন! কোথায় আমাদের ছেলেমেয়ে! আমি কি ক'রে বলবো! এয়ারপোর্টে!

ফোন করেছিল। ঐ গাধাটাকে। ঐ গরুটাকে। ব'লে দিয়েছে, হে যুভড্! হে যীশু! হে মেরী। তোমাদের মা তো কেঁদেই ফেলল! গরু! গাধা! একেবারে পুরোপুরি মোষ!"

ইতিমধ্যে সেই গাধা পুরোপুরিমোষ জন এ'সে পাশে দাঁড়িয়েছে। ঢ্যাঙা রোগা ফ্যাকাশে একটা লোক, মাথায় চকচকে কাঁচাপাকা চুল, হাতের শিরাগুলি সবুজ, তুবড়ানো লাল, চ্যাপ্টা চিবুক, ফিকে নীল চোখ।

জন বলল, "কুছ পরোয়া নেই! আমি চিনি তোমার বাবা-মা'র নতুন এ্যাপার্টমেন্ট! আমি পৌঁছে দেব তোমাদের!"

মিসেস ও'কনর প্রশ্ন করল, "কোথায়?"

জন বলল, "কেন? ম্যানহাটান!"

"কোন রাস্তায়? কতো নম্বর?"

"তা জানিনে। বাড়ী বদলাবার সময় আমি সাহায্য করেছি। বাড়ীটা আমার চেনা আছে।"

মাংসের পাহাড় প্রশ্ন করল, "ঠিক বলছ?"

জন বলল, "বিলকুল।"

আমি বললাম, "এক্ষুনি চলো।"

মিসেস ও'কনর বললেন, "তোমার বোনকে আমি ছাড়ছি না। ওকে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি। তুমি যাও এর সঙ্গে। আমাদের বাড়ীর ঠিকানা ও ফোন নম্বর সঙ্গে রাখো। সুপারের ফোন নম্বরও নিয়ে নাও। যদি তোমার বাবা-মাকে পাও, আমাকে ফোন কোরো; তোমার বোনকে পৌঁছে দেব।"

মিতুকে একরকম জোর ক'রেই সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন মিসেস ও'কনর।

জনের সঙ্গে বেরুবার আগে আমি তোমার জন্যে একটি চিরকুট লিখে রাখলাম। ভ'য়ে ভ'য়ে সুপারওম্যানকে বললাম, "যদি আমাদের বাবা-মা আবার আসেন, এটা দেবেন।"

জন আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পায়ে হেঁটে। দু'একটা কথা বলতে গিয়ে দেখলাম, সে না বোঝে আমার ইংরিজী, না বুঝি আমি তার। মিনিট পনের হেঁটে জন সিঁড়ি বেয়ে পাতালে নামল। দেখতে পেলাম, রাস্তার ওপরে নিশানা: "সাবওয়ে।"

একস্কলেটার চেপে যেখানে উপনীত হলাম ভূগর্ভে সে এক রেল-ষ্টেশন। জনই এগিয়ে গিয়ে টিকিট কেটেছিল। ষ্টেশনে কয়েক-মিনিট দাঁড়াতে হুড়মুড় ক'রে একটা ট্রেন এসে গেল। জন সামনের কামরায় উঠে পড়ল। দেখা দেখি আমিও। কয়েক

মুহূর্ত পরে জন দেখি ট্রেন থেকে নেমে পড়ছে। মরীয়া হ'য়ে আমিও লাফ দিয়ে ট্রেন থেকে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল! এক মুহূর্ত দেরী হলেই আমি আটকে যেতাম, আর জনের খোঁজ পেতাম না।

বেরিয়ে এসে আমার মেজাজ চ'ড়ে গেছে। জনকে প্রশ্ন করলাম, "কি হ'ল ?"

জন বলল, "মিস্‌টেক। নট দিস্‌ ট্রেন। আদার ট্রেন।"

কিছু বলতে যাবার আগে মনে হল, লাভ নেই, এক বর্ণও বুঝবে না এই লোকটা।

দু'তিন মিনিট পরেই আর একটা ট্রেন চ'লে এল। এবার জনকে আমি পাকড়ে আছি। তাকে উঠতে না দিয়ে একজন যাত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, এই ট্রেনটা ম্যান-হাটান যাবে কিনা। উত্তরে আশ্বস্ত হ'য়ে জনের সঙ্গে আমিও গাড়ীতে উঠলাম।

মনে হল আশি মাইল স্পীডে ট্রেন চলছে। তিন চার মিনিট পরে এক একটা ষ্টেশন। আধ-মিনিট ষ্টপ্‌ ক'রে ট্রেনের আবার সেই তীব্র গতি। মনে মনে প্রশ্ন, বাবা-মা কি তাহ'লে নিউ ইয়র্কের বাইরে বাসা নিয়েছে।

একটা ষ্টেশনে হঠাৎ দেখি, জন নেই। পরক্ষণেই দেখতে পেলাম, জন নেমে গেছে, দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মে। আমাকে নামতে পর্যন্ত ব'লে নি। ছুট ক'রে নেমে পড়ার সময় ছিল ভাগ্যিস!

এবার বললাম, "তুমি নেমে গেলে, আর আমাকে কিছু বললে না? যদি আমি তোমাকে দেখতে না পেতাম?"

জন শুধু বলল, "ও. কে."

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তায়; মিনিট পনের হেঁটে একটা বিরাট উদ্যান; তার মধ্যে কোথাও বা লেক, কোথাও পাহাড়, কোথাও বিরাট সবুজ লন, আবার ঘন গাছ-পালার সঙ্গবদ্ধ সবুজ। উদ্যানের বুক চিরে পথ। (তখন কি জানি এটাই নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্ক?) পথ দিয়ে যেমন গাড়ির পর গাড়ি, তেমনি পায়ে হাঁটা, সাইকেল চাপা মানুষও। কিন্তু পথ আর ফুরোয় না। মাইল খানেক মনে হ'ল হেঁটেই চলেছি। ক্ষিধেয় পেট ব্যথা করছে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে। জনকে কিছু ব'লে লাভ নেই। যাই বলবো, জবাব হবে: ও. কে.!

ভেবে দেখো, বাবা, পুরো সেন্ট্রাল পার্ক অতিক্রম ক'রে ম্যানহাটানের পুব থেকে আমাকে পশ্চিম অংশে পায়ে হাটিয়ে নিয়ে এসেছে জন। তারপর তিনটে বিরাট বিরাট রাস্তা এবং আরও অনেকটা পথ অতিক্রম ক'রে আমরা ব্রডওয়ে পেরিয়ে ওয়েষ্ট-এণ্ড এ্যাভিনিউতে এসে গেছি। এবার জনের মুখ দিয়ে বোধগম্য ভাষা নির্গত হ'য়েছে, "উই কাম।"

আমরা নাইনটি-ফোর্থ স্ট্রীটের মুখে পৌঁচেছি। জন রাস্তার নম্বর দেখে গলির মধ্যে উঁকি মারছে। আর বলছে, "নো।"

এমনি ক'রে ছয় সাতটা গলিকে জন "নো" ক'রে দেবার পর আমার সত্যিকার ভয় করতে লেগেছে।

জন বলছে, "নো।"

আমি বলছি, "নো হোয়াট?"

জন বলছে, "নো।"

আমি বলছি, "বাড়ী চিনতে পারছ না?"

জন একহাতে কপাল চাপড়ে বলছে, "নো।"

আমি বলছি, "তুমি এসেছিলে বাড়ীতে?"

জন বলছে, "নো।"

"তোমার কিসস্যু মনে নেই?"

জন বলছে, "নো।"

এবং, অবশেষে, জন ঘোষণা করছে, "গো ব্যাক।"

"কোথায়?"

জন একগাল হেসে বলছে, "মাই হাউস!"

জন আমাকে পুরো রাস্তা পুনঃক্রমণ ক'রে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে এল।

অবশ্য, পথে, হঠাৎ, জনের বোধহয় খেয়াল হল আমার ক্ষিধে-তৃষ্ণা লেগে থাকতে পারে।

একটা দোকানে দাঁড়িয়ে জন আমাকে কোক আর ক্যাণ্ডি কিনে দিল। নিজে কিছু খেলো না। জনের পিছু পিছু আমি তার বেসমেন্ট এ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলাম।

এবার লবীতে দাঁড়িয়ে সেই মাংসের পাহাড়। জনকে দেখেই আর্তনাদ ক'রে উঠল, "গরু! ছাগল! মোষ! বাড়ী খুঁজে পাওনি তুমি! পুরোপুরি গরু! হে যীশু! হে মা মেরী!"

জন কাচুমাচু হ'য়ে বলল, "নো।"

স্যাণ্ডওম্যান আমাকে ঘরে নিয়ে গেল। চেয়ারে বসিয়ে বলল, "ভেবো না। তোমার বাবা-মা এক্ষুনি এসে পড়বে।"

আমি তো অবাক।

"ফোন করেছিল। আমি বলেছি জন বাড়ী খুঁজে পাবে না। ওর মাথায় এক রত্তি বুদ্ধি নেই। তুমি চা খাবে, না কফি?"

জনের পত্নীর হাতে তৈরী কফি পান করতে করতেই মা আর তুমি এসে হাজির।

তখন জন নিশ্চিন্তে বীয়র পান করছে, আর স্ত্রীর বিরাট একখানা বাহু তার স্কন্ধদেশে জমাট হ'য়ে রয়েছে।

নিউ ইয়র্কে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুটি ভাইবোন হারিয়ে গিয়েছিলাম ঘণ্টা ছয়েকের জন্যে। পরে আমি অনেকবার ভেবেছি, বাবা, এই হারিয়ে-যাওয়া ঘটনার বৃহত্তর কোনও তাৎপর্য ছিল কি না। জীবনে কি আমরা প্রত্যেকে একাধিকবার হারিয়ে যাই না? আমরা অনেকেই কি বাঁচবার পদ্ধতিতে যাই না একেবারে হারিয়ে? যে লোকটা যৌবনে রেভলিউশনারী অথচ প্রবীন বয়সে মালটিন্যাশনাল কোম্পানীর পদস্থ অফিসার, সে কি জীবিকা-জীবনে নিজেকে হারিয়ে ফেলে নি? আমার এই চব্বিশ বছর বয়সেই বার বার যে প্রশ্ন পীড়া দিয়েছে, এখনও দিচ্ছে, ভবিষ্যতেও দেবে, তা হল: আমার মধ্যে কোন-আমি আসল-আমি, যাকে হারালে বাকি-আমি আর আমি থাকবো না? কুড়ি বছর বয়সে নিউ ইয়র্ক আসার পর, চার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে; এই চার বছর যদি আমার নিউ দিল্লীতে কাটত তাহলে আজকের যে এই-আমি, সে নিশ্চয় তৈরী হ'ত না, আমি থেকে যেতাম অন্য-আমি। সে-আমি কি এই-আমির চেয়ে পূর্ণতর, সহজতর, অপেক্ষাকৃত নিঃসংকর হ'ত? তাকে যেতে হ'ত না যে-সব বাস্তব ও ভাবগত ঝড়ঝাপটার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে গত চারবছরের এই-আমিকে; অনেক, অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়তে হ'ত না তাকে; পৃথিবীটা যে কি ভয়ানক সুন্দর তার অবিশ্বাস্য বৈচিত্র্য-বৈভবে, এ অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ আস্বাদে তাকে থাকতে হ'ত বঞ্চিত।

সেণ্ট ষ্টিফেন্স্ কলেজ থেকে পাশ ক'রে, দিল্লী য়ুনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি নিয়ে, ঐ ক্যাম্পাসেই কোন কলেজে সে লেকচারার হ'য়ে জীবন শুরু করত (কেননা আই-এ-এস পরীক্ষায় বসতে কিছুতেই সে রাজী হ'ত না); সপ্তাহে ত্রিশ ঘণ্টা ছাত্র (অথবা ছাত্রী অথবা ছাত্রছাত্রী) পড়িয়ে তার জীবনী-শক্তি প্রতিদিন দ্রুত অপচয়ের পথে যেত এগিয়ে; ক্ষতিপূরণের তাগিদে সে বিয়ে ক'রে বসত (হয়তো, হয়তো-না) নিজের নির্বাচিত, তোমাদের অনুমোদিত একটি বাঙ্গালী মেয়েকে; হয়তো (হয়তো-নয়) তার স্ত্রীও কোন কলেজে দর্শন (অথবা বাংলা অথবা রাজনীতি-বিজ্ঞান) পড়াত সপ্তাহে ত্রিশ ঘণ্টা; হয়তো মাঝে মধ্যে সে বীয়র খেত এবং কখনও-সখনও রাম্, হুইস্কি. এক-এক দিন ব্লাডি মেরী, কলেজের পলিটিক্সে জড়িয়ে না-পড়ার পথ দেখতে পেত

অবরুদ্ধ; প্রতিদিন তাকে একদল 'প্রতিষ্ঠিত' অতি-মানবকে তোয়াজ করতে হ'ত; তাঁর দৈনন্দিন জীবনের বেশীর ভাগ উদ্যোগ ও উদ্ভাবনাশক্তি প্রযুক্ত হ'ত একরাশি মহা-সমস্যা সমাধানে, যেমন রেশন আনা, দুধের ব্যবস্থা করা, হঠাৎ-কেরোসিন-তেল পাওয়া যাচ্ছে-না, বার-বার-হাজির-হ'য়েও-কাজ-হাসিল-হচ্ছে-না-সরকারী-দপ্তরে অথবা-বেসরকারী-প্রতিষ্ঠানে; অনাগত-বাসের-জন্য-চল্লিশ-মিনিট-রৌদ্রতপ্ত-অপেক্ষা। তবু তার জীবন দরিদ্র হত না, উত্তেজনার আস্বাদ থেকে বঞ্চিতও থাকতে হ'ত না তাকে। তবু তার সামাজিক স্থান নির্দিষ্ট থাকত সেই নিতান্ত সংখ্যালঘু অথচ অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের নিজের হাতে তৈরী, শ্রেণীতে, যার নাম উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী। সে হ'ত সেই ক্ষুদ্র অতি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একজন, যারা ভারতবর্ষকে নিজেদের গোষ্ঠী-স্বার্থের কব্জায় বজ্রমুষ্টিতে ধরে রেখেছে, যারা ভারতবর্ষের প্রকৃত গণতান্ত্রিক রূপান্তরের সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও কপট অন্তরায়। বাবা, তোমাদের জেনারেশন, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক নেতাদের দাক্ষিণ্যে, পঁচিশ বছরে এমন একটা সমাজ তৈরী ক'রে ব'সে আছে ভারতবর্ষে যেখানে আমরা, আমার মতো যারা তোমাদের সন্তান, আমরা এক কড়ি সম্পদ উৎপাদন না ক'রে, দেশের উন্নয়নের দশ আনা ভোগ করবার স্বর্গীয় অধিকারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পেয়ে ব'সে আছি।

যা বলতে চাইছি, বাবা, তা আর একটু স্পষ্ট করেই বলি: আমার এই যে বিস্তৃত প্রতিবেদন, এতো কেবল এক পুত্রের প্রতিবেদন নয়, কোনও এক পিতার সমীপে, এ হচ্ছে এক গোটা জেনারেশন পুত্রদের প্রতিবেদন এক গোটা জেনারেশন পিতাদের দরবারে। তোমরা পিতারা কেবল আমাদের মত সন্তানদের জন্ম দাও নি। তোমরা পিতারা পঁচিশ বছরে পৃথিবীর ছ'ভাগের একভাগ মানুষের বাসস্থান একটা দেশকে সমাজকে জাতিকে তৈরী করেছ: তোমাদের সৃষ্টি আজকের ভারতবর্ষ। নেতারাই শুধু তোমাদের চালান নি; তোমরাও নেতাদের চালিয়েছ। তোমরা তাঁদের বোঝাতে পেরেছ—বুঝতে তাঁরা তৈরীই ছিলেন—একটা শহুরে উচ্চশিক্ষিত পারদর্শী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছাড়া গণতান্ত্রিক সমাজ স্থিতিশীল হ'য়ে গড়ে উঠতে পারবে না। এক কথায়, ভারতবর্ষ গড়বার নামে তোমরা গড়েছ এমন একটা সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সিস্টেম যা আম্ জনতার কল্যাণের বুলি আউড়ে সংখ্যালঘু এক শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও তার গ্রামীন স্বার্থ-ভাইদের পুষ্টি ও ক্ষমতা বাড়িয়ে নেবার পক্ষে পরিপূর্ণ সহায়ক। তোমাদের প্রবর্তিত শিক্ষা-নীতি এই অনুচ্চারিত অথচ প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যকে সফল করতে পেরেছে। দেশের একশ জনের মধ্যে সত্তর জনকে নিরক্ষর রেখে তোমরা বাকী ত্রিশ জনকে "শিক্ষিত" করবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগে গেছ; ফলে পাঁচ জন "উচ্চশিক্ষিত" ও পঁচিশ জন "অর্ধ-শিক্ষিত"

ভারতবাসী. সত্তর জন দরিদ্র নিরক্ষরের উৎপন্ন সম্পদের বারো আনা উপভোগ করবার ঐশ্বরিক অধিকার পেয়ে ব'সে আছে। তোমরা নেতাদের বুঝিয়েছ—নেতারা বোঝাবার জন্যে তৈরীই ছিলেন—একটি "বিরাট" উচ্চশিক্ষিত "সেনানী" ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়. দেশকে মডারনাইজ করতে হ'লে চাই হাজার হাজার পি-এইচ-ডি, লাখ লাখ ইঞ্জিনীয়র, লক্ষ লক্ষ বি. এ., এম. এ ইত্যাদি ইত্যাদি। এরাই পারবে ভারতবর্ষকে জীবন্ত গণতন্ত্র রাষ্ট্রে স্থিতিশীল রাখতে, আবার এরাই তৈরী করতে পারবে, যাকে তোমরা নাম দিয়েছ "সমাজতান্ত্রিক কাঠামো।" না গণতন্ত্রের জন্যে, না সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর জন্যে, না উন্নয়নের জন্যে তোমাদের কাছে প্রয়োজনীয় মনে হ'য়েছে দেশব্যাপী স্বাক্ষর জনসাধারণ, যারা, অন্তত প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষীণ আলোটুকু পেয়েও বহুশতাব্দীর পুঞ্জীভূত অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে তোমাদের দরবারে তাদের মানবিক দাবী পেশ করতে পারত। তোমরা পঁচিশ বছরে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর চতুর্থ "উচ্চশিক্ষিত" এবং প্রথম "নিরক্ষর" দেশে পরিণত করেছ, বাবা, তোমাদের কারুশিল্পের তুলনা নেই ইতিহাসে।

"উচ্চশিক্ষিত" আমাদের এবং নিরক্ষর "ওদের" মধ্যে ব্যবধান বেড়ে বেড়ে পঁচিশ বছরে এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে এই পরস্পর বিরোধী দুটি শ্রেণীর মধ্যে যোগাযোগের খেয়া পর্যন্ত বন্ধ হ'য়ে গেছে। সামান্য একটা কেরানীর পদের জন্যেও তোমরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিম্নতম প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দিয়েছ। ফলে সারা দেশব্যাপী এক বিরাট কেরানীকুল সৃষ্টি ক'রে চলেছে আমাদের ষাট-পঁয়ষট্টি বিশ্ববিদ্যালয়, যারা নিজেরা উৎপাদন ক'রে না কিছুই, যারা কেবল পরভুক, এবং যাদের গোষ্ঠিবদ্ধ স্বার্থ দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে নিরক্ষর ও দরিদ্র ক'রে রাখা। এই কেরানীকুলের ঊর্ধ্বতম স্তরে বিরাজমান প্রশাসনিক আমলাযন্ত্রের বড়কর্তারা, যাদের ক্ষমতা দিন দিন বেড়ে গেছে, এবং যাদের স্বার্থ বহুসূত্রে মিলিত হ'য়েছে টেকনলজিক্যাল এলিটদের স্বার্থের সঙ্গে যেমন ম্যানেজার, ইনজিনীয়র, বৈজ্ঞানিক। এই সংযুক্ত এলিট গোষ্ঠি হাত মিলিয়েছে সহর নগরের শিল্পপতি ও গ্রামের বড় ও মাঝারি চাষীদের সঙ্গে; পৃষ্ট-পোষকতা পাচ্ছে রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃত্বের। ফলে পঞ্চাশ কোটি মানুষের ওপর মানুষের কায়েমী শাসন প্রতিষ্ঠা ক'রে তোমরা তাকেই "তৃতীয় বিশ্বের" আদর্শ গণতন্ত্র ব'লে জাহির করছ। যারা এই গণতন্ত্রের শাঁসটুকু উপভোগ ক'রে ক্রমশঃ তাকে নিঃশাঁস ক'রে তুলছে, সেই আমরা হ'য়ে দাঁড়িয়েছি অতিবৃহৎ একটা খাইখাই চাইচাই গোষ্ঠিতে, আমাদের ধারাবাহিক স্ফীত ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে ঐ ওরা ক্রমশঃ আরও নিঃস্ব, আরও দরিদ্র, আরও অন্তঃসারহীন হ'য়ে যাচ্ছে। মহাত্মা গান্ধী লিখেছিলেন, ভারতের সব সমস্যার heart হল, তার উচ্চশিক্ষিতের heart-

lessness. সত্যি, বাবা, আমাদের উচ্চশিক্ষিত মানস থেকে সাধারণ মানবিকতা কি দ্রুত নির্বাসিত হ'য়ে গেছে ভাবতেও অবাক লাগে। দরিদ্র দেশের মানুষ আমরা, অথচ দারিদ্র্যের প্রতি, দুর্বলের প্রতি মৌখিক দরদ ছাড়া প্রকৃত মানবিক দরদ আমাদের কোথায়? গান্ধীজি তো তাঁর একদল শিষ্যদের গ্রামে পাঠিয়ে গরীব সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাস করতে, তাদের জীবনের সঙ্গে মিশে যেতে, বাধ্য করেছিলেন! আজ কেন আমরা কেউ গ্রামের দিকে পা বাড়াতে দৃঢ় অসম্মত? কেন আমাদের জীবন অচল, যদি না আমাদের জীবনের মান "উন্নত" হ'তে পারল নানারকম আরামদায়ক বস্তুর সাহায্যে? গাড়ী, ফ্রিজ, এয়ারকণ্ডিশনার, ষ্টেরিও, নানারকম ইলেকট্রিক্যাল গ্যাজেট, ধার করা, অনেক দামে কেনা দ্বিতীয় মানের বিদেশী টেকনলজির বিচিত্র "আশীর্ব্বাদ" ব্যতীত কেন আমরা "ভদ্রলোক" হতে পারছি না? কেন আমরা তৈরী ক'রে বসেছি এক দরদহীন, করুণাহীন লালস লোভী কনজিউমার সোসাইটি, যার ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে দেশের অর্দ্ধেক লোককে থেকে যেতে হচ্ছে, দশকের পর দশকে, জেনারেশনের পর জেনারেশনে, অভুক্ত, নিরক্ষর, অসুস্থ, বেকার, দরিদ্র, আধা-উলঙ্গ? এবং এরা কারা? এদের কি আমরা চিনি? এদের সঙ্গে আমাদের জীবনের কি কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে? ভগৎ সিং আর আমি কি একই সমাজের মানুষ?

তাহলে, দেখতে পাচ্ছ, বাবা, আমি যদি নিউ ইয়র্কে না এসে নিউ দিল্লীতেই "মানুষ" হ'তাম, সমাজ থেকে, সাধারণ মানুষের সমাজ থেকে, আমার এ্যালিয়েনেশন কিছু কম হ'ত না? আমি থেকে যেতাম সেই টেন-পার্সেণ্ট, ফিফ্‌টিন-পার্সেণ্ট সমাজের মানুষ, যাদের কাছে নব্বইটি পার্সেণ্ট শুধু একটা নৈর্ব্যক্তিক ফাঁকা ফাঁকিবাজ আওয়াজ মাত্র! আমেরিকায় "উচ্চশিক্ষা" পেয়ে আমার এ্যালিয়েনেশন নিশ্চয় অনেকখানি অনুরূপ নিয়েছে: ভারতবর্ষে এখন আমি আমার নিজস্ব সীমিত "উচ্চশিক্ষিত" সমাজেও যুগপৎ প্রশংসা, নিন্দা, হিংসা, ও ঘৃণার পাত্র। এবং এই মার্কিন দেশেরও আমি নাগরিক নই, এখানেও আমি প্রবাসী ছাত্রের চেয়ে বেশি নই কিছু। এদেশে চিরস্থায়ী বসবাস করলেও আমি কোনও দিনই এদের একজন হ'তে পারবো না, এখানেও আমাকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকতে হবে সমাজের প্রধান সাংস্কৃতিক স্রোতগুলি থেকে।

স্বাধীনতার প্রথম পঁচিশ বছরেই, বাবা, তোমরা নিজেদের ভাবসম্পদকে দেউলিয়া ক'রে দিয়েছ! এক বিরাট সমবেত সমন্বিত মনুষ্য সমাজ গড়বার অঙ্গীকার ভঙ্গ ক'রে তোমরা গ'ড়ে তুলেছ পরস্পর বিচ্ছিন্ন পরস্পর-প্রতিরোধী এক স্খলিতপথ, লক্ষ্যচ্যুত আদর্শভ্রষ্ট সমাজ, যার নেতা তো তোমরাই, যার প্রথম বলি আমরা। কি দেশে, কি বিদেশে, যেখানেই আমরা "মানুষ" হচ্ছি, আমরা তোমাদের সংকুচিত স্বার্থের অস্ত্র

হিসেবে ব্যবহৃত। ভারতবর্ষে তো শতাব্দীর পর শতাব্দী অনড় অচল অচলায়তন ছিল, তার সন্তানদের মধ্যে আর যাই থাক-না-থাক, প্রতিযোগিতা বোধ তো ছিল না। গ্রামীন সমাজে, জাতিভেদ বর্ণভেদের কল্যাণে, যে যার চিরাচরিত জীবিকায় সীমাবদ্ধ ছিল, একে অন্যের সংরক্ষিত এলাকা দখল করতে এগিয়ে আসত না। ছোট্ট এক মধ্যবিত্তশ্রেণী ইংরেজের সাম্রাজ্যের উচ্ছিষ্ট ছিটেফোঁটা নিয়েই ছিল পরমতুষ্ট; গান্ধীর আগে, নেহেরু-সুভাষের আগে, স্বাধীনতা দাবী করার দুঃসাহসও ছিল তার অনায়ত্ব। বাবা, তুমি যখন ছাত্র ছিলে, তোমার বাবা তোমার ভবিষ্যৎ গঠনের পরিকল্পনা করার কথা ভাবতেই পারেন নি। দরিদ্র স্কুলমাষ্টারের প্রথম সন্তান তুমি, ছক কাটা ছোট্ট জীবনের জন্যেই সাবেকী পথে তৈরী হচ্চিলে: হাইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়; ভাগ্যে জুটে গেলে একটা ছোট বা মাঝারি চাকরী, হয়তো সরকারী আপিসে, নয়তো কোনও কলেজে, নয়তো কোনও সংবাদপত্রে। তোমার মুখেই শুনেছি, ভবিষ্যত নিয়ে কল্পনার জাল বুনবারও দুঃসাহস ছিল না তোমাদের। কল্পনা করতেও আকাশ প্রয়োজন। তোমাদের জীবনে আকাশ ছিল না।

আর আমাদের? হটাৎ সেই মন্থরগতি সাবেকী ভারতবর্ষেই এক দুরন্ত সামাজিক প্রতিযোগিতার স্রোত এসে গেল, যদিও তার সীমানা আটকে রইল প্রথম শহুরে মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তদের মধ্যে, পরে প্রসারিত হ'তে পারল গ্রামে কেবল ধনী ভূস্বামীদের মধ্যে। তোমরা উঠে পড়ে লেগে গেলে সন্তানদের জীবন "নির্মাণ" শিল্পে। যাদের সঙ্গতি নেই তাদের ছেলেমেয়েরাও ভর্তি হল "ভালো" স্কুলে, সবচেয়ে "ভাল" স্কুল হ'ল মিশনারীদের কনভেন্ট, তারপর মোটা মাইনের কতিপয় পাবলিক স্কুল, তারপর অপেক্ষাকৃত "অভিজাত" বিদ্যালয় সমূহ। তোমরা আমাদের "সাকসেসফুল" করবার জন্যে মরীয়া হ'য়ে উঠলে! পুশ্, পুশ্, পুশ: আমাদের ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিয়ে অবিরাম "সাকসেস" নামক মাতাল দামাল লক্ষ্যের পানে। পরীক্ষায় "ভালো" না করলে তোমাদের মুখ কালি, ক্লাসের রিপোর্ট ভালো না হ'লে তোমাদের মুখ হাঁড়ি। আমাদের স্কুল, কলেজ, পরীক্ষার-ফল, প্রতিযোগিতায় সাকসেস তোমাদের সামাজিক ষ্টেটাসের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠল। আমাদের বোঝান হল আই-এ-এস না হ'তে পারলে মনুষ্য জন্ম বৃথা; অন্তত ইঞ্জিনীয়র কিংবা ডাক্তার কিংবা এম-বি-এ না হ'লে অনাহারে জীবন কাটাতে হবে। মনে আছে, আমি যখন স্কুলজীবন শেষ হবার আগেই জেদ করে বসেছিলাম আই-এ-এস হ'বোনা, ইনজিনীয়র বা ডাক্তার হবো না, হবো ইংরিজীর অধ্যাপক, তুমি বলেছিলে, 'বেশ তো! কিন্তু ইউ হ্যাভ টু বি রেডী টু লিভ অ' পুওর ম্যান্‌স্ লাইক্।" গরীবদেশে অর্থবান জীবন যাপন করতে না পারাটা অপরাধ নয়, এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তুমি এ-ও বলেছিলে, আমার বন্ধুরা সবাই বড়

মাইনের চাকরী করবে, তাদের থেকে, মামাত পিসতুতো খুড়তুতো ভাইদের থেকে, নিম্নতর জীবনমানে খুশি থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা ভালো ক'রে ভেবে দেখি যেন। তুমি বলেছিলে, স্বাধীন ভারতবর্ষে নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠার মাপকাঠি হল পেশা, পদ, উপার্জন। পাণ্ডিত্য নয়, মনুষত্ব নয়, আদর্শবাদ নয়, এসব মূল্যগুলির বদলে আমদানী হয়েছে নতুন একগুচ্ছ প্রতিযোগিতামূলক মূল্য: কি ক'রে অন্য সবাইকে ডিঙিয়ে এগিয়ে গিয়ে কতো উচ্চাসনে আরোহণ করা সম্ভব, কতো বেশি মানুষের ওপর কতো খানি ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব, এবং কতো বেশি অর্থ উপার্জন করা সম্ভব। উপার্জনের পথ যাই হোক না কেন। এই নতুন মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত মূল্যমানের ফিতে দিয়ে তোমরা আমাদের মেপে আসছ বছরের পর বছর, সামাজিক দৈর্ঘ্য আমাদের কতোটুকু বাড়ল, কতোখানি মস্ত আর সাকসেসফুল হলাম আমরা? এর বাইরে বিশেষ কিছু শেখাও নি তোমরা আমাদের, শিখতে জানতে উৎসাহও দাও নি বিশেষ। তাই আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম ইয়ং জেনারেশন, আমাদের চাই চাই খাই খাই পাই পাই জন্ত ছাড়া আর কোনও পরিচয় নেই।

এই চব্বিশ বছর বয়সেই, বাবা, আমি বুঝতে পারছি, যতোদিন ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা থেকে যাবে পরভুক মধ্যবিত্তের কব্জায়, শাসন যন্ত্রকে মধ্যবিত্ত সমাজ ব্যবহার করবে শহুরে মালিক আর গ্রামের কুলাকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, ততোদিন হবেনা, হবেনা, হবেনা সেই সামাজিক রূপান্তর যা নাকি তোমাদের কাম্য, আমাদেরও লক্ষ্য। নিষ্ঠুরতম সত্যি কথা হল: আমরা মধ্যবিত্তরা ভারতের সামাজিক রূপান্তরের প্রধান অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। আমাদের সংখ্যা বেড়েছে, প্রতি বছর বাড়ছে, শহর থেকে নগরে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ছি, পড়েছি আমরা; নগর থেকে গ্রামে। আমাদের মধ্যেও বিভেদ অনেক; বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের অভাব নেই: ধরো, যে মুষ্টিমেয় সংখ্যা আমাদের মধ্যে বিদেশে "উচ্চশিক্ষার" সুযোগ পাচ্ছে (এই উন্নীত সংখ্যালঘুতে আমিও তো অন্তর্ভুক্ত:) তাদের মধ্যে আর দেশজ "উচ্চশিক্ষিতের" মধ্যেই কি রেষারেষি কম নাকি? তারপর আছে শহুরে মধ্যবিত্ত আর মফঃস্বল মধ্যবিত্ত আর গ্রামীন মধ্যবিত্ত আর বাঙালী, তামিল, মালায়ালম আর পাঞ্জাবী আর হিন্দী মধ্যবিত্ত। আরও আছে নানা জাতির মধ্যবিত্ত—যাদব মধ্যবিত্ত, ভূমিহার মধ্যবিত্ত, জাঠ, রাজপুত, বামুন, কায়স্থ, মারাঠা, দ্রাবিড় মধ্যবিত্ত! কি ভীষণ বিভেদজটিল দ্বন্দ্বসংকুল দেশ এই ভারতবর্ষ। এর মজ্জায় রক্তে চিন্তাভাবনায় শত শত শতাব্দীর বিভেদ ও খণ্ডিতসত্তা। তথাপি প্রশাসন, বিজ্ঞান, টেকনলজি, শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য আমাদের এক করেছে; শতসহস্র বিভেদ দিয়েও আমরা ঐক্যবদ্ধ। আমরা কারা? আমরা কারা ঐক্যবদ্ধ, বাবা? আমরা মালিকরা, ধনীরা, বিত্তবানরা, ক্ষমতাশীলরা,

প্রভাবতগুরা, উচ্চশিক্ষিতরা মধ্যবিত্তরা, আমলারা, স্তাবকরা, চোরাকারবারীরা, কালোটাকার অধিকারীরা : আমরা আমাদের বহু বিভেদ আর রেষারেষি আর খাওয়াখাওয়ি আর দলাদলি নিয়েও, একত্রিত ! ওরা নয়, ঐ যে যারা কাজ করে মাঠে, বাজারে, জঙ্গলে, কারখানায়, বন্দরে, অথবা যাদের কাজ নেই এবং ক্ষুধাও নেই, শুধু আছে বিরাট পুঞ্জীভূত ঐতিহাসিক অন্ধকার, যারা মানুষ হ'য়েও মানবিক অধিকার দাবী করতে পর্যন্ত শেখেনি। তাদের একসঙ্গে দাঁড়িয়ে দাবী করার দিন, করুণাময় ঈশ্বরের অপার আশীর্বাদে, আসবে না, আসবে না অন্তত এই শতাব্দীতে ; আমাদের প্রভুত্বের ক্ষমতার দাপটের লালসার রাজত্ব অন্তত বিংশশতাব্দীর সীমান্ত পর্যন্ত সুরক্ষিত।

তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকার অনেক কারণ আছে আমাদের বাবা! সাম্রাজ্য নির্মানে তোমরা ইংরেজের কাছে ব্যর্থ শিক্ষা পাও নি ! ইংরেজ সাত সমুদ্র পেরিয়ে এ'সে ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিল। তোমরা ঘরে ব'সে ভারতবর্ষকে শিল্পমালিক-মধ্যবিত্ত-কুলাকের সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করেছ !

আজকের দুনিয়ায় এতো বড় সাম্রাজ্য আর নেই ! আধ কোটি মানুষ উনষাট কোটি মানুষের ওপর প্রভুত্ব করছে, করবে ; উনষাট কোটি মানুষের মেহনতে এক কোটি হৃষ্টপুষ্ট সন্তুষ্ট জীবনের বনিয়াদ গড়া হয়েছে, হবে ; এতো বড়, এমন মহান উত্তরাধিকার তোমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে গিয়ে আমাদের একবারও বুক কাঁপছে না, হাত কাঁপছে না, মনে সন্দেহের কুয়াসার চিহ্ন নেই, আমাদের মতো দুঃসাহসী বীর আর কোথায় আছে এই পৃথিবীতে ?

গান্ধী বলেছিলেন, The heart of India's problems is the heartlessness of her educated classes.

দরদী হৃদয় নিয়ে কে কবে কোথায় সাম্রাজ্য গড়তে পেরেছে, বাবা ?

সুজান ফোর্ডকে জানবার আগে নিজেকে জানবার সুযোগ আমি পাই নি। সুজান ফোর্ড আজ আমার জীবন থেকে স'রে গেছে, চলতি জাহাজ থেকে যেমন স'রে যায় তীরভূমি। তবু যে ক্ষতগুলি সুজান ফোর্ড আমার দেহে মনে নিক্ষেপ ক'রেছিল, সে আগুন জ্বালিয়েছিল বাইস বছরের একটি তখনও-ইনোসেন্ট বাঙ্গালী যুবকের মধ্যে, তাদের চিহ্নগুলি আমি এখনও অসংকোচ অহংকারে বহন ক'রে চলেছি। যুদ্ধে প্রাপ্ত ক্ষতকে তো সৈনিকরা বীরত্বের পুরস্কার ব'লেই গ্রহণ করে ; করে না, বাবা ?

আমার জীবনযুদ্ধে হুজান কোর্ড যে ক্ষতগুলি নিক্ষেপ করেছিল, আমিও সেগুলি বীরের মতোই বহন করে চলেছি।

নিউ ইয়র্কে পৌঁছবার এক সপ্তাহের মধ্যে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা আমাকে ওয়ার্ক-পারমিট দিয়ে দিয়েছিলেন। তোমার সঙ্গে তাঁদের কথা হ'য়েছিল সামারে আমি খুচরা চাকরী করবো, যাতে সেপ্টেম্বরে ভর্তি হ'য়ে পড়া চালিয়ে যাবার বৃহৎ আর্থিক মূল্যের একটা ক্ষুদ্র অংশ আমি নিজেই উপার্জন ক'রে নিতে পারি।

আমার আগে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজী ও তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে ভারতবর্ষ থেকে কোনও ছাত্র ভর্তি হয় নি। অধ্যাপকদের ধারণা ছিল না ভারতবর্ষে, বিশেষ করে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইংরিজী শিক্ষার মান কতোখানি উঁচু অথবা নিচু। তাঁরা জাপান থেকে কয়েকটি ছাত্রছাত্রী গ্রহণ ক'রেছিলেন; জাপানীদের ইংরিজী শেখার কায়দা কানুন তাঁদের যথেষ্ট কৌতুক দিয়ে পেয়েছিল। অধ্যাপকরা অবশ্য যথেষ্ট ঔদার্যের সঙ্গেই আমাকে গ্রহণ ক'রেছিলেন, তাঁদেরই পরামর্শে দিল্লী থেকে এম. এ. শেষ না ক'রেই আমি কলাম্বিয়ায় এম. এ. কোর্সে ভর্তি হ'য়েছিলাম; দিল্লী থেকে এম. এ. পাশ ক'রে গেলেও কলাম্বিয়ায় আমাকে পুনরায় এম. এ. করতে হ'ত। যাদের মাতৃভাষা ইংরিজী নয় তাদের যে-সব প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করা বাধ্যতামূলক, সেগুলি থেকেও তাঁরা আমাকে রেহাই দিয়েছিলেন। এর মূলে ছিল ভর্তির ভার প্রাপ্ত অধ্যাপকের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার।

জন লিটল্‌হার্টকে এর আগে দেখবার সুযোগ হয় নি, কিন্তু তাঁর কবিতার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আধুনিক মার্কিন কবিদের মধ্যে তাঁর স্থান মাঝারি স্তরে হলেও তাঁর কবিতা আমার ভালো লাগত। দু'টি কবিতা মুখস্তও ছিল। আমার মুখে নিজের কবিতার ধ্বনি শুনে জন লিটল্‌হার্ট বিস্মিত ও মুগ্ধ হ'য়েছিলেন।

"তুমি এত সুন্দর ইংরিজী উচ্চারণ শিখলে কি ক'রে?" প্রশ্ন ক'রেছিলেন জন লিটল্‌হার্ট।

"আইরীশ ব্রাদার্সদের কাছে," আমি অকপটে উত্তর দিয়েছিলাম।

"তোমার ইংরিজী বলার ভঙ্গীটি সুন্দর। বৃটিশ এ্যাকসেণ্টকে ভারতীয় বচন ভঙ্গীতে তুমি কিছুটা মোলায়েম ক'রে নিয়েছ। আই লাইক দ' সাউণ্ড অব ইট।"

আমি তখন আর একটি কবিতা আবৃত্তি ক'রে দিলাম।

জন লিটল্‌হার্ট খুশিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলেন।

হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "কনগ্রাচুলেশনস্। ফ্রম ওয়ান পোয়েট টু এনাদার!"

আমি অবাক হ'য়ে বললাম, "এটা যে আমার কবিতা আপনি বুঝলেন কি ক'রে? ইজ্ ইট্ সো ব্যাড?"

জন লিটলহার্ট তখনও উচ্ছ্বসিত, "মোটেই নয়। বরং বেশ ভালো। কি ক'রে বুঝলাম? আমরা কবিরা বিশেষ আত্মপ্রিয়। আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম না?"

প্রথম সাক্ষাতেই আমি জন লিটলহার্টের "বন্ধু" হ'য়ে গেলাম।

"তুমি আমাকে জন ব'লেই ডেকো।"

আমি তো বিস্ময়ে নিস্তব্ধ!

বললাম, "সহজে পেরে উঠবো না।"

"কেন?" জন লিটলহার্টের মুখে কৌতুক-হাসি।

"শিক্ষকদের আমরা গুরুর সম্মান দিতে অভ্যস্ত।"

"জাপানীদের মতো?"

"জাপান সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নেই।"

"মর্যাদা হিসেবে সম্বোধন ক'রে থাকো কি তোমরা?"

"হ্যাঁ। তিন রকম সম্বোধন আমাদের।" আমি বুঝিয়ে বললাম।

"জাপানেও কিন্তু তাই," জানালেন জন লিটলহার্ট।

বললেন, "ঠিক আছে। তোমার বন্ধুত্বের জন্যে আমি অপেক্ষা করব। ইতিমধ্যে তোমাকে কিন্তু খুব খাটতে হবে।"

"এক বছরে এম. এ. শেষ করতে হবে আমাকে।"

"কেন? এতো তাড়া কিসের?"

"প্রধান তাড়া হ'ল অর্থের।"

"কাজ পেয়েছ?"

"দু'দিন হল পেয়ে গেছি।"

"কোথায়?"

"লাইব্রেরীতে। রেয়ার বুক্স্ সেকশনে।"

"চমৎকার।"

"এক বছরে শেষ করতে পারবো তো?"

"পরিশ্রম করতে পারো?"

"পারতে হবে।"

"দিনে দশবারো ঘণ্টা পড়তে পারবে?"

"পারতে হবে।"

"আর কিছু করারই সময় পাবে না।"

"বুঝতে পারছি।"

"নিউ ইয়র্ক আমেরিকার সাংস্কৃতিক রাজধানী। এখানে কত কিছু যে আছে ও ঘটছে তুমি ভাবতেও পারবে না। এক ডজন বিখ্যাত মিউজিয়াম আছে, তিনশ'র বেশি আর্ট গ্যালারী আছে; রোজ পঞ্চাশ ষাটটা নাটক অভিনয় হয় এখানে; এমন কোনও দেশ নেই যেখানকার মূভী দেখানো হয় না নিউ ইয়র্কে। নাচ গান অপেরা. কি চাও? বই!! লাখ লাখ বই!! একদিন দেখে এসো ডাউনটাউনে!"

"এর অনেক কিছুই আমার নাগালের বাইরে থেকে যাবে, অন্তত প্রথম বছর।"

জন লিট্‌ল্‌হার্ট দুষ্টুমি ক'রে বললেন, "গার্লস্?"

আমি কান-গরম জবাব দিলাম, "তারা তো বটেই।"

কাজেও তাই হ'ল। আমাকে আর মিতুকে মাইনে দিয়ে পড়াবার সঙ্গতি তোমার ছিল না। তুমি নিজেও এক অসীম দুঃসাহসিক কাজে নেমে পড়েছিলে। যে বয়সে ভারতবর্ষের পুরুষরা অবসরপ্রাপ্ত জীবনের প্রহর গুণতে শুরু করে, সে বয়সে তুমি তোমার কর্মজীবনকে নতুন পথে চালবার সংকল্পে পি.-এইচ-ডি প্রোগ্রামে ভর্তি হ'য়ে গিয়েছিলে নিউ ইয়র্কের অন্যতম বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ছিল তোমার গবেষণা ও কিতাব-লেখা, এবং অধ্যাপনা, যা থেকে রোজগার ছিল না তেমন কিছু। মিতু মাস তিনেকের মধ্যেই নিজের অসাধারণ জন-সংযোগ ক্ষমতা ব্যবহার ক'রে এডুকেশনাল টেলিভিশন শেখবার সুযোগ পেয়ে গেল বিখ্যাত "চ্যানেল থার্টিনে"; প্রথম বছর পারিশ্রমিক নেই; একদিন মিতু একটা চাকরীও জোগাড় ক'রে ফেলল, এক গির্জার তত্ত্বাবধানে তিন থেকে সাত বছরের শিশুদের স্কুলে পড়ান'র কাজ। সকাল সাতটায় বেরিয়ে যেতো মিতু, স্কুলে সাড়ে এগারটা পর্যন্ত পড়িয়ে বাড়ী ফিরে এসে লাঞ্চ খেয়ে তক্ষুনি আবার বেরিয়ে পড়ত টেলিভিশন শেখবার জন্যে, ফিরতে সন্ধ্যা সাতটা হ'য়ে যেতো! মারও একটা চাকরী হ'য়ে গেল একদিন কলম্বিয়া য়ুনিভারসিটির লাইব্রেরীতে: কি নিষ্ঠা, পরিশ্রম আর সুনামের সঙ্গেই না মা দুবছর কাজ ক'রে গিয়েছিল! তারও আগে, এক সপ্তাহের জন্যে, মা একটা পোষাকের দোকানে সেল্‌সগার্লের কাজ পেয়েছিল, বিরাট বিরাট কাপড়ের গাঁট তুলতে গিয়ে মার কোমড় ভেঙে যাবার মতো। সে চাকরীটা চ'লে যাওয়ায় (মা'র পক্ষে সম্ভব নাকি ঐ ধরনের কাজ করা?) কেঁদে ফেলেছিল মা, আমার আজও মনে আছে। তারপর যখন লাইব্রেরীতে কাজ জুটে গেল, মার সে কি আনন্দ! কলম্বিয়া লাইব্রেরীর গুদামে হাজার দশেক বাংলা বই বছরের পর বছর জমে গিয়েছিল; মা'র কাজ ছিল বইগুলিকে বাছাই ক'রে, বিষয় অনুসারে ক্যাটালগ করা, এবং কোন্ বই ফেলে দিতে হবে, কোনটা রাখতে হবে, কোন বই কোন লাইব্রেরীতে যাবে তা ঠিক ক'রে দেওয়া। লাইব্রেরীর কাজ ঠিক মতো করতে পারার জন্যে মা গিয়ে ভর্তি হল ওয়াই-ডব্লু-সি-এ

চালিত সান্ধ্য স্কুলে, লাইব্রেরী বিজ্ঞানে কোর্স নিতে। যাকেও, অতএব, সকাল থেকে রাত দশটা এগারটা পর্যন্ত একটানা কাজ ক'রে যেতে হত।

আর আমি? আমি তখন হারিয়ে গেছি এক অতল সমুদ্রে, যাতে কেবল ঢেউএর উপর ঢেউ, তীর নেই, সৈকত নেই, আমি কেবল খাবি খাচ্ছি আর আছড়ে পড়ছি আর ভেসে থাকার ক'রে যাচ্ছি আপ্রাণ প্রচেষ্টা। এতো বই দেখিনি জীবনে কোনওদিন, দেখিনি এতো জার্নাল, এতো মাইক্রোফিলম, এতো রেকর্ড, এতো পুঁথিপত্র; দেখিনি অধ্যাপকদের যাঁরা এক একটি কবি আর উপন্যাসিক আর নাট্যকার আর সমালোচক নিয়ে আজীবন সাধনা ক'রে গিয়েছেন; যাঁদের পাণ্ডিত্য গভীর, নিখুঁত এবং সর্বদা খুঁতখুতে; পারদর্শিতার প্রতিযোগিতায় যাঁরা একে অন্যকে কাৎ করতে সর্বদা তৎপর; আমি দেখিনি এর আগে ছাত্র-ছাত্রীদের এতো দীর্ঘসময় পড়তে, এতো বিষয় নিয়ে ভাবতে, তর্ক করতে, লিখতে। সেমিনারে ছাত্র-ছাত্রীদের পেপার শুনে আমি বিস্মিত, আতংকিত: কৈ আমাদের তো কেউ এভাবে শেখায় নি কোনদিন পেপার লিখতে, তা নিয়ে সমালোচনার মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে! যেহেতু আমি বিদেশী তাই আপ্রাণ আমার প্রচেষ্টা সত্বর এদের সমকক্ষ হবার, এবং অতএব আমার আর কোনও কিছুর সময় নেই, আমার পিঠে হাজার চাবুক একসঙ্গে পড়ছে। রোজ তিনঘণ্টা লাইব্রেরীতে রেয়ার বুকস্ সেকশনে চাকরী করতে গিয়ে আমার আর এক বিচিত্র শিহরিত বিচূর্ণ অভিজ্ঞতা: কতো কালের পুরাতন মূল্যবান সব কিতাব কত যত্নে স্তরে স্তরে সুরক্ষিত, এবং কিছু কিছু লোক, সংখ্যায় তাঁরা বেশি নয়, কী গভীর সম্মান সম্ভ্রমে ও ঐকান্তিকতায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই কিতাবগুলির চিরায়ত মাহাত্ম্যে লুপ্ত। সুদূর অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের মননশীলতার ধারাবাহিক ঐতিহ্যের সঙ্গে এই আমার প্রথম চাক্ষুষ বাহ্যিক পরিচয়। আমি জানিনে কি আছে এই সব সুরক্ষিত পুরাতন পুঁথিগুলির অমর অক্ষরমালায়; আমি জানিনে কি বিরাট সম্পদ স্তরে স্তরে সাজান রয়েছে এক ডজন লাইব্রেরীর লক্ষ লক্ষ কিতাবে; তবু এই সমুদ্রের চেয়েও বৃহৎ, হিমালয়ের চেয়েও উঁচু মননসম্পদের সঙ্গে শারীরিক পরিচয়ে আমি স্তম্ভিত, বিহ্বল, উত্তেজিত।

য়ুনিভারসিটির সংলগ্ন একটা এ্যাপার্টমেন্ট হাউসের চারতলায় আমাদের ফ্লাট। বাড়ীটায় উল্টোদিকে ল' স্কুল বিলডিং, দক্ষিণে প্রধান ক্যাম্পাস। উল্টো ফুটপাতে ল' স্কুলের পরেই জনসন হল, ছাত্রীদের প্রধান হষ্টেল। যে ফুটপাতে আমাদের বাড়ী তারও উপর কিংস্ ক্রাউন, কলম্বিয়া য়ুনিভারসিটি কর্তৃক পরিচালিত হোটেল। বাড়ী থেকে বেরিয়ে দুপা হাঁটতেই বেসমেন্টে একটা ভীয়েনিজ রেস্তোঁরা, দিনরাত তাতে ছাত্রছাত্রীদের ভিড়। অদূরে মর্ণিংসাইড ড্রাইভ, যার নীচে, অনেক নীচে, হার্লেম।

মর্নিংসাইড ড্রাইভের ওপর আইভি-লতায় ঘেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের বাড়ী। ক্যাম্পাসে ঢুকলেই বিরাট প্লাজা; একদিকে লো বিলডিং, যার তিন ধাপ সিঁড়ির মাঝামাঝি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক মূর্তি; আলমা মাতের। লো বিলডিংএর বিপরীত বাটলার লাইব্রেরী—যার মাথায় খোদাই করা ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মনিষীদের নাম: অ্যারিষ্টোটল, প্লেটো, দান্তে, হোমার, হেরোডোটাস, সফক্লিস। সেক্সপীয়র, গ্যেটে পর্যন্ত স্থান পান নি এই সনাতন জ্ঞানতপস্বীদের সভায়। প্লাজার চারদিকে একের পর এক বিলডিং, ছাত্রাবাস, প্রশাসন দপ্তর, থিয়েটার, ক্যানটিন। প্লাজা পেরিয়ে ডানদিকে একটা স্কোয়ারের চারদিকে চারটে বড় বড় বাড়ীতে বিভিন্ন বিভাগ, তারপর একের পর এক অনেকগুলি বাড়ী, তাতেও বিভিন্ন বিভাগ। স্কোয়ারের ওপরেই যে বাড়ীটার গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা "ফিলসফি," সেটাই হল ইংরিজী ও তুলনামূলক সাহিত্যের বিলডিং। স্কোয়ারের একপাশে রদাঁর হাতে গড়া চিবুক ন্যস্ত ভাবুক পুরুষ: মননশীল শিক্ষার্থীর প্রতীক ভাস্কর

ভীয়েৎনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে মার্কিন যুবমানস উদ্বেলিত। প্রতিদিন প্লাজায় সভা, গরম গরম বক্তৃতা, যুদ্ধবিরোধী গান, যুদ্ধের প্রতিবাদে মিছিল। অফ্ ব্রডওয়েতে রাতের পর রাত অভিনীত হচ্ছে ম্যাকবার্ড নাটক, ম্যাকবেথের অনুকরণে যে চরিত্রটিকে পরোক্ষে দেখান হয়েছে জন. এফ. কেনেডির গুপ্তঘাতকের ভূমিকায় তার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জনসনের মিল সবার কাছেই স্পষ্ট। ভীয়েৎনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ক্রমশ গোটা মার্কিন রাজনৈতিক ও সামাজিক সিষ্টেমের বিরুদ্ধে যুবশক্তির যুদ্ধঘোষণার রূপ নিতে চলেছে, ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ করছে যুদ্ধশিল্প ও পেন্টাগণের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গ্রন্থির, দাবী করছে যুদ্ধ-প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও পাঠগঠন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্বাসিত হোক। ছাত্রদের প্রতিবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক বিভাগে কর্মী সংগ্রহের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে, প্রতিদিন ছাত্ররা সভা ক'রে ড্রাফট্ কার্ড পোড়াচ্ছে। জনসন ঘোষণা করতে বাধ্য হ'য়েছেন পুন: নির্বাচনের জন্যে প্রার্থী তিনি হবেন না; ইউজিন ম্যাকার্থির পেছনে যুদ্ধবিরোধী ও আমূল সংস্কারকামী শক্তিগুলি জড়ো হ'য়ে এক বিরাট আন্দোলন গ'ড়ে তুলছে, যার পদক্ষেপে সারা মার্কিন সমাজ কাঁপছে, বহু, বহু মানুষের মন হ'য়ে উঠেছে বিভ্রান্ত, সাধারণ মানুষরাও প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে প্রশ্ন করছে, বর্জন করছে, যুবসমাজে জমে উঠছে বিক্ষোভের বারুদ। বিক্ষোভের কি বিচিত্রই না রূপ! একদিকে মিছিল, মার্চ, প্রতিবাদ, দাঙ্গা অন্যদিকে প্রতিবাদী সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপায়ন নাটকে, লোক-সঙ্গীতে, নাচে, সিনেমায়, উপন্যাসে, কবিতায়, প্রবন্ধে, সাংবাদিকতায়; এরই মধ্যে প্রতিবাদী সংস্কৃতি নিয়ে ব্যবসা, মিডিয়ার হাতে প'ড়ে তার চটকদার নানারূপ বাণিজ্যিক

অভিব্যক্তি। প্রতিবাদী সংস্কৃতি নিউ ইয়র্কের মধ্যবিত্ত সমাজকে হটাৎ জোরালো আক্রমণ ক'রে বসেছে, ঘরে ঘরে পিতামাতার সঙ্গে সন্তানদের নেই কমিউনিকেসন, জেনারেসন গ্যাপ হটাৎ বিরাট ফাটল সৃষ্টি ক'রে বসেছে মার্কিন সমাজে, ডর্মিটরির ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে রাত কাটাচ্ছে, মেয়েরা ব্রা পরছে না, অবিবাহিত প্রেমিক যুগলের সহবাস হটাৎ রাতারাতি সামাজিক বাস্তবে উত্তীর্ণ। কৃষ্ণকায় আমেরিকানরা হ'য়ে উঠেছে জঙ্গী, মাথা গজিয়েছে ব্ল্যাক প্যান্থাররা, সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাক মুসলিম, ব্ল্যাক লিবারেশন আর্মি, ম্যাসনের সেই রক্তলোভী দলটিও। দলের সঙ্গে দলের সংঘাত, মতের সঙ্গে মতের, পথের সঙ্গে পথের ; কালো "বিপ্লবী"রা শাদা প্রতিবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী নয়, নিজেরাও বহু খণ্ডিত দল-উপদলে বিভক্ত। এরই মধ্যে ফ্রান্সে ১৯৬৮ সালে ক্ষিপ্ত যুবশক্তি হটাৎ চমৎপ্রদ প্রতিবাদে রাজশক্তির ভিৎ আলগা ক'রে দিল, জাপানে যুবকযুবতিরা বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়, ময়দানে সামাজিক পরিবর্তনের দাবী নিয়ে, চেকোস্লোভাকিয়ায় ডুবসেকের বিদ্রোহের বেশির ভাগ ইন্ধন জাগাল যুবক যুবতিরা। সারা দুনিয়ার আকাশে আচমকা এক বিরাট ধুমকেতু উদ্ধত মাথায়, বদ্ধ মুষ্টি তুলে প্রতিবাদ ঘোষণা ক'রে বসল ; পৃথিবীর সব বাপ-মা'দের বুক কাঁপল, মাথা ঘুরল, নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে গেল, পণ্ডিতরা একবাক্যে সনাক্ত করলেন বিশ্বমানব রণাঙ্গনে এক নতুন শক্তির আবির্ভাব, যার নাম ইউথ পাওয়ার। নতুন স্লোগানে পৃথিবী কাঁপল, বিশ্বের যুবশক্তি এক হও !! পিতাদের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে দাও, মুক্ত করো মুক্ত করো বহু শতাব্দীর বন্দীদের, অর্থাৎ নিজেদের। সবুজ স্বপ্ন, সোনালি আদর্শবাদ, প্রদীপ্ত আশা আর উত্তপ্ত হৃদয় দিয়ে তৈরী করো নতুন সমাজ, নতুন দুনিয়া !!

পাঁচ বছরও টিকে থাকে নি সেই চোখ-ধাধান ধুমকেতু। তোমরা বাবারা অতিশয় জ্ঞানী ও ধূর্ত—পাঁচ বছরে তোমরা সেই দানবকে খাঁচায় ফিরিয়ে এনেছ, সে আবার নিজের পায়ে শৃঙ্খল পরতে পেরে নিশ্চিন্ত শান্ত হ'য়েছে। কিছু জমি তোমরা ছাড়তে বাধ্য হ'য়েছ, কিছু জমি ছেড়ে তোমরা তোমাদের রেজিমকে, রাজত্বকে, বজায় রাখতে পেরেছ। আমেরিকা ভীয়েৎনাম যুদ্ধ ছাড়তে বাধ্য হ'ল সেই দানবকে পুনরায় খাঁচায় ফিরিয়ে আনবার নিষ্ঠুর আবশ্যিকতায়, বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাম্রাজ্যের একটুকরো খ'সে গেল। কালোদের মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে সৃষ্ট হল একদল বুর্জোয়া : তারা বাকী সবাইকে বোঝাল, সিষ্টেমের মধ্যে থেকেই নিজেদের স্থান আদায় করতে হবে, অন্য পথ নেই, নেই, নেই। যারা মানল না, তোমাদের বন্দুক আর লাঠি আর চাবুক তাদের শায়েস্তা ক'রে দিল। ভিয়েৎনাম যুদ্ধে ভাটা পড়বার পর, শাদা প্রতিবাদীদের রক্তের চাপ কমে এল দারুণ কম সময়ে, যাদের কমল না তোমরা তাদের ধরে পাকড়ে জেলে পাঠিয়ে দিলে। তারপর এল

নতুন এক সংকট : বিশ্বের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বুনিয়াদ হঠাৎ ট'লে উঠল, "মুক্ত" জগতের দেশে উঠল হাহাকার—উৎপাদনের কলকারখানা নিস্তেজ, সবকিছুর দাম লাফে লাফে উর্ধগামী, কাজ নেই, রোজগার নেই, ব্যবসা-বাণিজ্যে গভীর দীর্ঘকালীন মন্দা। যুবশক্তি কোথায় গেল হারিয়ে? ছেলেমেয়েরা নোকরির খোঁজে বেরিয়ে পড়ল প্রতিবাদের বিলাস ত্যাগ ক'রে, তোমরা নিশ্চিন্ত হ'লে।

নিশ্চিন্ত হ'লে বটে, কিন্তু আমাদের আর তোমাদের মধ্যে যে ফাটল দেখে আমরা উভয় পক্ষই আঁৎকে উঠেছিলাম ষাট দশকের প্রান্তভাগে, তা আর জোড়া লাগল না। তা আর কোনদিনই জোড়া লাগবে না, বাবা।

সুজান ফোর্ড তোমার আর আমার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে নি ; সে ব্যবধানটা ঐতিহাসিক কারণে নিহিত ছিল, যা তুমি আমি টের পেলেও স্বীকার করতে ভয় পেয়েছি, তার অস্তিত্ব অনুভব করেও আমরা জানতে চাই নি, সে ব্যবধানকে তোমার ও আমার চোখের সামনে তুলে আনতে পেরেছিল। একটা ভীষণ নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি হ'য়ে আমি আর তুমি (তুমি মানে তুমি+মা+তোমরা) হ'য়ে গিয়েছিলাম হতভম্ব, অবশ হ'য়ে উঠেছিল আমাদের মস্তিষ্ক ও হৃদয়, এক অজ্ঞাতপূর্ব অন্ধকারে আমরা খাবি খেয়েছিলাম, হাতড়ে বেরিয়েছিলাম আলোর জন্যে, আলো, কোনও আলো, বিদ্যুতের অথবা প্রদীপের অথবা বুদ্ধির, যার সাহায্যে আমরা অন্ধকার পেরিয়ে কোনও আলোকিত তীরে পৌছতে পারি।

এম. এ পড়ার পুরো ন' মাস কোন মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব নির্মাণের সময় ছিল না আমার। দিল্লীতে আমার বান্ধবীর অভাব ছিল না, কিন্তু নিউ ইয়র্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে মেয়ের ছড়াছড়ি সত্ত্বেও বান্ধবী ছিল না আমার একটিও। ভারতীয় মেয়ে একে সংখ্যায় নিতান্ত কম, আমাদের ডিপার্টমেন্টে তো নেইই, তার ওপর হয় তারা বড় বেশি স্মার্ট নয়তো একেবারেই স্মার্ট নয়, অন্তত আমার তো তাই মনে হ'ত। সবচেয়ে বড় কথা, আলাপের সুযোগ কোথায়? সময় কোথায়? ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ ছিল না তা নয়, কিন্তু কোনটাই বন্ধুত্বের উপত্যকায় পৌছতে পারে নি। একে তো এম.এ. পি-এইচ.ডি-পড়নে-ওয়ালী মেয়েদের আমার বান্ধবী-রূপে পাবার আগ্রহ কম—ওরা বড় বেশি বকবক করে যা বোঝেনা তাই নিয়ে—তার উপর প্রথম বছর আমার বেশ একটু ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স ছিল এদের কাছে, যাকে আমি অহংকারের পর্দা দিয়ে আড়াল ক'রে রাখতাম। তবু একটি মেয়ের সঙ্গে কয়েকদিন গল্পগুজব একসঙ্গে কফিপান ইত্যাদি নিম্নস্তরের মেলামেশায় আমাদের দুজনেরই মন নরম হ'তে শুরু করে'ছিল। এলিজাবেথ বার্নষ্টাইন দেখতে সুন্দর ছিল না, লম্বা ছিপছিপে ইহুদি মেয়ে, ঘন কালো চুল, গভীর কালো চোখ, দাঁত সামান্য উঁচু, লম্বাটে

মুখখানায় সর্বদা একটা বিষন্নতার ছাপ। একদিন তাকে বাড়ীতে নিয়ে এসেছিলাম, মার রান্না খেয়ে তার কি আনন্দ। আমার সহপাঠীরা অবাক হ'ত শুনে আমরা বাবা-মা-ভাই-বোন একসঙ্গে বাস করি, আমাদের সম্পর্কের গভীরতা ও পারস্পরিক মমতা দেখে তাদের বিস্ময়ের শেষ থাকত না। জিম্‌কে মনে আছে, বাবা? জিম্ ভুল্লো? যার বাবা-মার ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যায় জিমের যখন পাঁচ বছর, যার মা অর্ধেক সময় মদ খেয়ে প'ড়ে থাকতো বষ্টনের একটি এ্যাপার্টমেণ্টে? মনে আছে, জিম যতো ঘন ঘন আসতো আমাদের বাড়ী, মার কাছে চাইতো কিছু খাবার, আর মা খাবার দিলে অবাক ভিজে চোখে তাকিয়ে থাকত মার দিকে, আর বলতো; তোমাকে আমার বড় ভালো লাগে? এলিজাবেথ বার্নষ্টাইনও আমাদের পারিবারিক সম্প্রীতি ও ঐক্য থেকে মুগ্ধ বিস্মিত হ'য়েছিল, এবং আমাকেও তার ভালো লাগতে শুরু ক'রেছিল, সুতরাং একদিন কফিপানের নিমন্ত্রণ সে গ্রহণ করল না, বিষন্ন মুখখানাকে কুমড়োর মতো গম্ভীর ক'রে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমি আর মিশতে পারবো না কেতু।"

আমি তো অবাক; কী এমন দুষ্কর্ম ক'রে ব'সে আছি যার জন্যে এলিজাবেথ ত্যাগ করতে বসেছে আমার সঙ্গ?

আমাকে নিস্তব্ধ দেখে এলিজাবেথ নিজেই বলল, "তোমার সঙ্গে আরও যদি মিশি, আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলবো।"

কী ভয়ানক এই মেয়েগুলির মনখোলা কথাবার্তা।

আমি বললাম, "সেটা যে ভীষণ গর্হিত কাজ হবে তা তো বুঝতে পারি নি!"

এলিজাবেথ বলল, "তুমি আহত হ'য়েছ কিন্তু আমার উপায় নেই। আমরা ভীষণ গোঁড়া ইহুদি পরিবার। আমাকে একটি ইহুদি ছেলেকেই বিয়ে করতে হবে। যদি জানতে পারেন আমি ইহুদি-নয় এমন কোনও ছেলের সঙ্গে মিশছি, ভাব করছি, আমার বাবা আমাকে আস্ত রাখবেন না।"

কী সর্বনাশ! এ-যে আমাদের দেশের মেয়েদের মত কথা বলছে!

আমার মুখ দিয়ে প্রশ্ন নির্গত হল, "তুমি কি বাবার খুব বাধ্য?"

"নিরুপায় হ'য়ে," জবাব দিল এলিজাবেথ। "বাবা-মার বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা আমার নেই।"

"কেন?"

"আমার সবটুকু ভবিষ্যৎ তাঁদের হাতে। বাবার অনেক টাকা। আমি একপয়সা পাবো না তাঁর অমতে কাউকে বিয়ে করলে। আমার পড়া বন্ধ হ'য়ে যাবে। তা ছাড়া, বাবা অনেকদিন আগে ঠিক ক'রে রেখেছেন আমাকে ইজ্‌রায়েল-এ গিয়ে শিক্ষকতা করতে হবে। জেরুসালেম বিশ্ববিদ্যালয়কে আমার ঠাকুর্দা ও বাবা অনেক অর্থ

দিয়েছেন। ওখানে ইংরিজী পড়াতে হবে আমাকে। অন্য কোন জীবনের পথ আমার জন্যে খোলা নেই। তাই, জড়িয়ে পড়ার আগেই আমি তোমার কাছ থেকে স'রে পড়ছি।"

এলিজাবেথ আর আমি ফিলজফি ভবনের বাইরে স্কোয়ারটায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। এলিজাবেথ আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। আমার হাত বন্ধ হ'ল তার হাতে। ঠাণ্ডা, ঘর্মাক্ত হাত এলিজাবেথের।

"তুমি খুব ভালো ছেলে। তোমার মার তুলনা নেই। তোমাদের জানতে পেরে আমি খুব উপকৃত হ'য়েছি। তুমি আমাকে মাপ কোরো, কেতু।"

এলিজাবেথের গলা ভারী, চোখ দু'টি ছলছল। হঠাৎ সে পেছন ফিরল, আর ছুট ক'রে চলে গেল।

মার্কিন দেশে আমার প্রথম বান্ধবী-সম্ভাবনা মুকুল হবারও আগে বৃন্তচ্যুত হল।

মিতু একদিন সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল তার হঠাৎ-পাওয়া বান্ধবীকে। চ্যানেল থার্টিনে শিক্ষানবিশী ক'রে সন্ধ্যাবেলা মিতু নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলিভিশনে কোর্স নিচ্ছে। জর্জ ওয়াসিংটন স্কোয়ার পেরিয়ে স্কুলে যাবার পথে একটি মেয়ে মিতুকে একদিন পাকড়েছিল।

"তোমার সঙ্গে আলাপ করতে পারি কি?" পথ আটকে প্রশ্ন করেছিল মেয়েটি।

"নিশ্চয়," বুকের দ্রুত স্পন্দন চেপে থমকে দাঁড়িয়ে জবাব দিয়েছিল মিতু।

"আমি ক'দিন ধ'রে তোমাকে লক্ষ্য করছি। আর ভাবছি, এই ভীষণ সুন্দর মেয়েটি কে?"

নিউ ইয়র্কে গিয়েই মিতু জীবনে প্রথম শুনতে পেয়েছিল, সে সুন্দর। দেশে মিতুকে সুন্দর ব'লে কেউ স্বীকার ক'রে নি। মিতুর রং ময়লা। মিতুর চোয়াল বড়। মিতুর নাক নিখুঁত নয়। মিতু কি সুন্দর হ'তে পারে ভারতীয় চোখে?

নিউ ইয়র্কে পৌঁছবার দিন যে আইরীশ পরিবার মিতু ও আমাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেয়ে আশ্রয় দিয়েছিল, সেই মিসেস ও'কনর এক নজরেই মিতুকে সুন্দর দেখেছিলেন। ঐ অল্প সময়েই বলেছিলেন, "তোমার মতো সুন্দরী একটি মেয়ে যদি আমার পাদ্রী ছেলেকে বিয়ে ক'রে তো আমি বড়ো খুশি হই!"

মিতু অবাক হ'য়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল। মিসেস ও'কনর তখন মিতুর কাছে তাঁর পাদ্রী ছেলের গুনকীর্তনে মুখর।

মেয়েটি মিতুকে বলেছিল, "আমার নাম এমিলি। এমিলি হার্ট। তুমি তো ভারতীয়?"

মিতু নিজের পরিচয় দিতে দুজনে একসঙ্গে স্কুল পর্যন্ত হেঁটেছিল।

সেই এমিলি হার্টকে একদিন মিতু বাড়ী নিয়ে এল।

অমন সুন্দর মেয়ে আমরা আগে কখনও দেখিনি। তুমি না, মা না, মিতু না, আমিও না। এমিলি হার্টকে দেখে মনে হল, কোনও ভাস্করের হাতে গড়া আইভরি কন্যা। এমিলির দেহের কোথাও বুঝি এতটুকু খুঁত নেই। সারা সন্ধ্যা, রাত এগারোটা পর্যন্ত, এমিলিকে আমরা চার জনেই বার বার হাজার বার মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছিলাম।

মাত্র আঠারো বছরের মেয়ে এমিলি, মিতুর চেয়েও ছোট। বাবা নিউ ইয়র্ক সহরেই গাইনকলজিষ্ট, অনেক টাকা উপার্জন করেন। এমিলির এক দিদি আছে, নাম ন্যানসি। সাইকলজিতে পি. এইচ-ডি প্রায় শেষ ক'রে এনেছে। এমিলি স্কুল পেরিয়ে পড়াশোনা সাঙ্গ করেছে, পড়তে আর মন নেই। এমিলির যখন বারো বছর তখন ওদের মা ম'রে যান; বাবা ন্যানসির চেয়েও ছোট একটি মেয়েকে বিবাহ করেছেন। সৎ-মা'র বিরুদ্ধে এমিলির নালিশ নেই, মেয়ে সে ভালোই, কিন্তু নালিশ আছে বাবার বিরুদ্ধে, তাই এমিলি একা থাকে, আর একটি মেয়ে রুম-মেট নিয়ে ছোট্ট একটি এ্যাপার্টমেণ্টে। ন্যানসিও আলাদা বাস করে, একা। ন্যানসি বিয়ে করে নি, তার অবশ্য একজন বয়-ফ্রেণ্ড আছে, পেশায় মিউজিশিয়ান, বয়স প্রায় পঞ্চাশ। এমিলিরও একটি বয়-ফ্রেণ্ড আছে। জর্জ। গ্রীসের ছেলে। গ্রীস তখন সামরিক একনায়কত্বের আয়ত্বে। জর্জ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে। আমেরিকায় গ্রীসে গণতান্ত্রিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্রতে ব্রতী একটি জঙ্গী দলের একনিষ্ঠ সভ্য জর্জ। ভীষণ রাজনৈতিক। প্রায়ই তাকে সামরিক প্রশাসনের গুপ্তচরদের গুলি থেকে বাঁচবার জন্যে আত্মগোপন ক'রে বেঁচে থাকতে হয়। এমিলিকে জর্জ বড় একটা পাত্তা দেয় না; তার সময় নেই প্রেম নামক বিলাসিতার, এমিলির চেয়েও অনেক সুন্দর, অনেক মূল্যবান, অনেক পবিত্র তার কাছে গ্রীসের গণতন্ত্র। জর্জকে প্রায়ই নিউ ইয়র্কের বাইরে থাকতে হয়; নিউ ইয়র্কে থাকবার সময়ও এক বাড়ীতে বেশিদিন বাস করা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। এমিলি জর্জের দেখা পায় বেশ কমই, এবং যদি-বা পায়, এমনও ঘটে, হরদম ঘটছে, যে জর্জ সারা রাত এমিলির সঙ্গে একটাও কথা বলে না, নিজের মনে কি-সব ভাবে, প্ল্যান তৈরী করে, চিঠিপত্র লেখে, ইস্তাহার রচনা করে। এমিলি দোকান থেকে খাবার কিনে নিয়ে যায়। সে খাবার প্রায়ই অভুক্ত প'ড়ে থাকে। একটা কথাই জর্জ বার বার বলে, "আমার কাছ থেকে স'রে পড়ো। আমার সময় নেই তোমার জন্যে, যতো সুন্দর আর মিষ্টিই হও না কেন তুমি। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে স'রে পড়ো।" এমিলি সরতে পারে না। জর্জকে যে ভালোবাসে এমিলি।

খাবার টেবিলে ব'সে প্রথম সন্ধ্যায়ই এমিলি এসব বলেছিল আমাদের, সংকোচ

ছিল না, লজ্জা না, আকাঙ্ক্ষা না, আমি শুনছিলাম আর অবাক হ'য়ে দেখছিলাম আর ভাবতে বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠছিল যে আঠার বছরের এই অতীব সুন্দরী মেয়েটিকে জীবন কি ভীষণ নিষ্ঠুরতার কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে নিচ্ছে। ভাবছিলাম, এসব দেশের ছেলেমেয়েদের যেসব সমস্যা, সংকট, সংঘাতের মুখোমুখি হ'তে হয়, একা, পথ দেখাবার মদৎ দেবার কেউ থাকে না, তার তুলনায় আমাদের জীবন কি ভীষণ সংরক্ষিত ; এমিলির কথা শুনতে শুনতে জীবনকে যেমন ভয় পাচ্ছিলাম, তখনি মনে হচ্চিল কী আকর্ষণীয়, কী উত্তেজক, কী ভয়ংকর নির্দয় আনন্দদায়ক হ'তে পারে এই বেঁচে-থাকা নামক অভিজ্ঞতা, আবার কি নিদারুণ নিস্তেজ, নিরামিষ, কি নিঃশেষে সুরক্ষিত।

মাঝে মধ্যে এমিলি হার্ট আসতো আমাদের বাড়ীতে ; তোমার ও মা'র দুজনেরই স্নেহের পাত্রী হ'য়ে উঠেছিল অল্পকালের মধ্যেই। আমার সঙ্গে "ভাব" হয়নি এমিলির, কিন্তু কিছুটা বন্ধুত্ব হ'য়েছিল। মনে আছে, বাবা, একদিন এমিলি আমাকে ব'লেছিল, "তোমাদের দেখে আমার বিস্ময় হয়, কেতু, হিংসেও হয়। সুন্দর আছো তোমরা, তোমরা চারজন, বাবা-মা-ভাই-বোন। ফ্যামিলি শব্দটাই আমার অপছন্দ, কারণ আমি বড়ো হ'তে হ'তে ফ্যামিলি-লাইফ কাকে বলে জানিই নি, যা দেখতে পাই আমাদের দেশে, তাতে শ্রদ্ধা করবার, আকৃষ্ট হবার, বিশেষ কিছু পাই নে। তোমাদের মধ্যেও নিশ্চয় টেনশন আছে, অমিল আছে, ঘাতপ্রতিঘাত তোমরাও নিশ্চয় ক'রে থাকো একে অন্যকে। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে ওপরে আছে তোমাদের পারস্পরিক স্নেহ আর মমতা, তোমরা অন্যকে ভালোবাসতে জানো, এই দেখ না, আমাকে, আমার মত দিকভ্রষ্ট বিদেশী একটা মেয়েকে, কতো সহজে তোমরা আপন ক'রে নিয়েছ! অনেক সময় কি মনে হয় জানো, কেতু? মনে হয়, যাকে আমরা প্রগ্রেস আর ডেভেলপমেন্ট বলি, তা একটু কম-সম হ'লেই বুঝি ভালো, এতো বেশি শিল্প, সম্পদ, ঐশ্বর্য, ক্ষমতা, আর এই পুরোপুরি শহুরে সভ্যতা, এ বুঝি এক বিরাট অভিশাপ। মনে হয়, তোমরা বুঝি ভালোই আছ তোমাদের সেই অনগ্রসর ভারতবর্ষে, তোমাদের ভাগ্য ভালো এতো গাড়ী নেই, নেই এতো কলকারখানা, তাই নেই তোমাদের এই শিকড়হীন বিচ্ছিন্ন জীবন, এই গলাকাটা প্রতিযোগিতার সভ্যতা। তোমার বাবা বলছিলেন আজই, এই একটু আগে, ভারতবর্ষে গিয়ে কিছুদিন থেকে আসতে। পাগল হয়েছ? কি হবে তোমাদের দেশে গিয়ে কিছুদিন থেকে এসে? কি শিখবো, যদি না ভারতবর্ষকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারি? দারিদ্র্য দেখে আঁতকে উঠবো, নিরক্ষরতা দেখে ভয় পাবো, ক্ষুধা দেখে মূর্ছা যাবো। দারিদ্র্য আর নিরক্ষরতা আর ক্ষুধার মধ্যেও তোমাদের যে ধৈর্য আছে তা না পারবো বুঝতে, না মানতে, না গ্রহণ করতে।

না, কেতু তোমরা আর আমরা এক নই, ভীষণ আলাদা। আমি তোমাদের মতো হ'তে পারলে সুখী হতাম, কিন্তু হ'তে পারবো না, হবার ক্ষমতা নেই আমার। আমি ঘুরে মরবো একের পর এক জর্জের পেছনে, তারা আমাকে জর্জরিত করবে, পঁচিশ বছর না পেরুতে পাঁচটা প্রেমিকের সঙ্গে আমার অনেক শোওয়াশুইরি হ'য়ে যাবে, তারপর সুযোগ আর সৌভাগ্য থাকলে তাদেরই কাউকে, কিম্বা অন্য কাউকে, বিয়ে করবো, আমাদের দুখানা গাড়ী, দুতিনটে টেলিভিশন, সাবার্বে ছবির মতো বাড়ী, সব হবে, সন্তান হবে, পৃথিবী ভ্রমণ হবে, অনেক ভোগ সম্ভোগ হবে, হয়তো ডিভোর্স হবে, পুনঃবিবাহ হবে, ওভারডোজ স্লিপিং পিল খেয়ে আত্মহত্যা হবে, হয়তো মানসিক ব্যাধির হাসপাতালেও গিয়ে উঠতে হবে একদিন। জর্জকেও আমি হিংসে করি, কেতু, তার গ্রীস আছে, গ্রীসের গণতন্ত্র আছে, তার লড়বার মতো প্রাণ আছে, সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা আছে। আমার তো কিছুই নেই। এই সুন্দর শরীরটা আছে, যা তোমাদের দৃষ্টি ধ'রে রাখে, আর একটা প্রাণ অথবা আত্মা আছে, যা বিশেষ কেউ দেখতেও পায় না। ভরসার কথা, দুটোর একটাও বেশিদিন থাকবে না। কি বললে ? আমি সারাজীবন সুন্দর থাকবো ? হয়তো থাকবো, কিন্তু নারীর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ অথচ প্রলুব্ধ নয়, এমন পুরুষ কি বেশিদিন থাকবে ?"

"চান্স"

সুসান কোর্ড ছিল না এলিজাবেথ বার্নষ্টাইন, ছিল না এমিলি হার্ট ; সুসান কোর্ড ছিল সুসান কোর্ডই, এক এবং অদ্বিতীয়। অনন্যা বলবো না, সুসান কোর্ডকে নিয়ে কাব্যিক কিছু বলার ক্ষমতা আমার নেই, বাবা। কৌমার্য থেকে পুরুষত্বে উত্তীর্ণ হবার রাস্তা দেখিয়েছিল আমাকে সুসান কোর্ড ; এ রাস্তা কেবল যোনির সঙ্গে পুরুষাঙ্গের প্রথম সঙ্গম নয়, যদিও সেটা প্রত্যেক পুরুষের এবং নারীর জীবনের অন্যতম বৃহত্তম ঘটনা, এ রাস্তা বিধিনিষেধনিয়মরীতিনীতির প্রাচীর টপকে এমন এক দুনিয়ায় পৌঁছবার পথ, সেখানে, হোক না সাময়িক, জীবনের আস্বাদ জ্বলন্ত বহ্নির তেজে উত্তপ্ত, মদিরার উত্তেজনায় কম্পমান। সুসান কোর্ডের জীবনটাই ছিল নিয়মের বিরুদ্ধে মূর্তিমান সোচ্চার প্রতিবাদ। যা করা নিয়ম, সুসান কোর্ড তা করতো না, না করার বাইরেই যে বেঁচে থাকার জীবন্ত আস্বাদ তা প্রমাণ করবার জন্যেই সুসানের অস্তিত্ব। অথচ জীবন তাকে যে পরিবেশের মধ্যে এনে ফেলেছিল সে পরিবেশকে মেনে নিয়ে আমি-আছি, আই-এ্যাম কথাটাকে কবর দিয়ে অন্য দশজনের মতো সুসান কোর্ড বেঁচে

থাকতে পারতো। কিন্তু "আই-এ্যাম" এই গায়ত্রী মন্ত্রটি যেদিন সুসান কোর্ডের মনে প্রথম অনুরণিত হল, কেমন ক'রে, কি কারণে, কার পৌরহিত্যে তা সে জানতে পারে নি, এ-যেন ঈশ্বরের পুত্রের মতোই স্বয়ংজাত, সেদিন থেকে সুসান চলতে শুরু করল তার নিজের তৈরী পথে, পরোয়া করল না কে কি বলে, সে-পথ সরু কি চওড়া, বন্ধুর কি সমতল, সে পথের শেষ আছে কি নেই, সে কোনও লক্ষ্যে পৌঁছায়, কি লক্ষ্যহীন তার ক্ষয়িষ্ণু পরিক্রমণ। "এ পৃথিবীর সব কিছু একজোট," সুসান একদিন বলেছিল আমাকে, "আর অন্তজোট হচ্ছি আমি একা। আমি আছি তাই পৃথিবী আছে, মানুষ আছে, ঈশ্বর আছে, স্বর্গ ও নরক, পাপপুণ্য সব আছে। এদের সবার হাতে বন্দী হ'য়ে থাকবার জন্যে আমি নই। এরা জানে আমাকে বন্দী না রাখতে পারলে এদের সর্বনাশ। মানুষ বন্দী তাই ঈশ্বর রাজত্ব করছে, রাজত্ব করছে ধর্ম, মতবাদ, সমাজ, নীতি আইনকানুন। অনেক মানুষ বন্দী বলেই কিছু মানুষ রাজত্ব করছে, যদিও তারা বন্দী, তাদের ওপরে রাজত্ব করছে যারা, তাদের হাতে। মানুষের গায়ত্রীমন্ত্র আই-এ্যাম না হ'য়ে আই-বি (I Be) হ'য়ে গেছে। আমি এই বিশ্বব্যাপী বন্দী মানুষের ব্যতিক্রম। আমি কারুর নই। আমি কেবল আমার।"

কথাগুলি যুক্তিতর্কের ধোপে টেকে না, কিন্তু যুক্তিতর্ক কে করবে সুসান কোর্ডের সঙ্গে? যে পাথরের মূর্তিকে তুমি ভগবান বলে পূজা করো সেও কি যুক্তিতর্কের ধোপে টিকতে পারে? সাইবাবাকে নিয়ে যুক্তিতর্কের মানে হয়? তুমি যদি বাগানে হঠাৎ ফুটন্ত ফুল দেখতে পাও, পথে চলতে চলতে হঠাৎ আকাশে তাকিয়ে দেখ পূর্ণিমার চাঁদ তোমাকে না-জানিয়েই আলোকিত ক'রে ফেলেছে, তুমি কি তখন বিচার-বিশ্লেষণ করবে, না অবাক হ'য়ে সেই ফুল, সেই চাঁদকে শুধু দেখবে, অন্তত যতক্ষণ তার সম্মোহনী প্রভাব তোমার উপর বিস্তৃত থাকছে?

আমারও তাই হয়েছিল, বাবা। আমি সম্মোহিত হ'য়ে সুসান কোর্ডকে দেখেছিলাম, তার কথা, তার জীবনকায়দা, ইংরিজীতে যাকে বলে লাইফ-ষ্টাইল, আমাকে বন্দী ক'রেছিল। এম. এ. পরীক্ষা শেষ করে মিলেছিল আমার বহু-প্রতীক্ষিত কয়েকমাসের ছুটি, সপ্তাহে স'তের ঘন্টার একটা নামমাত্র সামার-জব ছাড়া; এবং মার আপত্তি সত্ত্বেও, তুমি আমার ব্যাংক-এ্যাকাউন্টে জমা ক'রে দিয়েছিলে কলম্বিয়া য়ুনিভারসিটি থেকে ধার-করা দুহাজার ডলার, যার থেকে হাজার খানেক ডলার তখনও খরচ হয়নি; অতএব, আমি নিউ ইয়র্ক শহরের মতো ব'কে-যাওয়ার উর্বর ভূমিতে হঠাৎ লাগামহীন যুবক-অশ্ব, এক বছর যে-সব উত্তেজনা, ঔৎসুক্য, কৌতুহল ক্ষুধা-তৃষ্ণা দম বন্ধ ক'রে চেপে রেখে কেবল পড়া আর পরীক্ষায় মনোনিবেশ করেছি সেগুলো সব একসঙ্গে চাবুক মেরে যুবক-অশ্বের কদম বাড়াল।

এম.এ. পরীক্ষার থীসিস টাইপ করতে গিয়ে সুসান্‌ কোর্ডের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। কলম্বিয়া য়ুনিভারসিটির ছাত্রদের পরিচালিত দৈনিক সংবাদপত্রে সুসান কোর্ড বিজ্ঞাপন ক'রেছিল। টেলিফোন করে একদিন সকাল এগারটায় আমি হাজির হ'য়েছিলাম ডাউন টাউনে ইষ্ট সাইডে সুসানের ষ্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে।

তিনবার বেল টিপতে সুসান এসে দরজা খুলেছিল। মাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে। গায়ে একটা রোব জড়ানো। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে রোবের নীচে অন্য কোন আবরণ নেই।

আমাকে দেখতে পেয়ে সুসান হাই তুলে বলল, "ওহো, তুমি সেই ইণ্ডিয়ান বয়, যার আসবার কথা ছিল আজ সকালে। এসো, ভেতরে এসো। ঐ খানটায় বসো। আমি এক্ষুনি আসছি।"

সুসান অন্তর্হিত হল বাথরুমে। ষ্টুডিও অ্যাপার্টমেণ্ট মানে একখানাই ঘর, তাতেই বসা, শোওয়া, রান্না, খাওয়া, কাজ করা, সবকিছু। আমি তাকিয়ে দেখলাম ঘরখানায় রাজ্যের জিনিষপত্র ছাড়িয়ে রয়েছে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, গুছিয়ে রাখবার সময় অথবা ইচ্ছে হয়নি গৃহকর্ত্রীর বেশ কিছুদিন। বিছানা অগোছাল, সুসান কোর্ড নিশ্চয় ঘুমের মধ্যেও অস্থির, এক কোণে বিরাট একটা টেবিলে আই বি এম টাইপরাইটার, পাশে দামী নিউজিক সিষ্টেম: ফিশার। অন্য কোণে একটা পিয়ানো, তার ঢাকনার উপর একগাদা বই, প্রায় সবগুলিই আর্ট ও ফটোগ্রাফির। ঘরের তৃতীয় কোণে ষ্টীলের ফ্রেমে পর্দা লাগিয়ে ছোট্ট একটা ডার্করুম, সুসান কোর্ড নিশ্চয় ছবি তুলে নিজেই প্রিণ্ট ও ডেভেলাপ করে নেয়। দেয়ালে দুটো ছবি, একখানা পিকাসোর নগ্ন নারী, অন্যখানা গগার হাতে আঁকা তিনটি অর্ধনগ্ন তাহিতি কন্যা। এই ছবি দুটো ছাড়া দেওয়ালে অনেকগুলি পোষ্টার অধিকাংশই সমসাময়িক যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন বিক্ষোভ, দুখানা উইমেন্‌স্‌ লিব নিয়ে আঁকা। দেওয়ালে আরও রয়েছে, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রপত্রিকা থেকে কেটে নেওয়া অনেক ছবি, কার্টুন প্রবন্ধাংশ, সংবাদ। কাজের টেবিলের কাছাকাছি একটা সোফাসেট, দেখে বোঝা গেল প্রয়োজনে তাকে শয্যায় পরিণত করা যায়, একখানা লাভ সীট। অদূরে খাবার টেবিলে গত রাতের খাদ্যের উচ্ছিষ্ট ও প্লেট-গ্লাস প'ড়ে রয়েছে, সুসান একা আহার ক'রে নি, একজনকে খাইয়েছেও। খাবার টেবিলের গজ খানেক দূরে রান্নার গ্যাস ষ্টোভ আবার গজ দুই দূরে রান্নার সরঞ্জাম, বাসন ধোবার সিংক, হাতমুখ ধোবার ওয়াশ-বেশিন। কাজের টেবিলের ওপর একটা টেবিল ল্যাম্প, শোবার খাটের পাশে টেবিলে আর একটা, এবং ঘরখানার ঠিক মাঝখানে মাঝারি সাইজের ঝালর-লণ্ঠন। বেডের কাছাকাছি একটা বড়-রকমের ক্লসেট।

মিনিট পনেরো পরে বাথরুম থেকে সুসান বেরিয়ে এল, স্নান করেছে, গায় নীল রংএর স্কার্ট আর হলুদ রংএর ব্লাউজ পরেছে, বালুকা-রং একঝাঁক আধো-ভেজা চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। ছিমছাম স্লিম দেহ সুসানের, মাঝারি দৈর্ঘ্য, চওড়া কপাল, বড় বড় বাদামী চোখ, ভ্রূযুগল সামান্য তির্যক, চিবুকে একটি সুন্দর ত্রিভুজ, নাকের বাঁ পাশে কালো একটি তিল। সুসান সুন্দরী নয়। সুসান আকর্ষণীয়া।

এবার এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে সুসান করমর্দন করল; "মাপ কোরো, কাল ঘুমুতে বড্ড দেরী হ'য়ে গিয়েছিল, তাই তোমার বেল বাজানোর সময়ও ঘুম ভাঙে নি। কফি খাবে তো? বেশ। দাঁড়াও, আগে কফি তৈরী ক'রে নি, তারপর কথাবার্তা।"

কফির পার্কোলেটর চাপিয়ে দিল সুসান, আমার সঙ্গে মামুলি দু চারটে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে—কোথায় থাকি আমি, নিউ ইয়র্কে ক'বছর আছি, কেমন লাগছে নিউ ইয়র্ক; এরই মধ্যে দু'বার টেলিফোন বাজল, প্রথমবার ভুল নম্বর, দ্বিতীয়বার সুসান আমারই মতো একজনকে অপরাহ্ণ চারটের সময় আসতে বলল। কফি তৈরী হ'লে সুসান আমাকে এক পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে, নিজে পুরো এক মগ ব্লাক কফি নিয়ে আমার পাশে বসল।

কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, "এসো, এবার কথা বলা যাক।"

আমি বললাম, "আমার মাষ্টারস থীসিসটা টাইপ করতে হবে।"

"কতো পৃষ্ঠার?" সুসানের প্রশ্নে উৎসাহের অভাব।

"পঞ্চাশ ষাট হবে।"

"কবে চাই?"

"এক সপ্তাহের মধ্যে।"

"অসম্ভব।"

"কেন?"

"অনেক কাজ জমে রয়েছে। ডেট-লাইন রাখতে পারছি না!"

আমি নিরাশ হ'য়ে বোবা। ভাবছি, এবার তাহলে উঠে পড়া যাক।

"তুমি আর কাউকে জানো যে এক সপ্তাহে আমার কাজটা ক'রে দিতে পারবে।"

সুসান বলল, "অনেকেই পারবে। এ শহরে অন্তত তিন হাজার ছাত্রছাত্রী আছে যারা থীসিস টাইপ করে পড়াশোনার খরচের অনেকখানি উপার্জন করতে বাধ্য হয়।"

"আমি একজনকেও জানি না। তুমি জানো কাউকে?"

"দেখি তোমার ম্যানাসক্রিপ্ট।"

আমার হাত থেকে থীসিসটা নিয়ে সুসান উল্টে পাল্টে দেখল। প্রথম পৃষ্ঠা পড়ে দ্বিতীয় পৃষ্ঠা পড়ল, তারপর তৃতীয়।

"তুমি কোথায় পড়াশোনা করেছ ?" থীসিসের পাতায় মুখ দেখে জানতে চাইল সুসান।

"দিল্লীতে," আমি জবাব দিলাম, "এবং কলম্বিয়ায়।"

"তোমার ইংরিজী খুব সুন্দর। আমেরিকান ছাত্রছাত্রীরা এধরণের ভাষা লেখে না। তারা অনেক শক্ত আর লম্বা বাক্য লেখে। শব্দ অনেক, অর্থ কম। তোমার ভাষা সহজ, অথচ অর্থপূর্ণ।"

"ধন্যবাদ। সাতদিনের মধ্যে থীসিসটা দাখিল করতেই হবে।"

"নইলে—"

"ডিগ্রী পেতে ছ'মাস দেরী হ'য়ে যাবে। আমার পক্ষে অত দেরী খুব ক্ষতিকর হ'য়ে পড়বে।"

সুসান টেবিলের উপর রাখা দিন-পঞ্জিকার ওপর ঝুকে প'ড়ে পেন্সিল দিয়ে হিসেব করল।

বলল, "সাত রাত্রি তুমি আমাকে ঘুমুতে দেবে না।"

বললাম, "আমি মোটেই তা চাই নে।"

"ঠিক আছে। আমার কোনও থীসিসই পড়ে ভালো লাগে না। তোমারটা ভালো লাগছে। আমিই করবো। তবে, একটা সর্ত। তুমি রোজ সন্ধ্যেবেলা আসবে। ব'সে থাকবে এখানে। অনেক প্রশ্ন আমার মনে দেখা দেবে। তোমার ইংরিজীতেও ছোটখাট দুর্বলতা আছে। বিদেশীদের যা থাকে। তোমাকে ফোন ক'রে সব সন্দেহ, প্রশ্ন সমাধান করতে গেলে দেরী হ'য়ে যাবে। তুমি রোজ তিন চার ঘণ্টা আমার পাশে থাকবে। সপ্তম দিনে তোমাকে সবটা দিয়ে দেব।"

আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হ'য়ে গেলাম।

সুসান প্রশ্ন করল, "তোমার আর্থিক অবস্থা কেমন ?"

আমি বললাম, "তোমার বিল আমি মেটাতে পারবো।"

"এক্স্‌প্রেস সারভিসের জন্য আমি ডবল দাম নি।"

আমার রক্ত হঠাৎ হিম হ'য়ে গেল। তার মানে তো একশ' কুড়ি ডলার।

"তবে তোমার কাছ থেকে নেব না," সুসান হেসে উত্তপ্ত ক'রে দিল আমার রক্ত। "তুমি তিনচার ঘণ্টা রোজ আমার কাছে ব'সে থাকবে। তারও তো দাম কম নয়। একা একা ব'সে কাজ করতে হবে না আমাকে। তোমার কাছে পৃষ্ঠার জন্যে এক ডলারই নেব।"

আমি চেক লিখে দেব কিনা প্রশ্ন করতে সুসান বলল, "না। টাইপ-করা থীসিস নেবার সময় চেক দিয়ে যাবে।"

এক সপ্তাহে সুসান থীসিস টাইপ ক'রে দিয়েছিল ; তার কাজ দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। থীসিসটা ছিল পোপের কাব্যে তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ওপর ; সুসান টাইপ করবার সময় শুধু আমার ইংরেজীর "ছোট-খাট প্রব্লেম" গুলি শুধরে দেয় নি, বেশ কয়েকটি সন্দেহ, প্রশ্ন, তর্ক তুলে কয়েকটি স্থানে আমার রচনার ভুলভ্রান্তি দূর করেছে, যুক্তির গাঁথুনি শক্ত করেছে। দুটো কোটেশন সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে সুসান লাইব্রেরী থেকে পোপের কাব্যগ্রন্থ নিয়ে এসে মিলিয়ে দাখিল করেছে, তার সন্দেহ নির্ভুল। আমি বিস্মিত প্রশংসায় সুসানের কাজ দেখে গেছি পুরো সাত দিন, প্রতি সন্ধ্যায় তিন চার ঘণ্টা ক'রে। এরই মধ্যে সুসান এক আধটু নিজের কথা বলেছে, আমিও বলেছি আমার কথা, কিন্তু সুসানের মনোযোগ নিবিষ্ট থেকেছে থীসিসটার ওপর। আরও একটা "এক্স্‌প্রেস" কাজ নিয়েছিল সুসান ; পুরো পি-এইচ-ডি থীসিস, চারশ পৃষ্ঠারও বেশি, এক মাসের মধ্যে শেষ করার কথা, আমার কাজ হয়ে যাবার পর আরো চার ঘণ্টা প্রতি রাত্রে সুসান টাইপ করে গেছে, অর্থাৎ প্রতিদিন আট ন' ঘণ্টা একনাগাড় টাইপ-করা, যা ইলেকট্রনিক আই-বি-এম মেশিনেও সহজ কর্ম নয়। আমি অবাক হ'য়ে ভেবেছি এভাবে টাইপ ক'রে অর্থ উপার্জনের পথ সুসান কেন বেছে নিয়েছে ? যদিও বি.এ.পাশ করে নি, তিন বছর আণ্ডার-গ্রাজুয়েট প'ড়ে ছেড়ে দিয়েছে, তথাপি সুসান রীতিমত শিক্ষিত, বই যে কতো পড়েছে এবং কতো বিভিন্ন বিষয়ে তার বোধহয় গোনাগুনতি নেই, এক্‌জিস্টেনশিয়ালিজম্‌ থেকে হ্যুক্রিয়ার বায়োলজি পর্যন্ত সব বিষয়েই দুচারখানা বই পড়া আছে সুসানের। তা ছাড়া সুসান উচুঁ-মানের ফটোগ্রাফী জানে, ছবি আঁকায়ও বেশ হাত আছে। টাইপ করাও যে কতো সুন্দর আর্ট হ'তে পারে সুসানকে জানবার আগে আমি তা ভাবতেই পারি নি। ইচ্ছে করলে চাকরি-বাকরি করে এর চেয়ে আরামে থাকতে পারতো নিশ্চয় ! সাতদিনে সুসান মাত্র একবার তার মার কথা বলেছে, আর কোনও আত্মীয়স্বজনের উল্লেখ করে নি। বলেছে, মা ব্রুকলিনে একটা স্যানাটোরিয়ামে থাকে, মনের ব্যাধি, তার সব খরচ সুসানকে জোগাতে হয়। আমার উপস্থিতির সময় সুসান টেলিফোন রিসীভর থেকে নামিয়ে রেখেছে, যাতে তার কাজে ব্যাঘাত না ঘটে।

তবু এই সাতদিনে সুসানকে আমি চিনতে পেরেছি। টাইপরাইটারের আওয়াজ সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে নীরবতা সংযোগের অনেকগুলি সূক্ষ্ম সুতো তৈরী করেছে, আমি সুসানের মুখ, দেহ, চুল, আঙুল, পা, বাহু দেখে দেখে ওর মনের মধ্যে ঢুকে গেছি, সুসান, আমাকে বিশেষ না দেখেও, আমার মনের মধ্যে। কাজের মধ্যে এক আধবার মৃদু হেসে প্রশ্ন করেছে, 'কি দেখছ ?' আমি বলেছি, 'তোমাকে।' সুসান বলেছে, 'দেখে কিছু বুঝতে পারছ ?' আমি বলেছি,' পারছি, তবে তোমাকে নয়, আমাকে।'

সুসান বড় বড় চোখ রেখেছে কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমার চোখে, হাসির সঙ্গে বিস্ময় মিশিয়ে বলে উঠেছে, 'খুব সুন্দর কথা।' কাজ থামিয়ে সুসান কফি তৈরী করেছে, দুজনে পাশাপাশি বসে আমরা কফি পান করেছি, কথাবার্তা বিশেষ হয় নি, অথচ নীরবতা আমাদের দূরত্ব কমিয়ে এনেছে প্রতিদিন একটু একটু ক'রে। একদিন সুসান বলে উঠল, 'তোমাকে আমার বেশ লাগে। তুমি কম কথা বলো, কিছু অনুচ্চারিত কথা ও উচ্চারিত চিন্তা কমিউনিকেট করার আর্ট তোমার জানা আছে।' আমি বললাম, 'তুমি তো জানো না আমাকে, কথা বলতে আমি ভীষণ ভালোবাসি।' সুসান বলল 'জানি বৈ কি! তুমি তো অনর্গল কথা বলে যাচ্ছ আমার সঙ্গে। শব্দে নয়, ভাবনায়।' সুসানকে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি বুঝতে পারছ?' সুসান বলল,' সব কথা কি আর শুনতে পারছি? তবে তুমি যে বলছো সেটুকু না বুঝে উপায় নেই।' 'উপায় নেই কেন?' প্রশ্ন করতে সুসান জবাব দিল, 'আমি যে মন পেতে আছি তোমার নিঃশব্দ কথা শোনবার জন্যে।' আমি বললাম, 'মিথ্যে কথা। তোমার মন রয়েছে টাইপিং-এ।' সুসান বলল, 'আমার তিনটে মন, জানো?' আমার প্রশ্ন, 'তৃতীয় মন কি করছে?' সুসানের উত্তর, 'আমার স্বর্গে যাবার সিঁড়ি তৈরী করছে।' 'বুঝলাম না' বলতে, সুসান কফির সরঞ্জাম সরিয়ে রেখে, টাইপিং-এ ফিরে যাবার মুখে, আমার বুক-ঢিপ-ঢিপ উপেক্ষা করে বলে উঠল, "স্বর্গে যাবার একমাত্র পথ লিনডন জনসনকে গুলি ক'রে মারা। আমার তৃতীয় মন বোঝাচ্ছে, এ কাজ করতে হবে আমাকেই।"

সুসান ফোর্ড প্রেসিডেন্ট জনসনকে গুলি করে নি, কাউকে গুলি করে মারবার অথবা মারবার চেষ্টা করবার মতোও দুঃসাহস ছিল না তার; কিন্তু ভীয়েৎনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে জঙ্গী ভূমিকা নেবার আগ্রহে তার ভাঁটা পড়ে নি। যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে গিয়ে সুসান ফোর্ড পুলিশের হাতে চারবার জখম হয়েছে, তিনবার জেল খেটেছে। প্রতিবাদ আন্দোলনের যতো ছবি সুসানের হাতে তোলা হয়েছিল ততো আর কারুর হাতে নয়, পেশাদার ফটোগ্রাফারদের হাতে তো নয়ই। শিকাগোয় ডেমোক্রাটিক পার্টির কনভেনশনে সুসান ফোর্ড হাজার হাজার লোকের সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়েছে: The whole world is watching! The whole world is watching!!

পুলিশ চ্যাংদোলা করে ভ্যানে তুলে নিয়েছে ব্যাটনের আঘাতে জ্ঞানশূন্য তার দেহকে। ১৯৬৮ সালের প্রেসিডেন্টশিয়াল ইলেকশনে ইউজিন ম্যাকার্থীর পক্ষে ভোট কুড়োতে মাসের পর মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছে সুসান ফোর্ড। ড্রাফ্‌ট্‌ থেকে পলাতক ছেলেদের লুকিয়ে রেখেছে নিজের ঘরে, পালাতে সাহায্য করেছে কানাডায়, য়ুরোপে। কালো আমেরিকানদের সমান অধিকার সুসান শুধু সমর্থনই করে নি, সবচেয়ে অধিক

জঙ্গী কালোদের সাহায্য করে এসেছে টাকা দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, বুদ্ধি আর দেহের পরিশ্রম দিয়ে।

সুসান আমাকে একদিন বলেছিল, "জানো কেতু, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ছাড়া আমি বেঁচে থাকতে পারি নে। পৃথিবীতে এতো অন্যায় জমাট হ'য়ে আছে, আর এতো বেশি সংখ্যক মানুষ অন্যায়কে মেনে নিচ্ছে, হজম করে যাচ্ছে, যে সোজা রাস্তায় ভদ্রভাবে কোনও প্রতিকারের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। মেজরিটি দ্বারা কোনও মহৎ কাজ সাধিত হয় না, হয় নি, হবে না। যারা অন্যায় করছে, অত্যাচার করছে মানুষের চরম অপমান লাঞ্ছনা যাদের নিত্যকর্ম, তারা মাইনরিটি। তাদের রুখবার শক্তি আছে অন্য আর এক মাইনরিটির। মেজরিটি আজ আছে অত্যাচারীদের সঙ্গে, আসবে আমাদের সঙ্গে, মেজরিটি হচ্ছে জলের মতো, তুমি যে পথে খাল কাটবে সে পথেই তার প্রবাহ। আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই সুভদ্র সুশীল শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে। সংঘাত সংগ্রাম কখনও সুভদ্র ও শান্তিপূর্ণ হতে পারে না। বিতর্ক সভা সমাজকে করতে পারে না রূপান্তরিত। আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো সর্বনাশ কি হয়ে গেছে জানো? কল্পনাতীত বিশাল শক্তি একটা অতিশয় ধূর্ত মাইনরিটির কব্জায় আটকা পড়ে গেছে। এই শক্তি তৈরী করেছে আমার দেশের বিশ কোটি মানুষ। তাকে ব্যবহার করছে দুলক্ষ লোক। এরা হল দি মাইনরিটি ইন পাওয়ার। এদের কব্জা থেকে সেই বিরাট শক্তিকে ছিনিয়ে নিতে পারে শুধু আর একটা দুলক্ষ লোকের মাইনরিটি; যারা প্রতি চতুর্থ বছরে ভোট দিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে, সেই মেজরিটি নয়। তারা হোয়াইট হাউসে পাঠাবে হয় লিনডন জনসনকে নয় হুবার্ট হাম্প্‌ফ্রী নয় রিচার্ড নিকসনকে। তারা ভুলে গেছে ববী কেনেডি ভিয়েৎনাম যুদ্ধের জন্যে ততোখানি দায়ী যতোখানি ছিল তার ভাই জন এফ কেনেডি, এবং তারই দল-ভাই লিনডন জনসন। আজ জনসন যে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে তা কি মেজরিটির দাবীতে? আমাদের মতো একটা শক্তিশালী মাইনরিটি যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনকে জঙ্গী করে তুলতে পেরেছি বলেই না জনসন সরে গিয়ে তার প্রিয় সহকর্মী হাম্পফ্রীকে দাঁড় করিয়েছে।"

আমি বলেছিলাম, "শাসকদের হাতে এতো বেশি ক্ষমতা, এবং সে ক্ষমতার ব্যবহারে তারা এতো বেশি তৎপর যে জঙ্গী মাইনরিটিকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া তাদের পক্ষে মোটেই দুঃসাধ্য নয়।"

সুসান বলেছিল, "তা কি জানি না? দেশে দেশে উদারপন্থীদের দেহ থেকে আচ্ছাদন অলংকার সব খুলে পড়ছে। উলঙ্গ চেহারা দেখে আমরা আঁৎকে উঠছি। উদারপন্থীদের মতো মেকী আর কিছু নেই। আচরণ আভরণের আড়ালে তারা সবাই পরিবর্তনের পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি খাঁটি প্রতিক্রিয়াশীলদের সহ্য

করতে পারি, তাদের অন্তত সাহস আছে, সততা আছে; আমি একদম সইতে পারি না তথাকথিত উদারপন্থীদের। গায়ের চামড়া চুলকে দেখো, প্রত্যেকে এক একটি দুর্ধর্ষ রক্ষণশীল।"

সুসানের জীবনবেদ যে প্রতিবাদ তা বুঝতে আমার সময় লাগে নি। বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হবার কারণ ছিল না সুসান ফোর্ডের। বারো বছর বয়সে বাবা হার্ট ফেল ক'রে মারা যাবার পর থেকে সুসান একা। মার সঙ্গে বনিবনাও নেই ছোটবেলা থেকে। স্বামীর মৃত্যুর পরে মার উপার্জনে মানুষ হবার বাধ্যবাধকতা সুসানকে প্রতিদিন বিঁধেছে, আরও এজন্যে যে মা কথায় কথায় শুনিয়ে দিয়েছে তারই রোজগারে সুসান পড়ছে স্কুলে, পাচ্ছে পোষাক-আষাক, ভরণ পোষন, বছরে একবার ভ্রমণও। স্কুল পাশ ক'রে অতএব সুসান কলেজে না গিয়ে চাকরী নিয়েছে; মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, সতের বছর থেকে সুসান 'স্বাধীন'। 'কি করেছি আমার স্বাধীনতা নিয়ে শুনবে?" সুসান একদিন বলেছিল। "সতের বছরের মেয়ে কি করে তার স্বাধীনতা নিয়ে? যে সমাজ তাকে ভালোবাসে নি, তারই কাছে হাত পাতে চাকরীর জন্যে। সুপারমার্কেটে সেলস্‌গাল হয়, অথবা ব্যাংকে টেলার, ইনসিওরেন্স্ বা রীয়েল এষ্টেট কোম্পানীর কেরাণী। সারাদিন একটানা পরিশ্রম ক'রে সন্ধ্যা হতেই 'ডেট' খোঁজে। 'ডেট'রা তো আর স্বপ্নালোক থেকে আসা অচীন দেশের রাজপুত্র নয়। তারা রক্তে মাংসে গড়া পুরুষ। তারা সতের বছরের স্বাধীন মেয়েকে নিয়ে রেঁস্তোরায় যায়, সিনেমা নাটক দেখায়, পার্কে বেড়ায়, এবং তার গায়ে হাত বুলিয়ে, ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে, জিভ দি'য়ে জিভ চুষে তার রক্ত মাংসকেও আগুন ক'রে তোলে। সতের বছরের স্বাধীন মেয়ে আঠারয় পা না দিতে পুরুষের সঙ্গে শোয়, পুরুষের জন্যে সাজ পোষাক পরে, পুরুষকে কি করে আকর্ষণ ও বন্দী করা যায় তাই হয় তার একমাত্র ধ্যান। মেসী-গিমবেলস্-করভেট-আলেকজাণ্ডারের বাজেট কাউণ্টার ঘুরে ঘুরে সস্তায় চোখ ধাঁধান পোষাক আর মন-মাতানো কসমেটিক্স্ কিনতে শেখে। একটার পর একটা বয় ফ্রেণ্ড তাকে জীবনের আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে বিদায় নেয়। যদি তার ভাগ্য খোলে, এদের একজনকে বিয়ে করে তার সন্তানের জননী ও গৃহের ম্যানেজার হ'য়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে চাকরী ক'রে, দশ বছরে সে সুন্দরভাবে নিঃশেষ হ'য়ে যায়; তখন সে আর কোনও ব্যক্তি নয়, বিরাট মধ্যবিত্ত জনতা সমুদ্রের নামহীন ঠিকানাহীন বিন্দুমাত্র। আর যদি সে বর জোটাতে না পারে, তাহলে একদিন, ঈশ্বরের কৃপায়, তাকে মেণ্টাল হসপিটালে গিয়ে হাজিরা দিতে হয়।"

সুসান তার সতের বছর বয়সের স্বাধীনতা নিয়ে সাতাশ বছরে মেণ্টাল হাসপাতালে গিয়ে হয়তো হাজির হত, যদি-না সে জড়িয়ে পড়তো কালো-আমেরিকানদের একটি

জঙ্গী দলের সঙ্গে। দলের এক নেতা হ্যামিলটন স্যাভেজ-এর সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হ'য়ে গিয়েছিল সুসানের, হার্লেমে একদিন ক্যামেরা নিয়ে টহল দেবার সময়। ক্যামেরা নিয়ে সুসান মাঝে মধ্যে বেরিয়ে পড়ত, বিশেষ কোনও ছবি তোলার উদ্দেশে নয়, হটাৎ কোনও ছবি তোলার সুযোগের সন্ধানে। "দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে চমকদার অনেক কিছু প্রকাশিত থাকে, আমাদের নজরে যে গুলো প'ড়েই না," বলত সুসান, "আমি ওসব চমকদার জীবন প্রকাশের ফটো তুলতে ভালোবাসি।" সুসানের এ্যালবাম ভরতি এসব চমৎকার ছবি, তাদের অনেকগুলি মার্কিন ও য়ুরোপীয় ম্যাগাজিন, টেলিভিশন ইত্যাদির কাছে বিক্রী করে সুসান দুপয়সা রোজগার করত। সুসানের ক্যামেরার প্রধান লক্ষ্য ছিল মানুষ, প্রকৃতি নয়; সুসান বলত, আমি হিউম্যানস্কোপের প্রেমিক, মানুষকে বাদ দিয়ে প্রকৃতি আমাকে আকর্ষণ করে না। হার্লেমের কালো মানুষদের নিয়ে কয়েক শ' ছবি তুলেছিল সুসান, ছবিগুলিতে মূর্ত হ'য়েছিল কালো মানুষের প্রেম, মমতা, স্নেহ, নৃত্য, সঙ্গীত, আনন্দ, স্বপ্ন, ঘৃণা, লোভ, লালসা, হিংসা, উন্মত্ততা, নৈরাশ্য, অবক্ষয়। ছবি তুলতে গিয়ে একদিন হার্লেমের এক গির্জায় হাজির হ'য়েছিল সুসান; সেখানে আলাপ হল হ্যামিলটন স্যাভেজের সঙ্গে। হ্যামিলটন স্যাভেজ ব্ল্যাক প্যান্থারদের অন্যতম বুদ্ধিজীবি নেতা, ইংরিজীতে যাকে বলে থিওরেটিশিয়ান। কালোদের গির্জায় শ্বেতকায় একটি যুবতিকে দেখে হ্যামিলটন রেগে গিয়েছিল। "তুমি এখানে কেন?" সুসানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিল, যার মানে হল, এখান থেকে সরে পড়ো। সুসান জবাব দিয়েছিল, "তুমিই বা এখানে কেন?"

হ্যামিলটন সুসানের পাল্টা প্রশ্নে ঘাবড়ে গিয়েছিল. কারণ সে নিজেই জানতো না গির্জায় কেন সে হাজির। কথোপকথন এবার পারস্পরিক ব্যক্তিত্বের ধার পরখ করে দেখল।

"তুমি জানো আমি কে?" প্রশ্ন করল হ্যামিলটন স্যাভেজ।

"এটুকু জানি, তুমি গির্জার লোক নও। যারা এখানে আসে তাদের সঙ্গে দেহের বর্ণ ছাড়া তোমার আর কোনও মিল নেই।"

"কি ক'রে জানলে?"

"আমি ছবি তুলি। মানুষের মুখ আমাকে অনেক কিছু ব'লে দেয়।"

"হাতি। তুমি নিশ্চয় একটা টিকটিকি।"

"আর একবার ঐ শব্দটা আমার সম্বন্ধে উচ্চারণ করলে তোমার মাথায় এই ক্যামেরা ভাঙবো।"

"বটে।"

"বটে।"

"আমরা চাইনে শাদারা আমাদের কাছাকাছি আসুক।"

"কাছাকাছি না এলে লড়বে কি ক'রে ?"

"আমরা চাই দুষমণী কাছাকাছি। মিত্রতার কাছাকাছি চাই নে। তোমরা আমাদের মিত্র নও। হ'তে পারো না।"

"আমি আমরা নই। আমি শুধু আমি।"

"তুমি কে ?"

"আমার নাম সুসান।"

"কি করো ?"

"বেঁচে থাকবার চেষ্টা করি।"

"এখানে কেন ?"

সুসান এবার পাল্টা আক্রমণ করল, "তুমি কে ?"

"আমার নাম হ্যামিলটন হ্যাভেজ।"

"তাই নাকি ? তুমি খুব সুন্দর ভাষায় ভীষণ বাজে কথা লিখতে পারো।"

"বাজে কথা ? একটা কথাও আমি লিখি না যা বাজে কথা।"

"তুমি লিখেছ, দ' ব্ল্যাক্স্ আর আমেরিকাস ওনলি প্রলেটারিয়েট ; দে হ্যাভ নাথিং টু লুজ বাট্ দেয়ার চেনস্। লেখনি ?"

"লিখেছি।"

"ভুল লিখেছ।"

"তাই নাকি ?"

"নিশ্চয়। দেহের রং কখনও শ্রেণীবিভাগ করতে পারে না।"

"তুমি কম্যুনিষ্ট ?"

"না।"

"মার্কসিষ্ট ?"

"না।"

"এনার্কিষ্ট ?"

"না। আমি, আমি।"

"তুমি আমাদের সংগ্রামে বিশ্বাস করো ?"

"যে কোনও প্রতিবাদে, প্রতিরোধে আমি উত্তেজিত হই।"

"তুমি সংগ্রামে বিশ্বাস করবে কি করে ? তোমার গায়ের রং যে শাদা।"

"তার দায়িত্ব আমার নয়। তুমি যে কালো তার জন্ম দায়ী নও তুমি।"

"তাতে কিসসু এসে যায় না।"

"মিস্টার বার। আমি শাদা হয়েও তোমাদের মধ্যে আসতে চাইছি। তুমি কালো হয়েও আমাদের মধ্যে আসতে চাইছো।"

"মিথ্যে কথা।"

"তোমাদের সংগ্রামের আসল উদ্দেশ্য শাদা মানুষদের যা আছে তাই পাবার অধিকার। তাই না?"

"সমান অধিকার।"

"শাদা মানুষদের যা নেই তা কেন তোমরা দাবী করছ না?"

"কি নেই?"

"অনেক কিছু। বিবেক। মমতা। বিনয়।"

হ্যামিলটন স্যাভেজের মুখে কথা সরল না।

সুসান বলল, "তোমরা শাদা মানুষের ধনদৌলত, বাড়ী-গাড়ি, ক্ষমতা, অহংকার সব দাবী করছ। একটু একটু ক'রে পেয়েও যাবে। ক্ষমতায় আসীন শাদা মানুষরা তোমাদের জুনিয়র পার্টনার ক'রে নেবে দশ পনের বছরে। কিন্তু তাতে তোমাদের মনুষ্যত্ব বাড়বে না, ক'মে যাবে। তোমরা শাদাদের চেয়েও ভীষণ হ'য়ে উঠবে।"

হ্যামিলটন স্যাভেজ বলেছিল, "দেয়ার ইজ সামথিং ইন হোয়াট ইউ সে।"

সুসান ও হ্যামিলটন বন্ধু হ'য়েছিল বছর খানেকের মধ্যেই।

"কিছুর জন্যে, বড়ো কিছুর জন্যে, লড়াই না করলে বেঁচে থাকার উত্তেজনা নেই, কেতু," সুসান বলেছিল আমাকে। "লড়াইএর ফল কি হবে তা না ভেবে ল'ড়ে যেতে হয়, ল'ড়ে যাওয়াই সত্যিকারের বেঁচে থাকা। আমি ব্ল্যাক প্যান্থারদের প্রোগ্রামে বিশ্বাস করি না। শাসকরা কয়েক বছরের মধ্যেই ওদের নির্মূল ক'রে দেবে। তবু ওরা যে লড়ছে, আদর্শের জন্যে প্রাণ দিচ্ছে, ওরা একটা অতিশয় শক্তিশালী দুষমণের বাধ্যতা মেনে নেয় নি, এটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট।" পুলিশ বস্টনের কালো পাড়ায় একটা বাড়ী ঘেরাও ক'রে ফেলেছিল। সে বাড়ীটার মধ্যে ছিল হ্যামিলটন স্যাভেজ ও আরও ছ'জন প্যান্থার। পুলিশ ইচ্ছে করলেই ওদের গ্রেফতার করতে পারতো। বিচারে হয়তো ওরা ছাড়া পেয়ে যেতো। পুলিশ তাই 'শুট আউট' অভিনয় করল। বাড়ীটার এক এ্যাপার্টমেন্টে পুলিশের লোক লুকিয়ে ছিল। তারা গুলি ছুড়ল। পুলিশ বলল, প্যান্থাররা আক্রমণ করেছে। তারপর আর কি? শ' খানেক পুলিশ আক্রমণ করল প্যান্থারদের। একজনও রেহাই পেল না। হ্যামিলটনের শরীরে এগারটা বুলেট লেগেছিল। ভাবতে পারো? এগারটা বুলেট!! ওরা মরল। মরবে তো সবাই একদিন। ওরাও মরল। তবু ওদের মরার মধ্যে সৌন্দর্য আছে,

মহানতা আছে। ওরা ল'ড়ে মরেছে। আমিও ল'ড়ে মরতে চাই, কেতু। অসুখে নয়। বার্ধক্যে নয়। লড়াই ক'রে।"

হ্যামিলটন স্ট্যাভেজের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার পর সুসান নতুন ক'রে স্বাধীন হল। চাকরী করতো টাকার দরকার হ'লে ; এবার ঠিক করল চাকরী আর নয়, পরিশ্রম ক'রে স্বাধীনভাবে রুজি রোজগার করতে হবে। ফটো বিক্রীর টাকা জীবনধারনের পক্ষে যৎসামান্য ; অতএব সুসান টাইপিং সারভিস শুরু ক'রে দিল। মা মেন্টাল হাসপাতালে ভরতি হবার পর খরচ গেলে বেড়ে ; রোজ আটদশ ঘণ্টা টাইপ করতে হ'ত সুসানকে। পুলিশের ব্যাটন তার পিঠে আঘাত করার পর থেকে প্রায়ই পিঠে একটা ব্যথা হ'ত ; তাই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা টাইপ ক'রে যেত সুসান। রোজগারের একটা মোটা অংশ খরচ হ'ত হরেক রকম সংগ্রামী বন্ধুদের ওপর—যারা ড্রাফ্ট পালিয়ে লুকিয়ে থাকত সুসানের ঘরে, যারা যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন করতো, যারা কালো মানুষদের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতো, এরা ছিল সুসানের সংগ্রামী বন্ধু। সুসান আহার করতো সামান্য, সপ্তাহে দু'দিনের বেশি দিনে দুবার খাওয়া হ'ত না সুসানের। কফি ছাড়া আর কিছু নিজের হাতে তৈরী ক'রে খেত না। সুসান তিন চার ঘণ্টার বেশি ঘুমোতো না কোনওদিন। সুসান মাঝে মধ্যে মদ খেত। সুসান প্রায়ই মারিওয়ানা আর হাসিশ খেত। সুসান ইচ্ছামত পুরুষদের সঙ্গে শুতো। সুসান একার বই পড়তো। মিউজিক সিস্টেমে বিটোভেন, মোৎসার্ট, বাখ্ চড়িয়ে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভোর হ'য়ে থাকতো। ক্যামেরা কাঁধে ক'রে বেরিয়ে পড়লে কোথায় যাবে কতোক্ষণের জন্যে তার ঠিক থাকতো না। মাঝে মধ্যে ছবি আঁকতে বেরিয়ে পড়তো সুসান—নিউ ইয়র্ক থেকে বস্টন, অথবা বাল্টিমুর, অথবা ওয়াশিংটন।

আমি যখন সুসানকে জানলাম, তখন তার জীবনে একটা পুরুষের দাপট চলছিল, যাকে সুসান ছাড়তে পারছিল না, যাকে ধ'রে রাখাও ওর পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। লোকটিকে আমি দেখিনি কখনও, কিন্তু তার ছায়া দেখেছি কয়েকবার সুসানের ষ্টুডিও এ্যাপার্টমেন্টে, যে ছায়া সুসানকে ভয়ার্ত করে রাখতো, যার থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে সুসান একদিন আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল। আঠাশ বছরের একটা দুর্দান্ত পুরুষ, যাকে সুসান প্রথম দেখেছিল ওয়াশিংটনে লিনকন মেমোরিয়ালের পাদদেশে পীস র‍্যালীর সময়, দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল। নিউ ইয়র্ক ফিরেছিল দুজন এক সঙ্গে, আইভান ওকিলভ—পুরুষটির এটাই আসল নাম কিনা সুসানের সন্দেহ ছিল—সুসানের এ্যাপার্টমেন্টেই এক সপ্তাহ কাটিয়ে গিয়েছিল। মুউক্লিয়ার বায়োলজিতে রিসর্চ করত আইভান কেম্ব্রিজ শহরের এম-আই-টি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে তার বাবা ছিলেন ফিজিকসের অধ্যাপক।

গবেষণা যখন অনেকটা এগিয়ে গেছে তখন আইভান বুঝতে পারল যে বিরাট প্রজেক্টের একটা ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে তার কাজ, তার সবটাই চলছে পেন্টাগনের টাকায়, গবেষণার একমাত্র উদ্দেশ্য বীজ বীজাণু দিয়ে যুদ্ধ করা অর্থাৎ ব্যাক্টিরিওলজিক্যাল ওয়ার। আইভান আরও জানতে পেল তার বাবা বছরের পর বছর পেন্টাগনের টাকায় যুদ্ধের জন্যে মূল্যবান গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, ভীয়েৎনামে যে সব বীভৎস বৈজ্ঞানিক ধ্বংস অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে তার পিতার অবদান অসামান্য। জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে আইভানের মন বিদ্রোহ করে উঠল; আমি চাই নে, চাইনে বিজ্ঞান যুদ্ধের সেবায় নিযুক্ত হোক, আমি চাই বিজ্ঞান দিয়ে মানুষের সভ্যতাকে আরও সুন্দর ক'রে তুলতে। অথচ পাঁচ বছরের জন্যে রিসর্চ প্রজেক্টে কাজ করার বণ্ড সই ক'রে ব'সে আছে আইভান, তার মাইনে অনেক, বৈজ্ঞানিক হিসেবে তার নামও হ'তে শুরু করেছে। যে প্রজেক্টে এখন তার কাজ, এবং যে-কাজ অনেকখানি এগিয়েছে, তা সফল হ'লে মার্কিন যুদ্ধনেতারা বীজ-বীজাণু দিয়ে শত্রুর শস্যক্ষেত শুধু ধ্বংসই করতে পারবে না, তাকে বছরের পর বছর অনুর্বর ক'রে রাখতে পারবে।

আইভান ওকিলভের বাবা রুশ বিপ্লবের সময় রাশিয়া থেকে পালিয়ে এসেছিলেন: তখন তাঁর বয়স ছিল একুশ। সোভিয়েৎ রাশিয়া, কম্যুনিজম্ ছিল তাঁর রক্তের শত্রু। বিজ্ঞানকে সোভিয়েৎ-বিরোধী যুদ্ধের সেবায় বিনিযুক্ত করতে তাঁর পুরোপুরি সায় ছিল। আইভান আমেরিকায় জন্মালেও পরিবারের স্লাভ সংস্কৃতির প্রভাব তার ওপর অনেকখানি: পিতাকে সে শ্রদ্ধা করতো, আবার ভয়ও। এ্যানটন ওকিলভ আমেরিকার পদার্থ-বিজ্ঞানে অন্যতম মহারথী: হাইড্রোজেন বোমা থেকে বহুদূর ক্ষেপণকারী মিসাইল নির্মাণে তাঁর অবদান পৃথিবীর সর্বত্র জ্ঞাত। আইভান যা জানতো না তা হল ভীয়েৎনামের মতো ছোট্ট একটা কৃষি প্রধান দেশকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবার নিষ্ঠুর উদ্যোগকেও এ্যানটন ওকিলভ নিজের প্রতিভা দিয়ে সাহায্য ক'রে চলেছেন।

অনেক সাহস সঞ্চয় ক'রে পিতাকে আইভান জানিয়েছিল, পেন্টাগনের যুদ্ধশিল্পকে আরও শক্তিশালী করবার জন্যে বিজ্ঞান চর্চার ইচ্ছা তার আদৌ নেই।

এ্যানটন ওকিলভ প্রথমে বুঝতেই পারেন নি, পুত্র তাঁর কি বলতে চাইছে। বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রোধে বিস্ফোরিত হ'য়েছিলেন।

"তুমি! তুমি আইভান ওকিলভ! তুমিও পীস-নিকদের খাতায় নাম লিখিয়েছ!"

আইভান বলেছিল, "আমি পীসনীক নই। বিজ্ঞান যুদ্ধের সেবা করবে না, এই নীতিতে বিশ্বাসী।"

"তাহলে যুদ্ধ কি ঢাল তলোয়ার দিয়ে করতে হবে? না কি বাইবেল দিয়ে?"

"যে-সব মরণাস্ত্র আমরা তৈরী করেছি, যুদ্ধের পক্ষে তাই যথেষ্ট," নিবেদন করেছিল আইভান।

"কিন্তু ওরা?"—টেবিলে মুষ্টির আঘাত করে গর্জে উঠেছিলেন এ্যান্টন ওকিনভ। "ওদের বৈজ্ঞানিকরা তো এসব কথা বলছে না? ওরা যে আমাদের ছাড়িয়ে যেতে বসেছে- তা কি কম্যুনিজমের জোরে, না শৃঙ্খলিত বিজ্ঞানের জোরে?"

আইভান বলল, "বাবা, আপনি খুব ভালো ক'রে জানেন যে-অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ওরা আর আমরা আবদ্ধ, তাতে এক অন্যকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না, দুজনে একসঙ্গে শুধু শতাধিকবার সারা পৃথিবীকে, এবং নিজেদেরকেও, সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারবে।"

অ্যান্টন ওকিলভ পুনরায় টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করলেন, "এসব মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধি-জীবিদের কথা, যারা আসলে, ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছায় হোক, মস্কোর গুপ্তচর।"

আইভান এবার নিজেই রেগে উঠছিল; তবু রাগ চেপে বলল, "তা ছাড়া, ভীয়েৎনাম আমাদের সমকক্ষ দেশ নয়। ক্ষুদ্র, দুর্বল, কৃষিপ্রধান দেশ। তাকে ধ্বংস করবার জন্যে আমার গবেষণা কাজে লাগান অত্যন্ত গর্হিত।"

এ্যান্টন চেঁচিয়ে উঠলেন, "বিষাক্ত সাপ আকারে বড়ো কি ছোট তাতে আসে যায় না। শত্রু হচ্চে ভীয়েৎনাম নয়। শত্রু কম্যুনিজম। যেখানেই হোক, যে-অবস্থাতেই হোক।"

আইভান এবার মনে দৃঢ়তা এনে বলল, "কম্যুনিজমের সঙ্গে লড়তে হলে একটা গোটা দেশ আর গোটা জাতিকে ধ্বংস করতে হবে?"

এ্যান্টন আরও বেশি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "হ'তে পারে।"

আইভান অবাক হ'য়ে পিতার দিকে তাকিয়ে রইল। যে লোকটিকে সারা জীবন সে ভক্তিশ্রদ্ধা করেছে আজ তাকে দেখল অন্যরূপে। পণ্ডিতের বেশে সে দানব, তার দয়া মমতা মানবিকতা শুধু কথার কারচুপি। ঘৃণা আর হিংসা তার রক্তকে দূষিত ক'রে দিয়েছে। সে নিজেকে মনে করে লিবার্টি আর ফ্রীডমের পূজারী; আসলে সে পূজা করছে নির্বিবেক ক্ষমতা আর নিষ্ঠুর হিংসাকে।

আইভান বুঝল, পিতার সঙ্গে আলোচনা ক'রে লাভ হবে না কিছুই। যা করার করতে হবে তাকেই। গবেষণায় মন বসাতে পারল না। মদ্যপান বেড়ে গেল। রাত্রিতে ঘুম আসে না পিল না খেলে। যে আইভান এতোদিন বিজ্ঞানের সাধনায় নিজের কাছাকাছি মানুষদেরও দেখতে পেতো না, সে এবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে অবাক হল, তার বুকের কম্পন বেড়ে গেল। দেখল এম-আই-টিতে শত শত বৈজ্ঞানিক তারই মতো অস্থির, তার চেয়েও বেশি কুপিত: তারা চায় না বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান

দাসত্ব করুক পেন্টাগন ও যুদ্ধ শিল্পের। তারা সমর্থন করছে ছাত্রছাত্রীদের দাবী ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে যুদ্ধের জন্যে কাজ করা চলবে না। এম-আই-টির বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞান-বিভাগ কোটি কোটি ডলারের রিসার্চ ক'রে যাচ্ছে পেন্টাগনের টাকায় ; শুধু এম-আই-টি নয়, হার্ভার্ড, কলম্বিয়া, ইয়েল, কর্নেল, ষ্টানফোর্ড : কোন বিশ্ববিদ্যালয় নয়? আইভান দেখতে পেল এম-আই-টির ছাত্র ও তরুণ গবেষকরা আন্দোলনে মিলিত হ'য়েছে হার্ভার্ড এর ছাত্র ও তরুণ বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে ; বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেন্টাগনকে খেদাবার সংগ্রাম সারা আমেরিকায় দানা বেঁধে উঠেছে।

আইভান এ আন্দোলন সম্বন্ধে উৎসাহী হ'য়ে উঠল। এ সময়ই তার সঙ্গে সুজান ফোর্ডের পরিচয়—ওয়াশিংটনে পীস র‍্যালীর সময়! সুজান আইভানকে নিউ ইয়র্কে যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। একটা পুরো সপ্তাহ আইভান কাটিয়ে গেল সুজানের ঘরে। সুজান আইভানকে পেয়ে মহা উত্তেজিত। আইভানের উত্তেজনার বাইরে কোনও প্রকাশ নেই। সে কম কথা বলে। কথা শোনবার আগ্রহ ও ধৈর্য তার অসীম। তার ভেতরে কিসের যেন বিরাট লড়াই চলছে। নিঃশব্দে সে লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছে লড়াইএর গতি, অপেক্ষা করছে তার পরিণাম। সুজান বুঝতে পারল তার প্রতি আইভানের কোনও দৈহিক আকর্ষণ নেই। অবাক হল, একটু ক্ষুণ্ণও হল। ভাবল, হয়তো আইভান হোমোসেক্সুয়াল।

সুজানের কাছে আইভান ফিরে এল চার মাস পরে। তখন সে প্রায় উন্মাদ এবং পুলিশের কাছ থেকে পলাতক।

পেন্টাগনবিরোধী আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করলেন হার্ভার্ডের কর্তৃপক্ষ। ঘোষণা করলেন, সরাসরি যুদ্ধের সঙ্গে সংযুক্ত কোনও বৈজ্ঞানিক কাজ দু'বছর পর থেকে হার্ভার্ডে আর হবে না। নেওয়া হবে না পেন্টাগন থেকে কোনও প্রজেক্ট অথবা অর্থ। এম-আই-টির কর্তৃপক্ষরা আরও কিছুদিন নত হলেন না। অবশেষে, সাবোতাজের ভয়ে, ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন, চলতি প্রজেক্টগুলি সম্পূর্ণ হবার পর তাঁরা আর পেন্টাগনের জন্যে বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম হাতে নেবেন না।

আইভান এই ঘোষণায় সন্তুষ্ট হ'তে পারল না।

চলতি রিসর্চ শেষ হওয়া মানে তার নিজের কাজও শেষ করা। তার মানে, আইভানকে পেন্টাগনের হাতে তু'লে দিতে হবে এমন একটা প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক শক্তি, যার ব্যবহারে ভীয়েৎনামের মাঠে বছরের পর বছর শস্য জন্মাবে না, একটা পুরো দেশ ও জাতিকে স্থিতিশীল দুর্ভিক্ষের মধ্যে নিক্ষেপ করা যাবে।

আইভান তার চাকরীর কনট্রাক্ট বার বার পাঠ ক'রে দেখল পাঁচ বছরের আগে মুক্তির পথ বন্ধ। এখনও তিন বছর বাকী।

এই সংকটের মধ্যে আরও একটা ভীষণ সত্য আবিষ্কার ক'রে বসল আইভান ওকিলভ। পেন্টাগণের যে টপ-সিক্রেট প্রজেক্টে তার বাবা বছর তিনেক আত্মমগ্ন, এবং যা এখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, তারও ব্যবহার হবে ভীয়েৎনামে। লেসার বোমা (Laser Bomb) তৈরী হবার পর থেকে মার্কিনজঙ্গিবিমান বাহিনী উত্তর ভীয়েৎনামে ধ্বংসাত্মক আক্রমণ অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে। এ্যান্টন ওকিলভের নতুন আবিষ্কার হাতে পেলে উত্তর ভীয়েৎনামের একটি উন্নয়ন প্রজেক্টও আস্ত থাকবে না।

এম-আই-টি'র পৃথিবী বিখ্যাত ফিজিক্স ল্যাবরেটরীতে হঠাৎ এক বিরাট বিস্ফোরণ হ'ল। বিস্ফোরণে অগ্রসর প্রজেক্টের কাজকর্ম নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল। তার মধ্যে এ্যান্টন ও আইভ্যান অকিলভের দু'টি।

বিস্ফোরণের পরেই আইভান পলাতক।

এ ঘটনার পর বছর ঘুরে গেছে। আইভান এসে উঠেছিল নিউ ইয়র্কে সুজানের কাছে। তখনই তার মাথার ঠিক নেই। তবু সুজানকে বলতে পেরেছিল সে কি করেছে, কেন সে পলাতক। সুজান তাকে শুধু আশ্রয় দেয় নি, সুস্থির করতে অনেক চেষ্টা করেছে। পারে নি। আইভান এবার সুজানের আগেকার ভুল ভেঙে দিয়ে তার কাছে সঙ্গম চেয়েছে। সুজান আপত্তি করে নি। কিন্তু এ কি অদ্ভুত সঙ্গম! আইভানের কোনও প্রেম নেই, স্নেহ নেই, আছে বিস্ফারিত ক্ষুধা, এবং নিষ্ঠুর দানবীয় আক্রমণ। সে ক্ষুধার সহজে নিবৃত্তি নেই। সুজানের দম বন্ধ হ'য়ে যায়, সারা দেহ বেদনায় আর্ত হ'য়ে ওঠে, মনের, অন্তরের মধ্যে বিষ জ্বলে। তবু সুজান সহ্য ক'রে গেছে। আইভান যা করেছে মানুষের মঙ্গলের জন্যে তা করা খুব কম পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। আইভানের সাত খুন মাপ। তাকে আশ্রয় দেবার জন্যে সুজান জেলে যেতে প্রস্তুত। আইভানকে কিন্তু পুলিশ ধরতে পারছে না। সুজানের ঘর থেকে সে চলে গেছে। কোথায় থাকে সুজানও জানে না। দিনে দিনে তার প্রকৃতি বদলে গেছে। সব সময়েই সে অন্ন-বিস্তর মাতাল। হরেক রকম ছদ্মবেশ পরতে ওস্তাদ। হটাৎ আইভান এসে হাজির হয় সুজানের কাছে। অনেক সময় আগে থেকে খবর না দিয়েই। এ্যাপার্টমেন্টের চাবি আছে তার কাছে; প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ সর্বদা খোলা। তার নির্দয় দানবীয় অত্যাচার সুজানকে সহ্য করতে হয়। যাবার সময় টাকা পয়সা যা থাকে সুজানের তার সবটুকু নিয়ে নেয়। তার সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নের জবাব দেয় না আইভান। এমনিতেই সে ছিল অল্পভাষী, এখন কথা নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে তার মুখ দিয়ে বেরোয় না। সুজান বুঝতে পেরেছে, আইভানের সুস্থ হবার সম্ভাবনা কম। তার আইডেনটিটি বদলে গেছে। ছিল বৈজ্ঞানিক। হয়েছে মাস্তান। যে ধরনের চিকিৎসা যত্নে আইভান সুস্থ হ'তে পারত, তা জুটবার পথ বন্ধ।

পুলিশের হাতে একদিন আইভান ধরা পড়বে। সেদিন সুজানের রেহাই। সুজান সেদিনের অপেক্ষায় দম আটকে ব'সে আছে। আইভানকে আর সে সহ্য করতে পারছে না। তবু আইভানের সাতখুন মাপ। মানুষের মঙ্গলের জন্যে আইভান যা করেছে, ক'জন বৈজ্ঞানিক তা করতে পারে?

"কেতু," সুজান বলেছিল আমাকে, "আমাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু কে জানো? আমাদের বাপেরা। তারাই আমাদের জীবনকে তচনচ ক'রে দিচ্ছে। তারা চায় তাদের পৃথিবীতে তাদের দাস হ'য়ে আমরা বেঁচে থাকি। তারা পথ দেখাবে, আমরা চলবো। এদিকে তারা জানেও না যে তারা পথ হারিয়েছে, গড়বার দম তাদের নিঃশেষ, এবার তারা শুধু ধ্বংস করতে পারবে। সবার আগে ধ্বংস করছে আমাদের। ধ্বংস করছে ভবিষ্যতকে। আমরা আর আমাদের পিতারা আর একসঙ্গে বাস করতে পারবো না। এখন, এই বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে, সবচেয়ে বড়ো বিদ্রোহ পিতাদের বিরুদ্ধে পুত্রদের, সন্তানদের বিদ্রোহ।"

সুজান কোর্ডকে নিয়ে আমাদের পরিবারে প্রথম গভীর সংকটের সৃষ্টি হ'য়েছিল বাবা। বিরোধ সংঘাত সংকট ইতিহাসের প্রধান উপাদান। জীবনেরও। বিরোধ না হ'লে সম্প্রীতির জোর পরীক্ষিত হয় না। সুজান কোর্ড আমার জীবনে বিরাট ঘটনা, অথবা দুর্ঘটনা, শুধু এ জন্যে যে সে আমাকে বুঝতে দিয়েছিল জীবন কি ভীষণ ধারাল অস্ত্র, বেঁচে থাকা কি নিদারুণ উত্তেজনা।

মা প্রথম থেকেই সুজানের সঙ্গে আমার মেলামেশায় খুশি হ'তে পারে নি। আমি যখন এক সপ্তাহ প্রত্যেকদিন সন্ধ্যা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত সুজানের সঙ্গে ব'সে থীসিস টাইপ করিয়ে নিচ্ছিলাম, মা তখনই আপত্তি করেছিল।

মা আমার দুর্বলতার খবর রাখে তোমার চেয়ে বেশি। সব মারাই বোধহয় সন্তানের দুর্বলতাকে বাবাদের চেয়ে বেশি জানে।

মা বলেছিল তোমাকে, কেতুকে এতোদিন পড়াশোনা শক্ত ক'রে বেঁধে রেখেছে। এখন ছাড়া পেয়েই একটা হিপি মেয়ের খপ্পরে পড়ছে কেতু। এর পরিণাম ভালো হবে না। ওকে সামলাও।

মার কথা শুনে আমি রেগে গিয়েছিলাম।

তুমি আমাকে বাধা দাও নি। তোমার মত ছিল, আমি জীবনকে বাজিয়ে দেখতে শিখি। কিন্তু সাবধান ক'রেছিলে। আমি তোমাকে আশ্বাস দিয়েছিলাম, সুজানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

অথচ জড়িয়ে পড়তে আমার সময় লাগে নি। সুজানকে প্রথম থেকেই আমার অসাধারণ মনে হ'য়েছিল। তার জীবন-বেদ আমাকে বিচলিত ক'রেছিল।

থীসিস টাইপ শেষ না হবার আগে সুজান আমাকে জানতেও দেয় নি আমার সম্বন্ধে তার মনে মমতা জমে উঠেছে।

যখন থীসিসটা আমার হাতে তুলে দিয়ে সুজান আমার হাত থেকে চেকটা নিয়ে ব্যাগে রেখে বলল, "থাক, আমাদের বিজিনেস রিলেশন শেষ হল, এবার দেখা যাক অন্য কোনও রিলেসন হ'তে পারে কি না," তখনও আমি ভেবেছিলাম, সে মস্করা করছে। এই সাতদিনে তার সঙ্গে প্রায় ত্রিশ ঘন্টা কাটিয়েছি আমি, আমার মনে, ধমণীতে, রক্তে সুজান কিছুটা পরিব্যাপ্ত হ'য়ে গেছে। অথচ আমার দৃঢ় ধারণা সুজান তার কিছুই জানতে পারে নি। ব্যাগটা টেবিলের উপর রেখে সুজান আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, মুখে তার রহস্যময় হাসি। সুজান ব্রা পরে না। পাতলা নাইলনের টপ তার স্তনদুটিকে পরিস্ফুট ক'রে রেখেছে। টপ ও স্কার্টের মাঝখানে কটিদেশের কিয়দংশ অনাবৃত। সুজানের পায়ে জুতা নেই। গায়ে নেই কোনও আভরণ, একমাত্র মণিবন্ধে ঘড়ি ছাড়া।

আমি ভাবছি, এবার আমাকে বিদায় নিতে হবে। বিজিনেস শেষ অন্য কিছু শুরুর সম্ভাবনা নেই। সুজান যে ধরনের মেয়ে আমাকে তার ভালো লাগার কথা নয়। এবার বিদায় নিতে হবে ভাবতে বুকের মধ্যে ব্যথা করে উঠছে।

হটাৎ সুজান এগিয়ে এসে দুবাহু দিয়ে আমায় আলিঙ্গন ক'রে বসল। সঙ্গে সঙ্গে তার তপ্ত ওষ্ঠাধর আছাড় খেয়ে পড়ল আমার ওষ্ঠাধরে। বুকের ওপর সুজানের নরম গরম স্তনের স্পর্শ আমার দেহে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দিল। সুজান চুমু খেতে খেতেই বলল, "তোমাকে বিদায় নিতে হবে না, যদি নিতে না চাও।"

একটু পরে আমি প্রস্তাব করলাম, বাইরে গিয়ে কোথাও আহারের। সুজান রাজী হল। আমরা ডাউন টাউনে এক রাশিয়ান রেস্তোঁরায় গেলাম। সুজানকে এখানে অনেকে চেনে। খাওয়া শেষ হলে সুজান প্রশ্ন করল, "এবার?"

আমি বললাম "চলো, ফেরী ক'রে ষ্ট্যাটেন আইলাণ্ড বেরিয়ে আসি।"

নিউ ইয়র্ক শহরের অন্তর্গত হ'লেও অন্য তিনটি অংশ থেকে ষ্ট্যাটেন আইল্যাণ্ড প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে বিচ্ছিন্ন। ম্যানহাটান দ্বীপের সঙ্গে সেতুবন্ধে আবদ্ধ ব্রকলন্ এবং ক্রকলিন; ষ্ট্যাটেন আইল্যাণ্ড এতো দূরে যে তাকে সেতু দিয়ে বাঁধা সম্ভব হয়

নি। ম্যানহাটানের দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্রতীরে সাউথ ফেরী; সেখান থেকে স্টীমার চেপে যেতে হয় ষ্ট্যাটেন আইল্যাণ্ডে। প্রতি আধ ঘণ্টা স্টীমার পাওয়া যায়, তাতে যাত্রীরাও চাপে, মোটর গাড়ীও চাপান হয়। নাম মাত্র ভাড়া: দশ সেণ্ট। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের হাওয়া খাবার জন্তেই শত শত লোক স্টীমার চাপে, তারা ষ্ট্যাটেন আইল্যাণ্ডে নেমে পরের স্টীমারে ম্যানহাটান ফিরে আসে।

স্টীমারে ব'সে সুজান নিজের জীবনের গল্প বলছিল, আমার কথাও জিজ্ঞেস করছিল। বাবা-মা-বোনের সঙ্গে একত্র বাস করি শুনে অবাক হ'য়েছিল। আরও অবাক হ'য়েছিল যখন বলেছিলাম, নিউ ইয়র্কে আসার পর কোনও মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব হয় নি।

ষ্ট্যাটেন আইল্যাণ্ড থেকে ফেরবার পথে স্টীমারে ব'সে সুজান আমাকে আইভান ওকিলভের কাহিনী শুনিয়েছিল। আমি শুধু বলতে পেরেছিলাম, "কতো সব আশ্চর্য মানুষের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। আমি কিন্তু এদের কাছে নিতান্ত সাধারণ।"

সুজান বলেছিল, "তাই তো তোমাকে এতো ভালো লাগছে, কেতু। তোমার মধ্যে বিকৃতি নেই। সভ্যতা তোমাকে নিয়ে এখনও নিষ্ঠুর খেলা খেলতে পারে নি। আমি তোমার মতো সহজ সরল স্বচ্ছ ছেলে আর দেখি নি। তাই ভাবছি, তোমার জীবনটাকে নাড়াচাড়া দিয়ে লাভ হবে না ক্ষতি হবে।"

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, "কার?"

সুজান বলেছিল, "তোমার।"

আমি বলেছিলাম, "নাড়া যে দিয়ে বসো নি তার প্রমাণ কি?"

সুজান আলতো ভাবে আমার গালে আঙুল বুলিয়ে দিয়েছিল।

সুজানকে যখন তার এ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিলাম, রাত তখন একটা।

সুজান বলল, "আজ এখানেই থেকে যাও না কেন?"

আমি বললাম, "তা হয় না।"

সুজান প্রশ্ন করল, "কেন হয় না?"

আমি বললাম, "বাবা-মা ভাববে।"

সুজানের কণ্ঠে বিদ্রূপ, "বাধ্য ছেলে? বাপ-মা'র অনুমতি না নিয়ে কোনও মেয়ের সঙ্গে রাত কাটাতে পারবে না?"

আমার কাণ গরম হল।

বললাম, "আর একদিন থাকবো।"

সুজান বলল, "যদি থাকতে দি।"

বাড়ী পৌঁছতে রাত দুটো হ'য়ে গিয়েছিল। মা আর তুমি দুজনেই জেগে ছিলে।

বাড়ী ঢুকতে তুমি প্রশ্ন করলে, "এতো দেরী ?" মা ব'লে উঠল, "নিশ্চয় সেই মেয়েটার সঙ্গে ছিল।" আমি শুধু বললাম, "দেরী হ'য়ে গেল।" নিজের ঘরে গিয়ে জামা কাপড় ছেড়ে শু'য়ে পড়েছি, এমন সময় টেলিফোন বাজল। সুজান ফোন করেছে। "ঠিক মতো বাড়ী পৌঁচেছ তো বাচ্চা ছেলে ? বাবার হাতে চাবুক খেতে হয় নি তো ? শুনে আশ্বস্ত হলাম। এবার শু'য়ে পড়ো, বাছাধন। গুড্ নাইট।"

পরের দিন সুজানকে নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আমার প্রথম ঝগড়া হ'য়ে গেল। মা সহজ সরল মানুষ, রেগে গিয়ে যা-তা বলল। তুমি অন্যভাবে এক কথাই বললে। তোমাদের দুজনেরই বক্তব্য, সুজান ভালো মেয়ে নয়। তার সঙ্গে ভিড়ে গেলে আমার সর্বনাশ হবে। মা আমাকে বার বার মনে করিয়ে দিল, সুজান আমার চেয়ে ন বছরের বড়ো। ও তো মেয়ে নয়, একটা মাঝবয়সী স্ত্রীলোক। তোকে একবার ধরলে আর ছাড়বে না। তুমি বললে, বন্ধুত্ব করো, তাতে দোষ নেই, কিন্তু জড়িয়ে পোড়ো না। তোমাকে নিয়ে ভয় যে তুমি জড়িয়ে পড়বে।

সেদিন জীবনে প্রথম আমি তোমাকে ঘৃণা করেছিলাম, বাবা। কারণ, তুমি যা বলেছিলে, তার মানে ছিল, মেশো, ফষ্টি নষ্টিও করো, প্রেমে প'ড়ে যেয়ো না।

পর পর দুরাত্রি আমি দুটোর সময় বাড়ী ফিরেছিলাম। তোমরা ধ'রে নিয়েছিলে আমি ছিলাম সুজানের সঙ্গে। কিন্তু সুজানের কাছাকাছিও যাই নি আমি। শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি। পার্কে। সমুদ্রের ধারে ব'সে সময় কাটিয়েছি। আর ভেবেছি। শেষ পর্যন্ত একটা রেস্তোঁরায় ঢুকে একপেট খেয়ে দশটার সময় একটা সিনেমা হলে ঢুকে দুটোর সময় বাড়ী ফিরেছি।

তোমাদের সঙ্গে সুজানকে নিয়ে আর বাকবিতণ্ডা হয় নি। আমি বুঝিয়ে দিয়েছি সুজানকে ছাড়বার অভিপ্রায় আমার নেই। তোমরা নিরুপায় হ'য়ে পরবর্তী ঘটনার অপেক্ষা করেছ।

তৃতীয় দিন হাজির হলাম সুজানের এ্যাপার্টমেন্টে। আমাকে দেখে খুশি হল সুজান।

বলল, "ভাগ্যিস তুমি এলে! আমি ভয় পেয়েছিলাম আর তুমি আসবে না।"

আমি বললাম, "চলো।"

"কোথায় ?"

"বার্ণষ্টাইন নিউ ইয়র্ক ফিলহারমনিক কনডাক্ট করছে লিনকন সেণ্টারে। টিকেট কিনেছি।"

সুজান আনন্দে লাফিয়ে উঠে আওয়াজ করল, "ওয়াও!"

কনসার্ট শোনার পর আমরা ৫৭ স্ট্রীটের একটা নিরালা রেঁস্তোরায় গেলাম। বিল

দেখে আমার চোখ কপালে উঠবার উপক্রম। সুজান বলল, "আমি শেয়ার করি ?" আমি তার কথা কানেই তুললাম না। ওয়ালেট খুলে চারখানা দশ ডলারের বিল ওয়েটারের হাতে তুলে দিলাম।

এগারটা পনের মিনিটে ফিরে এলাম সুজানের এ্যাপার্টমেন্টে।

সুজানকে বললাম, "কফি হবে কি ?"

সুজান প্রশ্ন করল, "কতোক্ষণ আছো ?"

আমি ঘোষণা করলাম, "সারারাত।" সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিলাম, "যদি তোমার সম্মতি থাকে।"

সুজান বিজয়িনীর হাসি হেসে বলল, "মোষ্ট ওয়েলকাম।"

আমি তখন বাড়ীতে ফোন করলাম।

তুমি ফোন ধরেছিলে, বাবা।

আমি বললাম, "বাবা আমি আজ রাতে সুজানের এ্যাপার্টমেন্টে থাকছি।"

তুমি এক অথবা আধ মুহূর্তের ব্যবধানে বললে, "আচ্ছা। কখন আসবে।"

"কাল সকালে।"

"আচ্ছা।"

তুমি ফোন নামিয়ে রেখেছ।

আমি আবার ডায়াল করলাম। আবার ফোন ধরলে তুমি।

"বাবা, আমি যা বলেছি বুঝতে পেরেছ তুমি ?"

তুমি বললে, "আজ রাত্রে তুমি ফিরছ না। কাল সকালে ফিরছ।"

আমি বললাম, "আমি আজ সুজান ফোর্ডের সঙ্গে শুচ্ছি, বাবা।"

তুমি বললে, "বুঝেছি। কাল সকাল সকাল চ'লে এসো।"

আমার ঘরের একসটেনশনে মা শুনছিল।

সেদিন রাত্রিতে মা কেঁদেছিল:

"তুমি চেষ্টা করলে কেতুকে এ পথ থেকে ফেরাতে পারতে," মা তোমাকে বলেছিল। "আমার অমন ভালো ছেলেটা এ কী ক'রে বসল ?"

জুন মাসটা আমার সুজানের সঙ্গেই কাটল। বাড়ীতে তিনচার ঘন্টার বেশি একদিনও থাকি নি। সুজান আমাকে নিউ ইয়র্ক শহর দেখাল। এই শহরে যে এত দেখবার আছে তা কি ভেবেছি কখনও ? মিউজিয়ামের পর মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারীর পর আর্ট গ্যালারী, গির্জার পর গির্জা, ইতিহাসের কতো-না স্বাক্ষর, আর কতো বিচিত্র সংস্কৃতির মানুষ! সুজানের সঙ্গে পায়ে হেঁটে আমি ইহুদি পাড়ার বৈশিষ্ট্য চিনতে পারলাম, তেমনি আবার ইতালিয়ানদের, পোলিশদের, আইরীশদের

আর তাদের বিশেষ বিশেষ সংস্কৃতি। কোথায় ড্রাগস্ বিক্রী হয়, কাদের বলে পুশার (Pusher); রাস্তায় দেহপসারিণীদের দেখলেই কি ক'রে একনজরে চেনা যায়, কি ভাবে পুরুষদের তারা পাকড়াও করে; মাসাজ পার্লারে কি হয়, কারা মাসাজ করে; কোন আর্টস্ স্কুলে গেলে নগ্ন নারী দেখতে পাওয়া যায়; হার্লেমে রাত্রিতে কি ঘটে; কোন রেঁস্তোরায় নিউ ইয়র্কের লেখকরা কতো রাত পর্যন্ত আড্ডা দেয়, সুজান ঘুরে ঘুরে দেখাল আমাকে। সুজান আমাকে নিয়ে গেল গে' পার্টিতে, যেখানে হোমোসেকস্যুয়াল পুরুষদের ভিড়, এবং লেসবিয়ান পার্টিতে, যেখানে হোমো-সেকস্যুয়াল মেয়েরা একত্র হয়। উভয় শ্রেণীর মধ্যে সুজানের বন্ধুরা রয়েছে, তাদের সঙ্গে মিশে হোমোসেকস্যুয়ালদের নিয়ে আমার মনের কুসংস্কারগুলি দূর হ'য়ে গেল। সুজানের কাছে আমি 'পট' খেতে শিখলাম। শিখলাম মদ খেয়ে মাতাল হ'তেও। মদে আমার কোনওদিন রুচি নেই, একদিন মাতাল হ'য়ে সুজানের বিছানায়, ঘরে বমি ক'রে ভাসিয়ে দিলাম। সুজান বমি সাফ করল নিজের হাতে। আমাকে স্নান করিয়ে মাথায় হাওয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখল।

জুলাই মাসে আমার প্রফেসর তোমাকে ফোন ক'রে জানালেন, আমি অনার্স নিয়ে এম. এ. পাশ করেছি। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আমি পি-এইচ ডি করতে চাই, ফেলোশিপ পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কলাম্বিয়ায় অবশ্যই আমি পি-এইচ ডি পড়তে পারবো কিন্তু ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের যা অবস্থা, ফেলোশিপ পাবার সম্ভাবনা খুব কম।

আমেরিকা ছেড়ে কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে, এই সম্ভাবনা আমাকে সুজানের সঙ্গে আরও শক্ত ক'রে বাঁধল। আমার বাইশ বছরের জীবনে সুজানই প্রথম নারী যাকে আমি পুরোপুরি পেয়েছি—অন্তত সেই প্রথম মাস গুলির তপ্ত অভিজ্ঞতায় তখন আমার তাই মনে হ'য়েছিল, যদিও এখন আমি জানি কোনও মানুষই অন্য কোনও মানুষকে পুরোপুরি পায় না, পেতে চাওয়াও অসম্ভবের আকাঙ্ক্ষা, কেননা মানুষ তার অন্তর্নিহিত স্বকীয়তার জন্যেই সত্যকারের মানুষ, যে স্বকীয়তা সে আর কাউকে দিতে পারে না, ঈশ্বরকে পর্যন্ত নয়। সুজানকে আমি ভালবেসেছিলাম তার দুরন্ত স্বকীয়তার জন্যে, চারা গাছ যেমন প্রভাতের সূর্যকে ভালবাসে। সুজানের মধ্যে জীবনের এমন কতগুলি গভীরতা দেখেছিলাম যার আলোক আমার প্রয়োজন ছিল, সুজানের কাছে বেঁচে থাকার এমন একটা তীব্র আনন্দ-বেদনার অনুভূতি ছিল, যা আমি অন্তত কিছুটা আত্মভূত করতে চেয়েছিলাম। সুজানের দেহ আমাকে যতোখানি পরিতৃপ্তি দিতো তার চেয়ে বেশি ক'রে রাখতো উত্তেজিত, ক্ষুধার্ত: ভুলতে পারতাম না সুজানের জীবনে প্রথম পুরুষ নই আমি, দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ

পঞ্চমও নই; মনে হত সুজান পাচ্ছে না আমার কাছ থেকে যা সে নিশ্চয় পেয়েছে অন্য পুরুষদের কাছে; এবং সুজান দিতে পারছে না আমাকে যা আমার চাই, চাই, চাই। সব কিছু মিলে সুজানকে আমার মনে হত বিশাল এক দীঘি, যার অগাধ জলের মধ্যে আমি ডুবে যাই, অথচ যার অনেকখানি আমার ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। সুজানকে পুরোপুরি দখলের জিদ আমাকে আক্রমণ ক'রে বসল। আমি সুজানকে একদিন ব'লে ফেললাম, "আমাদের কি বি'য়ে হ'তে পারে না?"

শুনে সুজান সশব্দে হেসে উঠল।

"তুমি কি প্রস্তাব করছ, কেতু?"

"জিজ্ঞেস করছি।"

"তোমার প্রশ্নের জবাব : না।"

"কেন?"

"খ'খানেক কারণ দেখান সম্ভব। প্রধান কারণ, তোমার বাবা-মা সম্পত্তি দেবেন না।"

"যদি দেন?"

"তুমি জানো, দেবেন না।"

"অন্য কারণ?"

"আমি তোমার চেয়ে ন' বছরের বড়ো।"

"তাতে কি এসে যায়?"

"অনেক কিছু। তুমি যখন ত্রিশের যুবক' আমি তখন উনচল্লিশের প্রৌঢ়া।"

আমি বললাম, "তোমাকে আমার একমুহূর্তের জন্যেও একত্রিশ মনে হয় না।"

সুজান বিছানায় শুয়ে ছিল, তার দেহ সম্পূর্ণ নিরাবরণ। নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে সুজান বলল, "অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। তুমি সত্যি বড্ড মিষ্টি ছেলে।"

আমি রেগে উঠলাম: "আমাকে 'ছেলে' বলবে না। তুমিই আমার বয়স সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন।"

সুজান বলল, "নিশ্চয়। তোমার বয়সটা যে আমার কাছে দারুণ লোভনীয়। অসম্ভব স্বপ্নময়।"

আমাকে তখনও রাগে নিঃশব্দ দেখে সুজান বলল, "শুধু বয়সের জন্যে নয়, তোমার মধ্যে অনেক কিছু আছে যাতে আমার লোভ অসীম। তুমি নতুন, আনকোরা তরতরে নতুন। তোমার মধ্যে একটা সরলতা আছে, সজীবতা, যা আমাদের মধ্যে খুঁজে পাই নে। তোমার কালচারে এমন কতকগুলি গুণ আছে যা আমি কিতাবে পড়েছি, অভিজ্ঞতায় দেখি নি। যন্ত্রসভ্যতা তোমাকে কাটে নি, কেতু। তুমি এখনও নিরেট

আছ, আস্ত ; টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙে পড়ো নি, যেমন পড়েছি আমরা। সব চেয়ে বড়ো কথা, তোমার মধ্যে দেবার ও পাবার ব্যাকুলতা আছে, যা আমরা হারিয়েছি। তুমি যে ভাবে দিতে চাও, আমরা সেভাবে দিতে জানি না ; তুমি যেভাবে পেতে চাও, সেভাবে পাওয়ার ক্ষমতা নেই আমাদের। মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো? মনে হয়, তোমার হাত ধ'রে জীবনটাকে আর একবার আরম্ভ করতে পারলে মন্দ হত না।"

আমি ব্যাকুল হ'য়ে বললাম, "তবে? তবে পিছিয়ে যাচ্ছ কেন?"

সুজান ব্যথাতুর হাসির সঙ্গে বলল, "তুমি কখনও তোমার বাবা-মার বিরুদ্ধে যেতে পারবে না।"

এই একজায়গায় সুজান নির্ভুল। সে জানতো, আমিও, যে, বাবা, তোমার ও মার সম্মতি নেই, অনুমোদন নেই, এমন কাউকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় এ-কারণে নয় যে আমি তোমাদের বাধ্য ছেলে। এ জন্যে নয় যে নিজের প্রত্যয় মতো কাজ করবার সাহস আমার নেই। আমি জানতাম সুজানকে বিয়ে করলে তোমরা আমাকে "ত্যাগ" করতে না। আমার অক্ষমতার কারণ আরও জটিল। সুজান তা বুঝতে চাইলেও বোঝবার ক্ষমতা ছিল না তার। তোমার সঙ্গে বাবা, ছোটকাল থেকে, বুঝি প্রায় জন্ম থেকে, আমার একটা দৃঢ় ভাব-সম্প্রীতি তৈরী হ'য়ে গেছে। তাকে ভাঙবার ক্ষমতা নেই আমার। আমি যাই করতে চাই, প্রথমেই প্রশ্ন ক'রে দেখি, তুমি কি বলবে, 'বেশ তো, ক'রে যাও?' এটা অনুমোদন নয়, তোমার অনুমোদন চাই নে আমি, অনুমতি তো নয়ই, যা চাই তা হচ্ছে সেই ভাব-সম্প্রীতির অক্ষুন্নতা। সুজানকে এই ব্যাপারটা ইংরিজীতে তর্জমা ক'রে দেবার ক্ষমতা নেই আমার।

অতএব আমি তোমাকে আর মাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। সুজানকে নিয়ে এলাম তোমাদের কাছে। তোমরা সুজানের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করলে, কিন্তু বুঝিয়ে দিলে ওকে পুত্রবধূ করাতে আগ্রহ তোমাদের বিন্দুমাত্র নেই। সুজান তোমাদের নিমন্ত্রণ করল। আরও কয়েকজন বন্ধুদেরও ডাকল। তুমি, বাবা, সুজানের সঙ্গে মামুলি কয়েকটা কথা ব'লে সারাক্ষণ গল্প করলে আর একটি মেয়ের সঙ্গে, যে কলম্বিয়ায় আমার সহপাঠিনী। তোমরা চ'লে গেলে, সুজান বলল, আই হেট ইয়র ফাদার।

আমি তোমাকে মুখোমুখি পাকড়াও করলাম একদিন।

"তুমি চিরদিন ব'লে আসছ আমি যাকে ইচ্ছে বিয়ে করতে পারি, তুমি বলে এসেছ, ম্যারী ফর লাভ এণ্ড নাথিং এল্‌স্‌।"

তুমি স্বীকার করলে, "বলেছি।"

"তবে ? তবে আজ কেন বাধা দিচ্ছ ?"

"ভুল বলেছি।"

"মানে ?"

"যা বলেছি তা ভুল। তুমি যে-কোনও-কাউকে ভালবেসে বিয়ে করতে চাইলে আমি খুশি হ'য়ে সম্মতি দেব, আজ দেখছি তা সম্ভব নয়।"

"সুজানের অপরাধ কি ? বয়স ?"

"সুজানের অপরাধ নেই। প্রশ্ন হচ্চে সুজানকে বিয়ে করার। তুমি বিয়ে করলে তোমাকে রুখবার ক্ষমতা নেই আমার। তবু আমি প্রাণপণ চেষ্টা করবো। কারণ আমার সন্দেহ নেই, সুজানকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে তুমি সুখী হ'তে পারবে না। তোমার জীবনটা নষ্ট হ'য়ে যাবে। বিয়ে দুচার বছরের বেশি টিকবে না। সুজান নিশ্চয়ই খুব আকর্ষণীয় স্ত্রীলোক (তুমি সুজানকে সর্বদা 'উওম্যান' বলতে, কদাপি 'গার্ল' বলতে না !, কিন্তু, দুঃখের বিষয়, আমি তাকে সংকীর্ণ বিশিষ্ট ফোকাসে দেখতে বাধ্য হচ্চি। আমার প্রশ্ন হল, কেতু ও সুজানের বিয়ে হলে কেমন হয় ? আমার জবাব হল : খুব খারাপ হয়। তোমরা দুজনে বন্ধু হ'তে পারো, স্বামী-স্ত্রী হবার জন্যে তৈরী হও নি।"

"সুজানকে বিয়ে করলে তোমরা আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না ?"

"নিশ্চয় রাখব ! তবে কি ধরণের সম্পর্ক থাকবে তা কি ক'রে বলি ?"

"তোমরা খুব দুঃখ পাবে ?"

"শুধু দুঃখ পাবো না। আমাদের মনে হবে, তোমার জীবনটা নষ্ট হ'য়ে গেল। তোমাকে এদেশে আনিয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়ার জন্যে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না।"

"অর্থাৎ তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ যে তোমার অনুগ্রহে আমি কলম্বিয়ায় পড়তে পেরেছি, এবং এখন যা করতে যাচ্ছি তার মানে চরম অকৃতজ্ঞতা।"

" 'অনুগ্রহ' কথাটা আপত্তি জনক। আমি বাবার দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র। পুত্রের যদি কোনও দায়িত্ব থাকে তা পালন করবে কি না-করবে সে ভাবনা তোমার। দায়িত্ব মানে অবলিগেশন নয়। দায়িত্ব মানে সেন্‌স্ অব রেসপনসিবিলিটি।"

"আমি কাকে বিয়ে ক'রে সুখী হবো সে সিদ্ধান্ত আমার না তোমাদের ?"

"প্রথমে তোমার।"

"তোমাদের অনুমোদন সাপেক্ষ ?"

"কেতু, তোমার যুক্তিতে একটা বড়ো ভুল থেকে যাচ্ছে," তুমি কণ্ঠে অসম্ভব দৃঢ়তা এনে বলেছিলে।

" 'অনুমোদন' কথাটা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তুমি যদি একমাত্র নিজের বিচারে কাউকে বিয়ে করতে চাও, আমরা কি ভাবছি না-ভাবছি পরোয়া না করে, তাহলে আমার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করছ কেন? করছ শুধু এ জন্যে যে তোমার নিজের মনেই সন্দেহ আছে, তুমি জানো তুমি দাঁড়িয়ে আছ দুর্বল ভূমিতে, তাই তুমি বল চাইছ আমাদের কাছে। যা চাইছ তা পাবে না। শুধু এ জন্যে যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সুজানকে বিয়ে ক'রে তুমি ভীষণ ভুল করবে। সারা জীবন এ ভুলের জের তোমাকে টেনে যেতে হবে। এ বিশ্বাস নিয়ে কি ক'রে তোমাকে আমরা সমর্থন দেব?"

"বাধা দেবে?"

"নিশ্চয় দেব, যতোটুকু বাধা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব।"

মা তোমার চেয়ে অনেক সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করল: "ঐ বুড়িকে বিয়ে করলে তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক থাকবে না।"

সুজানও ক্ষেপে গেল। কথায় কথায় তোমাদের প্রতি আমার আনুগত্যকে আক্রমণ করতে লাগল সুজান। তোমাদের কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে বদ্ধপরিকর হল। সুজানের সবচেয়ে রাগ তোমার ওপর। তুমি "লিবারেল"—অর্থাৎ সবচেয়ে "নিকৃষ্ট মানুষ"। কথার মারপ্যাচে তুমি তোমার "দৃঢ় রক্ষণশীলতাকে ঢেকে রাখো।" তুমি তোমার পুত্রের জীবন "ডিকটেট করতে চাও।" তোমার পরাণ শৃঙ্খল না ভাঙতে পারলে মানুষ হিসেবে মুক্তি নেই আমার।

এই এক-সুজান। এর সঙ্গে রয়ে গেল অন্য আর এক সুজানও। যে আমাকে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয় সঙ্গীতের আস্বাদ গ্রহণ শেখাল। যে আমাকে রক-মিউজিকের অন্তর্লীন বিষণ্ণ জীবনদর্শনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। যে আমাকে মিখেইলএঞ্জেলো থেকে সমসাময়িক এ্যাবষ্ট্রাক্ট শিল্পীদের ছবির তাৎপর্য বোঝবার ক্ষমতা জোগাল। যার কাছে আমি বেঁচে থাকার অভিনব আস্বাদ পেয়ে চললাম দিনের পর দিন। সুজান আমাকে ক্যামেরা ব্যবহার করতে শেখাল; একদিন সেন্ট্রাল পার্কে ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত আমার শ'খানেক ছবি তুললো সুজান; ক্যানভাসে আঁকল আমার প্রতিমূর্তি। সুজানের সঙ্গে পায়ে হেটে নিউ ইয়র্ক শহর বেড়িয়ে আমি যা শিখলাম সারাজীবন বই পড়ে তা শেখা সম্ভব হ'ত না আমার। সঙ্গে সঙ্গে সুজান আমাকে গভীরভাবে ভালোবাসল; প্রিয়া আর মা একত্র হ'লে যে ভালোবাসা হয় তাই পেলাম আমি সুজানের কাছে।

সুজান আমাকে জানিয়ে দিল, আমি তৈরী হ'লে, বিবাহের জন্যে সেও তৈরী।

সুজান বলল, "আমাদের বিয়ে হ'লে তোমাকে আর টরোন্টো যেতে হবে না। আমার রোজগারেই কলম্বিয়ায় তোমার পড়া হ'য়ে যাবে।"

আর একদিন বলল, "আমাদের বিয়ে হ'লে তোমাকে আর দেশে ফিরে যেতে হবে না, কেতু। তুমি তৎক্ষণাৎ আমেরিকান নাগরিক হ'তে পারবে।"

এবং অবশেষে, একদিন বলল, "তোমাকে বি'য়ে করলে আমি আইভানের হাত থেকে মুক্তি পাবো।"

টরোণ্টো আমাকে যেতে হ'ল, বাবা।

কলম্বিয়া আমাকে ফেলোশিপ দিতে পারল না। টরোণ্টো আমাকে "কলেজ ফেলো" ক'রে নিল। অশ্বেতকায় ছাত্রদের মধ্যে আমিই প্রথম এবং "সম্মান" পেলাম। হোষ্টেলে বিনা পয়সায় থাকার ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। পুড়বার মাইনে মাফ্। এ সবের সঙ্গে টরোণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজী বিভাগের আন্তর্জাতিক সুনাম। আমার অধ্যাপক বললেন, কলম্বিয়া থেকে টরোণ্টো ইংরিজী অধ্যাপনায় কোনও অংশে হীন নয়। অতএব, আমি চলে গেলাম।

সুজানের একটুও ইচ্ছে ছিল না আমি নিউ ইয়র্ক ছেড়ে চ'লে যাই। কিছুদিন ধ'রে আমাদের প্রায় রোজই ঝগড়া হচ্ছিল। সুজান ভেবে নিয়েছিল, তার কাছ থেকে আমি স'রে পড়ছি। সরে-পড়ার মধ্যে সুজান তোমাদের "বিজয়" এবং নিজের "পরাজয়" দেখতে পাচ্ছিল। তোমাদের কাছে "হেরে যাওয়া" সহ্য করতে পারছিল না সুজান।

আমি সুজানকে কথা দিয়েছিলাম, সুযোগ পেলেই নিউ ইয়র্কে তার কাছে বলে আসব।

"এলে তো তোমার বাবা-মা'র কাছেই থাকবে!" গুমরে উঠেছিল সুজান।

আমি বলেছিলাম, "তোমাকে টরোণ্টো নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবো। তুমি ওখানে ভর্তি হ'য়ে এক বছরে বি. এ. পাশ ক'রে নিতে পারবে।"

"তাতে কি লাভ হবে?"

"সারা জীবন টাইপ করবে না কি?"

"টরোণ্টো যদি যাই, বাপ-মা'র কাছ থেকে, দূর থেকে, তুমি বিয়ে করতে পারবে আমাকে?"

"হয়তো পারবো।"

"হয়তো।" সুজান নিরাশ।

"বেশি চাপ দিয়ো না আমাকে," আমার কণ্ঠে উষ্মা।

'চাপ আমি দিচ্ছি? না তোমার বাপ-মা দিচ্ছে?"

"সবাই চাপ দিচ্ছ তোমরা আমাকে। আমার অবস্থা কেউ ভেবে দেখছ না।"

সুজান তক্ষুনি মাপ চেয়েছিল। বলেছিল, "জানি, আমি স্বার্থপরের মতো নিজের কথাই ভাবছি। তুমি আমার কথায় কান দিয়ো না। তোমার যা ভালো মনে হবে তাই কোরো।"

মিতু, তুমি ও মা আমাকে ইষ্ট-সাইড এয়ার টার্মিনেলে পৌঁছে দিয়েছিলে। সেখান থেকে এয়ারপোর্টের বাসে আমি কেনেডি গিয়েছিলাম। তোমরা জানতে না, কেনেডিতে সুজান এসেছিল আমাকে সী-অফ্ করতে।

আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় একবারও তুমি না-কেঁদে পারো নি, বাবা। ভেবেছিলাম, এবার তোমার চোখে জল আসবে না। বাস লাইন দিয়ে অন্তর্হিত হবার সময় দেখলাম, চোখের জলে তোমার গাল ভেসে গেছে।

টরোন্টো শহর আমার একেবারে অপরিচিত ছিল না; তোমার সঙ্গে একবার আমি তিন দিনের জন্যে গিয়েছিলাম টরোন্টোতে; তুমি গিয়েছিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিকাল একনমি বিভাগের নিমন্ত্রণে সেমিনার করতে, আমিও গিয়েছিলাম তোমার এক কানাডিয়ান অধ্যাপক বন্ধুর অনুরোধে তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে। অধ্যাপক তাঁর নিজের বাড়ীতে ত্রিশটি ছাত্রছাত্রীকে একত্র করেছিলেন; তাঁদের সঙ্গে দু ঘণ্টা আমার "আলাপ আলোচনা" হ'য়েছিল। সেই স্বল্পদিনের সুখদর্শনে টরোন্টোকে তোমার ও আমার দুজনেরই ভালো লেগেছিল। নতুন ও পুরাতনের মিশ্রণ টরোন্টো শহর—শুধু দালানবাড়ী গির্জা ইত্যাদিতে নয়, সংস্কৃতিতেও। কলোনীয়েল কানাডা, ডমিনিয়ন কানাডা ও আমেরিকার প্রতিবেশী কানাডা, এই তিনের সংমিশ্রণ টরোন্টো শহরে। নিউ ইয়র্ক যেমন আমেরিকার কালচারেল ক্যাপিটাল, টরোন্টো তেমনি কানাডার। মনে আছে, বাবা, তুমি বলেছিলে, "কানাডিয়ানদের মধ্যে ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ ও আমেরিকান প্রভাব সংমিশ্রিত হ'য়েছে; বেশ একটা ইনটারেসটিং এনভিরনমেন্ট"। আমি সায় দিয়েছিলাম।

টরোন্টোর কুইন্‌স্ কলেজের ছাত্র ও কলেজ ফেলো হ'য়ে এ শহরে বাস করতে এসে দেখতে পেলাম তুমি ভুল বলেছিলে, আমিও ভুল ভেবেছিলাম। কানাডার মতো আইডেনটিটি ক্রাইসিস বুঝি নেই পৃথিবীর আর কোনও দেশের। কানাডার অর্থনীতিতে মার্কিন মালিকানা দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন ক'রে নিয়েছে; সংস্কৃতির ওপরও মার্কিন আধিপত্য প্রবল। কানাডায় বিনিযুক্ত মূলধনের শতকরা ষাট ভাগ

আমেরিকান; রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র মার্কিন প্রভাবের অধীন। তরুণ তরুণীরা তাই কানাডাকে বলে আমেরিকান কলোনী। অপর দিকে, অন্তত টরোন্টো শহরে, গোঁড়া রক্ষণশীল বৃটিশ ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি এখনও প্রবল। বিশেষ ক'রে কুইনস্ কলেজে। এখানে অধ্যাপকদের গাউন প'রে ক্লাসে আসতে হয়। ডাইনিং হ'লে ছাত্রছাত্রীরা লম্বা টেবিলে ব'সে আহার করে; খাদ্য নিজেদেরই সেলফ্ সার্ভিস কাউন্টার থেকে সংগ্রহ ক'রে আনতে হয়। অধ্যাপকরা উঁচু প্ল্যাটফর্মে হাই টেবিল চেয়ারে বসে আহার করেন, তাঁদের পরিবেশনের জন্য ওয়েট্রেস নিযুক্ত থাকে। নিয়মকানুনের শত শত গজ লাল ফিতের ডিপার্টমেন্টের হাত-পা বাঁধা। যেমন হ'য়ে থাকে, কানাডা, বৃটেন ও আমেরিকা থেকে সংস্কৃতির হীনতর অংশগুলিই বেশি গ্রহণ ক'রে বসে আছে। উপনিবেশগুলির ভাগ্যে তাই জোটে। তার ওপর আছে ফরাসী ইংরেজদের দ্বন্দ্ব। কানাডার এক তৃতীয়াংশ লোক ফরাসী ভাষা বলে। তাদের জাতীয়তাবাদ দ্যগলের আমল থেকে ফ্রান্সের সমর্থন পেয়ে আসছে। তারা চাইছে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ইংরেজীভাষী লোকেদের সঙ্গে সমান অধিকার। মনট্রিয়ল ফরাসী জাতীয়তাবাদের প্রধান কেন্দ্র। ফরাসী-ভাষী কানাডিয়ানরা দাবী করছে প্রত্যেক কানাডিয়ানকে ফরাসী শিখতে হবে, ইংরেজীর সঙ্গে সমান সমান হবে ফরাসী ভাষা। এ অন্তর্দ্বন্দ্ব কানাডার ইংরেজদের শংকিত করেছে, তাদের ভয় ফরাসী-ভাষী কানাডা একদিন না আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা ক'রে বসে।

তরুণতরুণীদের একটা বড় অংশ কানাডায় নতুন জাতীয়তাবাদের ঢেউ এনেছে। এরা চায় মার্কিন দাপট থেকে মুক্তি। কানাডা আমেরিকার উপনিবেশ থাকবে না। তার স্বতন্ত্র স্বাধীন ভূমিকা আছে বিশ্বরাজনীতিতে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আর সে অন্ধ সমর্থন দিয়ে যাবে না। মাস মিডিয়াগুলিকে স্বাধীন হ'তে হবে। মার্কিন পুঁজিবাদকে সীমাবদ্ধ করতে হবে। কানাডা কেন ভীয়েৎনামে মার্কিন যুদ্ধ সমর্থন করবে? কেন সে চীন ও সোভিয়েতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না? তার ধনসম্পদ দিয়ে কেন সে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অধিকতর সাহায্য করবে না? এ আন্দোলনের চাপে কানাডার আভ্যন্তরীন নীতিও ধীরে আস্তে বদলাতে শুরু করেছে। ইণ্ডিয়ানদের (ভারতীয় নয়) ওপর শত শত বছর যে অত্যাচার অবিচার চলে আসছে তরুণতরুণীরা এখন তার ক্ষতিপূরণ দাবী করছে; বলছে, এদেশের আসল মালিক তো ইণ্ডিয়ান আর এস্কিমোরা, এদের অবস্থা ভালো করা সরকারের প্রথম কর্তব্য। কালো কানাডিয়ানদের আন্দোলনও দানা বেঁধে উঠছে। সব চেয়ে দানা বেঁধেছে ভীয়েৎনাম যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন। হাজার হাজার আমেরিকান ছেলে ড্রাফট পালিয়ে আশ্রয়

নিয়েছে কানাডায়। কানাডিয়ান তরুণ তরুণীদের ভয়ে সরকার তাঁদের পাকড়াও ক'রে মার্কিন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে পারছে না। কানাডার গভর্ণমেন্ট একাধিকবার হো চি মিনের গোপন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মার্কিন সরকারের কাছে পৌঁছে দিয়েছে; ওয়াশিংটন ও হ্যানয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করবার প্রস্তুতি জানিয়েছে। প্রেসিডেন্ট জনসনের গর্বিত উপেক্ষা কানাডিয়ান দৌত্যকে এগোতে দেয় নি।

কলম্বিয়া য়ুনিভারসিটিতে প'ড়ে আমার চরিত্র খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল, বাবা। ওখানে গণতন্ত্র কিতাবী ধ্বনি নয়, জীবনের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে ইচ্ছেমত ধূমপান করে। ছাত্ররা সেমিনারে টেবিলের ওপর পা তুলে বসে। তাতে অধ্যাপকরা অপমানিত বোধ করেন না। অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে সম্পর্কে পারস্পরিক সমতার প্রকাশ প্রতি পদক্ষেপে। একটু গভীর সম্পর্ক হ'লেই অধ্যাপক ছাত্রকে তাঁর নাম ধরে ডাকেন, ছাত্রও অধ্যাপককে ডাকে নাম ধ'রে। ইদানীং, ভীয়েৎনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন মার্কিন গণতন্ত্রকে অনেক বেশি বাস্তব ক'রে তোলার আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা দাবী করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায়ও তাদের সক্রিয় অংশ থাকবে। এ দাবী কর্তৃপক্ষ অনেকখানি স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। সেনেটের সদস্যদের একটা বড় অংশ এখন ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হচ্চে। কোর্স ও পঠনপদ্ধতি নির্ধারণেও ছাত্রদের মতামত এখন গ্রাহ্য। ছাত্রদের দাবীতে কালো আমেরিকানদের সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, রাজনীতি, সাহিত্য নিয়ে অনেকগুলি কোর্স চালু করা হয়েছে। ছাত্রদের দাবীতে যুদ্ধ-সংযুক্ত রিসার্চ উঠে যাচ্ছে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সৈন্যবিভাগে লোক সংগ্রহের জন্যে আগে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এক একটি স্থায়ী দপ্তর ছিল। সেগুলি আর নেই। ক্যাম্পাসে রিক্রুটিং অফিসাররা ঢুকতেই পারে না। ছাত্ররা অধ্যাপকদের যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করবার অধিকার পর্যন্ত দাবী ক'রে বসেছে। আমেরিকায় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সে দাবী মেনেও নিয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের সবচেয়ে অকাট্য যুক্তি হল: আঠার বছরে আমরা যদি যুদ্ধের জন্যে প্রাণ দিতে পারি তাহলে দেশ ও প্রতিষ্ঠানগুলি চালাবার অধিকারও আঠার বছর বয়সে আমাদের আছে।

তারা তাদের পিতাদের বলছে, তোমরা আমাদের দেশের জন্যে মরতে বলছ, মরবার যোগ্যতা আমাদের আঠার বছর বয়সেই হ'য়ে গেছে। অথচ দেশের পরিচালনার যোগ্যতা আমাদের আছে-তা তোমরা স্বীকার করছ না। তোমরা চাইছ: তোমাদের জন্যে আমরা কেবল মরি আর জখম হই। আমরা চাইছি, বাঁচবার অধিকার; সমাজ পরিচালনার অধিকার। এ অধিকার না স্বীকার ক'রে পথ নেই তোমাদের।

ছাত্রছাত্রীদের দাবীতে আমেরিকায় ভোটের বয়স আঠারয় নামিয়ে আনবার আয়োজন চলছে, বাবা। দু এক বছরের মধ্যেই কংগ্রেস এ আইন পাশ ক'রে বসবে।

টরোন্টোতে পৌছাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার কলম্বিয়া কালচারের সঙ্গে কুইনস্ কলেজের কালচারের সংঘাত বেধে গেল।

কলেজ ফেলো হিসাবে সপ্তাহে দুটো আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ক্লাস নিতে হ'ত আমাকে। টরোন্টোতে পড়তে যাবার এটা ছিল অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ। পড়বার সঙ্গে সঙ্গে পড়াবার অভিজ্ঞতা অর্জন।

গাউন প'রে ক্লাসে যাওয়া আমার কাছে বিকৃত অহংকার মনে হল। গাউন না প'রেই আমি ক্লাসে গিয়ে পড়ান শুরু করলাম।

বিভাগের অধ্যাপকেরা নারাজ হলেন। ডাক পড়ল চেয়ারম্যানের দপ্তরে।

"কেমন লাগছে ক্যুইনস কলেজে আপনার?" চেয়ারে বসিয়ে প্রশ্ন করলেন চেয়ারম্যান।

"খুব ভালো লাগছে," অকপট অসত্য উচ্চারিত হল আমার মুখে।

চেয়ারম্যান বললেন, "আমাদের নাম আছে। কলম্বিয়ার মতো অভিজাত আমরা নই। কিন্তু এখান থেকে ডক্টরেট পেলে পৃথিবীর কোনও দেশে আপনি অনাদৃত হবেন না।"

আমি বললাম, "কলম্বিয়ায় আমার অধ্যাপকরা বলেন, টরোন্টোর ইংরিজী বিভাগ তাঁদের বিভাগেরই সমতুল্য।"

চেয়ারম্যান শুনে খুশি হলেন।

"তবু, আমরা কলম্বিয়া নই। আমাদের অনেকগুলি প্রাচীন নিয়মকানুন আছে। আমরা ট্রাডিশনকে সম্মান করি। আমেরিকার মতো হটাৎ আমরা নতুন হ'তে পারি না।"

আমি বললাম, "ট্রাডিশনের কথা আমাকে বলবার সময় মনে রাখবেন আমি আমেরিকান নই, ভারতীয়। আমরা ট্রাডিশন দ্বারা শাসিত।"

চেয়ারম্যান বললেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনাকে আর ট্রাডিশনের মূল্য বুঝিয়ে বলতে হবে না। এখানে থাকবার সময় অনুগ্রহ ক'রে আমাদের নিয়ম কানুনগুলি মেনে চলবেন।"

"আপনি গাউন প'রে ক্লাসে যাবার কথা বলছেন কি?"

"নিয়মগুলির মধ্যে ওটা একটা।"

"গাউন পরলে আমাকে ক্লাউনের মতো দেখায়। নিজেকে দেখে নিজেরই হাসি পায়। তা ছাড়া, লেকচার দিতেও আমার রীতিমত অসুবিধা হয়।"

চেয়ারম্যান বললেন, "অভ্যেস হ'য়ে যাবে।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "গাউন পরা বাধ্যতামূলক?"

চেয়ারম্যান বললেন, "না। তবে সবাই আমরা পরে থাকি। একটা প্রাচীন প্রথা। আমরা এ প্রথা তু'লে দিতে চাই নে।"

আমি বললাম, "বেশ। গাউন পরেই আমি ক্লাসে যাবো। কিন্তু লেকচার দেবার সময় গাউন খুলে রাখবো। ক্লাস থেকে বেরুবার সময় আবার গাউন প'রে নেব।"

চেয়ারম্যান আপত্তি করলেন না।

কিন্তু গাউন প'রে লেকচার না দেবার জন্যে কয়েকজন অধ্যাপক অখুশি রইলেন।

পরের বিবাদ বাধল হাই টেবিলে পরিচারিকা কর্তৃক পরিবেশিত হ'য়ে আহার করা নিয়ে।

এক সপ্তাহে আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। অধ্যাপকদের মধ্যে কয়েকজন বেশ বৃদ্ধ। যাঁরা প্রৌঢ় তাদের মধ্যেও সজীবতার অভাব। এঁদের পাশে ব'সে দিনের পর দিন আহার করা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠল। বিশেষত যখন আমাদের চোখের সামনে একটু নিচে ছাত্রছাত্রীরা পরমানন্দে হৈ-হল্লা ক'রে খাচ্ছে, গল্প করছে। আমি শুধু খাদ্যবিলাসী নই, আহার বিলাসী। ছোটবেলা থেকে আমাদের পরিবারে খাবার টেবিল আনন্দের স্থান। মার হাতের ভালো ভালো রান্নার সঙ্গে আমাদের চারজনের গল্প, হাসি তামাসা; আত্মীয় অতিথি থাকলে তো কথাই নেই। খাবার সময় সঙ্গীত শোনাও এখন আমার অভ্যেস হ'য়ে গেছে। এখানে অধ্যাপকরা খেতে বসে ষ্টক এক্সচেঞ্জের দরদস্তুর আলোচনা করেন, তাঁদের স্মল টক-ও অত্যন্ত শুকনো। আমার গলা দিয়ে খাদ্য ঢুকতে চায় না।

দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আহার শুরু করলাম।

অধ্যাপক জোনস, যাঁর বয়স অন্তত সত্তর হবে, ডিনারের আগে দেখা হ'তে প্রশ্ন করলেন, "মিঃ গুপ্ত, আপনাকে হাই টেবিলে আজকাল দেখতে পাই না কেন?"

আমি জবাব দিলাম, "তার কারণ আমি লো টেবিলে খেতে ভালোবাসি।"

কণ্ঠস্বরকে আকাশের মতো উদাসীন ক'রে তিনি বললেন, "আই সী! আপনি ছাত্রদের সঙ্গে আহার করছেন?"

আমি সবিনয়ে নিবেদন করলাম, "অধ্যাপক জোনস, আমি সপ্তাহে মাত্র দু' ঘণ্টার জন্যে শিক্ষক, বাকী সময়ের জন্যে ছাত্র। অতএব ছাত্রদের সঙ্গে আহারে আমার অধিক আনন্দ।"

"কিন্তু, মিঃ গুপ্ত, আপনি হচ্ছেন কলেজ ফেলো!"

"অধ্যাপক জোনস," আমি বললাম, "আমার নিয়োগ পত্রে লেখা নেই যে আমাকে হাই টেবিলে ব'সে আহার করতে হবে।"

এবার ডাক পড়ল না চেয়ারম্যানের দপ্তরে। তবে অধ্যাপকরা যে আর একটু বেশি অখুশি হলেন তা বুঝতে কষ্ট হল না।

তৃতীয় সংঘর্ষ আরও গুরুতর।

সকাল আটটায় বৃহস্পতিবারের ক্লাস। এক বৃহস্পতিবার দেখা গেল যে ঘরে ক্লাস বসবার কথা তার তালা বন্ধ। চব্বিশ জন ছাত্রছাত্রী বন্ধ ঘরের বাইরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

আমি আসতেই তারা বলল, "ঘর বন্ধ।"

"চাবি কার কাছে?"

কেউ জানে না।

একজন ছুটল জ্যানিটরের খোঁজে। মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এল। জ্যানিটরের সন্ধান না পেয়ে।

আমি বললাম, "এসো এখানেই ব'সে পড়ি সবাই। জায়গাতো অনেক।"

নতুন কিছু শুনে তারা উৎসাহিত হল। সবাই ব'সে পড়ল মেঝের ওপর ক্লাস রুমের বাইরে।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ান শুরু করলাম।

ক্যাইনস কলেজে নাকি এ ঘটনা আগে ঘটে নি। ঘরের বাইরে বারান্দায় যে ক্লাস বসতে পারে তা নাকি এদের নিয়মকানুনের বাইরে। নিউ ইয়র্কে প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই গ্রীষ্মের গরমে অধ্যাপকরা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গাছতলায় ছায়াতে পড়াতে ব'সে যান।

বেশ কয়েকটি ছাত্রছাত্রী এদিক দিয়ে যেতে যেতে এই বিচিত্র ক্লাস দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কয়েকজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার লেকচার শুনছে।

এমন সময় অধ্যাপক হোমার ব্রাডলে এদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনিও এক মিনিট দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখে নিলেন।

সারা কলেজে ছড়িয়ে পড়ল নতুন ছোকড়া ভারতীয় কলেজ ফেলো "ওপেন ক্লাস" নিতে শুরু করেছে।

পুনরায় আমাকে চেয়ারম্যানের দপ্তরে হাজির হ'তে হল।

তাঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে তিনি আমার "উদ্ভাবনী শক্তির" প্রশংসাই করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে এও বললেন, "মিঃ গুপ্ত, একবার যা করেছেন, বার বার তা করতে

যাবেন না। এখানকার নিয়ম ক্লাসরুমে বক্তৃতা করা। 'ওপেন ক্লাস' আমাদের অধ্যাপকেরা একদম পছন্দ করেন না।"

একটু থেমে, "মনে রাখবেন, কলেজ ফেলো প্রতিবছর নিযুক্ত হ'য়ে থাকে। এখানকার নিয়ম কানুন অনবরত লঙ্ঘন করলে দ্বিতীয়বার আপনাকে এ সম্মান দেওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে না।"

আমার চতুর্থ অপরাধ কুইনস্ কলেজে কেতু গুপ্তের ভবিষ্যৎ চুরমার ক'রে দিল।

কলেজ ফেলোর নিবাস ছাত্রদের হস্টেলে। তার কর্তব্য ছাত্রদের জীবনযাত্রার তদারক করা। টরোন্টো যে কলম্বিয়া নয় তার অন্যতম প্রমাণ, ছাত্রদের ঘরে ছাত্রীদের প্রবেশ নিষেধ, ছাত্রীদের ঘরে ছাত্রদের। কলেজ ফেলো অবশ্যি এ বিধি নিষেধের আওতায় পড়ে না। তার ঘরে স্ত্রীলোক আসতে পারে, রাত্রিতে থাকতেও পারে।

আমি টরোন্টো আসবার তু'মাস পরে সুজান এসে হাজির। এক সপ্তাহ সুজান ছিল আমার কাছে। আমার ঘরে।

একটি ইণ্ডিয়ান ছোকড়ার ঘরে একটি শ্বেতকায় মেয়ে রাত্রিবাস করছে, এ বেয়াদপি অধ্যাপকরা মার্জনা করতে পারলেন না।

মুখে বললেন না কেউ কিছু। কোনও নিয়ম এবার আমি লঙ্ঘন করি নি। এবং লঙ্ঘন করেছি সব চেয়ে শক্ত ও দৃঢ় নিয়ম। যা এঁরা দেখতে চান না তাই আমি এঁদের চোখের ওপর করেছি। কয়েকজনের সঙ্গে সুজানকে ভদ্রতার খাতিরে পরিচয়ও করিয়ে দিতে হয়েছে। 'সুজান ফোর্ড; আমার বান্ধবী। নিউ ইয়র্ক থেকে বেড়াতে এসেছেন।" সুজানকে নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বসে এ'ক সপ্তাহ আহার করেছি।

অধ্যাপকরা আমাকে শাস্তি দেবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

আমার প্রথম-শাস্তি এসে গেল সুজান চ'লে যাবার পরই। পি-এইচ. ডি থীসিসের বিষয় নির্বাচনের জন্যে উপদেষ্টা দরকার। যাঁকে অনুরোধ করি, তিনিই দেখছি কোনও না কোনও অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছেন। যে তিনজনকে উপদেষ্টা পেলে আমার সুবিধে, তাঁরা একজনও রাজী হলেন না। অগত্যা আমাকে চেয়ারম্যানের শরণাপন্ন হ'তে হ'ল। তাঁর দায়িত্ব আমাকে উপদেষ্টা জুটিয়ে দেবার। তিনি নির্বাচন করলেন অধ্যাপিকা মার্গারেট কুককে। আমি প্রমাদ গুনলাম। মার্গারেট কুক ভয়ংকর মহিলা। ত্রিশ বছর বয়সের পর তাঁর কোনও পাবলিকেশন নেই। কোন ছাত্রছাত্রীকে তিনি ঘোল না খাইয়ে ছাড়েন না। মেজাজ সর্বদা খিটখিটে। ধৈর্যের নামলেশ নেই। কথায় কথায় অপমান করতে ছাড়েন না। কোনও ছাত্রই মার্গারেট কুককে খুশি করতে পারে না। তার ওপর মার্গারেট কুক অতিশয় রক্ষণশীল। সবাই তাঁকে বলে এক নম্বর রেসিষ্ট।

প্রথম মোলাকাতেই আমাদের মধ্যে শত্রুতা স্পষ্ট হ'য়ে উঠল।

কলম্বিয়ায় পড়ার সময় অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের মল ডেভিস নামে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, যদিও বর্তমানে প্রায়-অজ্ঞাত, মঞ্চ অভিনেত্রীর জীবনী নিয়ে ডক্টরেট থীসিস লিখবার আইডিয়া আমাকে দখল ক'রে ব'সেছিল; বিভাগের দুজন অধ্যাপক, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরিজী সাহিত্যে যাঁদের জ্ঞান-গবেষণা বিশ্ববিখ্যাত, আমার আইডিয়াকে পুরো উৎসাহ ও সমর্থন দিয়েছিলেন। যে প্ল্যানটা মাথার মধ্যে ছিল এক সপ্তাহ লাইব্রেরীতে পরিশ্রম ক'রে উপযুক্ত রসদে সাজিয়ে গুছিয়ে সঙ্গে নিয়ে মার্গারেট কুকের কাছে উপস্থিত করেছিলাম।

আমার প্রজেক্টে এক-নজর বুলিয়েই মার্গারেট কুক আঁৎকে উঠেছিলেন। ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, রাগ আর অহংকারের ত্রমিশ্র সংকর ফুটে উঠেছিল তাঁর হাড়ল মুখখানায়।

"মিঃ গুপ্ত, আমাদের পরিচয়টা সে পর্যায়ে আসে নি যখন আমরা পরস্পরের সঙ্গে রসিকতা করতে পারি!" মার্গারেট কুকের কণ্ঠে জ্বলন্ত অঙ্গার।

আমি এতো বেশি হতভম্ব হ'য়ে গেলাম তাঁর প্রথম মন্তব্যে যে হটাৎ কোনও কথা সরল না আমার মুখে।

মার্গারেট কুক আমার তিনপৃষ্ঠার প্রজেক্ট পুরো পড়বারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। ওটাকে যতো কম স্পর্শ করা যায় ততোটুকু মাত্র ক'রেছিলেন তিনি।

বললেন, "এটা ইংরিজী সাহিত্যের বিভাগ। অখ্যাতনামা একজন অভিনেত্রীর জীবনচরিত লেখবার জন্যে অন্য বিভাগ আছে। তার নাম আপনার জানা না থাকলে বুলেটিন খুললে জানতে পারবেন।"

এবার আমার রক্ত গরম হ'য়ে উঠেছে।

আমি বললাম, "প্রফেসর কুক, যে প্রজেক্ট আমি প্রস্তাব করেছি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরিজী সাহিত্যের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলেই আমি মনে করি। কলম্বিয়ার অধ্যাপক ক্লেষ ও অধ্যাপক উইলসনের নাম আপনি শুনে থাকবেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ওপরে এঁরা সম্ভবত পৃথিবীতে এখন শ্রেষ্ঠ বিশারদ। এঁরা দুজনই আমার প্রজেক্ট নিয়ে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন; এঁদের প্রাথমিক মন্তব্য আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি, আপনার অনুমতি পেলে দেখাতে পারি।"

মার্গারেট কুক ভেবেছিলেন প্রথম আঘাতে আমাকে নিঃশেষ করবেন। আমি-নিঃশেষ না হ'য়ে যে পাল্টা আক্রমণ করতে পারি তিনি ভাবতে পারেন নি।

এবার মার্গারেট কুকই নিজেকে সামলে নিতে পুরো এক মিনিট সময় নিলেন।

"মিঃ গুপ্ত, আপনার দুর্ভাগ্য যে আপনি কলম্বিয়ায় পড়ছেন না, পড়ছেন হান্টার কলেজে।"

"অধ্যাপক কুক, আপনার ভুল হল। আমার অতিশয় সৌভাগ্য আমি টরোণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যাইনস্ কলেজে পড়বার সুযোগ পেয়েছি।"

"তাহলে আপনাকে কলম্বিয়ার কথা ভু'লে গিয়ে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে হবে।"

"অধ্যাপক কুক, আপনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন আমি জানি। আপনার পক্ষে হয়তো সম্ভব হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়কে ভুলে যাওয়া। আমার পক্ষে কলম্বিয়া অথবা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়কে ভুলে যাওয়া কোনওদিন সম্ভব হবে না; টরোণ্টো-কেও না। এখানে পড়তে হলে কলম্বিয়াকে কেন ভুলতে হবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"আমার কথার অর্থ আপনি ঠিক বুঝতে পারেন নি। বিদেশীদের পক্ষে ইংলিশম্যানের ইংরিজী সব সময় বোঝা সম্ভব হয় না।"

"নিশ্চয়, অধ্যাপক কুক; তাছাড়া আমি যখন নেহাৎ একটি ভারতীয়! যদি বুঝতে না পেরে থাকি, মার্জনা চাইছি। অনুরোধ করছি, আর একটু সরল ভাষায় বলুন।"

"আপনার এ প্রজেক্ট আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।"

"এতো সরল ক'রে বলার জন্তে বিশেষ ধন্যবাদ, অধ্যাপক কুক। এবার আশা করবো বুঝিয়ে বলবেন আমার প্রজেক্টের দুর্বলতা, দোষগুলি কোথায়।"

এতোক্ষণে আমি অধ্যাপক গ্রেষ ও অধ্যাপক উইলসনের লিখিত মন্তব্য আমার সামনে টেবিলের ওপরে রেখেছি। মার্গারেট কুকের ফ্যাকাসে বিড়াল-চোখ অনিচ্ছা সত্বেও দুখানা মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে বাধ্য হয়েছে।

"আমি মনে করি না এ প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করলে বিশেষ সুফল পাওয়া যাবে।"

"এবং তাই কি প্রজেক্ট বরবাদের পক্ষে যথেষ্ট কারণ, অধ্যাপক কুক?"

"নিশ্চয়।"

আমি বলে ফেললাম, "অপরাধ আমারই। এখন মনে পড়ছে রেষ্টোরেশন ড্রামার ওপরে কোনও কাজ আপনি করেন নি। আপনার একখানা পুস্তকই পড়বার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছে। ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত 'পোপ: দ' পলিটিকস অব পোয়েট্রি'। আপনার বই নিয়ে অক্সফোর্ডের অধ্যাপক পিয়ারসন টাইমস্ লিটারেরী সাপ্লিমেণ্টে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাও আমি পড়েছি (মার্গারেট কুক মুখ বিকৃতি করলেন; পিয়ারসন তাঁর বক্তব্যকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়েছিলেন, এবং লিখেছিলেন, 'এই মহিলার পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু তিনি পলিটিকসও বোঝেন না, পোয়েট্রিও বোঝেন না, সুতরাং হোয়াট শি হাজ কুক্‌ড্ ইজ নো পরিজ)।"

আঘাতটা হজম করতে সময় দিয়ে আমি বললাম, "অনুরোধ করবো, কি ধরনের প্রজেক্ট আপনার অনুমোদন পেতে পারে তার আভাস দিতে।"

মার্গারেট কুক বললেন, "প্রজেক্ট প্রস্তাব নিয়ে আসা আপনার কাজ।"

আমি বললাম, "নিশ্চয়। কিন্তু আপনি আমার উপদেষ্টা। আমাকে উপদেশ নিতে হবে আপনার কাছে।"

"তার মানে এই নয় আমি আপনার প্রজেক্ট তৈরী ক'রে দেব।"

"নিশ্চয় নয়। কিন্তু কি ধরনের কাজ আপনার মতে সুফল আনতে পারে জানতে পারলে আমার সুবিধে হবে।"

"জানতে হলে আপনাকে আমার কোর্স নিতে হবে।"

"তার মানে ছ'মাস পরে। আপনার কোর্স 'অডিট' করবার অনুমতি দেবেন?"
('অডিট' করা মানে কোর্স-এ ভর্তি না হ'য়েও ক্লাশে উপস্থিত থাকা)।

"তা সম্ভব হবে না।"

"ধন্যবাদ, অধ্যাপক কুক। আপনার সহানুভূতি ও সাহায্যের আগ্রহে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ।"

উঠে পড়লাম। মার্গারেট কুকেরই উচিত ছিল আমাদের মিটিং ডিসমিস করা; করলাম আমিই।

মার্গারেট কুক বলে উঠলেন, "আই হ্যাভ নেভার সীন এ মোর ইমপারটিনেন্ট ষ্টুডেন্ট।"

সেদিনই চেয়ারম্যানকে এই ইনটারভিউর রিপোর্ট পাঠিয়ে অনুরোধ করলাম, আমাকে অন্য একজন উপদেষ্টা দেওয়া হোক।

এক সপ্তাহ লাগল চেয়ারম্যানের জবাব পেতে। জবাবের প্রতিটি বাক্যে এ্যাসিড। "আপনার পত্র পাবার পরে অধ্যাপক মার্গারেট কুকের কাছ থেকে তাঁর প্রতি আপনার ব্যবহারের যে বিবরণ পেয়েছি তাতে আমি খুশি হ'তে পারি নি। বর্তমান অবস্থায় আপনাকে অন্য একজন উপদেষ্টার সঙ্গে সংযুক্ত করতে সময় লাগবে।"

কুইনস্ কলেজে আমার একটিই বন্ধু হ'য়েছিল। তার নাম অলিভার ক্লাইভ।

ক্লাইভ বলল, "এখানে তোমার পড়া হবে না। স'রে পড়ো।"

আমি বললাম, "আমার চারদিকে দেয়াল। স'রে পড়ার পথ নেই।"

সত্যি, বাবা, আমার চারিদিকে দেয়াল উঠে গিয়েছিল, আমি দেয়ালগুলি থেকে বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। একটা দেয়াল ছিল তুমি, মা আর মিতু, আমার জন্মগত বন্ধন ; অন্যটা সুজান কোর্ড, যার আকর্ষণে আমি সর্বদা অস্থির, যে আমাকে দহন করছে, করছে, করছে, যার উত্তাপ আগুনের উত্তাপ, তাতে মণির ঔজ্জ্বল্যের স্নিগ্ধ প্রশান্তি নেই ; তৃতীয় দেয়াল টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের কুইনস কলেজের ইংরিজী বিভাগ ; চতুর্থ দেয়াল, অর্থের অভাব।

যে টাকা আমার নামে ব্যাংকে ছিল তার অনেকটাই আমি সুজানকে নিয়ে বেড়াতে, খেতে, সিনেমা-থিয়েটার ব্যালে-অর্কেস্ট্রার খরচ ক'রে ফেলেছি। অবশিষ্ট যা আছে তাও হু হু ক'রে খরচ হ'য়ে যাচ্ছে মাসে অন্তত দু'টো সপ্তাহ-শেষ নিউ ইয়র্কে কাটান'র প্রয়োজনে।

শুক্রবার সকালে একটা ক্লাস ; শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি দ্বিতীয় শুক্রবার আমি চলে গেছি সোজা টরোন্টো এয়ারপোর্টে, প্রথম প্রাপ্ত প্লেনে ক'রে পৌঁচেছি নিউ ইয়র্ক। তোমাদের জানতেও দি নি। সুজান আমাকে কেনেডি বা লা গার্ডিয়া থেকে সোজা নিজের ঘরে নিয়ে গেছে। সোমবার সকালের প্রথম বিমানে ফিরে এসেছি টরোন্টো।

সুজানের প্রয়োজন ছিল এ সময়ে আমাকে : আইভানের সঙ্গে শেষ যোগসূত্রটুকু ছিড়তে সুজান দৃঢ়সংকল্প হ'য়েছিল। উইক-এণ্ডে আমার উপস্থিতি সুজানের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে আইভানকে সরিয়ে রাখার একমাত্র উপায়।

তোমাদের না জানিয়ে নিউ ইয়র্ক যাচ্ছি, থাকছি নিউ ইয়র্কে, সতর্কতার সঙ্গে এমন সব স্থান এড়িয়ে চলছি যেখানে তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবার সামান্যতম সম্ভাবনা, এবং সর্বদা এই কাজটা আমার মনে শূলের মতো বিঁধছে, বিঁধছে, বিঁধছে। কতোবার ইচ্ছে হয়েছে ফোন ক'রে তোমাদের খবর নি ; তোমার, মার, মিতুর, কণ্ঠস্বর শোনবার জন্যে মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে ; জোর ক'রে সে ব্যাকুলতাকে চেপে গেছি।

সুজান ভালোই জানত, কী নিদারুণ দোষী-ভাব আমার মনের মধ্যে চ'ড়ে বেড়াচ্ছে। সুজান রেগে যেত। এ যুগেও কেউ বাপ-মা'র জন্যে এমন আকুল হয় ? এ যুগেও কোনও ছেলের ওপর বাপ-মা'র এতোটা প্রভাব থাকে ? সুজান অনেক চেষ্টা করেও তোমাদের কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারছে না।

কলম্বিয়া য়ুনিভারসিটির ধারে কাছেও আমি যেতে পারছি না। পাছে তোমার, তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়।

মিতু টেলিভিশনে ট্রেনিং নিচ্ছে টাইম স্কোয়ারের কাছাকাছি একটা রাস্তার ওপর চ্যানেল থার্টিনের বাড়ীতে। সন্ধ্যেবেলা পড়তে যায় নিউ ইয়র্ক য়ুনিভারসিটিতে। ঐ দুটো এলাকায় আমার "প্রবেশ নিষেধ।" মা সপ্তাহে তিনদিন সন্ধ্যেবেলা লেকসিংটন আর উনষাট স্ট্রীটে ওয়াই-ডবলু-সি-এ'তে লাইব্রেরি-সায়ান্স পড়তে যায়: ঐ দিকটায় আমি পা বাড়াই নে। সুজান বিদ্রুপ করে, খোঁচা মারে, আমি রেগে যাই, আমাদের ঝগড়া হয়, আবার ভাবও হয়, কিন্তু ভাবের মধ্যে একটা অভাব আমাকে মারে।

এতো ক'রেও তোমাদের কাছে ধরা প'ড়ে গেলাম একদিন।

তোমাদের টেলিফোন একদিন বিকেলে বেজে উঠল। তুমি টেলিফোন ধরতে একটা লোক বলল, "আপনার পাসপোর্ট হারিয়েছে?"

তুমি বললে, "না তো!"

সে বলল, "আমি একটা পাসপোর্ট কুড়িয়ে পেয়েছি। তাতে নাম লেখা আছে—"

কষ্ট ক'রে, বানান ক'রে লোকটা আমার নাম পড়ল।

তুমি বললে, "হ্যাঁ। আমার ছেলের পাসপোর্ট!"

লোকটা বলল, "পাসপোর্টটা একটা চামড়ার কেস-এ বন্ধ। তার মধ্যেই আপনার নাম ও ফোন নম্বর পেলাম।"

তুমি লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে জানতে চাইলে কোথায় পাওয়া যাবে পাসপোর্টটা।

লোকটা ডাউন-টাউনে তোমাকে একটা গ্যারেজের ঠিকানা দিল।

তুমি হন্তদন্ত হ'য়ে সেখানে এসে দেখলে লোকটি এক কালো আমেরিকান। গ্যারেজের মিস্ত্রী। সে তোমাকে পাসপোর্টটা দিল। তুমি তাকে পাঁচ ডলার বকশিস দিলে। সে মুখ ব্যাজার করল। তুমি তাকে আরও পাঁচ ডলার দিলে।

"কোথায় পেলে এটা?" তুমি জানতে চাইলে।

পথে কুড়িয়ে পেয়েছে, বলল লোকটা। যে রাস্তার নাম বলল তা সুজানের বাড়ীর রাস্তা।

এ ঘটনা ঘটল শনিবারের সন্ধ্যের একটু আগে।

পরের দিন সকাল ন'টায় সুজানের টেলিফোন বাজল।

ফোন ধরলাম আমি।

তুমি বললে, "কেতু!"

আমি দম বন্ধ ক'রে রইলাম। টেলিফোন নামিয়ে রাখতে পর্যন্ত ভুলে গেলাম।

তুমি বললে, "কেতু! তোমার পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে?"

কি সর্বনাশ।

আমার মুখ দিয়ে কথা বেরিয়ে এল: "আমার পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে?"

তুমি বললে, "হ্যাঁ।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "তুমি জানলে কি ক'রে?"

তুমি বললে, "তোমার পাসপোর্ট আমার কাছে। একটা লোক রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিল। আমাকে ফোন করায় কাল সন্ধ্যেবেলা আমি নিয়ে এসেছি।"

আমি বললাম, "মাই গড!"

"পাসপোর্টটা তোমার চাই?"

"নিশ্চয়।"

"কোথায় কখন তোমাকে দেওয়া যায় যদি বলো তাহলে তোমাকে দেবার ব্যবস্থা করতে পারি।"

তুমি আমাকে বাড়ী এসে নিয়ে যেতে বললে না, বাবা।

আমি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে বললাম, "কনস্যুলেট জেনারেলে, ১ টার সময়।"

তুমি বললে, "বেশ। আমি থাকবো ওখানে।"

তুমি আর আমি দুজনেই ঘড়ির মিনিট ধ'রে পাংচুয়াল। একটায় এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট থাকলে তুমি একটা বাজতে দু'মিনিট আগে হাজির। আমি ঘড়ির কাঁটায় ঠিক একটায়।

তবু সেদিন আমার জন্যে তোমাকে আট মিনিট অপেক্ষা করতে হ'য়েছিল। তোমাকে ও মাকে।

আমি ঠিক সময়েই পৌঁচেছিলাম। কিন্তু ইষ্ট চৌষট্টি ষ্ট্রীটে নিউ ইণ্ডিয়া হাউসে ঢুকতে পা ওঠেনি। রাস্তায় আট মিনিট দাঁড়িয়েছিলাম। নিশ্চিত জেনেও যে তোমরা রীডিং রুমে অপেক্ষা করছ।

ভারী কাঠের দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে রীডিং রুমে প্রবেশ করা মাত্র তোমার সঙ্গে চোখাচোখি। এবং মুহূর্ত কয়েক পরে মার সঙ্গেও।

আমি কয়েক পা এগিয়েছি, তুমিও কয়েক পা এগিয়ে এসেছ। এবং আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি।

তুমি পাসপোর্টটা পকেট থেকে বার ক'রে আমাকে দিলে।

আমি নিলাম।

তুমি সটান দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলে।

যাবার সময় মাকে বললে, "তুমি সোজা বাড়ী চ'লে যেয়ো। আমি স্কুলে যাচ্ছি।"

আমি তোমার এ-ধরনের প্রস্তাবের জন্যেই তৈরী হ'য়ে এসেছিলাম। ঠিক যেমন ব্যবহার তোমার কাছ থেকে পাবো ভেবেছিলাম, তুমি তাই দিয়েছিলে।

মা আর আমি একসঙ্গে কনসুলেট-জেনারেলের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় নেমেও দুজনে নীরব।

আমিই প্রথম কথা বললাম, "চলো, মোড়ে একটা রেঁস্তোরা আছে, কফি খাওয়া যাক।"

কয়েক পা এগোতেই রেঁস্তোরা। ছোটমত, ইতালিয়ান রেঁস্তোরা।

"পিৎসা খাবে, মা ?"

মা খাবে না জানাতে আমি আমার জন্যে পিৎসা-কফি আর মার জন্যে শুধু কফি নিয়ে টেবিলে গেলাম। মা আগে থেকেই টেবিল দখল ক'রে বসেছিল।

মা প্রশ্ন করল, "কবে এসেছিস ?"

আমি বললাম, "শুক্রবার।"

"প্রায়ই আসিস বুঝি ?"

"মাসে একবার।"

"মিথ্যে কথা। সপ্তাহে একবার।"

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

মা বলল, "আমাদের খবরও করিস না!"

আমি বললাম, "খবর করতে হলে তোমাদের কাছেই থাকতে হয়।"

মা বলল, "তুমি যে এমনি হ'য়ে যাবে ভাবতেও পারি নি।"

আমি বললাম, "তোমরা যা ভাবতে পেরেছ আমাকে তাই হ'তে হবে এমন কোনও নিয়ম আছে কি ?"

মা বলল, "তুমি তো দেখিয়েই দিলে, নেই।"

আমার আর লুকোচুরি ভালো লাগল না। বললাম, "মা, ভেবো না, আমি তোমাদের কাছ থেকে পর হ'য়ে গেছি বা দূরে চলে গেছি। তোমরা আমার কাছে এখনও ভীষণ দামী। সুজানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তোমরা গ্রহণ করতে পারছ না। পারলে এভাবে তোমাদের লুকিয়ে আমাকে নিউ ইয়র্কে আসতে হ'ত না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমি যা আমাকে সেভাবে গ্রহণ করতে তোমরা পারছ না বলেই আমাকে তোমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। তোমাদের ছেড়ে সুজানকে নিয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তাই প্রতি সপ্তাহে তোমাদের ফোন করছি, চিঠি

লিখছি, দিনরাত তোমাদের কথা ভাবছি। সুজানকে ছেড়ে দিয়ে আগের মতো তোমাদের সঙ্গে এক হ'য়ে থাকাও আমার দ্বারা এখনও সম্ভব নয়। সুজান সম্বন্ধে আমার কতোগুলি কমিটমেন্ট আছে। তা ছাড়া আমি সুজানকে ভালোবাসি। এ ব্যাপারটা আমাকে আমার মতো করেই মেটাতে দাও। আমার ওপরে চাপ দিতে যেয়ো না। অনেক দিক থেকে অনেক চাপ পড়েছে একসঙ্গে আমার ওপর। ধৈর্য ধরো। আমাকে স'য়ে যাও। তোমাদের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আজ আমার অনেক বেশি প্রয়োজন স্নেহ আর ভালোবাসার চেয়ে। আমার কথাগুলি বুঝতে পারছ?"

কয়েক মিনিট চুপ ক'রে রইল মা।

পরে বলল, "আজ রাত্রিতে বাড়ী আসিস। কাটলেট করেছি।"

একটু পরে যোগ দিল, "যদি একা আসা সম্ভব না হয়, ঐ মেয়েটাকে নিয়েই আসিস।

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, "না, মা, আমি একাই আসবো। দশটার বেশি থাকতে পারবো না কিন্তু।"

সেদিন রাত্রে বারোটা পর্যন্ত আমরা চারজনে গল্প করেছিলাম। আমি টরোন্টোর কথা বলেছিলাম তোমাদের। মার্গারেট কুকের সঙ্গে মোলাকাতের বিবরণ শুনে, বাবা, তুমি দারুণ রেগেছিলে, আবার খুশিও হ'য়েছিলে। সুজানকে নিয়ে একটা কথাও হয় নি আমাদের। মিতুর অনেক মজার মজার গল্প জমে ছিল। শুনে আমার কি হাসি, কি হাসি।

সুজানের এ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে দেখি সুজান মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে বিছানায় পড়ে রয়েছে। আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ক'রে, তোমাদের সঙ্গে আমার এতো সময় কাটান সহ্য করতে না পেরে, টেনশন থেকে পালাবার জন্যে মদ খেয়ে গেছে। ইদানীং সুজানের মদ্যপান বেড়েছে।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সুজান জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, "বাচ্চা সোনা, মিষ্টি সোনা, খোকামনি, মার দুধ খাওয়া শেষ হল? বাবার আদর খাওয়া শেষ হল?"

কিছুক্ষণ পরে বলল, "হে ঈশ্বর, পিতাদের দাসত্ব থেকে সন্তানদের মুক্ত করো।"

তুমিও বলেছিলে, এ ঘটনার দেড় মাস পরে, "বাবা হওয়ার মতো বড়ো দায়িত্ব পুরুষের জীবনে আর নেই, কেতু। আমরা সন্তানের জন্ম দি, সন্তানদের ঘিরে গ'ড়ে ওঠে আমাদের নিজস্ব ক্ষুদ্র রাজত্ব, আমাদের অহমিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিজস্ব ক্ষেত্র। প্রত্যেক বাবাই চায় তার ছেলের মধ্যে নিজের বিকাশ, পূর্ণতা দেখে যেতে। এরই নাম উত্তরাধিকার। আমরা জীবনে যা কিছু উপার্জন করি, শুধু অর্থ নয়, সম্পত্তি নয় আমাদের জীবনের কর্ম আর ধর্ম দিয়ে উপার্জন, তা আমরা রেখে যাই ছেলেদের কাছে।

আমরা চাই, পুত্ররা সে উপার্জনকে সম্মান করুক, শ্রদ্ধা করুক, তাদের নিজেদের জীবনের উপার্জিত সম্পদের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে মিশিয়ে নিক।"

আমি বলেছিলাম, "শুধু তাই নয়, বাবা। তোমরা আমাদের জীবন তৈরী ক'রে দিতে চাও। তোমরা চাও তোমাদের নির্দেশিত পথেই চলি আমরা, চাও আমাদের ওপর তোমাদের দখল বজায় রাখতে। যে মুহূর্তে আমরা তোমাদের নির্দেশিত পথ ছেড়ে অন্য পথে চলতে শুরু করি, তক্ষুনি বাধে সংঘাত, আসে সমস্যা।"

তুমি বলেছিলে, "কথাটা মিথ্যে নয়। অন্তত ভারতবর্ষে আমরা পিতারা তোমাদের আলাদা পুরুষ বলে ভাবতে শিখি নি। তোমরা আমাদের, আমরা তোমাদের।"

"দ্বিতীয় অক্ষর দুটোতে একটা ফাঁক আছে, বাবা। আমি কোনও বাপকে দেখিনি যে সন্তানের জন্যে নিজের জীবন তৈরী করেছে। সন্তানকে মানুষ করতে 'স্যাক্রিফাইস' করছে, করেছে, এমন বাবা অনেক দেখেছি, কিন্তু 'স্যাক্রিফাইস' কথাটা ভুল। বাপ সন্তানকে মানুষ ক'রে তোলে নিজের কর্তব্যের তাগিদে, নিজের ভবিষ্যতের আশায়। আমরা তোমাদের ইনভেস্টমেন্ট। ব্যাংকে টাকা রেখে সুদ পাবার মতো, কোম্পানীর শেয়ার কিনে ডিভিডেন্ট পাবার মতো, আমাদের জীবন থেকেও অনেক কিছু পাবার আশায় তোমরা ইনভেস্ট করো। এর মধ্যে একটা নিবিড় ও প্রাচীন স্বার্থ র'য়ে গেছে; তাকে অস্বীকার ক'রে লাভ নেই। যে-সব বাবাদের পুত্র ছাড়া গতি নেই শুধু তারাই নয়, যারা ছেলেদের ওপরে নির্ভরশীল নয় অর্থের জন্যে, তারাও অনেক দাবী নিয়ে ছেলেদের মানুষ করে। এ দাবী না মেটাতে পারলে আমরা কুপুত্র হ'য়ে যাই।"

আমি আরও বলেছিলাম, "তুমি উত্তরাধিকারের কথা বলছ। যদি একে সাম্রাজ্যবাদ বলি, খুব কি অন্যায় হবে? ফ্যামিলি তো এক একটি সাম্রাজ্য। তার অধিকর্তা, অর্থাৎ পিতা, এক একটি সম্রাট। তার দাপট স্ত্রীর ওপর, সন্তানদের ওপর, নির্ভরশীল আত্মীয়দের ওপর। সবাইকে তার আদেশ, ইচ্ছে, নির্দেশ, অনুশাসন মেনে চলতে হবে। কোনও কোনও ফ্যামিলি হয়তো খানিকটা গণতান্ত্রিক, কোনও ফ্যামিলি পুরোপুরি ফ্যাসিষ্ট, বেশির ভাগ ফ্যামিলিই ফিউডাল জমিদারী। সমান সমান মানুষদের নিয়ে ফ্যামিলি হ'তে পারে না। যে স্বামী স্ত্রী দুজনেই চাকরী করে তারাও, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, সমান নয় পরস্পরের কাছে। স্ত্রী স্বামীর আধিপত্য মেনে চলে পদে পদে। আমার কি মনে হয় জানো, বাবা? আমার মনে হয় পুরুষের মধ্যে যে এ্যাগ্রেসিভ ইনস্টিংক্ট সর্বদা সজাগ, যার থেকে জন্ম নেয় আমাদের ইগো, সুপার-ইগো, তাকে চরিতার্থ করবার জন্যেই ফ্যামিলির সৃষ্টি। ভারতবর্ষে তো পরিবার পুরুষদের বাঁচিয়ে রেখেছে। জীবনে সবটুকু অন্যায়, অপমান, লাঞ্ছনা,

হতাশা, অগৌরব, গ্লানি, ব্যর্থতা যা পুরুষরা প্রতিদিন কুড়ুচ্ছে, তার টাল সামলাতে হচ্চে স্ত্রীকে, সন্তানদের, নির্ভরশীল আত্মীয়দের।"

সারারাত তুমি আর আমি কথা বলেছিলাম, আমহার্স্ট শহরের ওয়াই-এম-সি-এ-র ছোট্ট এক চিলতে ঘরে, তুমি লোহার খাটে শুয়ে, আমি মেঝের ওপর চাদর বিছিয়ে শুয়ে। আমরা এবং আরও তিনটি বাঙালী পরিবার দল বেঁধে আমেরিকার বিখ্যাত শারৎ-রং (Fall Colour) দেখতে বেরিয়েছিলাম। নিউ ইয়র্ক স্টেট ছাড়িয়ে নিউ হ্যাম্পশায়ার ঘুরে আমরা পৌঁচেছি ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের আমহার্স্ট শহরে, সারাদিন 'ফল কালার' দেখে, খোলা মাঠে হটাৎ-গজান রেস্তোরায় আহার সেরে, রাত্রিবাসের সস্তা আস্তানা খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে সন্ধান পেয়েছি ওয়াই-এম-সি-এ-বাসভবনের। ভাড়া সস্তা, কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রীলোক একসঙ্গে এক ঘরে রাত্রিবাস নিষেধ, স্বামী-স্ত্রী হলেও। আমাদের মধ্যে একটি দম্পতির দুবছরের ছেলেকে নিয়ে প্রশ্ন উঠল; বাসভবনের ম্যানেজার নিষ্পলক চোখে নির্দেশ দিল, একটুও না হেসে, ছেলেটিকে শুতে হবে বাবার সঙ্গে! ধর্মের অনুশাসন যে কি নির্বুদ্ধি গোঁড়ামির রাজত্ব চালিয়ে যায় তার নজির শুধু প্রাচীন ভারতবর্ষেই নেই, আছে অতি আধুনিক ইলেকট্রনিক যুগের মার্কিন দেশেও।

তুমি আর আমি, অতএব, একঘরে একা রাত্রিযাপনের সুযোগ পেলাম। এ সুযোগের প্রয়োজন ছিল। বেশি রাতে আড্ডাশেষে আমরা ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে প্রথমে দুজনেই নীরব। আমার মনে হল, তোমারও নিশ্চয়, অনেকখানি ব্যবধান রচিত হ'য়ে গেছে আমাদের মধ্যে, যা বহুকাল ছিল না, যা তৈরী হবার কথা ছিল না, যা তুমি বা আমি কেউ চাইনি। কয়েক মিনিট সেই ব্যবধানের ঘনীভূত অন্ধকার অনুভব ক'রে আমি ভয় পেয়ে গেলাম, বাবা। সময় যেন নিস্তব্ধ স্থবির হ'য়ে হিমালয়ের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের মাঝখানে, আমরা তার আড়ালে প'ড়ে এক অন্যকে আর দেখতে পাচ্ছি না, পিতা ও পুত্র হ'য়েও আমরা পরস্পরের কাছে অচেনা, কিম্বা তারও চেয়ে-ভয়ানক, স্তিমিত-চেনা। ঘরটা ছোট। লোহার কাঠের পাশে একটা ছোট্ট টেবিল, সংলগ্ন একখানা হাতল-হীন চেয়ার। দেওয়ালে যীশুর একখানা ছবি আর শুধু বোবা অন্ধ শাদা, তাতে একটা টিকটিকি নেই, একটা মাকড়সা পর্যন্ত নেই। পাশের ঘরগুলি থেকে পরিচিত পুরুষ-স্ত্রী কণ্ঠের কথা, হাসি খুশি, এবং দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চলাচলের শব্দ ভেসে আসছে। রাস্তায় চলতি গাড়ীর হুস-হুস-হুহুস—মার্কিন জীবনযাত্রার অবিরাম দিনরাতের আবহসঙ্গীত—এখানেও অনুপস্থিত নেই। পৃথিবী মুখর। জীবন কোলাহলতপ্ত। শুধু তোমার আর আমার মধ্যে সময় নিস্তব্ধ স্থবির। আমার মনে হল আমি যেন সময়ের বাইরে কোনও জনহীন প্রত্যন্ত

প্রান্তরে বিক্ষিপ্ত, আমার দেশ নেই, ভাষা নেই, পরিচয় নেই, নাম-ঠিকানা কিছু নেই, আমি কারুর সন্তান নই, আমার পিতা নেই, বিধাতা নেই, এক দিগন্তবিহীন মহাকাশে আমি একক নক্ষত্র, একাকীত্বের তীরে বিদ্ধ।

সার্ত্রের একটা উপন্যাস পড়েছিলাম, জার্মেনীর অর্ধ অধিকৃত ফরাসীদের নিয়ে। হিটলারের সৈন্যরা প্যারিস দখল ক'রে নিয়েছে, কয়েকশ' মাইল দূরে একদল ফরাসী সৈন্য অপেক্ষা করছে দিনের পর দিন বিজেতাদের হাতে বন্দী হবার জন্যে, তাদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব গেছে হারিয়ে, তাদের স্বদেশ নেই, তাদের নেই জাতীয় স্বকীয়তা, তারা আর মানুষ নয়, শুধু পরাজিত সৈনিক, এমন এক যুদ্ধে পরাজিত যে যুদ্ধ তারা বাধায় নি, যে যুদ্ধ ঘোষণা করার সময় তাদের মতামত নেবার প্রশ্নও জাগে নি কারুর মনে, যে-যুদ্ধ জিতবার সুযোগ, অন্তত তাতে শত্রুকে মারবার ও মরবার সুযোগ পর্যন্ত তারা পায়নি। আমার মনে হল তেমনি এক পরাজিত সৈন্য আমি, আমার চারিদিকে কেবল প্রশ্নের ব্যূহ, সবকিছু কেবল আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন চাবুকের মতো দেহে পড়ছে আমার—কে তুমি ? কেন তুমি ? কি তুমি ? কোথায় তুমি ? তুমি কে কেন কখন কোথায় কিজন্যে কারজন্যে কেন কে ?

ব্যূহ থেকে বেরিয়ে যাবার উৎক্ষিপ্ত প্রচেষ্টায় আমি তোমার হাতে হাত রাখতেই তুমি আমার হাতখানা শক্ত শীতল মুঠোর মধ্যে বন্দী ক'রে নিয়েছিলে, বাবা ; আর সেই মুহূর্তের আত্মিক বন্ধন নিস্তব্ধ স্থবির সময়কে এক ধাক্কায় সরিয়ে আমাদের দুজনকে পুরাতন পরিচয়ের পরিচিত উপত্যকায় উপনীত করেছিল।

পুত্র ফিরে পেয়েছিল পিতাকে। পিতা পুত্রকে।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি নীরবে কাঁদছ।

কথা প্রথম আমিই বলেছিলাম।

বলেছিলাম, "আমি আছি, বাবা। আমি হারিয়ে যাইনি।"

তুমি আমার হাতখানাকে নিজের হাতের মধ্যে আরও গভীর ভাবে বন্দী ক'রেছিলে।

হঠাৎ আমাদের মধ্যে কথার স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হ'য়ে গেল, আহা, কথা বলে মানুষ যে কতোখানি মুক্ত হ'তে পারে, কতোখানি ভারহীন, তা আবার নতুন ক'রে বুঝতে পারলাম আমি।

তোমাকে বলেছিলাম, "তোমাদের দুঃখ দেবার সাহস আমার আছে, বাবা। সন্তান যদি সত্যিকারের বাঁচতে চায় বাপ-মাকে দুঃখ না দিয়ে তার পথ তৈরী হ'তে পারে না। বাপ-মাকে সুখী করাই যদি সন্তানের প্রধান কর্তব্য, তাহলে তাকে বাপ-মার জীবনেরই জলছবি হ'য়ে বেঁচে থাকতে হয়। এবং এভাবেই বেঁচে থাকে

ভারতবর্ষের অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা, তারা নিজেদের জন্যে বাঁচেনা, বাঁচে বাবা-মা, পরিবার, সমাজের জন্যে। আমি তাদের মতো বাঁচতে পারবো না, বাবা; আমার জীবনের পথ আমাকেই জেনে নিতে হবে। এতে তোমরা দুঃখ পেলে, সে দুঃখ দেবার মতো সাহস আমার আছে। কিন্তু একটা সাহস আমার নেই। তা হল, তোমাদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেবার। তোমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মানে আমার স্বকীয় জ্যোতিষ্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। সে সাহস আমার নেই।"

তুমি বলেছিলে, "কেতু, আজ অকপটে স্বীকার করছি, তোর কাছ থেকে বড়ো আঘাত পাবার সাহস আমার নেই। দেড় বছর কী দারুণ ভয়ের মধ্যে যে বাস করছি তা বলে বোঝাতে পারবো না। এ ভয়টা আরও ভীষণ এজন্যে যে এর অস্তিত্ব একটুও জানা ছিল না।"

"তোমার জাহাজের মাস্তুলে আমি আর পতাকা নই, বাবা," বলেছিলাম আমি।

তুমি বলেছিলে, "অভিযোগ মানছি, কেতু। সব বাবারাই চায় পুত্ররা তাদের জীবনের জয়ধ্বজা হোক।"

"দিল্লীর বিষ্ণুপদ ঘোষ মহাশয়কে মনে আছে, বাবা? যিনি হ্যাট্রিক ক'রেছিলেন তিন তিনটে ছেলেকে আই-এ-এস বানিয়ে? তিন ছেলের বিয়ে দিয়ে পাঁচ লাখ টাকা নগদ সংগ্রহ করেছিলেন? বিষ্ণুপদ ঘোষ মশাইকে নিশ্চয় পদ্মবিভূষণ খেতাব দেওয়া হ'য়েছে দেশে গিয়ে শুনতে পাবে।"

এক সঙ্গে হাসতে পেরে দুজনেই হালকা হ'য়েছিলাম।

তুমি দিল্লীর আর এক মহাশয়ের কথা তুলেছিলে। একদা তিনি স্বদেশী ক'রে জেল খেটেছিলেন। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের পদস্থ অফিসর হবার সৌভাগ্যও তাঁর হ'য়েছিল। আই-এ-এস পরীক্ষা দিয়ে তাঁর একমাত্র ছেলে পুলিশে চাকরী পেল। হ'ল আই-পি এস। বছর তিনেক পরে আগ্রার ডি-এস-পি। একদিন ভদ্রলোক আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসে ছেলের গুণকীর্তনে ফেটে পড়লেন। "কি বলবো মশাই, আমাদের মন্টু, ঐ একরত্তি ছেলে, পর্শু সে একটা বিরাট জনতার ওপর গুলি চালাবার হুকুম দিয়ে বসল। একটুও ভয় পেল না। চেঁচিয়ে হুকুম দিল, ফায়ার। আর একশ পুলিশের বন্দুক এক সঙ্গে গর্জে উঠল। তিনটে লোক তৎক্ষণাৎ মরে গেল, দশটা আহত হল। জনতা এক নিমেষে ছত্রভঙ্গ। শুনে আমার দেহে কী রোমাঞ্চ, মশাই। কি দুঃসাহস, ভেবে দেখুন তো। আহা, যদি আমি নিজের চোখে এ দৃশ্যটি দেখতে পেতুম।"

ভদ্রলোকের উল্লাস দেখে তোমার চোখ ছানাবড়া হ'য়ে গিয়েছিল। আমার মনে আছে, তুমি বলেছিলে, "জনতার ওপরে পুলিশের গুলি চালনা আপনার এত সুখের, তা তো জানতাম না।"

আমি বলেছিলাম, "তাহলে দেখো, বাবা, তোমরা আমাদের মধ্যে নিজেদেরই সম্পূর্ণ দেখতে চাও, তোমাদের জীবনে যা হল না, তাই হওয়াতে চাও আমাদের দিয়ে।" অথচ আমরা যে এক একটি স্বতন্ত্র মানুষ, আমাদেরও যে নিজস্ব অভিজ্ঞান আছে জীবনে, আছে স্বকীয়তায় বাঁচবার ইচ্ছে, তা তোমরা সহজে মানতে চাও না।"

তুমি বলেছিলে, "এমনি করেই তো জীবনের ধারাবাহিকতা তৈরী হয়।"

আমি তোমার সঙ্গে একমত হ'তে পারি নি। "ধারাবাহিকতার নামে পিতাদের যে সাম্রাজ্যবাদ চলে আসছে তার অবসান না হ'লে সন্তানদের মুক্তি নেই। জীবনের ধারাবাহিকতা এক জিনিস, আর তোমাদের নির্বাচিত পথে আমাদের চলার বাধ্য-বাধকতা অন্য জিনিষ।"

তুমি বলেছিলে, "পিতা তো চিরদিন বেঁচে থাকে না। তা ছাড়া পুত্রের জীবন কখনই পিতার জীবনের অসমাপ্ত অধ্যায় হ'য়ে উঠতে পারে না। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা তো স্বতন্ত্র হ'য়েই থাকো।"

আমি বলেছিলাম, "একবার জীবনের কাঠামো তৈরী হ'য়ে গেলে স্বতন্ত্রতার বিশেষ কিছু সুযোগ থাকে না, বাবা। কোনও দু'টি মানুষই এক নয়। তোমার সন্তান হ'য়েও আমি অন্য মানুষ। আমাকে নিজের পথে চলতে দেখে তুমি কেন আনন্দ পেতে পারো না?"

তুমি বলেছিলে, "চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে যদি প'ড়ে যাও, পথের সন্ধানে যদি বিপথে কুপথে রওয়ানা হও, আমি কি আনন্দে আটখানা হবো?"

তোমার স্বরে উষ্মা এসে গিয়েছিল, বাবা। আমি তোমাকে জেমস জয়েসের পোর্ট্রেট অব দ' ইয়ং ম্যান এ্যাজ এ্যান আর্টিষ্ট থেকে কয়েকটি লাইন আবৃত্তি ক'রে শুনিয়েছিলাম: "To live, to err, to fall, to triumph, to recreate life out of life! A wild angel had appeared to him, the angel of mortal youth and beauty, an envoy from the fair courts of life, to throw open before him in an instant of ecstasy the gates of all the ways of error and glory. On and on and on and on!"

তোমাকে নীরব দেখে আমি বলেছিলাম, "বড় ভুল করতে পারার মতো সৎসাহস সবার থাকে না, বাবা।"

তুমি বলেছিলে, "তোমার আছে?"

"তাইতো দেখতে পেলাম," জবাব দিয়েছিলাম আমি। "সুজান আমার জীবনে প্রথম বড় ভুল।"

তুমি অবাক হ'য়েছিলে আমার কথা শুনে।

আমি বলেছিলাম, "সুজান অসাধারণ স্ত্রীলোক। তাকে হজম করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

তুমি নীরব থেকে আমাকে কথাগুলি গুছিয়ে বলার অবকাশ দিয়েছিলে।

আমি বলেছিলাম, "সুজানের প্রেম লেলিহান অগ্নিশিখা। সুজানের পুরো ব্যক্তিত্বটাই একমাত্র প্রেম। সুজান যে কতো কিছুকে কতো বেশি উত্তাপ দিয়ে ভালোবাসতে পারে তা তুমি ভাবতে পারো না। পেরুতে ভূমিকম্প হল, ম'রে গেল দেড় হাজার লোক, সুজান কেঁদে অস্থির। নাইজিরিয়ায় গৃহযুদ্ধে সুজানের ভালোবাসা বিআফ্রার দুর্বলদের জন্যে। যেদিন ভীয়েৎনামে মায়-লাই-হত্যার কথা কাগজে বেরুল, একফোঁটা জল পর্যন্ত খেতে পারল না সুজান। রোজগারের অর্ধেক সে প্রতিমাসে বিলিয়ে দেয় নানারকম প্রতিষ্ঠানে, নয়তো বন্ধুবান্ধবদের অভাব মেটাতে। সুজানের কাছে এগুলো পরোপকার নয়, তার মধ্যে দয়া নেই, সুজান অত্যন্ত নিষ্ঠুর। সুজান যা করে, কেবল ভালোবাসার জন্যে। নিজেকে ভালোবেসে বিলিয়ে দেবার জন্যে ছটফট করে সুজান। সুজানের এত বেশি প্রেম যে কোনও একজন পুরুষের পক্ষে তা বেশিদিন হজম করা অসম্ভব।"

আমি আরও বলেছিলাম, "ভারতবর্ষে আমাদের জীবন কেটে যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে, জীবনের কতটুকু আস্বাদ আমাদের জোটে? নিজেদের ছোট ছোট স্বার্থ ও সার্থকতা গুছিয়ে নিতেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'য়ে যায়। বাবারা সন্তানদের 'মানুষ' করবার নামে এক একটি জীবন কাটাবার যন্ত্র তৈরী করে। কোনও বড় কিছুর আহ্বানে সাড়া দি' না আমরা, সাবধানে গা বাঁচিয়ে পা ফেলি, আমাদের সাফল্যের চেহারাটা পর্যন্ত ছকে কাটা, বৈচিত্র্যহীন। এর ব্যতিক্রম হলেই আমরা কুপথের, বিপথের পথিক। আর, এদেশে, ভেবে দেখ, যুবক-যুবতিরা কী দুর্দম দুঃসাহসে জীবন থেকে উত্তেজনা কেড়ে নিচ্ছে "

"উত্তেজনাটাই কি সবচেয়ে বড়ো, কেতু?" তুমি প্রশ্ন করেছিলে।

"নিশ্চয়," জবাব দিয়েছিলাম আমি, "যদিও উত্তেজনা কথাটা ঠিক ভালো শোনায় না। উত্তপ্ত না হ'লে জীবন কি তার প্রকৃত সম্পদ গুলো ধরতে পারে? দেখতে পাচ্ছ না, বাবা, দেশে দেশে যুবশক্তি কি ভাবে উত্তপ্ত হ'য়ে উঠছে? ফ্রান্সে যা ঘটে গেল তার উত্তাপ এল কাদের কাছ থেকে? ভীয়েৎনাম যুদ্ধ বন্ধ করবার লড়াই করছে কারা? তুমি দেখবে, বাবা, এ শতাব্দীর শেষ দশকগুলিতে একের পর এক দেশ আমাদের দাপটে কেঁপে উঠবে। আমরা তোমাদের তৈরী সমাজ-সভ্যতা ভেঙে দেব, আজ, কাল, অথবা পর্শু। ভেঙে দেব শুধু এজন্যে যে তোমাদের সমাজে আমাদের শ্বাস-রোধ হ'য়ে আসছে। তোমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর মূল্যবোধকে বিংশ শতাব্দীর

শেষ তাগেও পূজা ক'রে চলেছ। তোমরা না বিশ্বাস করো মুক্তিতে, না স্বাধীনতায়, তোমাদের দৃষ্টি ব্যক্তি ও গোষ্ঠিস্বার্থে অন্ধ, শ্রেণী-সংগ্রাম পর্যন্ত তোমরা মানতে তৈরী নও। তোমাদের সভ্যতার ইমারৎ বহু বহু মানুষের নানাবিধ দাসত্বের ওপর দাঁড়িয়ে! শোষণ আর শাসন তোমাদের কাছে সমার্থক, বাবা। ক্ষমতা তোমাদের ঈশ্বর। নতি-স্বীকার তোমাদের পতাকা। তোমরা একদিকে যেমন ঠকতে ওস্তাদ, অন্যদিকে তেমনি ঠকাতে। তোমরা সাম্রাজ্যবাদী।"

"আর তোমরা?" তুমি অনেকক্ষণ পর গলা খুলেছিলে, তোমার স্বরে শ্লেষ প্রচ্ছন্ন।

"আমরা পাগল, বাবা। আমাদের মাথা গরম, দেহের রক্তে ঝড়। আমরা বন্যা প্লাবন আর ভূমিকম্প। আমরা প্রলয়।"

তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল, "কী সর্বনাশ!"

আমি বলেছিলাম, "আমরা সর্বনাশই, বাবা। আমরা সর্বহারা শ্রমিক-কৃষক নই, যারা বিপ্লব ক'রে ধনতন্ত্রকে ভাঙে, এবং যাদের নামে তৈরী হয় কঠিনতম একনায়কত্ব। আমরা নই শিল্পপতি এবং তাদের ম্যানেজার, যাদের হাতে তৈরী এই বিশ্বব্যাপী ধনতান্ত্রিক সভ্যতা। আমাদের শ্রেণী-পরিচয় নেই। আমরা সাময়িক। স্থিতিহীন, সুতরাং অস্থির। আমাদের একমাত্র পরিচয় যৌবন, যা আজ আছে, কাল নেই। সতের আঠার থেকে ত্রিশ, এইটুকু আমাদের জীবন! এর পরে আমরা আর আমরা নই, আমরা তোমরা! অথচ এটুকু পরিধির মধ্যেই আমরা সংখ্যায় অশেষ, আমাদের পদভারে ধরণী কম্পিত। ভারতবর্ষের কথাই ধরো না, বাবা। আমরা ষাট কোটির এক চতুর্থাংশ। আমরা সভ্যতার নানাবিধ কংস, বাবা।"

"তুমিও?"

আমি তোমার আতঙ্কিত প্রশ্ন শুনে হেসে উঠেছিলাম, বাবা।

বলেছিলাম, "কেতু নামে একটা বাঙালী ছেলে কংস হোক কিম্বা না হোক, সে এক বিরাট বিশ্বব্যাপী কংশ বাহিনী থেকে একেবারে আলাদা নয়, হ'তে পারে না। একদিন দেখবে, বাবা, আমাদের প্রাচীন এশিয়াতেও কংসরা মাটি কাঁপিয়ে তুলবে। রাজশক্তি ভেঙে পড়বে, রক্তের স্রোত বইবে রাজপথে-জনপথে। আমি না হয় র'য়ে গেলাম শেষ পর্যন্ত মেনে-নেওয়া পথভ্রান্ত পথিক। কিন্তু আমরা? আমরা আর তোমাদের বেশিদিন মানবো না, বাবা। আমরা সমাজ সভ্যতা ঈশ্বর ভবিষ্যৎ কিছুই মানবো না বেশিদিন।"

"তোমাদের কথা শুনে ভয় করছে," তুমি বলেছিলে, "এবার তুমি তোমার কথা বলো।"

তোমাকে প্রাণখুলে, কিছু-না-লুকিয়ে আমার কথা বলেছিলাম। আমার কথার অনেকখানি ছিল সুজান কোর্ডের কথা, যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনের কথা, কালো মার্কিনদের জঙ্গী সংগ্রামের কথা, সুজান আমাকে এদের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, আমার চোখের সামনে অভাবনীয় কয়েকটি ছনিয়ার দ্বার খুলে দিয়েছিল একসঙ্গে। আমি এদের সঙ্গে মিশে মদ খেয়েছি, ড্রাগ খেয়েছি, পিস্তল ছুঁড়তে শিখেছি, শিখেছি বোমা তৈরী করতে, এবং একদিন প্রায় সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে বেরিয়ে এসেছি, শুধু বুঝতে পেরে যে এরা আমি নই, এদের মধ্যে আমার সত্যিকারের স্থান নেই। শুধু সুজানের বৃত্ত থেকে বেরুতে পারি নি এখনও, যদিও জানি, বেরুতে পারার দিন আসছে, তার ছায়া দেখতে পাচ্ছি আমি। আমার কথার মধ্যে ছিল টরোন্টোর কুইন্‌স্ কলেজে ব্যর্থতার কথা, অধ্যাপকদের সঙ্গে বিবাদের কথা, নিয়ম না মেনে চলার উত্তেজনার কথা। "ছুটো বছর অকাজ অনেক করেছি, বাবা, কাজ করিনি বিশেষ কিছু। পড়েছি অনেক, পড়াশোনা প্রায় কিছুই করিনি। শিখেছি, জেনেছি, বুঝেছি অনেক কিছু, জীবনের বিচিত্র বহুরূপ দেখেছি, কিন্তু তুমি যে পথে এগিয়ে যাবার জন্যে অনেক আশা ক'রে এই দশবারো হাজার মাইল দূরের বিদেশে এনেছিলে, সে পথে একটুও এগোতে পারিনি।"

ছোট্ট ঘরের ন্যাংটো দেয়ালে অল্প তেজের বিজলি বাতি জলছিল, তার স্তিমিত আলোকে বিপরীত দেয়ালে একমাত্র ছবিখানায় যীশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি বড় করুণ ও আর্ত দেখাচ্ছিল। তুমি, বাবা, যে-দৃষ্টিতে একমনে আমাকে দেখছিলে তার মধ্যে বিস্ময়, ভয়, সন্দেহ ও প্রশংসার অমিল মিশ্রণ। তুমি নিশ্চয় ভাবছিলে, কে তোমার সামনে, সামান্য ব্যবধানে, একটি হাতের ওপরে ন্যস্ত তার দেহ, মুখে একবোঝা দাড়ি গোঁফ, মাথার কোঁকড়া চুল বাবুইএর বাসা, একি তোমারই সন্তান, তোমারই পুত্র? একি সেই উনিশ বছরের তরুণ যাকে তিন বছর আগে তুমি নিউ ইয়র্ক আনিয়েছিলে, এই বিরাট শহরে পদার্পণ ক'রেই সে, আঠারো বছরের একটি তরুণীর সঙ্গে, কয়েক ঘণ্টার জন্যে হারিয়ে গিয়েছিল? বিশাল বিচিত্র কঠিন মমতাহীন পৃথিবীর প্রভাবে তোমার সেই কমনীয় নমনীয় পুত্র আজ, এই সামান্য সময়ের ব্যবধানে, কোথায় গিয়ে পৌঁছল, যেখানে তোমার হাত পৌঁছয় না, হৃদয়ও! তুমি নিশ্চয় ভাবছিলে, সামান্য দূরের, অনেক দূরের, এই যুবক এমন একটা বিরাট সমুদ্রের একটি মাত্র তরঙ্গ, যে-সমুদ্র তোমরা কোনও দিন আগে দেখ নি, যার অস্তিত্ব পর্যন্ত ছিল তোমাদের অজ্ঞাত, এবং যা হটাৎ উদ্বেলিত হ'য়ে দেশদেশান্তরের প্রতিষ্ঠিত মূল্য-সৌধের গায়ে দুর্বার আঘাত হানছে!

আমিও, বাবা, তোমাকে দেখে দেখে ভাবছিলাম, তুমিই কি আমার জনক, আমার

পিতা, আমার পৃথিবীতে জন্মাবার কারক, তোমারই হাত ধরে কি আমি প্রথম হাঁটতে শিখেছিলাম, তোমার হাত ধরেই কি রাস্তায় বেরিয়েছিলাম প্রথম ? তোমারই কাছে হাত পেতে বছরের পর বছর কি আমি জীবনের অভিজ্ঞান গ্রহণ করেছিলাম ? এমন কি ছিল না এক সুদীর্ঘ সময় যখন তোমার কাছ থেকে জীবনবোধ গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় নি আমার ? যখন আমরা ছিলাম এক পৃথিবীর মানুষ, ছোট্ট পাকাপোক্ত সুঠাম একটি পৃথিবী, যার নীলাকাশে স্বপ্ন ভেসে বেড়াত শাদা শাদা ফুরফুরে মেঘের মতো, যার গাছে গাছে ঘাস-পাতায় ঘন সবুজের গাঢ় আশ্বাস, যার বাগানে ফুলে ফুলে জীবনের প্রস্ফুটিত সম্ভাবনা ? সে ছোট্ট পৃথিবী উড়ে গেল কোন অনামন্ত্রিত প্রভঞ্জনে ? তুমি তো অনেক কিছু বুঝতে, যা তোমার জীবন-পরিধির বাইরে তার অনেক কিছুই তো ছিল না তোমার মনন-বৃত্তেরও অনায়ত্ত। তবে কেন আজ তুমি এ যুগের একটা বিরাট নামহীন অভ্যুত্থানকে বুঝতে পারছ না ? কেন পারছ না বুঝতে যে সুজান কোর্ড কেবল চায় ভালোবাসতে, এমন একটা নিষ্ঠুর সমাজে, দুনিয়ায়, যেখানে কেউ কাউকে আর ভালোবাসতে পারে না, যার দেহমন থেকে মমতার শিশির ভেজা মানবিকতা বহুদিন উধাও ? কেন বুঝতে পারছ না কেন, কোন ঐতিহাসিক আক্রোশে, দলে দলে ছেলেমেয়েরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে পথে, শিবির গেড়েছে মাঠে, হাটে, পরিত্যক্ত জলাভূমিতে, কেন তারা হানছে, আঘাতের পর আঘাত হানছে, তোমাদের হাতে গড়া সমাজের প্রাচীন সৌধে, তোমাদের বজ্রমুষ্টি থেকে মুমূর্ষু পৃথিবীকে ছিনিয়ে নেবার বেপরোয়া প্রচেষ্টায়, যাতে এখনও এই সুন্দর পৃথিবী বাঁচতে পারে, তোমাদের ব্যাপক, গভীর, অকল্পনীয় হত্যা-চক্রান্ত থেকে এখনও তাকে উদ্ধার করা সম্ভব ? কেন তুমি বুঝতে পারছ না, বাবা, সেই-যে দিল্লীর এক বস্তি গরীব ছেলে ভজন সিং, যাকে মাসের প্রথম সামান্য বৃত্তি দিয়ে তুমি 'মানুষ' হ'তে সাহায্য করবার নৈসর্গিক আত্মসুখে পরিতৃপ্ত ছিলে, তার অনেক কালের হিসেব-নিকেশ আছে তোমাদের সঙ্গে, যা একদিন তোমাদের মেটাতে হবে, বেশী দেরী নেই সে দিনের ? শত শত বছরের শোষণের ক্ষতিপূরণ দাবী করছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কাছে তাদের ভূতপূর্ব (?) উপনিবেশগুলি, তোমরা তাদের বাহবা দিচ্ছ। কিন্তু তোমাদের উপনিবেশিকতা তো চলছেই, চলছেই, চলছেই, বাবা। কি শাদাদের দেশে, কি কালোদের, কি হলদে, তামাটে মানুষদের দেশে, চলছে না কি বহুরূপী উপনিবেশিকতা, যার নিচে চাপা পড়ে আছে সমস্ত মানুষের বৃহত্তর অংশ ? ধনীর উপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি কোথায় দরিদ্র দাসদের ? যন্ত্রের উপনিবেশিকতা থেকে কোথায় মুক্তি সভ্যতার দাসদের ? অস্ত্রের উপনিবেশিকতা থেকে কে মুক্ত করবে জীবন দরদী মানুষকে ? পুরুষের উপনিবেশিকতা থেকে নারীদের ? পিতার সাম্রাজ্যবাদ থেকে পুত্রকে ?

আমি তোমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে, কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে, ভাবছিলাম, তুমিই একদিন বলেছিলে, অনেকদিন আগে, আমি যখন বালকের সীমা পেরিয়ে মাত্র কৈশোরে পা দিয়েছি, তুমিই একদিন বলেছিলে, ভারতবর্ষের জমিদাররা বহুকাল প্রজাদের পিতা ছিল, এখন তারা কেবলমাত্র শোষক। তেমনি, বাবা, পৃথিবী বহুকাল পিতৃবৎসল ছিল, সমাজ ছিল পিতার ছত্রছায়ায়, আজ পৃথিবী, সমাজ, মানুষ পিতৃহীন। যন্ত্র ও তন্ত্র হাত মিলিয়ে তৈরী করছে জন-সমাজ, মাস্ সোসাইটি, এখানে ব্যক্তি, পরিবার ক্রমশ অবান্তর। স্থান নেই, স্থান নেই, এ বিরাট তরণীতে স্থান নেই ব্যক্তির, স্বতন্ত্র মানুষের, একক মানুষের। আজ মানুষ কাজ ক'রে যাচ্ছে দায়িত্বহীনতার সঙ্গে; এক বিরাট অসভ্য সভ্যতা তার কোটি কোটি যন্ত্র অবিরাম যাচ্ছে চালিয়ে দায়িত্বহীন ভাবে। ভেবে দেখো, বাবা, এই যে দুটো নামজাদা দেশে হাজার হাজার আনবিক বোমা, মিসাইল, আই-সি-বি-এম, এম-আর ভি-এম বোঝাই হ'য়ে রয়েছে, যা সারা দুনিয়ার মানুষকে কয়েক দিনের মধ্যে শতাধিকবার ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট, এবং যা কোটি কোটি মিলিয়ন ডলার খেয়ে বসে আছে এবং খেয়ে যাচ্ছে প্রতি বছর, এর মধ্যে কি আছে সামান্যমাত্র দায়িত্ববোধ? শিল্পোত্তর বিপ্লবের বন্দী দেশগুলি গোগ্রাসে ধরিত্রীর সম্পদ সম্ভার খেয়ে ফেলছে, একি দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয়? গাড়ীতে গাড়ীতে এদের শহরে পা ফেলার স্থান নেই, পলিউশনে প্রত্যেকের ফুসফুস আক্রান্ত—একি দায়িত্বজ্ঞান? ইনডাষ্ট্রি মানুষকে নিছক মেকানিক ক'রে রেখেছে, এবার অটোমেশন মানুষকে অবান্তর ক'রে তুলছে, এতে কোথায় দায়িত্বজ্ঞান? মাস্ মিডিয়ার ব্যবহারে অপ্রয়োজনীয় চাহিদার দৈত্য সৃষ্টি হচ্ছে প্রতি বছর, তার ক্ষুধা না মেটাতে পারলে প্রাচুর্য-গৌরব সমাজ মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে, ঘরে ঘরে উঠবে হাহাকার: এর মধ্যে দায়িত্ব কোথায়? আর, এই প্রাচুর্য-বিভ্রান্ত সমাজ থেকে চোখ ফিরিয়ে নাও ঐ আমাদের অভাব-অন্ধকার পৃথিবীতে, কি দেখতে পাও, বাবা? দায়িত্বজ্ঞান? পিতৃ-ভূমিকা? পঁচানব্বুই জনকে বঞ্চিত ক'রে পাঁচ জনের অপর্যাপ্ত বৈভবের মধ্যে কোন পিতৃত্বের স্বাক্ষর? যারা শাসন করছে তারা যদি পিতা, তাহলে অনাহারে অর্ধাহারে রোগে নিরক্ষরতায় কোটি কোটি সন্তানের চোখের সামনে কোন লজ্জায় তারা বাস করছে প্রাসাদোপম ভবনে, চড়ছে বড় বড় গাড়ী, উড়ছে আকাশে, খাচ্ছে, ভোগ করছে, গুছিয়ে নিচ্ছে ইহকালের আখের পুত্রকলত্র পৌত্রদের? মানুষের কাছ থেকে মানবিক অধিকার কেড়ে নিতে কোনও শাসককুল কি ইতস্তত করছে আজ? বড় বড় বুলিতে বাতাবরণ সরগরম রেখে দেশে দেশে ক্ষমতা-দর্পিত শাসকগণ যে জনতার কল্যাণের নামে মানুষকে দাসত্বে নিক্ষেপ করছে, এর মধ্যে পিতৃত্বের দায়িত্বজ্ঞান কোথায়, বাবা?

তুমি বলবে, ছেড়ে দাও, পৃথিবী, সভ্যতা, মানুষ, দূর হোক আনবিক জতুগৃহ, দূর হোক শাসক ও প্রশাসন, শুধু থেকে যাই, যতোদিন সম্ভব থেকে যাই, আমরা ছোট্ট ছোট্ট মানুষরা পারিবারিক বন্ধনের প্রাচীন উত্তাপে; ভালোবাসা, মমতা, সমবেদনা আমাদের ক্ষুদ্র জীবনকে রাখুক কোমল ক'রে, তার কান্তিটুকু আঁকড়ে থাকি, যতোদিন, যতোক্ষণ সম্ভব। পৃথিবীর যাই হোক না কেন, আমি আর তুই তো এখনও আছি, কেতু, আমি পিতা, তুই আমার পুত্র, এবং আমাদের পেছনে বহু পিতাপুত্রের মিলিত অভিজ্ঞান, এটুকুই কি যথেষ্ট নয়? হোক না দুনিয়া নিষ্ঠুর, আগ্রাসী, সর্বনাশী, তবু তো আমার বুকে, কেতু, তোর জন্যে টাটকা দরদ আর মমতা আর আকুলতা, এবং তোর বুকে আমার জন্যে? এমনি ক'রে মা ও ছেলে, প্রেমিক ও প্রেমিকা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী: মরুভূমিতে মরূদ্যানের কি অভাব আছে এখনও? তুই ফিরে আয়, কেতু, নিজের ঘরে ফিরে আয়, ক্লান্ত বিহঙ্গ, ফিরে আয় সমন্বয়ে, সন্ধিতে, সমানুভূতিতে। যদি না আসিস, নিষ্ঠুর পৃথিবী তোকে পিষে মেরে ফেলবে, তার নখদন্ত তোর দেহমনের কিছু বাকী রাখবে না।

আমি তোমার কাতর আহ্বান শুনতে পেয়েছিলাম, বাবা।

এবং, রাত যখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল, রাস্তায় গাড়ীচলার হুসহুস শব্দ গিয়েছিল প্রায় থেমে, দেয়ালে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মুখ অন্ধকারের মত আর্ত দেখাচ্ছিল, স্বল্পালোক বালবটার গায়ে রাত-জাগার ক্লান্তি, তখন আমি তোমাকে বলেছিলাম, "ভয় পেয়ো না, বাবা, আমি তোমাদের কাছেই ফিরে আসবো! না এসে উপায় নেই আমার।"

তুমি আশ্বস্ত হ'লেও নিশ্চিত হ'তে পারো নি।

আমি বলেছিলাম, "ভারতবর্ষের ছেলে আমি, আমার রক্তের উত্তাপ সবল নয়, দীর্ঘস্থায়ী নয়। অতি সহজে আমাদের দম ফুরিয়ে যায়, শুধু একটি দম ছাড়া, যার নাম নিজেদেরটা গুছিয়ে নেওয়া। ব্যক্তিকে সমষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে, দেখতে শিখিনি আমরা এখনও, শিখতে আরও বহুদিন লাগবে। যে যুগটা চলছে, বাবা, তাতে আমরা চাবুক খেয়ে কেবল সার্থকতার সন্ধিগলিতে ঘুরপাক খাচ্ছি, নিজেদের ছোট্ট ছোট্ট বিচ্ছিন্ন সার্থকতা, বড় চাকরী, মাইনের সঙ্গে ন্যায্য অন্যায্য পার্ক্‌ইজিটস, জীবনযাত্রার আরামদায়ক রসদ, যা দেখলে বঞ্চিতদের বুকে ঈর্ষা, ভয়, সমীহ সবকিছুর যুগপৎ প্রবাহ। আমরা তোমাদের হাত থেকে আখের গুছিয়ে নেবার দীক্ষা পেয়েছি, এ দীক্ষা থেকে স'রে আসবার শক্তি নেই আমাদের। আমরা বিপ্লব করবো না, ভাংবো-ও না বিশেষ কিছু, আমরা শুধু, অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের গড়া এই কুৎসিৎ কদর্য অশ্লীল ইমারৎটা তোমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেব, এবং

তাকে আরও কুৎসিৎ, কদর্য, আর অশ্লীল ক'রে তুলবো। এই হল, বাবা, ভারতের চলতি যুবশক্তির ঐতিহাসিক ভূমিকা, আমাদের সমবেত শক্তি, লোভ, উচ্চাশা, দম্ভ এবং লালসার ভূমিকা। আমিও এ ভূমিকা থেকে রেহাই পাবো না। দেখবে, লেজ গুটিয়ে আমি একদিন আবার কলেজে ঢুকবো, শেষ করবো আমার-আমাদের-তোমার-তোমাদের বহুকাম্য বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি, তারপর হয় এদেশেই লক্ষ ভারতীয়ের প্রাচুর্য-ঝলসান দ্বীপে আস্তানা ক'রে নেব, বছর দু-বছর বাদে দেশে গিয়ে ডলারের দীপ্তিতে ভাস্বর হবো, জাহাজ বোঝাই ক'রে ভারতীয় কারুশিল্প নিয়ে আসবো ছবির মতো বাড়ী সাজাতে; আর নয়তো দেশে গিয়ে চাকরীর উমেদারী করবো, ডবল-চিবুক ঘোলাটে চোখ ভোগ-ক্লান্ত মহাশয়দের পায়ে তেল দিতে দিতে চাকরী একটা জুটেও যাবে, এবং তখন থেকে শুরু হবে গুছিয়ে নেওয়া, যে-কোনও উপায়ে যতোটুকু সম্ভব যতো তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নেওয়া। এমনি ক'রে কেটে যাবে বছরের পর-বছর, বিয়ে করবো, পিতা হবো, হায় ঈশ্বর, আমিও একদিন পিতা হবো, এবং আমার পুত্রকে একদিন চিনতে পারবো না, তাকে বলবার, দেবার, দেখাবার, শোনাবার কিছুই থাকবে না আমার।

"পিতা হবার পর আমার পুত্রকেও আমি আমারই পথে চালাতে চাইবো। তবু, বাবা, আজ প্রার্থনা করছি, আমার পুত্র যেন আমাকে, আমাদের এই কুৎসিৎ, কদাকার অশ্লীল পৃথিবীটাকে, ভেঙে চু'রে নতুন কিছু তৈরী করার দুঃসাহস অর্জন করতে পারে। বসন্তের প্রার্থনা শীতে বেঁচে থাকে না, জানি, বাবা; তবু এ প্রার্থনাটুকু উচ্চারিত হোক আমার মুখে, যতোদিন আমার শিরায় বসন্তের উত্তাপ, আমার চোখে বৈশাখের প্রখর দীপ্তি।"

হটাৎ চোখে পড়ল, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ, বাবা।

তোমার সারা মুখে বেদনা, শংকা, সন্দেহ আর্ত হ'য়ে রয়েছে।

তোমাকে সেদিন সে মুহূর্তে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছিলাম।

বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি আর পিতা নও।

তুমি এই দিকভ্রান্ত পৃথিবীর একটি আহত মানুষ মাত্র।

কুযুইনস্ কলেজ থেকে একদিন প্রত্যাশিতভাবেই আমাকে প্রায় স'রে আসতে হল। ছাত্র হিসেবে নামটা রইল, কিন্তু কলেজ ফেলোশিপ শেষ হবার পরে আর্থিক সম্পত্তি নিঃশেষ হ'য়ে গেল। মাইনে দেবার টাকা নেই, নিজেকে খাইয়ে পরিয়ে রাখবার টাকাও নাগালের বাইরে। কানাডায় আমি ইমিগ্র্যান্ট নই, চাকরী পাওয়ার পথ আমার কাছে বন্ধ, ইমিগ্রেশন দপ্তরে হাজির হ'তেও ভয়, পাছে, আমার আর্থিক অবস্থা জানতে পেরে, ছাত্র হিসেবে টরোন্টো:তে বাস করার অনুমতিটুকু পর্যন্ত ওরা নাকচ করে দেয়। একদিকে এই দুরবস্থা, অন্যদিকে কুযুইনস্ কলেজেরই একদল ছাত্রছাত্রী আমাকে নিয়ে মেতে উঠল। আমার পড়ানর কায়দা ও দৃষ্টিভঙ্গী নাকি তাদের কাছে এতোই আকর্ষনীয় যে তারা চাঁদা তুলে একটা "ওপেন স্কুল" তৈরী ক'রে বসল, সে স্কুলে ক্রমে আঠারোটি ছাত্রছাত্রী এসে সমবেত হল। স্কুল বসে সপ্তাহে দুদিন—মাঠে, গির্জায়, কারুর এ্যাপার্টমেন্টে, কখনও বা বিশ্ববিদ্যালয়েরই কোনও বিলডিংএর করিডরে। শিক্ষকও শুধু আমিই রইলাম না, কুযুইনস কলেজেরই আরও দুটি যুবক লেকচারার ভিড়ে গেল আমাদের সঙ্গে। প্রথম মাস শেষ হলে আঠারটি ছাত্রছাত্রী একশ আশি ডলার তুলে দিল আমাদের হাতে, আমার সহকর্মীরা দুজনে একশ' নিয়ে, আশি ডলার দিয়ে দিল আমাকে। উপোস ক'রে থাকতে হল না কানাডায়, একটা পুরানো বাড়ীতে এক চিলতে ঠাণ্ডা স্যাতসেতে ঘরও জুটে গেল।

ষাট দশকের দ্বিতীয় অর্ধেকে সারা উত্তর আমেরিকায় "ওপেন স্কুল" আন্দোলন দানা বেধে উঠেছিল, প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একদল ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতিবাদের স্বাক্ষর বহন ক'রে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা যুবক যুবতিদের মানবিক বিকাশের পথ অবরুদ্ধ ক'রে তাদের প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও সরকারের অনুগত সেবক হিসেবে তৈরী করছে, প্রধান নালিশ ছিল এটাই। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীদের সমাজ-সচেতন করছে না, অধ্যয়নের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাস্তবজীবনের সম্পর্ক ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে, শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে দূরত্ব গেছে অনেক বেড়ে। স্কুল কলেজে প'ড়ে ছেলে মেয়েরা স্বাধীন চিন্তা ও দৃষ্টি হারিয়ে ফেলছে, মিথ্যে, আধা-মিথ্যে, আধা-সত্যিতে তাদের মস্তিষ্ক ও মননকে সুকৌশলে ধোলাই করে নেওয়া হচ্ছে। প্রাচুর্যের সমাজেও যে ব্যাপক ও গভীর দারিদ্র্য; অশ্বেতকায় নাগরিকদের জীবন যে নানা দারিদ্র্যে জীর্ণ

ও কুৎসিৎ; যান্ত্রিক সভ্যতা যে মানুষকে ক্রমাগত যন্ত্রে পরিণত করছে; শিক্ষার নামে তৈরী হচ্ছে প্রতি বছর লাল লাল রোবট; জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের সম্মোহনী শক্তি যে মানুষকে অন্ধ ক'রে রাখছে ক্ষমতার জুলুমের প্রতি, দেশে দেশে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রতি, সাম্রাজ্যবাদের প্রতি; জাতীয় সংরক্ষণের নামে রাজস্বের অর্ধেকের বেশি চলে যাচ্ছে সামরিক শিল্পগুলিকে দুর্ধর্ষ রাখতে; গণতন্ত্রের নামে তৈরী হচ্ছে লুক্কায়িত স্বৈরাচার; "ওপেন স্কুল" আন্দোলনের উদ্দেশ্য এসবের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, তাদের মানসকে সজাগ করা।

যে আঠারোটি ছাত্রছাত্রী আমাদের ওপেন স্কুলের পৃষ্ঠপোষক, তারা সবাই অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারের সন্তান। তাদের পিতারা হয় ব্যবসায়ে নয় প্রফেশনে কানাডিয়ান সমাজের উচ্চতর পংক্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

জেমস স্মিথের বাবা ওনটারিও ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট।

ওয়ালটার ক্লাইভের পিতা টরোন্টো ক্রনিকলের সহকারী সম্পাদক।

রবার্ট করবেটের বাবা ইয়র্ক য়ুনিভারসিটিতে পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক।

আইরীন ক্লার্কসনের পিতা পার্লামেন্টের সদস্য।

জুলিয়েট লণ্ডনের মা বিখ্যাত টেলিভিশন তারকা।

লরেন্স কালাকিনোর বাবা এটর্নী।

লেনার্ড ওলস্কির বাবা ভূতপূর্ব মেয়র।

মেরী ষ্টিভেনসনের মা নামকরা সোস্যাল ওয়ার্কার।

বড় ঘরের, ধনী ঘরের, শিক্ষিত ঘরের, এসব ছেলেমেয়েরাই কানাডার নতুন জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ। তাদের বাবা-ঠাকুর্দারা কানাডাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "উপনিবেশে" পরিণত করেছে, এই তাদের প্রধান নালিশ। কানাডার শিল্প-সম্ভারে মার্কিন আধিপত্য শতকরা ষাট ভাগেরও বেশি, ব্যাংক, ইনসিওরেনস, বড় বড় কারখানার মালিকানার বেশির ভাগ অংশ মার্কিন পুঁজিপতিদের; শিক্ষায়তনগুলি মার্কিন অধ্যাপক দিয়ে ঠাসা; রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, এমন কি পাবলিশিং ইনডাষ্ট্রিও মার্কিন মালিকানার আওতায়।

রবার্ট করবেটের ভাষায়, "আমাদের পিতা-পিতামহরা কানাডার দেহই শুধু তুলে দেন নি আমেরিকানদের কাছে, তার আত্মাকে পর্যন্ত তুলে দিয়েছেন। আমাদের টেলিভিশনে একশ প্রোগ্রামের মধ্যে নব্বুইটি কেনা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। কানাডা যে একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ তা পর্যন্ত আমাদের ভুলিয়ে দিতে চায় আমাদের বাবারা।"

আইরীন ক্লার্কসন বলে, "জানেন নিশ্চয়, আমেরিকা আর রাশিয়ার মধ্যে যদি

আণবিক লড়াই বেধে যায়, সে-যুদ্ধের প্রথম বলি হবে কানাডা। কানাডাকে ঘিরে তৈরী হয়েছে আমেরিকার আণবিক আক্রমণ প্রতিরোধের প্রথম ও প্রধান ব্যবস্থা। প্রতিরোধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অংশ হয়তো ধ্বংস থেকে রেহাই পাবে, কিন্তু কানাডার চিহ্নমাত্র থাকবে না, চারদিকে যা দেখছেন জ্বলে পুঁড়ে অঙ্গার হ'য়ে যাবে।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও আয়তনে বড়ো কানাডা, অথচ মাত্র দু কোটি মানুষের বাস। কানাডার প্রাকৃতিক সম্পদকে সমাজের কাজে লাগাতে হলে লোকবল চাই। বিনিয়োগের মূলধন চাই। মার্কিন দাপট থেকে মুক্তি পেতে হলে অন্তত কয়েক বছর কানাডার নাগরিকদের অনেক প্রাচুর্য পরিত্যাগ করতে হবে।

জুলিয়েট লণ্ডন বলে, "এ্যাফ্লুয়েন্সের এক কণা ছাড়তে রাজী নয় এ দেশের লোক। হোকনা প্রাচুর্যের দাম মার্কিনী উপনিবেশিকতা; আমার মা মাসে পঞ্চাশ হাজার ডলার রোজগার করে। তার একঘণ্টার টেলিভিশন প্রোগ্রামে পয়ত্রিশ মিনিট আমেরিকান মারচেণ্ডাইস বিজ্ঞাপনে চলে যায়। টপ রেটিং। মার প্রোগ্রাম দেখে না, শোনে না, এমন গৃহিণী নেই গোটা কানাডায়। এমন মেয়েও কমই আছে। অতএব বিজ্ঞাপনের বাজারে, মার দাম বুঝতেই পারেন। আমি মাকে বলি, তুমি তো মার্কিন প্রসাধন আর গ্যাজেট আর গাড়ী বিক্রীর সবচেয়ে করিৎকর্মা সেলসউয়োম্যান মাত্র! মা কি বলে জানেন? মা বলে, যাই হই না কেন, বছরে দুমাস রিভিয়ারায় কাটাতেও পারছি, তিন বছরে একবার সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারছি। মার তিনটে গাড়ী আছে, দুটো ইম্পট, আর একটি ট্যু-সীটর; নিজস্ব প্লেনও আছে। এবং মার প্রতি বছর এক একটি নতুন লাভারও আছে।"

আমরা সবাই জানি, জুলিয়েটের মা আর বাবা বহুদিন বিচ্ছিন্ন! জুলিয়েট মার একমাত্র কন্যা ও সন্তান।

আমি একদিন জুলিয়েটকে বলেছিলাম, "মার সব সম্পত্তি সম্পদই তো তোমার হবে একদিন!"

জুলিয়েট নাক সিঁটকে বলেছিল, "কি হবে আমার ওসব সম্পত্তি আর সম্পদে? আমি কোনও দিন আমেরিকান শ্যাম্পু আর ডিওডোরেন্ট প্রচার করবো না। মার প্রাচুর্য আমার চারিদিকে তুলে ধরেছে শক্ত দেয়াল। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক পাতান আমার পক্ষে এখন মোটেই সহজ নয়। এবং জেনে রাখুন, মার সঙ্গে আমি বাস করিনে। বছরে আমি মার কাছ থেকে মাত্র চার হাজার ডলার নি। আর সন্ধ্যেবেলা একটা ব্যাংকে চাকরী করি। তাতেই আমার বেশ চলে যায়।"

ওয়ালটার ক্লাইভও বাস করে না তার বাবা-মা'র সঙ্গে। টরোণ্টো ক্রনিক্‌ল্‌

কানাডার সবচেয়ে রক্ষণশীল সংবাদপত্র। তার সম্পাদকীয় নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গভীরতর মিতালি, এমন কি রাষ্ট্রীয়সংযুক্তি। কুইন ও আংকল্ স্যাম : এই দুই দেবতার পূজক টরেন্টো ক্রনিকল। ওয়ালটার ক্লাইভের সঙ্গে তার বাবা-মা'র প্রথম সংঘর্ষ বাধল মনট্রিয়েলের "স্বাধীনতা" দাবী নিয়ে। ক্লাইভ ফরাসী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিল আঠার বছর বয়সেই। কুড়ি বছরে ফ্রেঞ্চ কানাডার দাবী-দাওয়ার সে মুখর সমর্থক হ'য়ে উঠল। মনট্রিয়েলের স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় সৈনিক হ'য়ে গেল ওয়ালটার ক্লাইভ। টরেন্টো ক্রনিকল্ ফ্রেঞ্চ কানাডার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে না, অতএব পিতাপুত্রে সংঘাত বাধল। ক্লাইভ বাড়ীঘর ত্যাগ ক'রে স্বাবলম্বী হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হুরণ স্ট্রীটে একশ বছরের পুরাণ একটা বাড়ীতে একখানা ঘরে তার বাস, একটা রেঁস্তোরায় প্রতিরাত্রে সাত ঘণ্টা কাজ ক'রে তার রুজি রোজগার। কিছুটা বাড়তি আয় ইংরাজী-ফরাসী অনুবাদ ক'রে।

ওয়ালটার ক্লাইভ বলে, "একদিকে ইংরিজী ভাষী কানাডা আমেরিকার উপনিবেশ, অন্যদিকে ফরাসী-ভাষী কানাডা ইংরিজী-ভাষী কানাডার উপনিবেশ। মনট্রিয়েলের মুক্তি না হ'লে কানাডার মুক্তি কোনওদিন হবে না।"

জিম স্মিথ চায় কানাডা তার প্রাচুর্যের একটা বড়ো অংশ দিয়ে আফ্রিকার গরীব দেশগুলিকে উন্নত হ'তে সাহায্য করুক, ধনী দেশ দরিদ্রদেশের জন্যে কি করতে পারে, কানাডা হোক তার জলন্ত নিদর্শন।

জিমের বাবা শাদা কানাডায় দৃঢ় বিশ্বাসী, কালো, হলদে, তামাটে মানুষদের কানাডায় এ'সে বসতি তৈরী করায় তার ঘোরতর আপত্তি। শুধু তাই নয়, কানাডার এ্যাংলো-স্যাকসন, অর্থাৎ ইংরেজ, ব্যক্তিত্ব অটুট থাক, এই হল জিমের বাবার সুদৃঢ় ইচ্ছে। জিম চায় কানাডা আরও উদারতার সঙ্গে এশিয়া-আফ্রিকার লোকেদের গ্রহণ করুক, তার চেয়েও বড়ো কথা, আরও অনেক উদার হস্তে এশিয়াকে, বিশেষ ক'রে আফ্রিকাকে, সাহায্য করুক। "কোনও উন্নত দেশ", জিম বলে, "তার জি-এন-পি'র এক শতাংশও দরিদ্র দেশগুলির সাহায্যে ব্যয় করছে না, যদিও এ প্রস্তাব প্রথম এসেছিল কানাডারই তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী লেস্টার পিয়ার্সনের কাছ থেকে। কানাডা তার 'জি-এন-পি'র একার্ধ শতাংশ দিয়েও গরীব দেশগুলোকে সাহায্য করতে রাজী নয়। নাইজিরিয়ার গভর্ণমেন্ট আমার বাবার ব্যাংক থেকে দশ মিলিয়ন ডলার ক্রেডিট চেয়েছিল কানাডার সাহায্যে একটা বড়ো রকমের সার কারখানা গ'ড়ে তুলতে; আমার বাবা কিছুতেই এ সামান্য অর্থ বিনিয়োগেও রাজী হল না শুধু এই কারণে যে নাইজিরিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থার স্থিতি নেই, ষ্ট্যাবিলিটির অভাব।"

আমাদের ওপেন স্কুলের আঠার জন ছাত্রছাত্রীর একজনও তার পিতামাতার

দৃষ্টিতে কানাডা এবং পৃথিবীকে দেখতে রাজী নয়, তাদের সঙ্গে তাদের বাবাদের মতান্তর আজ মনান্তরে দাঁড়িয়েছে। "আই হেট মাই ফাদার", "আই হেট মাই মাদার," "আই হেট মাই প্যারেন্টস্" বলতে এদের মুখে এক মুহূর্তের জন্যে বাধে না, এবং এ-কথাগুলির পেছনে সঞ্চিত বিরাগ ও বিদ্বেষ দেখে বার বার আমি চমকে যাই। এ বিদ্বেষ-বিরাগের পিছনে রয়েছে নতুন ক'রে নতুন পথে নতুন আদর্শে বাঁচবার আকাঙ্খা, পৃথিবীকে নতুন করে দেখবার, গড়বার প্রশ্ন। এ আকাঙ্খা ও স্বপ্নের অনেকখানিও ধ্বসে পড়বে, আমি জানি, এবং জানে এরাও, কিন্তু এদের আকাঙ্খা ও স্বপ্ন প্রচেষ্টাবিহীন নয়, প্রত্যয়ের জন্যে দাম দিতে পিছুপাও নয় এরা।

আমি এদের কথা ভাবি, এদের নিয়ে সপ্তাহে দুদিন ওপেন স্কুলে বসি, আর আমার মন মাঝে মাঝে চলে যায় সেই বিপন্ন জীবনভূমিতে যার নাম ভারতবর্ষ। বিপন্ন, কেননা জীবন এখানে এখনও স্বকীয় মর্যাদায় স্বীকৃতি পায় নি, কবে পাবে, কোনও দিন পাবে কিনা কে জানে। ক'দিন আগে চিঠি পেয়েছি একজনের কাছ থেকে যে একবার বিনা কারণে আমার হঠাৎ-বন্ধু হ'য়ে গিয়েছিল। তোমার মনে পড়বে, বাবা, আমার কলেজ জীবনের প্রারম্ভে, মিতু তখনও স্কুল পেরোয় নি, আমরা একবার মাইথন বেড়াতে গিয়েছিলাম। বার্ণপুরে বাস করতো ডাক্তার-মেসো, ষ্টেশন রোডে, বাজারের অনতিদূরে ছিল যাঁর ডিসপেনসারী এবং বসত-বাড়ী। ডাক্তার মেসো মাইথন বাঁধের এলাকায় গেষ্ট-হাউস না ইন্‌স্‌পেকশন বাংলোয় আমাদের জন্যে রিজারভেশন ক'রে রেখেছিলেন। মাসতুতো ভাইবোনদের সঙ্গে মিতুর আর আমার গলাগলি ভাব, দুই পরিবার একসঙ্গে আমরা পুরো সপ্তাহ কাটিয়াছিলাম মাইথনে। ডাক্তার মেসো সারাদিনের কাজ সেরে রাত আটটা নাগাদ গাড়ী-বোঝাই মাছ মাংস শব্জী মিষ্টি নিয়ে রোজ এসে হাজির হতেন, রাতটা মাইথনে কাটিয়ে সকালে ফিরে যেতেন বার্ণপুর। ডাক্তার-মেসোকে আমরা খুব ভালোবাসতাম। আমুদে লোক, তোমার ভাষায়, ঝকঝকে পরিষ্কার মানুষ, আমাদের নিয়ে সব সময় একটা-না-একটা মজা করতেন। ডাক্তার হিসেবেও নাম ছিল ডাক্তার-মেসোর, তোমার ও মার কাছে শুনেছি রুগীর জন্যে তিনি আপ্রাণ লড়ে যেতেন, অসুখ না সারলে রাত্রে ঘুম হত' না, নিজে থেকেই প্রত্যেকদিন রুগীকে দেখতে যেতেন, যদি কোনও রুগী ম'রে যেতো হাউ-হাউ করে কাঁদতেন ডাক্তার-মেসো। এখনও, বুড়ো এবং আংশিক প্যারালিসিস নিয়েও, ডাক্তার-মেসো সাধ্যমত রুগীদের জন্যে ল'ড়ে যাচ্ছেন।

বার্ণপুর-মাইথনে একটি বন্ধু জুটেছিল আমার, বয়সে যদিও বছর দু'একের ছোট, তবু আমাদের খুব ভাব হ'য়েছিল। ছোট্ট শহরে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি ছেলের সঙ্গে এই আমার প্রথম বন্ধুত্ব। সুভাষ মল্লিকের বাবা বার্ণপুর ইস্পাৎ

কারখানায় ছোটো খাটো একটা কাজ করতেন, কোম্পানীর কোয়ার্টারেই বাস করত মল্লিক পরিবার। সুভাষ পড়ত আসানসোলের একটা সাধারণ স্কুলে, আমার মতো সাহেবী স্কুলে নয়। সুভাষ আর আমার মধ্যে বিরাট পার্থক্যই বুঝি আমাদের পারস্পরিক আকর্ষণের কারণ হ'য়েছিল, আমরা দুজন দুজনকে বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করতে ভালোবাসতাম। বন্ধুত্বটা এতোই জমে গিয়েছিল যে সুভাষ পুরো দশদিন একবার দিল্লী এসে কাটিয়ে গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে।

সুভাষ দেখতে সুশ্রীর চেয়েও কমনীয় ছিল। হালকা বর্ণ, চোখ দুটো গভীর কালো, চওড়া কপালের ওপরে একগুচ্ছ কোঁকড়া চুল। দেখলেই সুভাষকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করত। হাসিতে মেয়েলি লাজুকতা, কথাবার্তায় খানিকটা সংকোচ, এবং তারই সঙ্গে সহজ সরল সপ্রতিভতা। সুভাষের মন ছিল স্পর্শকাতর, অতি সহজে চোখে জল এসে যেত।

আমি জানতাম সুভাষ স্কুল থেকে ভালো নম্বর পেয়ে হায়ার সেকেণ্ডারীতে প্রথম বিভাগে পাশ ক'রেছিল। বাবার অর্থ ছিল না কলকাতায় পাঠিয়ে ভালো কলেজে পড়াবার। তাই ভর্তি হয়েছিল আসানসোলেই একটা ছাপোষা কলেজে। সুভাষের ইচ্ছে ছিল ইনজিনীয়ারিং পড়বার। অর্থের অভাবে তাকে বি-এস-সি-তে ভর্তি হ'তে হল। ষাট দশকের শেষ দিকে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা সুভাষকেও রেহাই দিল না। কলেজে পড়াশোনা বন্ধ। পরীক্ষার নামে গণটোকাটুকি। রেজাল্ট বেরুতে দুবছর। নিউ ইয়র্ক চলে আসবার আগে বার্ণপুরে ডাক্তার-মেসোর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সুভাষের খোঁজে তার বাড়ী গিয়ে শুনলাম, তার পাত্তা নেই, সে নাকি বীরভূমের জঙ্গলে বন্দুক হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে চাষীদের দ্বারা লিবারেটেড এলাকা সংরক্ষণের জন্যে।

সুভাষের বাবা, দেখতে পেলাম, এক বছরে ভীষণ বুড়িয়ে গেছেন। ছেলের জন্যে তাঁর দুঃখ, হতাশা, উদ্বেগ সব ছাড়িয়ে বিস্ময়। "সুভাষ তো একটা ইঁদুর কোনও দিন মারতে পারে নি। টিকটিকির থাবা থেকে আরশোলা বাঁচাবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। সেই সুভাষ কি ক'রে ভিড়ল গিয়ে একজন নৃশংস হত্যাকারীর সঙ্গে? একবার ভেবে দেখল না তার বাবা-মা ভাইবোনের কথা? ভেবে দেখল না যে তাকে ছাড়া এ পরিবারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার? দেশ তো চলবে, সমাজের কোন কিছু এসে যাবে না। কিন্তু এই পরিবারটার কি হবে? একবার ভেবে দেখল না সুভাষ?"

ভেবে নিশ্চয় দেখেছে, আমি নিজেকে অনেকবার বললাম, ভেবে ভেবে কোনও পথের দিশারা পায় নি ঐ কোমল স্পর্শকাতর অল্পে-চোখে-জল-এসে-যাওয়া ছেলেটা, আমার চেয়েও বছর দু'একের ছোট। ইস্পাত কারখানার জলন্ত চুল্লীগুলির আগুনে

বছরের পর বছর শুকিয়ে গেছে পিতার জীবন-রস, তাঁর হাত থেকে জীবন-বোধ একরত্তি পায় নি তরতাজা বাড়ন্ত একটা ছেলে, দেখতে পায় নি ভবিষ্যতের কোনও আশ্বাসবাহী পথ। কিন্তু, জীবনে যে কোনও দিন একটা চাষার জ্যান্ত সংস্পর্শে আসে নি, সে সুভাষ চাষীদের কি ক'রে বেছে নিল নতুন সমাজের পথিকৃতের ভূমিকায়? ইস্কোর মজদুরদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে ট্রেড য়ুনিয়ন করাই কি তার পক্ষে সহজতর ছিল না? বার্ণপুরে ডাক্তার-মেসোর বাড়ীতে রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে আমি কেবল সুভাষের কথা ভাবতে লাগলাম। বীরভূম দেখিনি কোনও দিন, নকসালবাড়ী আমার কাছে একটা শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়, তবু চোখের সামনে ভেসে উঠল মাইলের পর মাইল জঙ্গল আর অরণ্য, শালবন আর শালবন। ঘুমের মধ্যে দেখতে পেলাম শালবন পেরিয়ে চলছে একদল যুবক, তাদের পরনে খাকি প্যান্ট আর খাকি সার্ট, কাঁধে বন্দুক। সে যুবকদলের মধ্যে সুভাষ। তারা চলছে তো চলছেই, এক শালবনের পর, মাঠ পেরিয়ে, আবার শালবন, অবশেষে ক্ষীণদেহ এক চিলতে নদী, আমার কাছে তার কোনও নাম নেই, ঠিকানা নেই। নদীর কাছাকাছি একটি গ্রাম, চাষীদের দরিদ্র গ্রাম। সুভাষদের দল সেই গ্রামে এলে চাষীরা সব তাদের ঘরে নিয়ে গেল। দেখতে পেলাম, একদল চাষীকে সুভাষরা বন্দুক চালান শেখাল, এক সঙ্গে ব'সে মিটিং হল, এবং তারপর রাত এল ঘনিয়ে, সুভাষরা চাষীদের ঘরে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল! কি নিঝুম অন্ধকার সেই বীরভূমের গ্রামের রাত্রি, আমার ঘুমের চেয়েও অনেক অনেক অন্ধকার।

হঠাৎ সে অন্ধকারের বুক চিরে কোথা থেকে দু'টো জীপ এসে দাঁড়াল সেই বীরভূমের গ্রামে; জীপ থেকে একদল সশস্ত্র সৈনিক ঝটপট নেমে প'ড়ে গ্রামখানাকে মুহূর্তে ঘিরে ফেলল এবং তারপর শুরু হল দু পক্ষের লড়াই। গুলির শব্দে আকাশ মুখর, মাঠ ফেটে চৌচির, নদীর জল পলাতক, শালবনে গাছগুলি আতংকে স্থবির। একে একে সুভাষদের দলের প্রত্যেকে ঘায়েল হল, দুজন গেল মরে; সৈন্যদের মধ্যেও একজন হত, চার পাঁচজন আহত। আহত সুভাষকে গুলি করে' একটা সৈনিক মারতে যাবে, আমি হঠাৎ কোথা থেকে তার সামনে হাজির হ'য়ে তাকে কাতর কণ্ঠে বলতে লাগলাম, ওকে মেরো না, ও ম'রে গেলে ওর পরিবারের সর্বনাশ, ওর পথ চেয়ে ব'সে আছে বুড়ো বাপ, ক্ষীণ দেহ মা, ওর ভাইবোনেরা। ওকে মেরো না, আমি যে ওকে অনেকদিন চিনি, ওর মতো নরম হৃদয় ছেলে আমি দেখিনি কোনও দিন, কারুর দুঃখের কথা শুনলেই ওর চোখে জল এসে যায়। আমার কথাগুলো শুনে আহত সুভাষ গর্জে উঠল; খবরদার, কেতু, আমার বদনাম করবে না, আমি কোমল নই, নরম নই, আমি পাথরের মতো শক্ত, আগুনের মতো নিষ্ঠুর। আজ আর দয়ামায়া

নেই, কোনও পরিবারের রক্ষা নেই, আজ কেবল মৃত্যু, কেবল রুধির আর লড়াই। আমি দেখতে পেলাম সুভাষের বাহু থেকে দরদর রক্ত ঝরছে, দেখে আমি চীৎকার ক'রে উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

সেই ভয়ংকর স্বপ্নে সুভাষ মল্লিকের সঙ্গে আমার শেষ দেখা। তার কি পরিণতি হল, আমার জানা নেই। অজিতেশও তো 'নকশাল' হ'তে চলেছিল, মার্কিন মুলুকে এসে সে রেহাই পেল, তাকে বীরভূম মেদিনীপুরের জঙ্গলে বন্দুক হাতে ঘুরে বেড়াতে হল না, কলকাতার অলিতে গলিতে বদলার আত্মঘাতী নাটকে অভিনয় করতে হল না। অজিতেশ চার বছরে এক ডজন মেয়ের সঙ্গে দলাদলি করে এখন একটি ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান কন্যার সঙ্গে অবিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর জীবন যাপন করছে, সঙ্গে সঙ্গে কেমিক্যাল ব্যাংকের কম্পিউটার বিভাগে মোটা ডলারের চাকরীও করছে। প্রাণেশ কুমার দত্ত পুত্রকে ফেরৎ পান নি, অজিতেশ দেশে যাবার নাম পর্যন্ত করে না, কিন্তু তাকে হারাতেও হয় নি তাঁর। তিন চার মাসে দু ছত্র চিঠি দিয়ে অজিতেশ তার অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত করে রাখে, বছরে একবার একগুচ্ছ ডলার পাঠিয়ে দেয় মার নামে, তাই দিয়ে নাকি প্রাণেশ কুমার দত্ত সল্ট লেকে জমি কিনে বাড়ী তৈরী করে নিয়েছেন, বেনামীতে। অজিতেশ তো বেশ আছে, মদ খায়, ফুর্তি করে, বুঁদ হয়ে বসে আকাশ পাতাল ভাবে, অবিবাহিতা 'স্ত্রী'র সঙ্গে মাঝে মধ্যে মারামারিও করে থাকে, অজিতেশ তো বেশ আছে, নেই কি? শুধু তার হৃদয়-মন থেকে সবটুকু শ্রদ্ধা নিঃশেষ শুকিয়ে গেছে। পৃথিবী, মানুষ, দেশ, বিদেশ, সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম, ঈশ্বর, বিজ্ঞান, টেকনলজি, সাহিত্য, শিল্প কোনও কিছুকেই একরত্তি শ্রদ্ধা করে না অজিতেশ, সব চেয়ে কম শ্রদ্ধা তার নিজের ওপরে। "এ এক আজব যন্ত্র, এই মানুষ, বুঝলি," অজিতেশ বলেছিল মাস তিনেক আগে নিউ ইয়র্কে এক সন্ধ্যায়, টাইমস্কোয়ারে একটা গ্রীক রেঁস্তোরায় বসে পঞ্চম পেগ হুইস্কি গলায় ঢেলে দেবার পর, "এ যন্ত্রটার সবচেয়ে বড়াই এর একটা মগজ আছে, এ চিন্তা করতে পারে। আর সেই মগজের ব্যবহারে কি চমৎকার একখানা দুনিয়া তৈরী করেছে এ যন্ত্রটা, একবার চেয়ে ঢাখ। চোখ জুড়িয়ে যায়, না কি? মদ আছে, মেয়ে মানুষ আছে, ডলার আছে, তাই অজিতেশ নামক যন্ত্রটা বেশ টিকে আছে।" সপ্তম পেগ হুইস্কি খেয়ে অজিতেশ বলেছিল, "মাইরী, কতো মেয়ের সঙ্গে কতোবার যে শুলাম গুণে শেষ করতে পারবো না। কি দারুণ ক্ষুধা এই যন্ত্রটার জানিস? দিনে তিনবার শুয়েও এটার তৃপ্তি নেই। একখানা যন্ত্র বটে। মাইরী।"

কিন্তু সুভাষ মল্লিক? সরকারী পরিসংখ্যানে হাজার খানেক সুভাষ মল্লিকরা পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। জেলে পচছে নিশ্চয় পঁচিশ ত্রিশ হাজার। এবং এক তিল ভারতভূমি লিবারেটেড হয় নি, চাষীরা হ'তে পারে নি জমী গেরিলা, সনাতন

ভারতবর্ষ কয়েক বছর মূহ্ কম্পিত হয়ে আবার তার সুপ্রাচীন স্থিরত্ব অর্জন ক'রে যথাস্থিত হয়ে গেছে। এর মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে বার্ণপুরের সুভাষ মল্লিক কে তার খবর রাখে? [তার বাবা তো পারে নি তাকে জীবনের পথ দেখাতে, পারে নি পিতার প্রতিভূ সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার, ঈশ্বর? কোন অধিকারে, তাহলে, আজ তোমরা পিতৃকুলরা দাবী করবে, পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাই ঈশ্বর? কোন অহংকারে ঘোষণা করবে, পিতা তুষ্ট হলেই সকল দেবতারা পরিতুষ্ট? কোন মুখে চাইবে আনুগত্য, বাধ্যতা, কর্তব্যবোধ, ত্যাগ ইত্যাদি পুত্রের সনাতন শাস্ত্রীয় প্রদেয়?]

লয়েন্স কালাকিনো, আমাদের ওপেন স্কুলের অন্যতম ছাত্র, সাফ বলেছিল, "আমার বাবার প্রতি কোনও কর্তব্য নেই আমার। এ সত্যিটা আবিষ্কার করতে পুরো তিন বছর কেটে গেল, জানেন? আবিষ্কার করা কিন্তু মোটেই সহজ হয় নি। সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস, নিজেকে নিয়ে অবিরাম লড়তে হয়েছে। কারণ, জীবনের উনিশ বছর আমি ভাবতেই পারি নি বাবাকে বাদ দিয়ে আমার জীবনের বড়ো কোনও কিছু ঘটতে পারে, বাবাকে সুখী না করে আমি কোনও দিন সুখী হ'তে পারি।"

বলতে ভুলে গেছি, ল্যারী কালাকিনো কানাডিয়ান নয়, আমেরিকান। কেনটাকী রাজ্যের একটা ছোট শহরে তার জন্ম একটি ক্যাথলিক পিউরিটান পরিবারে। বাপ এ্যাটর্ণী, ছোট শহরেই সেরা এ্যাটর্ণী হয়ে জীবন কাটিয়ে সন্তুষ্ট। তা ছাড়া লোকাল রিপাবলিকান পার্টিরও সে প্রেসিডেন্ট। শহরটা ছোট হ'লে কি হবে, নাম তার ব্যাবিলন। ব্যাবিলনের অধিবাসীদের অনেকে ল্যারী কালাকিনোর বাবাকে কাউন্টি আদালতের বিচারক হবার জন্যে নির্বাচনে দাঁড়াতে বলেছে, কিন্তু এ্যাটর্ণীর রোজগার কাউন্টি আদালতের বিচারপতির মাইনের চেয়ে অনেক বেশি, এই কারণ দেখিয়ে ভদ্রলোক তাদের অনুরোধ সরিয়ে দিয়েছে। ল্যারীর মাও ধর্মপ্রাণা মহিলা, প্রতি রবিবারের প্রভাতী প্রার্থনায়ই শুধু উপস্থিত থাকেন না, ব্যাবিলন প্যারিসের পাদ্রী জানেন, শহর থেকে চাঁদা তুলে প্যারিস চালানয় মিসেস কালাকিনোই নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন।

ল্যারী ব্যাবিলনের স্কুলে আগাগোড়া সেরা ছেলেদের একজন ছিল। শুধু পড়াশোনায় নয়, খেলায় বিতর্কে, বক্তৃতায় সে ছিল স্কুলের প্রথম পংক্তিতে। স্কুল পার্লামেন্টের স্পীকার, স্কুল বেস-বল টীমের খেলোয়াড়, বাস্কেটবল টীমের কাপ্তান। ল্যারীর ছ'ফুট দেড় ইঞ্চি দেহ দেবদারু গাছের মতো সোজা, কালো চুল, ঈষৎ ফিকে চোখ, পাখির ঠোঁটের মতো নাক: ল্যারীকে দেখলেই বোঝা যেত সে ইতালিয়ান বংশের ছেলে।

ল্যারী বড়ো হয়ে উঠছিল পিতাকে পূজা ক'রে। জর্জ কালাকিনো ব্যবসায়ে বিনিযুক্ত সময়ের উদ্বৃত্ত অবসরটুকুর অনেকখানিই স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সঙ্গে কাটাতে ভালোবাসত। ল্যারীর একটি ছোট বোন ছিল, লাইলাক তার নাম। জর্জ কালাকিনো নিজের রক্ষণশীলতার জন্যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত ছিল না। তার মূল্যবোধে ছিল না জটিলতা। আমেরিকা, তার কাছে, পৃথিবীর নৈতিক নেতা। আমেরিকার আসল শক্তি তার নৈতিক শক্তি। দুনিয়াকে ঈশ্বরহীন সাম্যবাদ থেকে রক্ষা করার চেয়ে বড়ো নৈতিক কর্তব্য জর্জ কালাকিনো চিন্তা করতে পারতো না। এ কর্তব্যের বিশ্বব্যাপী ভূমিকা জীসস ক্রাইষ্ট স্বয়ং আমেরিকার বলিষ্ঠ স্কন্ধে তুলে দিয়েছেন, জর্জ কালাকিনোর এ নিয়ে সংশয় ছিল না। সে দৃঢ় বিশ্বাস করতো, এ কর্তব্য পালন করতে হলে আমেরিকার নিজের চরিত্রকে নৈতিক দিক থেকে বলিষ্ঠ করতে হবে। অতএব জর্জ কালাকিনো পিউরিটান নীতিমালায় বিশ্বাসী। প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পতাকা, জাতীয় আদর্শ এ তিনটি ছিল তার প্রধান প্রত্যয়। বছরের শেষ দিন, নিউ ইয়ার্স ঈভ ছাড়া, সে কখনও দু পেগের বেশি মদ্য পান করতো না। স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনও নারীর সঙ্গে বিবাহিত জীবনে সঙ্গম করে নি জর্জ কালাকিনো।

জর্জ কালাকিনো কখনও আদেশ করে নি ল্যারীকে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্যে নিজেকে তৈরী করতে। "ল্যারী, তোমার যা ভালো লাগে, তুমি তাই করবে জীবনে, বুঝলে?" প্রায়ই বলত জর্জ কালাকিনো। তথাপি সবাই জানতো বাপের ইচ্ছে ছেলে কেমিক্যাল ইনজিনীয়ার হোক। কেনটাকী রাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভীর দক্ষিণে না হলেও, দক্ষিণের কাছাকাছি। কৃষি প্রধান, অশ্বপ্রধান রাজ্য। কিন্তু হালে এ রাজ্যে নানা রকম কারখানা গড়ে উঠছে, বিশেষ ক'রে সার ও খাদ্যের কারখানা। কেমিক্যাল এনজিনীয়র হলে ল্যারীর ভালো কাজ পেতে অসুবিধে হবে না। স্কুলে ল্যারী গণিতে মেধার পরিচয় দিয়েছিল, কেমিস্ট্রিতেও তার গ্রেড ভালো। স্কুল পাশের পরীক্ষায় তার গ্রেড এতো ভালো হল যে তিন চারটে বিশ্ববিদ্যালয় তাকে স্কলারশিপ সহ পড়বার সুযোগ দিল। ল্যারীর মনেও সন্দেহ ছিল না তার ভবিষ্যৎ কেমিক্যাল ইনজিনীয়ারিং। নিজেকে সে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিল, কেমিক্যাল ইনজিনীয়ারিং এর মতো চিত্তাকর্ষক বিষয় দ্বিতীয় নেই, প্রফেশনে কেমিক্যাল এনজিনীয়রের সমকক্ষ নেই আর কেউ। ল্যারী নিয়মিত মার সঙ্গে রবিবারের প্রাত্যহিক প্রার্থনায় গেছে, গির্জার কয়েরে যোগ দিয়ে পবিত্র সঙ্গীত গেয়েছে। ল্যারীর পৃথিবী পরিপূর্ণ নিটোল ছিল, কোনও ঝড়-ঝাপটা তাকে বিধ্বস্ত করে নি। স্কুলের শেষ বছর পর্যন্ত ল্যারী কোনও মেয়ের সঙ্গে দেহচর্চা করে নি। একটি মেয়ের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল, কিন্তু স্নানসীর হাত ধরে পার্কে ঘুরে বেড়ান ছাড়া আর কিছু দৈহিক সম্পর্ক হ'তে পারে নি তাদের।

বাবা-মা'র কাছ থেকে ল্যারী শিখে নিয়েছিল, বিবাহ ছাড়া কোনও মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া পাপ। এ শিক্ষাও সে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করেছিল।

বাপ ল্যারীকে পূর্বাঞ্চলে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে রাজী হল না। ইষ্ট কোষ্টের লোকেদের নীতির বাঁধন ভীষণ হালকা, কলম্বিয়া, হার্ভার্ড, ইয়েল আর কর্ণেল আইভী লীগ হ'লে কি হবে, ওখানকার ছাত্রছাত্রীরা কেবল বিদ্রোহ আর বিশৃঙ্খলা করতে জানে, তারা প্রেসিডেন্ট জনসনকে বলে পিগ., পুলিশের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধ লেগে যায়, বিশ্ববিদ্যালয় "দখল" করে, শিক্ষকদের ঘেরাও। ল্যারী, অতএব, ভর্তি হল কেনটাকী রাজ্যের রাজধানী লেকসিংটন শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে। কলেজে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ল্যারীর পুরাতন পৃথিবীর ইট পাথর খসে পড়তে শুরু করল। দেখতে পেল, স্কুলে তার যতোই সুনাম থাক না কেন, কলেজে অনেক ছেলে মেয়েই পড়াশোনায় তার চেয়ে অনেক অগ্রসর, এবং তারা কেউ ল্যারীর মতো প্রতিষ্ঠিত মূল্য বোধকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে রাজী নয়। ক্লাসে তারা শক্ত শক্ত প্রশ্নে অধ্যাপকদের কাবু ক'রে দেয়, তাদের পড়াশোনার ব্যাপক পরিধির পরিচয় পেয়ে ল্যারী নিজের শিক্ষার দারিদ্র্য সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে ওঠে। কলেজ যাবার সময় বাপ শুধু একটি মাত্র উপদেশ অথবা আদেশ দিয়েছিল ল্যারীকে ; কোনও মেয়ের সঙ্গে বেশি একটা জড়িয়ে পোড়ো না। ল্যারী দেখতে পেল শুধু পড়াশোনায়ই সে ক্লাসে নিতান্ত সাধারণ নয়, খেলাধুলা, ব্যায়ামেও সে অনেকের পিছুতে। ট্রাকে প্রাণপণ দৌড়েও ল্যারী দশজনের একজন হ'তে পারল না. আরও ভীত সংকিত হল ল্যারী যখন সে আবিষ্কার করল, কেমিষ্ট্রি তার একদম ভালো লাগে না, কিছুতেই তাতে তার মন আকৃষ্ট হয় না। প্রথম বছর ল্যারী নিজের ডর্মে আটকে রইল, একটি বন্ধু হল না তার, বান্ধবী তো দূরের কথা, সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম ক'রে বছর শেষের পরীক্ষায় সি-প্লাস গ্রেড পেল।

নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা সত্ত্বেও কলেজ ল্যারীর জীবনকে তার স্বাভাবিক উত্তাপ থেকে রেহাই দিল না। কেনটাকী বিশ্ববিদ্যালয়েও

যুব-বিক্ষোভ মাথা গজিয়ে উঠল, ছাত্রছাত্রীরা কেন্ট ষ্টেট য়ুনিভারসিটির ছাত্রদের ওপর ন্যাশনাল গার্ডদের গোলা বর্ষণে ক্ষেপে উঠে হরতাল ক'রে বসল। ল্যারী প্রথমে কিছুতেই হরতালে যোগ দিতে চাইল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যোগ না দিয়েও পারল না। যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ল্যারী আতংকের সঙ্গে আবিষ্কার করল, একটা দেয়ালে চিড় খেয়ে তার পুরো পৃথিবীটাই ভেঙে পড়ার উপক্রম! প্রেসিডেন্টকে একবার "পিগ" বলতে পারার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুকে "পিগ" বলার জন্যে ল্যারীর দেহমন একসঙ্গে আকুল হ'য়ে উঠল। ডর্মের সহবাসী ছেলেটি যখন

অনায়াসে বলে বসল, মাই ফাদার ইজ অ পিগ, তখন ল্যারীর মুখেও প্রায় উচ্চারিত হল, মাই ফাদার টু।

দ্বিতীয় বছরও ল্যারী প'ড়ে গেল। কেমিক্যাল ইনজিনীয়ারিং-ই তখনও তার জীবনের লক্ষ্য। অরগানিক কেমিস্ট্রিতে মন না বসলেও তাকেই মেজর বিষয় হিসেবে নির্বাচন করল। কিন্তু কেমিষ্ট্রির চেয়ে ল্যারীকে অনেক জোরে টানতে লাগল একনমিকস, পলিটিক্যাল সায়ান্স, সোসিওলজি এবং হিষ্ট্রী। ল্যারীর মনে হ'তে লাগল, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মানে সমাজের তৈরী খাঁচায় নিঃশব্দে সারাজীবনের জন্যে ঢুকে যাওয়া, পৃথিবীতে যে কতো কিছু দেবার আছে তা বুঝতে পেরেও তার উত্তপ্ত আস্বাদ থেকে জোর ক'রে নিজেকে বঞ্চিত রাখা। ল্যারীর মন চাইতে লাগল বেরিয়ে পড়তে, য়ুরোপে, লাতিন আমেরিকায়, আফ্রিকায়, বিদেশী ভাষা শিখতে, যাতে দেশ দেশান্তরের মানুষ, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারা যায়। নিজের ঘরে বসে বসে, পার্কে, নদীর ধারে, রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার সময় ল্যারী ভাবত, কেন আমি খাঁচায় ঢুকবো, কেন মেনে নেব যা আমার মানা উচিত নয়, কেন বাবার জীবন-টাই আমার জীবনের ছক হবে, কেন আমি নিশ্চিত মাইনের চাকুরী, প্রাচুর্য, আরামের দাসত্ব গ্রহণ করবো, কেন আমি প্রশ্ন করবো না, বর্জন করবো না, কেন আমি পালাব না সেসব থেকে যার মধ্যে আনন্দ নেই, বৃহত্তের নেই আস্বাদ ?

১৯৬৮ সালের গ্রীষ্মে ল্যারীর সঙ্গে তার বাবার বিরোধ শুরু হল।

প্রথম বিরোধ বাধল যেদিন ডাকে ল্যারীর হাতে এসে পৌঁছল সেই সর্বনাশা নোটিশটি যা সারা আমেরিকার যুবকদের প্রধান আতংকে পরিণত হ'য়েছিল। ভীয়েৎনাম যুদ্ধে যোগ দেবার ড্রাফট। ল্যারী প্রথমে কি করবে ভেবে পেল না। ড্রাফট অনুসারে এক বছরের মধ্যে তাকে যুদ্ধের জন্যে তৈরী হ'তে হবে, তিন মাস ট্রেনিং-এর পরে, আসবে তার প্রথম ভীয়েৎনাম ট্যুর।' ল্যারীর মন বিদ্রোহ ক'রে উঠল। "এ যুদ্ধে আমার সম্মতি নেই, এ যুদ্ধ আমার নয়" বার বার মনে মনে বলল ল্যারী। কিন্তু মনের ইচ্ছে মত কাজ করবার সাহস হল না। অগত্যা বাবাকে ফোন করল।

জর্জ কালাফিনো ল্যারীর ড্রাফট পাবার খবর শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল, "ল্যারী, প্রেসিডেন্ট তোমাকে দেশের সব চেয়ে মহান কাজে আহ্বান করেছেন। তুমি যুদ্ধে গেলে আমরা খুব দুঃখ পাবো। তোমার মার রাত্রে ঘুম হবে না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমিও তো তিন বছর লড়েছি। দেশ ও পতাকার আহ্বান তো উপেক্ষা করার নয়। এ যে ধর্মের আহ্বান, ঈশ্বরের আহ্বান।"

ল্যারীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "শীট্!" শুনে সে নিজেই চমকে উঠল।

চমকে উঠল জর্জ কালাকিনোও।

"ল্যারী, আমার কিছু প্রভাব আছে উপরিওয়ালাদের ওপর। আমি হয়তো তোমার ড্রাফটা পিছিয়ে দিতে পারি। অন্তত বছর খানেক। তার মধ্যে হয়তো যুদ্ধে আমরা জিতে যাবো। কিন্তু, বাছা, আজ না হয় কাল, দেশের ডাকে তোমাকে সাড়া দিতেই হবে।"

ল্যারী বলল, "বাবা, এ যুদ্ধ আমার নয়। এ যুদ্ধ অন্যায়। আমি জনসনের জন্যে প্রাণ দিতে তৈরী নই।"

জর্জ কালাকিনো নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না।

চেঁচিয়ে উঠল, "ল্যারী! তুমি কি আমার ছেলে? আমার পুত্র কি কথা বলছে আমার সঙ্গে? না তুমি অন্য কেউ, যাকে আমি চিনি না, কোনদিন দেখি নি?"

ল্যারী ঠাণ্ডা গলায় পাথুরে জবাব দিল, "ড্যাড্, আমি ড্রাফট কল মানছি না। কালই জানিয়ে দিচ্ছি, আমার বিবেক এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে।"

"তার ফল জানো? তোমাকে জেলে নিয়ে যাবে!"

ল্যারী বলল, "এক জেল থেকে অন্য জেলে।"

জর্জ কালাকিনো নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না! কেনটাকী বিশ্ববিদ্যালয়তো হার্ভার্ড, কলম্বিয়া নয়; কেনটাকীতে তো এখনও পুরো বেঁচে আছে সেই ধ্রুপদী মার্কিন আদর্শবাদ যার জোরে আমেরিকা সারা "মুক্ত" দুনিয়ার নেতৃত্বে অটল। তবে কি কেনটাকীর মতো সুরক্ষিত দুর্গও আক্রান্ত হ'য়েছে বিষাক্ত বিদ্রোহের কলুষিত অবক্ষয়কারী শক্তি দ্বারা? সে দূষণ কি ঢুকে পড়েছে জর্জ কালাকিনোর পরিবারেও?

কপাল ঘেমে গেছে জর্জ কালাকিনোর। বুঝতে পারছে, পা ও হাত কাঁপছে।

"ল্যারী। তোমার কথার মানে আমি বুঝতে পারছি না।"

ল্যারীর মুখেও আর কোনও কথা সরছে না।

"ল্যারী! আমার মনে হচ্ছে তোমার এক্ষুনি বাড়ী চলে আসা উচিত। মা ও আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"ড্যাড, এখন বাড়ী যাওয়া আমার পক্ষে সহজ নয়।"

জর্জ কালাকিনোর কণ্ঠস্বর পাথুরে: "ল্যারী! আমি আদেশ করছি তুমি এ সপ্তাহ শেষে বাড়ী চলে এসো। আমি আদেশ করছি, তোমার মা ও আমার সঙ্গে কথা বলার আগে তুমি এমন কিছু করবে না যার জন্যে সারা জীবন তোমাকে অনুতাপ করতে হ'তে পারে।"

পিতার সঙ্গে কথা বলার পর ল্যারী তিন বছর যা করেনি, তাই দুদিনে ক'রে

বসল। তিন বছর সে কোনও মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে নি। শাদামাটা পরিচয়ের বেশি কোনও মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গ'ড়ে উঠতে দেয় নি। ল্যারীর চারিদিকে ছেলে-মেয়েরা ভালোবাসাবাসিতে জমে থেকেছে; ভর্মেই প্রণয়ীরা দিনে রাত্রে যখন সম্ভব অন্তিম দৈহিক মিলনে আবদ্ধ হ'য়েছে। ল্যারীর দেহও উত্তপ্ত হয়েছে, কামনার দংশনে উৎক্ষিপ্ত ল্যারী নিজেই নিজেকে শান্ত ক'রে এনেছে। একটা "বুস পার্টি"তেও ল্যারীকে কেউ দেখতে পায় নি।

সেই ল্যারী লেকসিংটন শহরে বেরিয়ে পড়ল সেদিনই সন্ধ্যেবেলা; একটা বারে ঢুকে মদ খেয়ে আধা-মাতাল হল, আমুদে পাড়ার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একটি মেয়ে একসময় যখন সামনে এসে রঙিন হাসির সঙ্গে মাখন-গলায় বলল, 'আমার সঙ্গে আসবে, ডারলিং?' ল্যারী তার মুখে নির্বোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে জবাব দিল, "নিশ্চয়।" মেয়েটি পরমুহূর্তে তাকে বাহুবদ্ধ ক'রে খুব নিচু গলায় বলল, "পঁচিশ ডলার!" ল্যারী তখনও নির্বোধ চোখে তার দেহকে স্পর্শ ক'রে বলল, "কিন্তু আমি যে কিছুই জানি নে!" মেয়েটি ঝরণা হাসির সঙ্গে বলল, "সব শিখিয়ে দেব তোমাকে। কোথায় যাবে? হোটেলে, না আমার ঘরে?" ল্যারী বলল, "তোমার যা ইচ্ছে।"

সপ্তাহ শেষ বাড়ী গেল ল্যারী কালাফিনো। ছবির মতো ছোট্ট শহর, ছবির মতো বাড়ী, সংলগ্ন আঠার একরের বাগানটি ছবির চেয়েও মনোরম। ল্যারীর কাছে এই প্রথম বার বাড়ী-ঘর-বাগানের, ছোট্ট শহরের, শহরের মাঝখান করে নীল লেক, বাগানের সামনে ঝরণা, সব কিছু বিস্বাদ লাগল, মনে হল এই অপর্যাপ্ত মানুষের হাতে গড়া বৈভব আর সৌন্দর্যের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে বিরাট কিছু অন্যায় আর ফাঁকি মাঝে মাঝে জিভ বার ক'রে সে ভেঙাচ্ছে আমাকে, তোমাকে, সবাইকে। বাবা-মার সঙ্গে বোঝাপড়া বিশেষ এগোল না, তারা যা বোঝাল, ল্যারীর প্রাণ তা আর স্পর্শ করল না। মনে হল, ছোটবেলার স্কুলে-পড়া বইএর মতো অনেক-দূরে-ফেলে-আসা উপদেশ, এখন শুধু শব্দ, কানের ওপরে আঘাত করা ছাড়া আর কোনও ক্ষমতা তার নেই।

শহরে ল্যারীর একটি মেয়ের সঙ্গে স্কুল থেকে খানিকটা ভাব ছিল, কলেজে গিয়েও ল্যারী তার সঙ্গে চিঠিপত্র বিনিময় করত। পামেলা ডায়মণ্ড তার নাম, স্কুল শেষ ক'রে এই ছোট শহরেই এখন সে কমার্শিয়াল আর্ট শিখছে। ল্যারীর মতো পামেলা ইতালিয়ান নয়, তার পরিবারের আর্থিক অবস্থাও অনেক নিচে। পামেলাই, তবু, ছিল একমাত্র মেয়ে ল্যারী একদা যার সঙ্গে হাত-ধরাধরি ক'রে মাঠে, পাহাড়ে, লেকের ধারে, পার্কে ঘুরে বেরিয়েছে, একসঙ্গে স্টিমবোট চেপে লেকে ছুট লাগিয়েছে,

একমাত্র পামেলাকেই ল্যারী চুমু খেয়েছে, তার নরম দেহের স্পর্শ ল্যারীকে একসঙ্গে মুগ্ধ ও উত্তেজিত করেছে। পামেলা ও ল্যারী দুজনেই বিশেষ এগোয় নি, দুজনেরই বিশ্বাস ছিল, যাকে বিয়ে করবো না, তার সঙ্গে দৈহিক মিলন সম্ভব নয়। পামেলাকে অসাধারণ মনে হয় নি ল্যারীর কোনওদিন, সৌন্দর্যে না, বুদ্ধিতে না; মনে হয়েছে, পামেলা জল, হাওয়া আকাশের মতোই সাধারণ, তাকে কাছে পেয়ে মন-খুশি, পামেলা নিশ্চিন্ত নির্ভর বাল্যসখী।

পিতা-মাতার সঙ্গে জীবনের প্রথম সংঘাতে বিভ্রান্ত হ'য়ে ল্যারী পামেলার কাছে হাজির হল।

বছর খানেক দুজনের দেখা হয় নি, শুধু দুচারখানা চিঠির বিনিময় হ'য়েছে মাত্র; পামেলা আর্ট স্কুলে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে পাট টাইম চাকরীও করছে এক বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানে। টেলিফোনে পামেলাকে ডেট ক'রে সন্ধ্যের পর তাকে নিয়ে ল্যারী বেরিয়ে পড়ল। লেকের ধারেই তরুণ তরুণীদের রেঁদেভু, সেখানে গিয়ে বসল দুজনে।

ল্যারী এবার নতুন চোখে দেখতে পেল পামেলাকে। উনিশ পেরিয়ে কুড়িতে পড়েছে পামেলা; তার দেহে পরিপূর্ণ যৌবন। কথা-বার্তায়, অঙ্গভঙ্গিতে পুরুষকে আকর্ষণ করার সচেতন প্রচেষ্টা এসে গেছে পামেলার মধ্যে। পামেলাই স'রে এসে গা ঘেষে বসেছে ল্যারীর, তার হাতখানা মুঠোয় আবদ্ধ ক'রে নিজের কোলে স্থাপন করেছে। জঙ্ঘা থেকে নরম উত্তাপ উঠে এসে ল্যারীর ধমনীতে বিদ্যুত সঞ্চারণ করছে।

একসময় পামেলা বলল, "ল্যারী! তোমার গার্ল ফ্রেণ্ড নেই?"

ল্যারী বলল, "না।

পামেলা আশা করেছিল, ল্যারী বলবে, তুমিই তো আমার গার্ল ফ্রেণ্ড। হতাশ হল।

ল্যারী প্রশ্ন করল, "তোমার কোনও বয়-ফ্রেণ্ড আছে?"

পামেলা বলল, "কিছুদিন হল আমি একটি লোকের সংগে ডেট করছি।"

বলেই পামেলা তাকাল ল্যারীর মুখে। ঈর্ষার চিহ্নমাত্র দেখতে পেল না।

পামেলা বলল, "লোকটাকে খুব ভালো লাগছে না।"

"কেন?"

"আজকাল তিনবার ডেট করলেই চতুর্থবার ছেলেগুলি হোটেলে অথবা নিজেদের ঘরে নিয়ে যেতে চায়।"

ল্যারী প্রশ্ন করল, "তুমি এখনও ভার্জিন, প্যাম?"

পামেলা উলটো প্রশ্ন করল, "তুমি?"

ল্যারী বলল, "ক'দিন আগেও ছিলাম।"

পামেলার মুখ অন্ধকার হ'ল।

"কে, জানতে পারি কি?"

ল্যারী নির্বিকার স্বরে বলল, "একটা বেশ্যা।"

পামেলা বলে উঠল, "কেন? কেন?"

ল্যারী বলল, "নিজেকে নিয়ে ক্ষেপে আছি আমি।"

ল্যারী পামেলাকে বলে গেল তার কলেজ জীবনের ইতিহাস।

"প্যাম, যে পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরে আমার কুড়ি বছর কেটে গেল, সে পৃথিবী আজ চুরমার হ'য়ে ভেঙ্গে পড়ছে। আমি আর কিছুকেই বিশ্বাস করতে পারছি না, মানতে পারছি না। এতোদিন ভেবেছি, কেমিকাল এনজিনীয়র হ'য়ে একটা ভালো কাজ পেলে, কাউকে বি'য়ে ক'রে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটানই সবচেয়ে লোভনীয়। এমন একটি স্ত্রী যাকে আমি ভালোবাসতে পারি, যে ভালোবাসবে আমাকে, আমরা দুজনে ভালোবাসবো আমাদের সন্তানদের; এমন মাইনে পাবো যাতে প্রতি বছর সবাইকে নিয়ে একবার বিদেশে ছুটি উপভোগ করতে পারি; দুখানা গাড়ী, একটা ট্রেলর, একটা বোট, নিজের একটি সুন্দর বাড়ী, পাহাড়ের ওপর, পাহাড় আমার বড়ো প্রিয়, এর চেয়ে বেশি পাবার কথা কোনও দিন ভাবিনি। মনে হয়েছে, আমার ছোট্ট পৃথিবীটুকু সুরক্ষিত থাকলে দুনিয়ায় কি ঘটল না-ঘটল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি? ভেবেছি, বাবা-মার চিরন্তন স্নেহ, ঈশ্বর, আমেরিকার অপর্যাপ্ত সম্পদ ও ক্ষমতা, এই ট্রিনিটী যতোদিন বহাল থাকবে ততোদিন এমন কোনও সমস্যা আসবে না যা সমাধানের বাইরে। কিন্তু গত এক বছরে এই ট্রিনিটী ভেঙ্গে চুরে মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছি বাবা-মার স্নেহের পেছনে রয়েছে বিরাট দৈত্য-দাবীর, আমার জীবনটাকে তাদের মূল্যবোধ দিয়ে তৈরী রাস্তায় চালিয়ে নেবার দাবী। দেখতে পাচ্ছি, ঈশ্বর মানে অনেক, অনেক অন্যায় ও অবিচারের কাছে মাথা পেতে দেওয়া। আর দেখতে পাচ্ছি, আমেরিকার বৈভব ও প্রতাপ বিশ্বের নিষ্ঠুরতম, প্রবলতম শোষণ ও অত্যাচারের দানব। আমার বিবেক বলছে, মানবো না, পাতবো না মাথা, আমি আমার জীবনে বাঁচবো পছন্দমতো। অথচ সাহস জুড়োতে পারছি না। রাশি রাশি ভয়ংকর ভয় আমাকে অনবরত শাসাচ্ছে।

পামেলা ল্যারীর অনেক কথার মানে বুঝতে পারল না। শুধু বুঝল, ল্যারী এক ভীষণ সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

"হয়তো ভীয়েৎনাম যুদ্ধে যাবার ভ'য়ে তুমি সবকিছুকেই বিকৃত ক'রে দেখছ, ল্যারী," বলে ফেলল পামেলা।

"ল্যারী বলল, 'যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ! কেন যুদ্ধ? কিসের জন্যে? যুদ্ধে যে বীরত্ব নেই, মাহাত্ম্য নেই, তা কি আজ কারুর অজানা? যুদ্ধ যে মানুষকে পশু ক'রে দেয় তাও কি জানি নে আমরা? তবু কেন যুদ্ধকে মহান, বিরাট ক'রে দেখাবার এই ব্যাপক ষড়যন্ত্র? মানুষ কি জন্মায় মানুষকে মারতে, নিজেকে হত্যা করতে? যারা যুদ্ধ বাধায়, তাদের দেহে তো আঁচড়টুকু পর্যন্ত লাগে না? যারা ভিয়েৎনামকে ধ্বংস করবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছে, তারা তো দিব্যি আরামে আছে। পঞ্চাশ হাজার আমেরিকান মরেছে, তাতে তাদের কি? তারা চায় আরও পঞ্চাশ হাজার মরবার জন্যে এগিয়ে আসুক, যাতে তারা 'জয়' ঘোষণা করতে পারে? ভীয়েৎনামকে মেরে আমাদের জয় কোথায়?"

পামেলা বলল, "যুদ্ধটা তো কমিউনিজমের সঙ্গেও, তাই না?"

ল্যারীর কণ্ঠে শীতল বিষাদ: "আমার বাবা তাই বলে। জনসন তাই বলে। কমিউনিজমের সঙ্গে যুদ্ধ তো রাশিয়া আর চীনের সঙ্গে ভাব জমানো কেন? পূর্বয়ুরোপে রুশ আধিপত্য মেনে নেওয়া কেন? ভীয়েৎনাম তো বারো হাজার মাইল দূরে ছোট্ট একটা দুর্বল দেশ। তাকে ধ্বংস ক'রে কমিউনিজম আটকানো যাবে? জনসনের সাহস থাকে তো রাশিয়া আর চীনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে বসুক। আসলে কমিউনিজম-রুখতে-হবে ব্যাপারটা বিরাট ধাপ্পা। ভীয়েৎনামের লোকেরা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কাছে আনত হচ্ছে না, তারা স্বাধীন ভাবে নিজেদের দেশ চালাতে চাইছে, এই হল তাদের অমার্জনীয় অপরাধ। এ অপরাধের শাস্তি পরিপূর্ণ ধ্বংস। কেননা, ধ্বংসের যন্ত্র জনসনের হাতে। ফাক্ দেম্ অল!"

শেষ তিনটি শব্দ উচ্চারণ ক'রে ল্যারী নিজেই চমকে উঠল। শুনে, হতবাক হল পামেলা।

"ল্যারী! তুমি তো এসব নোংরা কথা বলতে না কখনও," আর্তনাদ করল পামেলা।

ল্যারী দাঁতে দাঁত ঘসে বলল, "নোংরা বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলে নোংরা ভাষা ব্যবহার করতে হয়।"

পামেলাকে ঘায়েল ক'রে ল্যারী নিজের মনে ব'লে চলল, "গড্ড্যাম। ড্যাম্! সব কুত্তার বাচ্চা। সব!"

লেকের ধার থেকে উঠে দুজনে একটা রেস্তোরায় ঢুকল। পামেলাকে পুনরায় অবাক ক'রে ল্যারী বারের দিকে এগিয়ে গেল।

পামেলা বলল, "তুমি তো ড্রিঙ্ক করতে না ?"

ল্যারী বলল, "সে অনেক কাল আগের কথা। পুরো এ-ক স-প্তা-হ।"

দুজনে বারের কাউন্টারে পৌঁছে ছুটো গোল টুলে বসল।

"তুমি কি খাবে ?"

পামেলা বলল, "জীন।"

ল্যারী পামেলার জন্তে জীন-এণ্ড-টনিক আর নিজের জন্তে হুইস্কি চাইল— "অন দ' রকস্।"

"ল্যারী।" পামেলা আবার আর্তনাদ করল।

ল্যারী পর পর তিনটে হুইস্কি গলায় ঢালল। প্রত্যেক গলাঃধকরণের সময় মুখ বিকৃতি করল, বুক চাপল হাত দিয়ে, দুতিনবার ব'লে উঠল, মাই গড!

তৃতীয় পানের পর ল্যারী অনেকটা সুস্থির হল। তার মুখ লাল, চোখও।

"চলো, এবার যাওয়া যাক।"

খেতে খেতে কথাবার্তা বিশেষ এগোল না। হোচট খেল প্রতি পদে। পামেলা আশা করেছিল ল্যারী তার কথা জানতে চাইবে। ল্যারী বিশেষ ঔৎসুক্য দেখাল না। পামেলা নিজেই নিজের কথা বলতে গিয়ে দেখল ল্যারীর বিশেষ মনোযোগ নেই। যা পামেলাকে আবার অবাক করল তা হল, ল্যারীর চোখ বারবার পামেলার উন্নত বুকের ওপর ন্যস্ত।

রেঁস্তোরা থেকে বেরিয়ে এসে দুজনে ল্যারীর ঝরঝরে বুইকে বসল।

ল্যারী বলল, "এই গাড়ীটাকে দেখছ তো! আমার জীবনটাও এমনি হ'য়ে গেছে।"

পামেলা বলল, "গাড়ীটা এবার বদলান দরকার।"

ল্যারী বলল, "বাবা একটা নতুন গাড়ী এখুনি কিনে দিতে তৈরী, যদি সুপুত্র হ'য়ে চলতে রাজী হই।"

"উনি কি তোমাকে যুদ্ধে যেতে বলেছেন ?"

"বাবা আমার পালাবার পথ তৈরী ক'রে দিতে রাজী আছে। ড্রাফট বছর খানেক পিছিয়ে দেবার মতো রাজনৈতিক প্রভাব আছে বাবার। ইতিমধ্যে বাবা আমাকে পীস কোরে যোগ দিতে বলছে। যোগ দেবার রাস্তাও নাকি সে তৈরী করতে পারে। পীস কোরে ঢুকে গেলে আর আমাকে যুদ্ধে যেতে হবে না।"

"তাহলে! তাহলে তোমার তো কোনও মুস্কিল নেই!"

"একেবারে না," ল্যারী ঠনঠন হাসির সঙ্গে বলল, "বাবার তৈরী পালাবার পথে

আমি কলম্বিয়া অথবা পেরু অথবা সেনেগলে মার্কিন মাহাত্ম্য আর সাম্রাজ্যবাদের সেবা করব বছর তিনেক, ভীয়েৎনামের ধানক্ষেতে ভাসবে না আমার মৃতদেহ, আমার বদলে আর একটা ছেলের মৃতদেহ ভাসলে বাবার বা আমার কোনও কিছু এসে যাবার কথা নয়। ট্রিনিটী পুরো রাজত্ব করবে; ঈশ্বরের মুক্তহস্ত আশীর্বাদ পেয়ে যাবে মার্কিন মাহাত্ম্য ও সাম্রাজ্যবাদ. আমার বাবা-মা'র দুনিয়ায় কোনও দুষমনের আঁচড়টুকু পর্যন্ত লাগবে না। চমৎকার বন্দোবস্ত!"

পামেলাকে তার নিজের এ্যাপার্টমেন্ট বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে ল্যারী বলল, "প্যাম, তোমার একটা সন্ধ্যে নষ্ট করবার জন্যে মার্জনা চাইছি।"

পামেলা বলল, "চলো, আমার ঘরে ব'সে একটু কফি খেয়ে যাবে।"

ল্যারী বলল, "তুমি নিশ্চয় আমাকে ঘৃণা করছ!"

পামেলা বলল, "তোমার মাথা খারাপ।"

ল্যারী বলল, "তোমার করুণার প্রয়োজন নেই আমার!"

পামেলা ল্যারীর হাত ধরে বলল, "ল্যারী, আমরা ছেলেবেলার বন্ধু। আমি তোমাকে ঘৃণা করি না, করুণাও না। আমি তোমার বান্ধবী মাত্র। তার চেয়ে বেশি কিছু নই, কমও নই।"

এগার তলায় পামেলার ছোট্ট এক ঘরের এ্যাপার্টমেন্ট, সঙ্গে এক চিলতে কিচেন। ঘরখানা সুরুচি-সজ্জিত, যদিও আসবাবপত্র কোনওটাই দামী নয়। এক পাশে কুইন-সাইজের বেড, অন্য পাশে একটা টু'-পীস সোফাসেট। দেয়ালে কয়েকখানা ছবি, মধ্যে একখানা নকল বামবার্ট, বাকীগুলি পামেলার নিজেরই আঁকা। একটা দেয়াল ভর্তি পামেলার তৈরী কমার্শিয়াল আর্টের কাজ।

ল্যারীকে সোফায় বসিয়ে পামেলা ষ্টেরিও চালিয়ে দিল। রক-মিউজিকের বিষম চীৎকার ছুটে এসে আঘাত করল ল্যারীকে।

পামেলা কিচেনে ঢুকে পারকোলেটরে কফি চাপিয়ে দিল।

কফি খাওয়া শেষ হ'লে, ল্যারী বলল, "প্যাম, তুমি বড়ো ভালো। তোমার সন্ধ্যে ও রাত্রিটা খারাপ করার জন্যে আমি সত্যি দুঃখিত।"

পামেলা বলল, "ল্যারী, যদি যেতে ইচ্ছে না করে, তোমার এক্ষুনি যাবার কোনও কারণ নেই।"

ল্যারী উঠল না।

পামেলা ষ্টেরিওর রেকর্ডটা বদলে দিল। এবার একটা নৃত্য-সঙ্গীতের রেকর্ড বেজে উঠল।

পামেলা বলল, "নাচবে, ল্যারী?"

ল্যারী উঠল। দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে নাচল কয়েক মিনিট। পামেলার দেহ বার বার স্পর্শ করল ল্যারীর দেহকে।

মিনিট দশেক পরে ল্যারী সোফায় বসল। পামেলা বসল ল্যারীর পাশে। গা ঘেঁসে।

অত্যন্ত সহজ নিয়মে দুজন দুজনের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল। দুজনের ওষ্ঠাধর মিলিত হ'য়ে দুজনকেই কাঁপিয়ে তুলল।

ল্যারী বলল, "খুব সুন্দর।"

পামেলা বলল, "কি ?"

"তুমি। তোমার শরীর।"

"ল্যারী, তুমি এর আগে কখনও আমাকে সুন্দর বলো নি।"

"প্যাম, আজ আমি তোমাকে প্রথম দেখতে পাচ্ছি।"

"তুমি দেখতে চাও আমাকে, ল্যারী ?"

ল্যারী চুপ ক'রে রইল।

পামেলা বলল, "আমাকে চাও তুমি, ল্যারী ?"

ল্যারীর সারা দেহে বিদ্যুৎ ছুটে বেড়াতে লাগল।

"আমার একটু নেশা হ'য়ে গেছে, প্যাম।"

"তুমি চাও আমাকে, ল্যারী ;"

"প্যাম," ল্যারী ব'লে উঠল, "তুমি কেন দেবে আমাকে ? আমার আজ শক্তি নেই তোমাকে, অথবা কাউকে, ভালোবাসার।"

পামেলা বলল, "তোমার ভালোবাসায় আমার লোভ অনেক দিনের। সেই কবে থেকে অপেক্ষা ক'রে আছি, একদিন তুমি আমাকে ভালোবাসবে, আমাকে বিয়ে করতে চাইবে।"

"তাই নাকি ? আমি তো বুঝতে পারি নি ?"

"তুমি কলেজে চলে যাবার পরও আশা আমাকে অনেকদিন ত্যাগ করে নি। বাড়ী এলে তুমি আমার সঙ্গে সময় কাটিয়েছ, আমি তোমার মধ্যে ভালোবাসার নিশানা খুঁজেছি, পাই নি।"

"কিন্তু এখন তো তোমার একজন বয়-ফ্রেণ্ড আছে।"

"আছে। তবু, সেতো তুমি নও।"

"ভালোবাসো তুমি তাকে ?"

"হয়তো বাসি। হয়তো বাসি না।"

"মাই গড।"

"ল্যারী, তুমি জানতে চেয়েছিলে আমি ভার্জিন কিনা।"

"এখন আর জানতে চাইনে, প্যাম।"

"তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে অনেককাল আমি ভার্জিন ছিলাম। ছেলেরা শুতে না পেলে ডেট করতে চায় না। দু তিন দিন ডেট করার পরই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। ডেট করার জন্যে এতোখানি দাম আমি অনেকদিন দিতে চাই নি। এর আগের বার তুমি যখন এলে, সে তো মাস ছ'য়েক হ'য়ে গেছে, তখনও তোমার মধ্যে আমি কোনও সংকেত খুঁজে পেলাম না। উনিশ পেরিয়ে আমার কুড়ি বছর শুরু হ'য়ে গেল। তখন যে পুরুষটি আমাকে ডেট করতে এগিয়ে এল, তার দাবী না মেটালে তাকেও হারাতে হত। আমার মতো সাধারণ মেয়ে একের পর একটা পুরুষকে হাত ছাড়া করতে পারে না, ল্যারী।"

"তুমি বিয়ে করছ তাকে?"

"সম্ভবত করছি না। তা ছাড়া, বিয়ের প্রস্তাব সে করেনি, করবে কিনা তাও জানি না।"

"না ভালোবেসে তুমি নিশ্চয় কাউকে বিয়ে করবে না।"

"যাকে ছেটবেলা থেকে ভালোবেসেছি, সে যখন ভালোবাসল না আমাকে, তখন কেবল ভালোবাসার জন্যেই বিয়ে করব এমন বড়াই আর আমার নেই, ল্যারী। এই লোকটা অনেক টাকা রোজগার করে। মানুষও খারাপ নয়।"

"মাই গড।"

"আরও শুনবে? লোকটার দুটো বিয়ে ভেঙে গেছে। ওর দোষে নয়।"

"পামেলা!"

"লোকটার অনেক টাকা। প্রত্যেক বছর আমাকে য়ুরোপ নিয়ে যাবে। নিয়ে যাবে জাপান, হংকং, তাইওয়ান, ব্যাংকক। বারমুডায় একটা হোটেলের মালিক লোকটা। হোটেল আছে মায়ামি, নাভাডা, লস এঞ্জেলস আর লেকসিংটনেও।"

ল্যারী চেঁচিয়ে উঠল, "প্যাম, আমি আর শুনতে চাই নে!"

পামেলা বলল, "ধনী হবার লোভ আমার ছিল না। লোভ ছিল ছোট খাট সচ্ছল সুখী জীবনের, প্রেমে কমনীয়, স্নেহে মধুর। তা বুঝি আজকাল আমার কেন, কারুরই ভাগ্যে হবার নয়। আমার বুদ্ধি কম, পড়াশোনা বিশেষ করি নি, তবু বুঝতে পারি, ল্যারী, কিছু একটা বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে গেছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে, সব কিছু ভেঙে পড়ছে, আমরা সবাই একসঙ্গে দিকভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ছি। দেখো না! আমার লক্ষ্য ছিলে তুমি, আর ছিটকে গিয়ে পড়লাম কার কাছে!"

ল্যারী বলল, "প্যাম, তাড়া কিসের? তোমার বয়স এখনও কুড়ি হয় নি। একটু সময় দাও নিজেকে। আমাকেও দাও কিছু সময়।"

পামেলা ল্যারীর হাত তুলে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল: "তা কি ভাবি নি, ভেবেছ? নিজেকে সময় দেওয়া মানে আরও কয়েকটা পুরুষের বিছানায় শোওয়া। শুতে শুতে কি একদা উদিত হবে সেই রাজকুমার, যার জন্যে এই প্রলম্বিত প্রতীক্ষা? আর তুমি। তোমাকে তো আজ দেখলাম, ল্যারী। তোমার পৃথিবী ভেঙ্গে পড়েছে, এবার তুমি পালাবে। পালিয়ে কোথায় যাবে, কোন পথে কার কাছে কিসের কাছে পৌঁছবে জানি নে, কিন্তু আমার কাছে যে নয়, সেটুকু ভালো করেই জানি।"

ল্যারী সত্যি পালাল, বাবা। সে রাত্রে পালাল পামেলার কাছ থেকে। তার পরের দিন বাপ-মা'র কাছ থেকে। এক মাস পরে কেনটাকী থেকে। নিউ ইয়র্কে এসে যোগ দিল আরও অনেকের সঙ্গে যারা তারই মতো জনসনের যুদ্ধ থেকে পালাচ্ছে। ল্যারীকে পালাবার পথ ক'রে দিল সুজান কোর্ড। যেমন ক'রে দিয়েছে আরও অনেককে। ল্যারী চলে এল টরণ্টোতে। দশ হাজার আমেরিকান যুবকদের একজন ল্যারী, যারা জনসনের যুদ্ধে হত অথবা আহত হ'তে রাজী হয় নি, যারা একটা ক্ষুদ্র দরিদ্র অচেনা অজানা দূরদূরান্তের দেশকে জ্বালিয়ে দিতে রাজী হয় নি, তারা জনসাধারণের মৃত্যুর কারণ হতে রাজী হয় নি। এই দশহাজার যুবক, দেশনেতা, সমাজপিতাদের চোখে দেশপ্রেমিক নয়, বরং দেশদ্রোহী, ঈশ্বর-পতাকা-মাতৃভূমির ঘোলাটে রসায়নে হাজার হাজার বছর দেশে দেশে, সারা পৃথিবীতে, যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে সমাজপিতারা মানুষকে মানুষ মারার কাজে বিনিয়োগ করেছে, এরা সেই সুপ্রাচীন নিয়মের ব্যতিক্রম। এরা দেশ ছেড়েছে, প্রাচুর্যের আরাম ছেড়েছে, ছেড়েছে নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের সুরক্ষিত সম্ভাবনা, অথচ এরা ভীতু নয়, বাবা, এদের দুঃসাহসের তুলনা নেই! ল্যারী টরোণ্টোতে এসে এমন কোনও কাজ নেই যা করে নি শুধু খেয়ে পরে থাকার রসদ জোগাতে। দোকানে সেলসম্যান, রেঁস্তোরার 'বয়', বাড়ীতে বাড়ীতে জ্যানিটর। অবশেষে একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে কেরানীর কাজ পেয়ে সন্ধ্যে বেলায় কলেজে ভর্তি হয়েছে, এবং, শেষ পর্যন্ত, আমাদের 'ওপেন স্কুলে' এসে পৌঁচেছে।

ল্যারী কালাকিনোর মতো বেশ কয়েকজনকে আমি জানবার সুযোগ পেয়েছি, বাবা। সুজানের ঘরে দেখেছি এদের। দেখেছি নিউ ইয়র্ক শহরে অন্যান্য গোপন আস্তানায়। এরা সবাই অবস্থাপন্ন পরিবারের, শিক্ষিত পরিবারের তেজস্বী সন্তান। জনসনের যুদ্ধে এগিয়ে গিয়ে কারা নাম লিখিয়েছে, জানো, বাবা? যারা গরীব, যাদের শিক্ষা স্কুলের বাইরে এগিয়ে যেতে পারে নি, যারা ভেবেছে যুদ্ধে যোগদানের মাধ্যমে

নিজেদের স্বার্থের গুছিয়ে নিতে পারবে। যুদ্ধের সময় মাইনে অনেক, এক বছরের বেশি এক সঙ্গে কাউকে ভীয়েৎনামে "ট্যুরে" যেতে হয় না, যুদ্ধের পরেও সরকারী খরচে যতোদূর ইচ্ছে লেখাপড়া, সরকারী ভাতা। তাই এগিয়ে গেছে গরীব শাদা পরিবারের ছেলেরা, কালো পাড়ার ছেলেরা, স্প্যানীশ পাড়ার ছেলেরা। নিগ্রোদের সংখ্যা একসময় এত বেশি হ'য়ে যাচ্ছিল যে ভীয়েৎনামে মার্কিন সেনাপতিরা এবং পেন্টাগনের নেতারা প্রমাদ গুণেছিলেন। শুধু শাদা-কালোর যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘাতের ভয় নয়, লড়াই-এ হাত পাকিয়ে, অন্তরকে লোহার মতো শক্ত ক'রে কালোরা কি ফিরে এসে যোগ দেবে না সেই সব জঙ্গী দলগুলিতে যারা সারা নিগ্রো সমাজটাকে সশস্ত্র সহিংস সংগ্রামের পথে টানতে চাইছে? কয়েকটি জঙ্গী কালো দল নিগ্রো যুবকদের ভীয়েৎনামে যুদ্ধে না-যাবার জন্যে অনেক আবেদন ক'রেও বিশেষ সাড়া পায় নি। যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের প্রায় সবটাই এসেছে মার্কিন সমাজের উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত স্তরগুলি থেকে।

ল্যারী কালাকিনোদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি, বাবা, বুঝেছি অনেক কিছু।

আমি জানতে পেরেছি, সব দেশে, বিশেষ ক'রে আমাদের 'উন্নতশীল' দুনিয়ায়, শাসককুলের, অর্থাৎ সমাজ-পিতাদের, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত মিত্র হ'ল দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা, দুর্বলতা। সব রকমের দুর্বলতা।

এবং ভয়। যতো বেশি ভয় জনসাধারণকে অধিকার ক'রে থাকবে, নানা রকমের, নানা পরিমাপের ভয়, সমাজের পিতৃকুল ততো নির্ভয়।

আমি বুঝতে পেরেছি, যাঁরা প্রচার করেন, দেশে দেশে, জনতাকে দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা, রোগ, ইত্যাদি থেকে মুক্ত করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, তারা চান না, এ মুক্তির স্রোত তীব্র হোক, স্রোত পরিণত হোক প্লাবনে; তাঁরা চান পরিবর্তনের মন্দগতি চাকাকে পুরোপুরি নিজেদের আয়ত্তে রাখতে।

আমি আজ জানি, দ্রুত পরিবর্তনই শুধু আরও দ্রুত পরিবর্তনের পথ তৈরী করতে পারে।

আমি আরও জানি, দরিদ্র নিরক্ষর ক্ষুধার্ত জনতা বিপ্লব করে না। তারা অভ্যুত্থানে ভিড়ে যায় নিশ্চয়। কিন্তু বিপ্লব যে ভীষণ সময় সাপেক্ষ। তার অন্যতম মূলমন্ত্র হচ্ছে ধৈর্য। বিপ্লবের পথ তৈরী করে তারাই যারা পরিবর্তনের আস্বাদ পেয়েছে, মানে বুঝতে পেরেছে, পরিবর্তনের নিয়মকানুন ও পাগলা অনিয়ম যাদের কাছে বোধগম্য।

আমি জানি, ভয় না ভাঙলে মানুষের মুক্তি নেই।

আমি জানি, যতোদিন মানুষ 'না' বলতে পারে না, ততোদিন সে ভয়ের শৃঙ্খলে বন্দী।

ল্যারী কালাকিনো মুক্তির আস্বাদ পেয়েছে। সে বলে, আমি সুখী; আমার মন হালকা; নিজেকে আমি একটু শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শিখেছি।

ল্যারী হয়তো একদিন, ভবিষ্যতে কোনও একদিন, দেশে ফিরে যাবে। আমেরিকার সমাজপিতারাই একদিন ল্যারীদের ঘরে ফেরবার পথ খুলে দেবে। ল্যারী মধ্যবিত্ত সমাজে যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে।

কিন্তু জর্জ কালাকিনো আর ল্যারী কালাকিনোর পৃথিবী আর কোনও দিন মিলে মিশে এক হবে না।

সুজান কোর্ড একদিন আমার জীবন থেকে নিজেই উধাও হ'য়ে গেল। আমি জানতাম, সুজান যাবে, তবু তার যাবার জন্মে প্রস্তুত করতে পারিনি নিজেকে।

ড্রাফট-পলাতক ছেলেদের এবং তাদের অনেকের বান্ধবীদের কানাডায় স্থানান্তরিত করবার প্রয়োজনে সুজানকে প্রায়ই টরোন্টো আসতে হত। এক একবার দুতিন মাসও একসঙ্গে থেকে যেতো সুজান টরোন্টো শহরে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইল আটেক দূরে একটা বিরাট পুরানো বাড়ী সস্তায় ভাড়া ক'রে সুজান তৈরী করেছিল এক "কম্যিউন", যে শব্দটা, বাবা, ষাট দশকের শেষের দিকে আমেরিকা ও পশ্চিম য়ুরোপের কাউন্টার-কালচার চলতি ক'রে দিয়েছিল সংবাদপত্র, রেডিও আর টেলিভিশনের মাধ্যমে। নর্থ আমিরিকায় এসব হটাৎ-গজান "কম্যিউন" গুলি যুব-বিদ্রোহের এক আকর্ষণীয় সৃষ্টি। এদের সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের প্যারিস কম্যিউন অথবা মাও সে-তুং-এর চীনভূমিতে চাষীদের কাম্যউনকে তুলনা করা ঠিক হবে না। নর্থ আমেরিকার সাময়িক 'কম্যিউন'গুলি গ'ড়ে উঠছিল কিছুটা প্রয়োজনের তাগাদে, কিছুটা বিদ্রোহের উত্তাপে, কিছুটা আদর্শবাদের আলোকে। বাড়ী থেকে পলাতক ছেলেমেয়েদের সঙ্গতি ছিল না আলাদা আলাদা ঘর নিয়ে বাসা বাঁধার; একসঙ্গে বাস করার অর্থ নৈতিক প্রয়োজন, অতএব, প্রখর হয়ে উঠেছিল। প্রাইভেট প্রপার্টি এবং তার ওপরে ভিত্তি ক'রে যে জীবনবেদ নর্থ আমেরিকায় দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রেও কিছু কিছু ছেলেমেয়েরা 'কম্যিউনে' একত্রিত হ'য়ে কমন প্রপার্টির জো .রা নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখতে চেয়েছিল। আবার কারুর কারুর

মধ্যে একটা আদর্শবোধও ছিল, ধনতান্ত্রিক সমাজের অণুবিভক্ত মানুষকে সমস্বার্থ-যৌথ জীবনের ছাঁচে পুনর্গঠিত করার।

কিলবার্ণ এ্যাভিনিউর কম্যিউনটাকে সুজান কোর্ড গ'ড়েছিল এই আদর্শ নিয়ে। গোটা বাড়ীটায় আঠারখানা ঘর; আটচল্লিশটি যুবক যুবতিদের কম্যিউনের সভ্য ক'রে নিয়েছিল সুজান। তাদের মধ্যে ত্রিশটি যুবক, আঠারটি যুবতি। সব ছেলেরই তো আর বান্ধবী অথবা স্ত্রী ছিল না, অনেকেই আমেরিকা থেকে পালিয়ে এসেছিল। কম্যিউনের বাসিন্দাদের বয়স সতের থেকে তেত্রিশ। নিয়ম ছিল, যে যা উপার্জন করবে তার দশ ভাগের আটভাগ কম্যিউনের সমবেত ভাণ্ডারে জমা দিতে হবে। কারুর কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না। যা কিছু সম্পত্তি থাকবে তাতে সবাকার সমান অধিকার। প্রতি দু সপ্তাহের জন্যে কম্যিউনের সভ্যদের থেকেই এক একজন ম্যানেজার নিযুক্ত হবে। খরচপত্র সব তার হাতে। কম্যিউনের কিচেন থাকবে একটাই, তাতে পালা ক'রে সভ্যদের রাঁধতে হবে। বাড়ীর অন্যসব কাজ কর্মও— যেমন ঘরদোর সাফ করা, বাজার করা, কাপড় ধোওয়া, শীতের সময় বরফ সাফ করা— সবাইকে পালা ক'রে করতে হবে।

ম্যানেজার প্রতি দু'সপ্তাহে বদলালেও কম্যিউনের একজন পাকাপোক্ত ডিরেক্টর ছিল। সব সমস্যা তাকে সামলাতে হত। নিয়ম কানুন সভ্যরা যাতে মেনে চলে তাও দেখতে হ'ত তাকে। ডিরেকটারের সভাপতিত্বে পাঁচজন সদস্য নিয়ে সুজান তৈরী ক'রেছিল "পিপল্‌স্ বোর্ড" সব রকম বিবাদ, ঝগড়া এবং তারও চেয়ে গুরুতর সমস্যাগুলি "পিপল্‌স্ বোর্ড" কে ফয়সালা করতে হ'ত।

টরোণ্টোতে থাকবার সময় সুজান ছিল কম্যুনের পাকা ডিরেক্টর। তার অনুপস্থিতিতে আমি। আমাকে সবাই এ পদে নির্বাচন করেছিল প্রধানত আমি বিদেশী বলে। আমার কাছ থেকে নিরপেক্ষ পরিচালনা নাকি সহজেই আশা করা যায়। তা ছাড়া, হয়তো আমি বিদেশী বলেই, কম্যিউনের অনেকেই নিজের কথা আমাকে প্রাণখুলে বলতে পারত। বেশির ভাগ সভ্য আমাকে বিশ্বাস করতে পেরেছিল। কেউ কেউ আমাকে মোটেই সুনজরে দেখত না. কম্যিউনের ওপর আমার খবরদারি তাদের পছন্দ ছিল না। কিন্তু এরা সবাই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের মনোনয়ন সংখ্যালঘুরা স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নিয়েছিল।

কম্যিউনে নিয়ম ছিল না কো প্রেমিক যুগল অথবা স্বামী স্ত্রী আলাদা ঘর পাবে। আঠারখানা ঘরের মধ্যে ছ'খানা ঘরকে শোবার জন্যে ব্যবহার করা হত না। হত বসবার জন্যে, গানের জন্যে, নাচের জন্যে, জিনিষপত্র, খাবার জন্যে, তাস ইত্যাদি খেলার জন্যে। বাকী বারোখানা ঘরের এক একটিতে চার জনকে

শুতে হ'ত। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রেই দুটি প্রেমিক যুগলকে একঘরে রাত্রি কাটাতে হ'ত। বিবাহিত দম্পতি ছিল চারিটি। তারাও নিজেদের আলাদা ঘর পেত না।

আমার ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে এ ব্যবস্থাটা আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারছিলাম না। সদস্যদের মধ্যে দুটো মত দেখা গেল। একদল বলল, স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক প্রেমিকা নিজস্ব ঘর পেলেই পত্তন হবে আলাদা পরিবারের। ফ্যামিলি আর কম্যিউন একসঙ্গে হ'তে পারে না। ফ্যামিলি থেকে আসে প্রাইভেট ওনারশিপ, প্রাইভেট প্রপার্টি। সব টীরানীর উৎস হচ্ছে ফ্যামিলি। তুমি তোমার "গোপন" অস্তিত্বকে আঁকড়ে থাকলে, সমবেত অস্তিত্বে উত্তীর্ণ হবে কি ক'রে ?

অন্য দল বলল, সমবেত থেকেও মানুষ আলাদা। তার সবটুকু, সব কিছু সবার সঙ্গে মিলে মিশে করা সম্ভব নয়। মেয়েরা সমবেত ভাবে মা হ'তে পারে না। প্রত্যেককে আলাদা ক'রে গর্ভবতী হ'য়ে আলাদা ভাবে সন্তানের জন্ম দিতে হয়। সেক্স এমন একটা 'ব্যক্তিগত' জিনিষ যা অন্যের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। অনেকে বলল, আমরা অন্যের উপস্থিতিতে সঙ্গম করতে পারব না।

প্রথম দল, এ যুক্তি খণ্ডন করতে অন্য যুক্তি তুলল। লুকিয়ে সঙ্গম করা, প্রাইভেট সেক্স, তারা বলল, একটা শক্ত, প্রাচীন সংস্কারই শুধু নয়, মানুষের ওপর মানুষের দখল-দাবীর প্রধান ভিত্তি-ও। পশ্চিমের সব দেশে ছেলেমেয়েরা লোকজনের সামনেই কুচপরোয়া না-ক'রে চুমু খায়, আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়, আরও অনেক কিছু করে। লণ্ডনে রাত এগারটায় রাস্তায় চলতে কে না দেখতে পায় বাড়ীর দরজায়, সিঁড়িতে পুরুষ আর স্ত্রীলোকেরা সঙ্গমে আবদ্ধ ? যদি এতোটাই আমরা এগোতে পেরেছি তাহলে দুই বা তার বেশি প্রেমিক যুগল এক ঘরে রাত্রি বাস করতে আপত্তি হবে কেন ? আজ যা কঠিন মনে হচ্ছে, লজ্জা-সংকোচ লাগছে, দুদিনের চেষ্টাতেই তা সহজ হ'য়ে যাবে। ব্যক্তি-বাদ ও প্রাইভেট ওনারশিপ দূর করাই যখন কম্যিউনের আসল উদ্দেশ্য, তখন সাহসের সঙ্গে নতুন পথে এগিয়ে যেতেই হবে।

তৃতীয় দলটি সংখ্যায় সবচেয়ে বড় ; এর লোকেরা "নিরপেক্ষ" ভূমিকায় থেকে অন্য দুই দলের যুক্তির লড়াই উপভোগ করল।

অবশেষে ঠিক হল, ভোট নিয়ে সিদ্ধান্ত করা হবে। এক সদস্যের প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে সিক্রেট ব্যালটের ব্যবস্থা হল। দেখা গেল সাতাশ জন "সেপারেট রুম ফর কাপ্‌ল্‌স্" এর বিরুদ্ধে, ন'জন পক্ষে, বাকী বারোজন কোনও পক্ষেই ভোট দেয় নি।

সিদ্ধান্ত একবার নিয়মে চালু হ'য়ে গেলে এ নিয়ে বিশেষ কোনও সমস্যা দেখা দিল না। বরং নতুন একটা বাক্যাংশের সৃষ্টি হল : কম্যিউন সেক্স। যারা ভেবেছিল অন্যের উপস্থিতিতে সঙ্গম সম্ভব নয়, তারাও দেখল, সম্ভব। শুধু সম্ভবই নয়, নতুনত্বের

ফলে বেশ একটু উত্তেজকও। এ নিয়ে ব্যঙ্গ রসিকতাও কমিয়্উনে চালু হ'য়ে গেল। কিছুদিন পরে কমিয়্উন সেক্সটা আমার চোখেও অশালীন দেখাল না। বরং এমনি দেখতে পেলাম, কমিউন সেক্স একটুও কমিয়্উনিটি সেক্স অথবা কলেকটিভ সেক্স-এ পরিণত হল না। কমিয়্উনের যুগলরা দেখতে পেলাম পরস্পরের প্রতি দৃঢ় আনুগত্যে আবদ্ধ! মার্কিন সমাজের একটা অংশে স্ত্রীবদল চালু হচ্ছে ইদানীং কালে। কমিয়্উনে বাধা-নিষেধ, গোপনতা খুব কম। কিন্তু মেয়ে-বদল একদম নেই। যুগলে ভাঙন ধরলে, ভেঙে গেলে, অন্যতর বন্ধুত্বের উদ্যোগ আছে। জয়েস ক্লিফোর্ড ষ্ট্যান হুকনারকে খোলাখুলি ছেড়ে দেবার মাস খানেক পর ব্যারী ষ্টিফেনস্-এর বান্ধবী হল। জয়েস ক্লিফোর্ডকে কমিয়্উনের সবাই 'সেক্সপট' বলত। সেও ষ্টান হুকনারের সঙ্গে প্রেমাবদ্ধ থাকবার সময় অন্য কারুর দ্বারা শায়িত হয় নি।

তবু কমিয়্উন টিকল না। না, ঠিক বলা হল না। সুজান ফোর্ড যে কমিয়্উন চেয়েছিল, তা হল না।

ছোট খাট চিড় দেখা দিল প্রথম থেকেই।

কয়েকজন সদস্য দেখতে পেল তাদের জামা কাপড় উধাও হ'য়ে যাচ্ছে। বিশেষ ক'রে অন্তঃবাস। এবং কসমেটিকস।

সবাই যাকে সন্দেহ করল তার নাম বারবারা ওয়ার্ড। শিকাগো শহর থেকে ড্রাফ্‌ট্-পলাতক পল হোয়াইটের বান্ধবী।

বারবারা একটা বই এর দোকানে সেলসগালে'র কাজ পেয়েছিল। তার অনুপস্থিতিতে কয়েকজন বারবারার স্যুটকেস খুলে এক রাশি কমসেটিকস ও ডজন খানেক ব্রা, প্যান্টি, আর প্যান্টি-হোস বার করল।

বারবারা ফিরে এলে দারুণ হৈচৈ বেধে গেল। কয়েকজন বারবারাকে পরের জিনিষ চুরির জন্যে দায়ী সাব্যস্ত ক'রে বসল। বারবারা অভিযোগ করল, তার অনুপস্থিতিতে চারজন সদস্য তার স্যুটকেস খুলে জিনিসপত্র বার ক'রে নিয়েছে এবং তাকে চুরির মিথ্যে অপবাদ দিয়েছে।

সুজান তখন নিউ ইয়র্কে। অতএব অস্থায়ী ডিরেক্টর আমিই। আমার কাছে দুপক্ষের অভিযোগ হাজির।

আমি বারবারার সঙ্গে একা কথা বলতে গিয়ে দেখতে পেলাম তার কাছ থেকে রাগ ও চোখের জল অনেক পাওয়া গেল, আমার প্রশ্নের সদুত্তর বিশেষ পাওয়া গেল না।

পল হোয়াইট কাজ পায় নি। এখানে ওখানে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। কমিয়্উন তার খাওয়া-থাকার দায়িত্ব নিয়েছে। অন্য খরচ জোগায় বারবারা।

পল ফিরল অনেক রাত করে। আমি ওর জন্যে জেগে ছিলাম। বারবারা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। পলকে নিয়ে আমি আপিস ঘরে বসলাম।

সমস্যাটা পলকে জানাতেই, সে বলে ফেলল, "হায় ভগবান। ব্যাপারটা খুব সহজ, কেতু। বারবারার একটা অসুখ আছে।"

"ক্লিপ্টোম্যানিয়া?"

"হ্যাঁ।"

আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম। বারবারা চুরি না ক'রে পারে না। বড় কিছু নয়, ছোটখাট জিনিস সরান।

পল বলল, "আমার জিনিসও মাঝে মাঝে চুরি ক'রে বসে বারবারা।"

"এখন কি করা, বলো?" আমি প্রশ্ন করলাম।

পল বলল, "সপ্তাহ খানেক যেতে দাও। তুমি ওদের বুঝিয়ে বলো। ওরা যেন বারবারাকে মিষ্টি কথা ব'লে বুঝিয়ে দেয় সে অপরাধী নয়। আমি সব জিনিসগুলি এনে তোমাকে দিয়ে দেব।"

বারবারার ব্যাপারটা মিটে গেল, কিন্তু স্ট্যান হুকনার যখন নালিশ করল তার ওয়ালেট থেকে আশি ডলার নিখোঁজ, তখন কম্যিউনের শিকড়ে টান পড়ল।

স্ট্যান হুকনার নিঃসন্দেহ, কম্যিউনেরই কেউ তার টাকা চুরি করেছে।

সে কাউকে সন্দেহ করতে পারল না।

একজন বলল, "আশি ডলার হুকনারের কাছে থাকে কি ক'রে? ও নিশ্চয় রোজগারের আশি ভাগ কম্যিউনে জমা দিচ্ছে না!"

বিতর্ক উঠল। বিতর্ক থেকে দোষাদুষি। অভিযোগ, পাল্টা-অভিযোগ।

দেখা গেল, অনেকেই রোজগারের দশভাগের আটভাগ কম্যিউনে জমা দিচ্ছে না। আট চল্লিশ জনের মধ্যে বত্রিশ জনের চাকরী আছে। বড় জোর আটজন রোজগারের আশি শতাংশ কম্যিউনে জমা দিচ্ছে।

স্ট্যান হুকনারের টাকার হদিশ পাওয়া গেল না।

সুজান বলল, "ক্যাপিটালিজম মানুষকে শত শত বছর ধ'রে স্বার্থপর হ'তে শিখিয়েছে। শিখিয়েছে কেবল নিজেরটা গুছিয়ে নিতে, নিজের কথা ভাবতে, নিজের সুখ সুবিধের রাস্তা তৈরী করতে। সহজে কি এই প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে?"

চতুর্থ মাসে নতুন সমস্যা। পাঁচজন সদস্য কাজে বেরোয় না। জিজ্ঞেস ক'রে জানা গেল তারা কাজ ছেড়ে দিয়েছে। কম্যিউনের বাজেটে চাপ পড়ল। বীয়র এবং মদ কম কেনা হল। তাতে অনেকে গেল চটে। কেউ কেউ বলল, আমরা কম টাকা দেব কম্যিউনকে, কারণ আমাদের বীয়র আর মদ কিনতে হবে।

যারা চাকরী ছেড়ে দিয়েছে, সুজান ও আমি তাদের সঙ্গে কথা বললাম।

তারা কাজ ছেড়ে দিয়েছে কারণ কাজ তাদের পছন্দ মত নয়।

কমিউন তাদের খাওয়া-থাকার দায়িত্ব নিতে বাধ্য, তারা বলল। তারা প্রথম থেকেই কমিউনের সদস্য, শুধু কাজ নেই এ কারণে কমিউন তাদের বিদায় ক'রে দিতে পারে না।

কথাগুলিতে একটু অতিরিক্ত ধার শোনাল আমার কানে। আমিও তো বেকার। কমিউন থেকে উৎখাতের হুকুম হ'লে আমার বিপদ কম নয়।

বাজেটে চাপ আরও বাড়ল কারণ প্রায়ই হঠাৎ দুচার জন ছেলেমেয়ে অল্প ক'দিন অথবা এক দিনের জন্যে কমিউনে হাজির হত, এদের খাবার খরচ কমিউনকেই বহন করতে হত। সুজান কোর্ডের টরন্টো কমিউনের নাম সারা উত্তর আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। অস্থায়ী অতিথিরা যেমন এসে পড়তো, তেমনি আসত সভ্যদের বন্ধু-বান্ধবীরা। এক একদিন কমিউনে প্রায় একশ লোক হ'য়ে যেত। নাচ গান হৈ হুল্লোড় বচসায় বাড়ীটা সরগরম হত, প্রতিবেশীরা বিরক্ত।

প্রতিবেশীদের নালিশ পৌঁছতে লাগল পুলিশের কাছে।

পুলিশ এল কমিউনে। বেআইনী কিছু ধরতে পারল না, কেবল গোলমাল ছাড়া। আমাদের ওপর আদেশ হল, রাত দশটার পরে গোলমাল না করার।

কমিউনে মদ্যপানের মাত্রা মাঝে মাঝেই বড় বেশি হ'য়ে যেত। দুচার জন বুঁদ হ'য়ে যেত প্রায় প্রতি রাত্রেই, কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শনির রজনী ছিল মাতলামোর অনুমোদিত সময়। উইক-এণ্ডে ড্রাংক হওয়া পশ্চিমী সমাজে বিশেষ কিছু অপরাধ নয়, কিন্তু এতগুলি যুবক-যুবতি একসঙ্গে মদ খেয়ে মাতাল হওয়ার মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা নিশ্চয় নিহিত ছিল। মাতাল হ'লে তো সবাই একরকম ব্যবহার ক'রে, না। কেউ চুপ হ'য়ে যায়, কেউ হয় দুর্দান্ত মুখর; কেউ কাঁদে, কেউ চেঁচায়, আবার কেউ গান ধরে, আবৃত্তি করে, অভিনয়ও। অনেকে বমি ক'রে দেয়। মদ খেতে আমার ভালো লাগে না, তাছাড়া সপ্তাহ-শেষের মাতলামির সময় অন্তত একজনকে স্থিরমস্তিষ্ক থাকতে হবে এজন্যে আমি মদ্যপান থেকে দূরে রাখতাম নিজেকে। তাতে সব ব্যাপারটা বিশেষ উপভোগ্য হ'ত মাঝে মাঝে, যাতে তর্কাতর্কি হাতাহাতিতে পরিণত না হয় তাও দেখা যেত। বাগ-বিতণ্ডা মারামারির কিনারায় পৌঁছলেই আমি গিয়ে দলের মধ্যে হাজির হতাম, কলহ-আবদ্ধ দলগুলিকে ভাগ ক'রে দিতাম।

একদিন তা সম্ভব হল না। জিমী টেলর আর তার বান্ধবী অনীটা ক্রুক্স্ সেদিন আটজন বন্ধুকে কমিউনে নিয়ে এ'সেছিল। এদের দেখেই আমার মনে হ'য়েছিল, বিপদ ঘটতে পারে। জিমী টেলর ও অনীটাকে নিয়ে কমিউনে ছোটখাট সমস্যা

ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। কম্যিউনে মারিওয়ানা, হাশিস ইত্যাদি রোজই চলত, নিষিদ্ধ ছিল কেমিক্যাল ড্রাগ। আমরা জানতাম জিমী ও অনীতা দুজনেই হেরোইন-আসক্ত। নিজেরাই একে অন্যের শিরায় হেরোইন ইনজেক্ট করত। আমাদের সন্দেহ ছিল কমিউনের সদস্যদের মধ্যে হেরোইন-চর্চা বেড়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে অবশ্য কোনও সমস্যা দেখা দেয় নি। ড্রাগ যখন বর্তমান ইয়ুথ কালচারের এক আঙ্গিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তখন এ নিয়ে নিয়মের বাড়াবাড়ি করা আমাদের কাছে বৃথা ও অপ্রয়োজনীয় মনে হ'য়েছিল।

জিমী-অনিটার অতিথিদের দেখেই আমার মনে হ'য়েছিল, এরা ড্রাগ-এ্যাডিক্ট।

সুজানকে বলতে, সে শ্রাগ ক'রে জবাব দিয়েছিল, "ওদের তো বার ক'রে দিতে পারবো না!"

আমি বলেছিলাম, "ড্রাগ কম্যিউনকে ডোবাবে।"

সুজান ম্লান হেসে বলেছিল, "ফুটো কম্যিউন এমনিতেই একদিন ডুববে।"

আমি সুজানের চোখে হঠাৎ-ঔদাসীন্য দেখতে পেয়ে অবাক হ'য়েছিলাম।

দিনটা ছিল শুক্রবার। সবাই মদ খাচ্ছিল, অনেকে গান করছিল গীটারের সঙ্গে, অনেকে নাচছিল। বব ওরশাভস্কি হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয় করছিল, পলোনিয়াসকে হত্যা করার পরে দেখলাম সে হটাৎ একটা চেয়ারের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ ক'রে একেবারে চুপ।

মারামারিটা কি ক'রে শুরু হল সুজান আর আমি টেরও পেলাম না। হটাৎ দেখলাম জিমী-অনীটার বন্ধুদের একজন—বিরাট দেহ ছেলেটার, গায়ে ভীষণ জোর—পল হোয়াইটকে নাকের ওপর ওজনদার ঘুষি মেরে বসল। পল ঘুষিটাকে পুরো এড়াতে পারল না, তার ঠোঁট কেটে মুখ বেয়ে রক্ত ঝরল। পলও কম শক্তিশালী নয়, সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আক্রমণকারীর ওপর। মুহূর্তে তাণ্ডব লেগে গেল। যে যাকে পারে মারছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা চেয়ারও আস্ত রইল না। মদের ও বীয়রের বোতল উড়তে লাগল মিসাইলের মত। যারা অন্যান্য ঘরে ছিল তারা এল ছুটে, দেখা গেল তাদেরও অনেকে মারামারি করছে। কয়েকটি মেয়েও পুরুষদের কম যাচ্ছে না, যদিও বেশির ভাগ মেয়েরা এককোণে সরে এসে মারামারি দেখছে, হাসছে, বাহবা দিচ্ছে, দুএকজন কাঁদছেও।

সুজান আমাকে বলল, "পুলিশকে ফোন করো।"

আমি বললাম, "তা'হলে কম্যিউনের কি থাকল?"

সুজান জোর দিয়ে বলল, "কারুর প্রাণ যাবার আগে পুলিশকে ফোন করো।"

আমি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। দুতিন মিনিট পরে ফিরে এসে আমি

একটা জানলায় উঠে দাঁড়ালাম। আমার হাতে ষ্ট্যান হুকনারের ব্যাটারী-চালান লাউড-স্পীকার। স্পীকারে মুখ রেখে আমি ঘোষণা করলাম, "সবাই শোনো ! পুলিশে খবর দেওয়া হ'য়েছে। এক মিনিটের মধ্যে পুলিশ এসে যাবে। তোমরা এক্ষুনি থামো। এক মিনিটের মধ্যে পুলিশ এসে যাবে। পুলিশ এসে যাচ্ছে।"

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মারামারি থেমে গেল। রাস্তায় পুলিশ-গাড়ীর সিটি বেজে উঠল। সবাই হতভম্ব হ'য়ে স্থির, নিশ্চুপ।

সিটি বাজিয়ে পুলিশের গাড়ী রাস্তা অতিক্রম ক'রে চলে গেল।

সুজান আমাকে বলল, "পুলিশকে খবর দাও নি ?"

আমি বললাম, "না।"

সুজান বলল. "এরা আবার এক্ষুনি শুরু করবে।"

আমি বললাম, "করবে না। মারামারি একবার থেমে গেলে দ্বিতীয়বার শুরু হবে না।"

হ'লও না। প্রথম কয়েক মিনিট সবাই নিশ্চুপ স্থির। এই মিনিট বিরতিতে মারামারির ফলাফল দেখতে পেল সবাই। একটা চেয়ারও আস্ত নেই ! আবার টেবিলটা উল্টে গেছে। সারা ঘরে ভাঙ্গা বোতলের কাচ। দুটো জানলার কাচ ভেঙেছে। হলে একটা টেলিভিশন ছিল—ব্যারীর নিজস্ব জিনিষ, কম্যিউনকে দান ক'রে দিয়েছিল। তার কাচ ভেঙে চুরমার। আরও দেখা গেল বাইশ জন আহত হ'য়েছে। চারজনের আঘাত লঘু নয়। দশজনের মুখ অথবা নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। তিনজনের মাথা কেটে গেছে। উড়ন্ত টুকরো কাচের আঘাতে অনেকেই জখম।

মেয়েরা লেগে গেল ছেলেদের ফার্স্ট-এড দিতে। কম্যিউনেই ফার্স্ট-এডের যাবতীয় সরঞ্জাম ছিল, ব্যাণ্ডেজ. স্পিরিট, টিনচার আইওডিন, কাঁচি, ব্যাণ্ড-এড ইত্যাদি। তিনটি মেয়েরও আঘাত কম নয়, একজনের বাহুতে একটা কাচের টুকরো ব'সে রয়েছে আর একজনের কপাল কেটে রক্ত ঝরছে।

সমস্যা দেখা দিল গুরুতর আহতদের নিয়ে। পাঁচজনকে হাসপাতালে না নিয়ে গেলে নয়, সেলাই-এর জন্যে, দেহ থেকে কাচের টুকরো বার করবার জন্যে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মানেই পুলিশকে জানিয়ে দেওয়া কম্যিউনে মারামারির কথা। কেউ কেউ তথাপি হাসপাতাল নিয়ে যাবার পক্ষে, আবার কেউ কেউ তার বিরুদ্ধে। অগত্যা সিদ্ধান্ত নিতে হল সুজানকে। সুজান গুরুতর আহতদের অবস্থা ভালো ক'রে দেখে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে তার পরিচিত এক সার্জেনকে ফোন করল। নতুন পাশ করা সার্জেন. টরোণ্টোর এক হাসপাতালে ইনটার্ণ। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সে এসে গেল। হাসপাতালে আর যেতে হল না।

এই দুর্ঘটনার পর থেকে দেখতে পেলাম সুজান কমিয়ুউন সম্বন্ধে আর বিশেষ উৎসাহী নয়। তার কথাবার্তায় মনে হল, কমিয়ুউনের ভবিষ্যৎ তার কাছে আর বিশেষ দাম পাচ্ছে না।

একদিন সুজান আমাকে বলল, "কেতু, তুমি এভাবে আর ক'দিন চলবে?"

আমি প্রশ্নটার লক্ষ্য ঠিক বুঝতে না পেরে আলগা-ভাবে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, "কি ভাবে?"

সুজানের স্বরে অধৈর্য: "এক পাল বিদেশী দিকভ্রষ্ট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কিছু-না-করেই কি তোমার দিন কাটবে ভেবেছ? চাকরী করছ না, পড়াশোনা বন্ধ, মদ আর মেয়ে বাজি ও করছ না, ড্রাগও খাচ্ছ না। তুমি করছটা কি?"

আমি আহত হ'য়ে বললাম, "যা করছি তা তো দেখতেই পাচ্ছ।"

সুজান বলল, "জানি, তুমি বলতে পারো, আমার জন্যেই তোমর আজ এ অবস্থা। বেশ ছিলে বাপ-মা'র আদরের বাধ্য পুত্র, এতদিনে কলম্বিয়ায় তোমার পি-এইচ. ডি. হয়তো হ'য়ে যেত। পড়লে আমার পাল্লায়—"

আমি সুজানের কথাগুলিকে বন্ধ ক'রে দিয়ে বললাম "যা করেছি এবং করি নি তার পুরো দায়িত্ব আমার।"

সুজান বলল, "শুনে নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি কৈ? দায়িত্ব যে আমারও কতোটা জানিনে ভাবছ?"

সুজানের স্বর এবার গাঢ় কোমল।

আমি বললাম, "আমার জন্যে ভাবতে হবে না তোমাকে। তুমি নিজেই বা কি করছ?"

"কেতু, এ সব আর চলবে না।" বলল সুজান।

"কি সব?"

"এই যুব বিদ্রোহ, যুব-আন্দোলন, এই কাউন্টার-কালচার, এই কমিয়ুউন।"

আমিও এ কথাই ভাবছিলাম বেশ কদিন ধরে।

সুজান বলল, "ভীয়েৎনাম যুদ্ধ এবার শেষ হ'তে চলেছে। নিকসন চাইছে আমেরিকাকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে আনতে। ড্রাফট বন্ধ হ'য়ে গেছে। বিদ্রোহের প্রধান ইন্ধন ছিল ড্রাফ্‌ট। যুব-বিদ্রোহ এবার নিভে যাবে।"

"খুব তাড়াতাড়ি?"

"অনেকটা তো নিভে গেছেই দেখতে পাচ্ছি। নিকসন সহজে ভীয়েৎনাম ছাড়বে না। কিন্তু তার কাছে যে বিশেষ ঘটনাটা পরিষ্কার হ'য়ে গেছে তা হল: আমেরিকার জনসাধারণ এ যুদ্ধ চায় না। নিকসন আরও বুঝতে পেরেছে, ভীয়েৎনাম

যুদ্ধ জেতার ক্ষমতা আমেরিকার নেই। এ দুটো কঠিন বাস্তবের সামনে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া নিকসনের পক্ষে সম্ভব নয়।"

আমি একমত হলাম।

সুজান বলল, "শুধু আমেরিকা নয়, সমস্ত পশ্চিমী দুনিয়া এবং জাপান, এক বিরাট অর্থনৈতিক সংকটে আটকে গেছে। এবার যে ডিপ্রেশন আসছে, তিন দশকের পর এতো গভীর ও ব্যাপক সংকট আর ঘটে নি। বেকার লোকেদের সংখ্যা এখনই অনেক। ভীয়েৎনাম যুদ্ধ প্রায় এক কোটি মানুষের চাকরী জুটিয়েছিল। যুদ্ধ আর চলবে না সুতরাং দলে দলে লোকেদের চাকরী যাবে। স্কুল-কলেজে পড়া ছেলেমেয়েরা সামার জব পাবেনা। কলেজ থেকে পাশ করার পর দেখবে চাকরী নেই। তখন ছেলেমেয়েরা আর বিদ্রোহ করবে না। চুল ছেটে দাড়িগোঁফ কামিয়ে পড়াশোনায় মন দেবে। ক্যাম্পাসগুলি হয়ে যাবে শান্ত।

সুজান বলে চলল, "শেষ পর্যন্ত কি হবে জানো? সব ফুরিয়ে যাবে, শুধু থাকবে ড্রাগ। ড্রাগ খাওয়া ছেলেমেয়েদের কাছে হ'য়ে থাকবে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিবাদ।"

আমি বললাম, "যুববিদ্রোহ তো চিরদিনই শিকরহীন। হঠাৎ বিস্ফোরণ। আজ, আছে, কাল নেই।"

সুজান বলল, "আমি আগে এ কথা বিশ্বাস করি নি। এখন করছি। যুবক-যুবতিরা সমাজের কোনও স্থায়ী শ্রেণী নয়। আজ যে যুবক, কাল সে প্রৌঢ়। বয়সে না হ'লেও মানসে। আমার কথাই ভেবে দেখ। আমার পঁয়ত্রিশ হ'তে বেশি দেরী নেই। কলেজ পেরিয়ে গেলে যুবক-যুবতিদের ভোল বদলে যায়। কলেজগুলিতে বছর বছর নতুন ছেলেমেয়েদের আগমন, পুরানোদের প্রস্থান। যুবশক্তিকে আলাদা শ্রেণীশক্তির ভূমিকায় দেখতে যাওয়া দৃষ্টিভ্রম মাত্র। যুবশক্তিকে অন্য কোনও শ্রেণী শক্তির সঙ্গে একত্র না করতে পারলে সমাজ ব্যবস্থা ঢেলে সাজাবার কাজে সে কোনও বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে পারে না।"

"ঠিক বলছ," আমি সায় দিলাম।

"যারা পাকাপোক্ত রাজনীতি করে, তারা এ সত্যটা খুব ভালো করে জানে। তাই দেখবে তারা প্রত্যেকে ইয়ুথ-ফ্রন্ট তৈরী করতে সচেষ্ট হয়। আসল কথা, ইতিহাসের কয়েকটা সন্ধিক্ষণ বাদ দিলে, যুবশক্তি নিজের পায়ে দাঁড়ান কোনও স্বাধীন শক্তি নয়। হয় সে শোষকদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, নয় সে শোষিতদের সঙ্গে হাত মেলায়।"

আমি বললাম, "ফ্রান্সে, থাইল্যাণ্ডে যুবশক্তি কি স্বকীয় স্বতন্ত্র ভূমিকায় কাজ করে নি?"

সুজান বলল, "এগুলো ঐতিহাসিক নিয়মের আকর্ষনীয় ব্যতিক্রম। কিন্তু ১৯৫৮ সালের ফরাসী অভ্যুত্থানের ফলাফল কি হল? দ্য' গল আলজেরিয়ার স্বাধীনতা মেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে প্রতিক্রিয়াশীল বিদ্রোহ হ'তে যাচ্ছিল। যুবশক্তি তা হ'তে দিল না। খুব একটা বড় কাজ করল। দ্য'গল নিজেই তো এক ধরণের অথরিটারিয়ানিজম্ চাপিয়ে দিল ফ্রান্সের ওপর। যুবশক্তি যে বিপ্লবের আহ্বান দিয়েছিল তা তো খুব সহজে নস্যাৎ হ'য়ে গেল।"

আমাকে চুপ দেখে, সুজান বলল, "একটা বিরাট আন্দোলনের অঙ্গার নিয়ে কাটিয়ে দেবার মতো সময় আমার নেই, কেতু।"

"কি করবে তুমি?"

"কিছু একটা করবো। এখনও মনস্থির করিনি।"

সুজান খুব দুর্বল মিথ্যুক। তার মুখ দেখেই আমি বুঝলাম, মনস্থির হ'য়ে গেছে।

"কম্যিউনের কি হবে?"

সুজান বলল, "যারা ড্রাফ্‌ট্ পালিয়ে কানাডা চলে এসেছে, দেশে ফেরার পথ তাদের বন্ধ। নিকসন এদের মার্জনা করবে না। কিন্তু নিকসনের পর ডেমোক্র্যাটরা যদি রাজত্ব করে, এদের দেশে ফেরার রাস্তা খুলে দেওয়া হবে। কয়েকটা বছর এদের কানাডাতেই কাটাতে হবে।"

"আমি কম্যিউনের কথা ভাবছি।"

"উঠে যাবে। আমার কাজ ছিল ড্রাফ্‌ট্ পলাতকদের পালাবার পথ তৈরী ক'রে দেওয়া। তারপর এরা কি করবে না করবে সে দায়িত্ব আমার নয়।"

"নিশ্চয় না।"

"কিন্তু তুমি?" সুজান স্কোয়ার ওয়ানে ফিরে এল।

"আমি কি?"

"তুমি কি করবে?"

"সে দায়িত্বও তোমার নয়।"

সুজান মলিন হাসির সঙ্গে বলল, "এক সময় তোমার ওপর ভীষণ চাপ দিয়েছিলাম আমাকে বিয়ে করার জন্যে।"

আমি নীরব।

"নিজেকে নিয়ে অস্থির হ'য়ে গিয়েছিলাম তখন। কোনও রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলাম না অর্থপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার। মনে হ'য়েছিল তোমাকে বিয়ে করলে নতুন, একেবারে নতুন, একটা কিছু করা হবে। বত্রিশ বছরের জীবনের ওপর পর্দা টেনে দিয়ে আরম্ভ করবো একেবারে নতুন জীবন।'

আমি তখনও নীরব।

"ভুলে গিয়েছিলাম, ভুলে যেতে চেয়েছিলাম, জীবন বড় কঠিন মনিব। বত্রিশ বছরের জীবনকে কিছুতেই পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখা চলে না। যেখানেই যাই, যে ভাবেই বাঁচি, সে আমার সঙ্গেই থাকবে।"

আমার মুখে কথা ফুরিয়ে গেছে।

সুজান বলল, "তুমি বড় ভাল ছেলে, কেতু। তুমি এবার তোমার জীবনটাকে তৈরী ক'রে নাও। তোমার দেশ সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা আমার কিছুই নেই। তবু এটুকু বুঝতে পারি, দেশে তুমি যা করতে পারবে, বিদেশে তা পারবে না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি না, শুধু বলছি, জীবনের জন্যে নিজেকে তৈরী ক'রে নাও।"

এতক্ষণে আমি বলতে পারলাম, "তুমি কবে চলে যাচ্ছ?"

সুজান বলল, "জানি না।"

বুঝতে পারলাম, সুজান মিথ্যে বলছে।

সুজান বলল, "খুব দেরী নেই, এটুকু জানি।"

আমাকে নীরব দেখে, সুজান বলল, "তোমার বাবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কেতু।"

আমি অবাক হলাম।

"তোমার বাবাকে অনেক দিন আমি হেট করেছি। আজও বোধহয় করি। কিন্তু একটা কাজ তিনি ভালোই করেছেন। তোমাকে আমার খপ্পরে পড়তে দেন নি।"

আমি হুট করে উঠে সোজা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। এপ্রিলের টরোণ্টো। রাস্তায় শীতের বরফ জমে আছে, মাঠ বরফে শাদা, লেকের, নদীর জল জমে রয়েছে, গলবার এখনও অনেক দেরী। হিমেল হাওয়া আমাকে আক্রমণ করল। আমি ওভারকোটের কলারে কান ঢেকে বড় বড় পা ফেলে হাঁটতে লাগলাম। পথে লোকজন খুব কম, সহরের কেন্দ্র থেকে এ পাড়াটা বেশ দূরে, পায়ে হাঁটা লোক নেই বললেই হয়। গাড়ী যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে বরফ পেরিয়ে। নিয়ন আলো বরফের ওপর পড়ায় একটা নতুন ঝকঝকে আলো তৈরী হয়েছে। আমি হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার পর রাস্তা পেরিয়ে এক সময় দেখতে পেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় পৌঁছে গেছি। অদূরে ক্যুইনস কলেজ। চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে ও দুঃখে আমার মন ভ'রে গেল। শালারা আমাকে পড়তে দিল না, দাঁতে দাঁত কেটে বলে উঠলাম আমি, তোদের নিয়ম না-মানার জন্যে আমার পড়াশোনা বন্ধ হ'য়ে যাবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী খোলা, সেখানে গিয়ে ঢুকলাম। ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকরা পড়ছে, দেখে মন আরও ভারী হ'য়ে উঠল। লাইব্রেরীর বাড়ীতেই একটা

সেলফ-সার্ভিস ক্যানটিন, সেখানে ঢুকে এক পিয়ালা কফি নিয়ে কোণের একটা চেয়ারে বসলাম, যাতে কারুর সঙ্গে কথা বলতে না হয়। সুজান জানিয়ে দিয়েছে সে চলে যাচ্ছে, আমার জীবন থেকে, অনেকের জীবন থেকে। সুজান চলে গেলে আমার দুঃখ হবে না বেশি, কিন্তু বড় একা লাগবে, আজ কতোদিন হ'য়ে গেল, ভাল-মন্দ মিলিয়ে, সুজানই আমার একমাত্র বন্ধু। তবু আমি জানতাম আমাদের সম্পর্ক শেষ হ'য়ে এসেছে, এবং তাতে আমার বরং হালকাই মনে হচ্ছিল নিজেকে, মুক্তি আমিও চাইতে শুরু করেছিলাম। সুজান কি তা বুঝতে পারে নি? পেরেছে নিশ্চয়। সেজন্যেই কি সুজান সব ছেড়ে চলে যাচ্ছে? না কি আমি আমার নিজেকে বড় বেশি ক'রে দেখেছি? সুজান চলে যাচ্ছে শুধু এ জন্যে যে একটা নাটক শেষ, যবনিকা প'ড়ে গেছে, দর্শকরা একে একে উঠে পড়েছে, আর ব'সে থাকার মানে নেই, বসে থাকা কিসের জন্যে? জীবনটাতো একাধিক নাটক, একের পর এক, এক নাটক শেষ হলে বিরতি, তার পর অন্য নাটকের শুরু। ক'জনের জীবনে একের পর আসে অন্য নাটক, ক'জন সইতে পারে অনেক নাটকের জুলুম? আমার দেশে, ভারতবর্ষের, কি জীবন একটানা একই নাটক নয়? দৃশ্য পর্যন্ত বদলাতে চায় না সে নাটকের! সুজান এবার কোন নাট্যশালায় গিয়ে হাজির হবে? কোন ভূমিকায় হবে তার অভিনয়?

সুজানের কথা ভাবতে গিয়ে বার বার যেখানে এসে হোঁচট খেলাম তা হচ্ছে আমি। আমি কি কোনও নাটকে অভিনয় করছি? এই যে সারা আমেরিকাকে কাঁপিয়ে তুলেছে যুদ্ধবিরোধী যুব প্রতিবাদ, আমি তো তার আঙ্গিক অংশ নই। এ প্রতিবাদকে আমি শ্রদ্ধা করেছি, স্বাগত করেছি, এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য আমাকে মুগ্ধ বিস্মিত করেছে, এ প্রতিবাদ, এবং নিগ্রোদের সমান মনুষ্যত্বের দাবীর আন্দোলন, আমার মানসকে, মস্তিষ্ককে সঞ্জীবিত করেছে, আমার মধ্যে যেটুকু সৃষ্টিশীলতা আছে তাকে প্রস্ফুটিত করেছে, কিন্তু তার জন্যে কি কোনও দাম দিয়েছি আমি? আমেরিকার হাজার হাজার ছেলেমেয়ে দাম দিয়েছে, আমি তো দিই নি! আমি এদের সঙ্গে ভিড়েছি সুজান ফোর্ডকে ভালোবেসে, সুজান না থাকলে আমি তো এদের মধ্যে এসে পড়তাম না। সুজানকে ভালোবেসে আমি কি পেয়েছি, কতোখানি হারিয়েছি? যেখানে এসে পৌচেছি সেখান থেকে এগিয়ে যাবার পথ কি আছে? এগিয়ে কোথায় যাবো? জানি, আমার বাবা মা বোন অপেক্ষা ক'রে আছে আমার প্রত্যাবর্তনের, ফিরে গেলে তারা আমাকে লুফে নেবে, কিন্তু আহত, পরাজিত আমি ফিরে যাবো কোন মুখে? আর ফিরে গিয়েই কি ফিরে পাবো আমার পুরান সত্তা, সেই হারমনি যা বহুদিন, বাবা, তোমার সঙ্গে আমাকে এক তন্ত্রীতে সংযুক্ত রেখেছিল? ভারতবর্ষকে মনে হল অনেক দূরের, অনেক অতীতের স্মৃতি, তথাপি কালাতীত ভাস্বর। ভারতবর্ষ

কি আমাকে ফিরে যেতে বলছে? সেখানে অন্য নাটক, অনেক নাটক একসঙ্গে; ধীর মন্থর নাটক; ষাট কোটি মানুষের বাঁচবার অধিকারের নাটক; প্রাচীন শোষণ অন্যায় অবিচার অত্যাচারের নাটক; গভীর ও ব্যাপক প্রতারণার নাটক; এবং সেখানে সংগ্রামের নাটক, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের জটিল আদিম সংগ্রাম—খাদ্যের জন্যে, ভূমির জন্যে, শিক্ষার জন্যে, স্বাস্থ্যের জন্যে, বিচার, ন্যায়, মানবিক অধিকারের জন্যে। ভারতবর্ষের এই এপিক নাটকে কোথায় আমার স্থান, আদৌ কি স্থান আছে আমার? শোষণ-শাসন-প্রতারণার মহীরুহের কোনও এক ক্ষীণতম প্রশাখার শেষতম পত্র পল্লবে? পরভুক অনুৎপাদী বিশাল মধ্যবিত্ত মঞ্চে কোনও এক বুদ্ধিজীবি ক্লাউনের ভূমিকায় আমার প্রবেশ? অথবা ঐ দিগন্তবিস্তৃত ক্ষতবিক্ষত অবদমিত তথাপি বার বার প্রতিঘাতে অক্লান্ত সংগ্রামী মানুষের লক্ষ কোটি পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবার কোনও এক পদাতিক ভূমিকায়? কোথায় স্থান ক'রে নেব, কে ডেকে নেবে, কার ডাকে সাড়া দেব, কখন, কবে?

কম্যিউনে ফিরতে রাত এগারটা পেরিয়ে গেল। দেখলাম, সুজান তখনও ফেরে নি। অবাক হবার কিছু নেই, সুজান কখন কত রাতে ফেরে, কিম্বা না-ফেরে, তার হিসেব সে নিজেও রাখে না। সারা কম্যিউনটা নিশ্চুপ, শুধু ষ্ট্যান হকনার তাদের ঘরে বসে গীটারে মৃদু সুর তুলছে। আমার খিধে পেলেও কিচেনে গিয়ে কিছু একটা খেয়ে নেবার মত উৎসাহ নেই, অতএব শুয়েই পড়লাম। সুজানের বিছানা খালি, হয়তো সারারাতই খালি থাকবে আমাদের ঘরে অন্য যে যুগলটি থাকে, তারাও এখন ফিরে আসে নি। র‍্যাক্ থেকে আমার প্রিয় উপন্যাস "নিউ গ্রাব ষ্ট্রীট" টা তুলে নিয়ে শুয়ে শুয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। মন বসল না। কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন জানতে পারলাম, সুজান রাত্রেই নিউ ইয়র্ক চলে গেছে।

জানতে পারলাম, ডাকে সুজানের চিঠি পেয়ে। দুখানা চিঠি। একখানা আমাকে। অন্যখানা গোটা কম্যিউনকে।

"কম্যিউনের সদস্যগণ, তিন দিন আগে বাড়ীর মালিককে আমি জানিয়ে দিয়েছি, আসছে মাসের প্রথম দিনে কম্যিউনের বাড়ী আমরা ছেড়ে দেব। বাড়ীটা আমার নামে। আমি কম্যিউন থেকে বিদায় নিচ্ছি। তোমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেও।

"যদি তোমরা এ বাড়ীটা রাখতে চাও, যদি কম্যিউন চালিয়ে যেতে চাও বাড়ী-ওয়ালার সঙ্গে নতুন বন্দোবস্ত করতে হবে তোমাদের। লীজ শেষ হবার দুমাস বাকী ছিল বাড়ীওয়ালাকে দুমাসের ভাড়া দিয়ে দিয়েছি আমি। লীজ এ মাসের শেষ দিনে শেষ হ'য়ে যাবে।

"কম্যিউন ছেড়ে দিচ্ছি কেন সে কথা বলার প্রয়োজন নেই। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আন্দাজ করতে পারবে। তবে একটা বিষয়ে তোমাদের সতর্ক ক'রে দিচ্ছি। কম্যিউনের আটজন সদস্য আজ তিন মাস ধ'রে ড্রাগ পুশ ক'রে যাচ্ছে। কম্যিউনের মধ্যেই তারা বেশ কিছু হাশিস ও হেরোইন জমা করেছে। ড্রাগ নিয়ে আমার মতামত গৌণ। তবে জানতে পেরেছি পুলিশ টের পেয়ে গেছে। সম্ভবত দুচারদিনের মধ্যেই কম্যিউনে হানা দেবে।

"তোমাদের প্রত্যেকের শুভ কামনা করি। সুজান ফোর্ড।"

সুজান আমাকে লিখেছে: "কেতু, তুমি বুঝতে পেরেছ, আমি চলে যাচ্ছি। তোমার কাছ থেকে সামনা সামনি বিদায় নেওয়া সাহসে হ'য়ে উঠল না। চলেই যখন যাচ্ছি তখন বিদায় এক রকম ক'রে নিলেই হল।

."কোথায় যাচ্ছি? আমি চলে যাচ্ছি আমেরিকার অন্য সীমান্তে। কালিফোর্নিয়ায়, শহরে নয়, গ্রামে। মেক্সিকোর সীমান্তে। সেখানে সীজর সাভাজের নেতৃত্বে ক্ষেত্র মজুরদের একটা বিরাট আন্দোলন গড়ে উঠেছে। ক্ষেত মজুরদের মতো দরিদ্র ও শোষিত লোক আমাদের দেশে আর নেই। তারা সংখ্যায় কয়েক লক্ষ। শাদা, কালো, তামাটে। তারা সামান্য মজদুরীর জন্যে রোজ দশ বারো ঘণ্টা পরিশ্রম করে। পুরুষের সমান খাটে মেয়েরা, শিশুরাও। ক্ষেত মজুরদের য়ুনিয়ন তৈরী করতে দেওয়া হ'ত না। মিনিমাম ওয়েজ আইনে একটা আছে বটে, কেউ পায় না। বাসের জন্যে বস্তি তৈরী ক'রে দেয় মালিকরা—তাতে পাইখানা পর্যন্ত নেই। ক্ষেত মজুরদের অধিকাংশ প্রায় নিরক্ষর, একশ জনের মধ্যে ষাটজন অসুস্থ। এদের কথা কোনও আমেরিকান সংবাদপত্র রিপোর্ট করে না, মিডিয়া জগৎ থেকে এরা নির্বাসিত। এদের শোষণ করে কোটি কোটি ডলার লুটছে ইউনাইটেড ফ্রুটস্ এবং আরও দশটা বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠান। ইউনাইটেড ফ্রুটস লাতিন আমেরিকায় তিনটে ডিকটেটরশিপকে পুষছে।

"সীজর সাভাজ ক্ষেত মজদুরদের মধ্যে নতুন প্রাণ, নতুন আশা আনতে পেরেছে। তোমাদের গান্ধীর মতো সীজার সাভাজ অহিংসায় বিশ্বাসী। তার দৃঢ় ধারণা, সশস্ত্র বিদ্রোহে আমেরিকার শোষিতের দল সাম্রাজ্যবাদের কাছে হেরে যেতে বাধ্য। সীজার সাভাজ ক্ষেত মজুরদের দিয়ে সার্থক হরতাল করিয়েছে। সবচেয়ে দুরবস্থা আঙুর ক্ষেতের মজদুরদের। য়ুনিয়ন করার জন্যে দশ হাজার মজদুরের কাজ চলে যায়। সাভাজ-সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আঙুর বয়কটের আন্দোলন গড়ে তোলে। শুনে অবাক হবে, নিউ ইয়র্ক শহরে আমরা পিকেটিং করার সঙ্গে সঙ্গে আঙুর বিক্রী প্রায় বন্ধ হ'য়ে যায়। আরও অনেক শহরেও জনসাধারণ আঙুর কেনা ছেড়ে দেয়। ফলে,

মালিকরা আঙুর ক্ষেতের মজদুরদের য়ুনিয়ন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। য়ুনিয়নের দাবীগুলিও একে একে মালিকরা মেনে নিচ্ছে।

"গ্রেপ-ওয়ার্কারদের প্রদর্শিত পথে পা বাড়িয়েছে আরও হাজার হাজার ক্ষেত মজদুর। আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে দারিদ্র ও শোষিতরা নিজেদের শক্তিতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে।

"সীজর সাভাজের লোক চাই। আমি যাচ্ছি তার কাছে। তার সংগ্রামের পদাতিক হ'য়ে।

"কতদিন তার সঙ্গে কাজ করতে পারবো, জানিনে। এখন ভাবছি, বছরের পর বছর। ভাবছি, আর ফিরবো না শহরে। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করিনা আমি। আগামীকালের পর আর ভবিষ্যৎ নেই, কেতু।

"যুব অন্দোলন, যুব-সংগ্রাম শেষ হ'য়েছে। এবার লড়বে অন্যরা। আমি লড়ুয়াদের দলে। যারাই যেখানে জীবনের জন্যে লড়ছে, আমি তাদের। তারা আমেরিকান হোক কিম্বা মেক্সিকান, কিম্বা আরব, কিম্বা ভারতীয়: আমি তাদের। তারা আমার।

"আমি তাদের নই, আমি শত্রু তাদের, যারা মানুষকে বঞ্চিত করছে, শোষণ আর প্রতারণা করছে। তারা যে দেশেই থাক, আমি তাদের বিরুদ্ধে।

"কেতু, যুব শক্তিকে বেশি বিশ্বাস করতে নেই। ভুলে যেতে পারি না, হিটলারও যুবশক্তির কাঁধে চেপে রাজদণ্ড অধিকার করেছিল! যুবশক্তি যদি হাত মেলায় সংগ্রামী শ্রেণীগুলির সঙ্গে, তবেই সে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের মিত্র।

"তোমাকে আমি এখনও ভালোবাসি, কেতু। আরও অনেকদিন বাসবো। হাফ্‌ অব ফর-এভার। তাই তোমাকে বলছি, ফিরে যাও। যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফিরে যাও। তুমি যাদের, যেখানকার সেখানে ফিরে যাও। নিজেকে উদ্ধার ক'রে নিজের ঘরে ফিরে যাও, কেতু। সুজান।"

ফিরে যাও, ফিরে যাবো, বললে তো ফেরার পথ হঠাৎ আবির্ভূত হয় না। সুজানের অনুনয় আমার মধ্যে ঐকতান তুলল; বুঝতে পারলাম, ফিরতে হবে; বুঝতে পারলাম না, কোন পথে ফিরব, কোথায়, কি উদ্দেশ্যে, কোন সেতুকে নির্ভর ক'রে এই ব্যবধান পার হ'তে পারব, পার হয়ে কোন তীরে পৌঁছব, সেখানে কি আছে আলোর প্রতিশ্রুতি? জীবনটাকে প্রতিশ্রুত উত্তাপে উজান-পেরোবার আলোকিত সম্ভাবনা?

কম্যিউন থেকে অনেকে স'রে পড়ল সুজান বিদায় নেবার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে। অনেকে সরতে রাজী হল না। ষ্ট্যান হকনার তাদের নেতৃত্ব নিল। ষ্ট্যান বলল, আমরা নতুন বীজ নিয়ে কম্যিউনকে বাঁচিয়ে রাখব।

ট্যান এসে ধরল আমাকে।

আমি তখন স'রে পড়বার জন্তে তৈরী। বললাম, "আমার দ্বারা কোনও সাহায্য হবে না তোমাদের। আমি স'রে পড়ছি।"

ট্যান বলল, "তোমার তো রুজি রোজগার নেই কিছু। কলেজ থেকেও নাম কেটে দিয়েছে। তুমি যদি কম্যিউনে থেকে পরিচালনার ভার নাও, তাহলে তোমার অন্তত খাওয়া-থাকার সমস্তাটা মিটে যায়।"

আমি বললাম, "তা হয় না। আমি কালই চলে যাচ্ছি।"

কালই চলে যাবার সংকল্পটা তক্ষুনি জন্ম নিল। মনের মধ্যে, টের পেলাম, হঠাৎ কিছু একটা জন্মাল। তার উত্তাপ প্রবাহিত হ'ল রক্তে, ধমনীর পর ধমনীতে। কোথায় যাবো, কি ক'রে দিন চলবে কিচ্ছু ঠিক নেই। শুধু ঠিক হল, বেরিয়ে পড়তে হবে। ফিরে যাবার রাস্তা তৈরী ক'রে নিতে হবে।

তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লাম। আশ্বস্ত হলাম দেখে যে পকেট একেবারে খালি নয়; চার ডলার বাহাত্তর সেন্ট রয়েছে ওয়ালেটে।

বেরিয়ে পড়ার মুখেই দেখা হল পোষ্টম্যানের সঙ্গে। আমার নামে একটা রেজিস্টার্ড চিঠি। ঠিকানা টাইপ করা। খুলে দেখলাম পঞ্চাশ ডলারের ব্যাংক-অর্ডার। সঙ্গে কোনও চিঠি নেই।

বুঝতে এক মুহূর্ত লাগল না, টাকাটা সুজান পাঠিয়েছে। সুজান জানে আমার পকেট শূন্য। সুজান আরও জানে, আমি বেরিয়ে পড়ব। পাথেয় পাঠিয়েছে যাতে না-খেয়ে রাস্তায় ঘু'রে বেড়াতে না হয়।

চোখে জ্বালা। ব্যাংক-অর্ডারটা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। তখনও চোখে জ্বালা।

পৌঁছে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে।

লাইব্রেরীর একজন কেরানী-মেয়ের সঙ্গে খানিকটা আলাপ ছিল। তার অনুমতি নিয়ে চারখানা কাগজে পার্ট-টাইম রিসর্চ এ্যাসিষ্টেন্টের কাজ প্রার্থনা করে চারটি আবেদনপত্র লিখে ফেললাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি কলেজের নোটিশবোর্ডে আবেদন-পত্র টাঙিয়ে দেবার অনুমতিও পাওয়া গেল।

কুইনস কলেজের ধারে কাছে গেলাম না।

আবেদনপত্রে তো একটা ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর দিতে হবে। কার ঠিকানা দিতে পারি চিন্তা করতে মনে একটা ঠিকানাই উদিত হল। টরোণ্টো শহরে ভারতীয় এবং বাঙালীর সংখ্যা অনেক। কিন্তু আমার বন্ধু মাত্র দুজন; মালিনী ও শৈলেশ।

মালিনী-শৈলেশ স্বামী-স্ত্রী, তাদের একটি পাঁচ বছরের ছেলে আছে, তার নাম অনল। মালিনী-শৈলেশের ঠিকানা ও ফোন নম্বর শুধু আবেদন পত্রেই দিয়ে দিলাম না, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে দেড় মাইল হেঁটে তাদের এ্যাপার্টমেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে বেল টিপলাম।

শৈলেশ দরজা খুলল। শৈলেশ খুব প্রয়োজন না হ'লে কথা বলে না। এমন নীরব মানুষ আমি আর দ্বিতীয় দেখি নি। শুধু একটা বিষয় শৈলেশকে কিছুটা উত্তেজিত করে। ক্রিকেট। আমার মতো শৈলেশও ক্রিকেট পাগল। কানাডায় ক্রিকেট বিশেষ পাত্তা পায় না: আমেরিকান প্রভাবে কানাডার ক্রীড়া-জগতে ক্রিকেট সম্মান পেতে পারে নি। মনে আছে, একবার এম-সি-সি আর ওয়েস্ট ইনডিস টেষ্ট খেলার সময় শৈলেশ আর আমি তিন মাইল বরফ ভেঙ্গে শীতে কাঁপতে কাঁপতে হাজির হ'য়েছিলাম নিকটতম নিউজ ষ্টাণ্ডে যেখানে বিলিতী খবরের কাগজ রোজ পাওয়া যায়। সারা পথ আমি টেষ্ট-খেলার ইতিহাস মুখস্ত ব'লে গিয়েছিলাম, শৈলেশ সবশুদ্ধ পাঁচবার মুখ খুলে ছিল। অত বেশি কথা বলতে তাকে আর কখনও দেখি নি।

দরজা খুলে শৈলেশ একটু হাসল। অর্থাৎ বলল, তোমাকে দেখে দারুণ খুশি হ'য়েছি, এসো এসো ভেতরে এসো।

আমি ঘরে ঢুকেই বললাম, "মালা কোথায়?"

শৈলেশ নীরব। বোঝা গেল মালিনী বাড়ী নেই; কোথায় গেছে শৈলেশ জানে না।

শৈলেন-মালিনীর এ্যাপার্টমেণ্টে একখানা শোবার ঘর, একটা বসবার ঘর, টয়লেট, রান্নাঘর। পুরানো ফার্নিচার দিয়ে সাজান। বসবার ঘরের সোফাসেটের আপহোলষ্ট্রী ছিঁড়ে গেছে। একটা বিহারী তাঁতের বেড-কভার দিয়ে বড় সোফাসেটটার ব্যাকরেষ্ট মালিনী ঢেকে রেখেছে। শোবার ঘরের ডবল-বেডটাও সস্তায় কেনা। ম্যাট্রেসটা বড় বেশি নরম। নড়লে চড়লে বিছানা থেকে গড়িয়ে প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা।

ধরাচূড়া ছেড়ে আমি বসবার ঘরে সোফাতে দেহটাকে স্থিত করেছি, শৈলেশ একটা প্লেটে একখানা বীফ-স্যাণ্ডউইচ নিয়ে সামনে দাঁড়াল। আমার মুখ দেখে বুঝতে পেরেছে পেটে কিছু পড়ে নি। আমি স্যাণ্ডউইচটা তুলে নিয়ে একবার কামড়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কোক আছে?"

শৈলেন ফ্রীজ থেকে দুটো বীয়র-ক্যান নিয়ে এল।

খেতে খেতে শৈলেশকে আমার সিচুয়েশনটা বললাম।

সুজান চলে গেছে আমার জীবন থেকে একেবারে এ খবরটা শৈলেশ শুনলো চোখ বড় ক'রে। কমিউন ছেড়ে দিয়েছি শুনে বাঁকা হাসল। রোজগারের সন্ধান শুরু

করেছি শুনে কপালে তার সাতটি রেখা একসঙ্গে দৃষ্ট হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে আবেদন লিপি পটকে দিয়েছি শুনে মাথা নেড়ে অনুমোদন জানাল। সুজানের পাঠান ডলারের ব্যাংক-অর্ডারটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি শুনে চোখ কপালে তুলল। পকেটে চার ডলার সম্বল শুনে নিঃশব্দে হাসল। খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা নেই শুনে প্রথম কথা বলল, "এখানে চ'লে এসো।"

আমি জানি মালিনী-শৈলেশেরই কষ্ট ক'রে মাস কাটে। মালিনী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউটর ছিল। শৈলেশ কাজ পেয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। মালিনীই প্রথম টরোণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে চ'লে আসে ডক্টরেট করবার জন্যে। ইষ্টার্ণ ফিলজফিতে। ফেলোশিপ পায় নি, কিন্তু টিচিং অ্যাসিস্টেন্টসীপের আশ্বাস পেয়েছিল। ইনিভারসিটিতে ভর্তি হবার পর ডিপার্টমেণ্ট থেকে একজন মালিনীকে টীচিং এ্যাসিষ্টেন্টসীপ দেওয়ার প্রস্তাবে আপত্তি ক'রে বসে। টরোণ্টোর বা নর্থ আমেরিকার এম. এ. ডিগ্রী না থাকলে নাকি এখানকার কোনও কলেজে টীচিং এ্যাসিষ্টেন্ট হওয়ার নিয়ম নেই। মালিনী এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে ভেঙ্গে প'ড়েছিল। টি. এ. হ'তে না পারলে নিজের পড়ার জন্যে মাইনে দিতে হবে; নিজের ভরণ পোষণের খরচ তো আছেই। এই সংকট সময়ে মালিনীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। নিজের বিপদের কথা বলে কেঁদে ফেলেছিল মালিনী। আমার রক্ত টগবগিয়ে উঠেছিল। আমি মালিনীর সঙ্গে তার নতুন নেওয়া এক ঘরের বাসস্থানে এসে ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানের লেখা চিঠিগুলি পড়েছিলাম। মালিনীর লেখা চিঠির কপিগুলিও। চিঠিগুলি নিয়ে সেদিনই আমি আমার ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানের কাছে হাজির। তখনও ক্যুইনস কলেজে আমার জাত যায় নি। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. এবং কলেজ ফেলো; আমাকে তখন সবাই একটু নেক-নজরে দেখত। আমার চেয়ারম্যানকে বলেছিলাম, "দশ বারো হাজার মাইল থেকে একটি মেয়েকে পরিষ্কার আশ্বাস দিয়ে যাঁরা এখানে নিয়ে এসেছে, তাঁদের কি এভাবে কাজ করা উচিত?"

চেয়ারম্যান লোকটা খারাপ নয়, তবে ভীষণ ভীরু, কোনও গোলমালে থাকতে চান না। প্রথম তিনি "আমি-কি-করতে-পারি-বলো-আমি-বড়-দুঃখিত" ব'লে ব্যাপারটা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। আমি নাছোড়বান্দা হ'য়ে বলেছিলাম, আপনি যদি একটু সাহায্য না করেন, এ মেয়েটির ভীষণ বিপদ ঘটে যাবে। আমি ওকে নিয়ে সরাসরি য়ুনিভারসিটির প্রেসিডেন্টের কাছে চলে যাবো। আমি জানতাম আমার চেয়ারম্যান ফিলজফির চেয়ারম্যানের বন্ধু। অবশেষে তিনি ফিলজফির চেয়ারম্যানকে কিছু বলেছিলেন। মালিনী টীচিং এ্যাসিষ্টেন্টশিপ পেয়ে গিয়েছিল, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকৃষ্টতম কলেজে। টি. এ.⋯দের পড়তে মাইনে লাগে না। বছরে

চার হাজার ডলার মাইনে। মালিনী শৈলেশকেও নিয়ে এল টরোন্টোতে। শৈলেশ ইতিহাসের লেকচারার ছিল যাদবপুরে। টরোন্টো য়ুনিভারসিটিতে পি-এইচ-ডি করছে, সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রজেক্টে কাজও। যা মাইনে পায় তাতে ওর নিজের পড়ার বেতনই পুরো হ'য়ে ওঠে না। অর্থাৎ শৈলেশকে পুষছে মালিনী। অনলের সব খরচও মালিনীকেই সামলাতে হচ্ছে।

আমি বললাম, "আমাকে পোষার ক্ষমতা তোমাদের নেই।"

শৈলেশ শ্রাগ করল। অর্থাৎ বলল, বোঝার ওপর শাকের আঁটি।

আমি বললাম, "মালিনীকে আসতে দাও।"

শৈলেশ ঈষৎ হাসল। সে জানে, মালিনী কি বলবে।

শৈলেশ খুব কম কথা বলে, কিন্তু ভীষণ ভাল শ্রোতা। আমি কম্যিউনের কথা বলতে লাগলাম। শৈলেশ খুব মজা পেয়ে শুনে গেল।

এক এক ঘরে দুটি ক'রে যুগলের শোবার ব্যবস্থা বর্ণনা ক'রে আমি বললাম, "দু এক দিনের মধ্যেই কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজ হ'য়ে গেল। এক যুগল প্রেম করার সময় অন্য যুগলের উপস্থিতি ভুলে যেত। আবার এমনও শুনেছি, এক যুগলের প্রেম-করা অন্য যুগলকেও কামার্ত ক'রে তুলত। শেষ পর্যন্ত সবাই ব্যবস্থাটাকে খুব পছন্দ ক'রে ফেলেছিল।"

শৈলেশ এবার কথা বলল: "আমাদের দেশে গ্রামে, বস্তিতে, মানে, সাধারণ মানুষের সংসারে, এ ব্যবস্থাই চালু।"

আমি যুব-বিদ্রোহ বিষয়ে সুজানের শেষ বিশ্লেষণ শৈলেশকে শোনালাম।

শৈলেশ মাথা নেড়ে জানাল, সুজান ঠিকই বলেছে।

সুজান সাঁজর সাভাজের সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছে শুনে শৈলেশের চোখ দুটো চিক-চিক ক'রে উঠল। উঠে, বুক সেল্‌ফ্‌ থেকে একখানা বই এনে আমাকে দিল। বইটার নাম "সাঁজর সাভাজ"।

শৈলেশ আবার কথা বলল, "এ গ্রেট ম্যান"!

টেলিফোন বাজল।

শৈলেশ উঠে গিয়ে শোবার ঘরে টেলিফোন ধরল।

শুনতে পেলাম, মিনিট খানেক শৈলেশ হুঁ, হুঁ ক'রে গেল। অবশেষে বলল, "কেতু এসেছে।" একটু পরে বলল, "কেতু ক'দিন আমাদের কাছে থাকবে।" তারপর আরও অনেকক্ষণ নিঃশব্দে মালিনীর কথা শুনে গেল।

বসবার ঘরে ফিরে এসে শৈলেশ বলল, "চল"।

"কোথায়?"

"তোমার জিনিষপত্র নিয়ে আসা যাক।"

"মালিনী কি বলল ?"

শৈলেশ মৃদু হাসল।

"জিনিষ পত্রের মধ্যে তো একটা স্যুটকেস আর এক রাশি বই !"

শৈলেশ বলল, "একটা টি. ভি. সেট ! একটা ষ্টেরীও।"

"টি. ভি. সেটটা গেছে। কম্যিউনের চারটে ছেলে মাতাল হ'য়ে ওটাকে টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙ্গেছে। ষ্টেরীওটা স্নুজানের পরিচিত একটি মেয়ের কাছে। একদিন রেকর্ড বাজাবে ব'লে ধার করল, আর ফেরৎ আসে নি।"

আমার "জিনিষ-পত্র" নিয়ে দুজনে যখন ফিরে এলাম, তখন মালিনী ও অনল দুজনেই বাড়ী এসে গেছে। অনল টিফিন খেয়ে মেকানো নিয়ে ব'সেছে এরোপ্লেন বানাতে। মালিনী বসবার ঘরে ব'সে টেলিভিশন দেখছে।

দরজা খুলে আমাকে দেখেই মালিনী চেঁচিয়ে উঠল, "আয়, শালা, আয়।"

আমি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, "ক'দিন পরেই বলবি, "ভাগ, শালা, ভাগ।"

মালিনী আমার চেয়ে বছর দু'একের বড়, শৈলেশ চার বছরের। মালিনী আর আমি তুই-তুকারি ক'রে থাকি, শৈলেশ এত কম কথা বলে যে একে কিছুতেই 'তুই' বলা যায় না।

মালিনী কফি তৈরী করল। কফি খেতে খেতে শুনল আমার কথা।

"মাস ছ'এক তোর কোনও খবর নেই," মালিনী বলল, "দু তিনবার ফোন করেছি।"

"কারুর সঙ্গে দেখা-করার মন-মেজাজ ছিল না," আমার কৈফিয়ৎ।

"তুমি একটা আস্ত এস-ও-বি," বলল মালিনী।

আমি বললাম, "দু'এক সময় তুই ঠিক কথা বলে থাকিস।"

"তাহলে তোর একটা কাজ চাই, কি বলিস ?" মালিনীর প্রশ্ন।

"চাই, এবং আজই, এক্ষুনি।"

"বাসন ধু'তে রাজী আছিস ?"

"নিউ ইয়র্কে একদিন ধুয়েছিলাম। ম্যানহাটানে, ব্রডওয়ের ওপর, মহারাজা রেস্তোঁরায়। অন্ততঃ দুহাজার প্লেট, দুহাজার গেলাস। পরের দিন আর যাই নি। গা-হাত-পা'র ব্যথা সারতে এক সপ্তাহ লেগেছিল।"

"একদিনের মাইনেটা ?"

"পেয়েছিলাম। পনের ডলার।"

"টরোন্টোয় অত দেবে না। বড় জোর দশ ডলার। রাজী আছিস ?"

"আছি। অন্তত এক সপ্তাহের জন্তে। চল, নিয়ে চল।"

মালিনী হেসে উঠল, "সপ্তাহ খানেক খেয়ে ঘুমিয়ে একটু চাঙ্গা হ'য়ে নে। চেহারাখানা কি করেছিস তাকিয়ে দেখিস ?"

"আয়নার সামনে দাঁড়ালে চোখ ফেরাতে পারিনে", আমি বললাম।

"কাকে দেখতে পাস কে জানে। নিজেকে নিশ্চয় নয়।"

"তোর চাকরীটা আছে ?" আমার প্রশ্ন।

"নিশ্চয় !" মালিনীর জবাব।

"অত জোর দিয়ে বলছিস যে !"

"এ বছর গেলে আর থাকবে না, তাই।"

"তখন কি হবে ?"

"আরে শালা, আমার তো আরও আট মাস চাকরী আছে! তোর এখন কি হবে তাই ভাব আগে।"

"চাকরী হবে।"

"হবে ?"

"নিশ্চয়।"

"পড়াশোনা ?"

"তাও হবে।"

"ক্যুইনস তোকে ফিরিয়ে নেবে ?"

"ক্যুইনস না নিক কিংস নেবে।"

মালিনী হটাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "আরে, কেতু, কি সর্বনাশ! তোদের হাওয়ার্ড প্লেস টরোন্টোয়, তা জানিস ?"

"হাওয়ার্ড প্লেস !"

"হ্যাঁ। তোর কলম্বিয়ার প্রফেসর। এখানে এসেছেন একসটেনশন লেকচার দিতে।"

"তুই জানলি কি ক'রে ?"

"তোদের ডিপার্টমেন্টের সার্কুলার এসেছে আমাদের ডিপার্টমেন্টে।"

"তাই বুঝি !"

মালিনী উত্তেজিত তখনও। "কেতু, এক্ষুনি ফোন কর।"

"কাকে ?"

"কাকে আবার ? প্লেসকে !"

"কেন ?"

"দেখা ক'রে বল, তোকে কলম্বিয়ায় ভাতর ব্যবস্থা ক'রে দিক।"

"কলম্বিয়ায় ?"

"হ্যাঁ। তুই তো ফিরে যাচ্ছিস। ফিরে যা নিউ ইয়র্কে, ফিরে যা কলম্বিয়ায়, ফিরে যা দিল্লীতে।"

"মাইনে কতো জানিস ?"

"বছরে তিন হাজার ?"

"তিন হাজার দুশো।"

মালিনী এবার চুপ।

আমি বললাম, "তার ওপর খাওয়া-থাকা-বইপত্রের জন্যে বছরে আরও অন্তত তিন হাজার ছ'শ। এত টাকা কে দেবে আমাকে ?"

মালিনীর মত তুখোড় মেয়ের মুখ বন্ধ করতে পারলে আমার খুব ভাল লাগত। আজ মোটেই ভাল লাগল না।

আমার যেন কি হ'য়েছে, আবার আমার মধ্যে আর একটা কিছু হটাৎ জন্ম নিল। সেই ঠিক সকাল বেলাকার মতো! রক্ত গরম হ'য়ে উঠল। মাথাও।

"প্লেস কোথায় উঠেছে, জানিস ?"

মালিনী বলল, "তোদের ডিপার্টমেন্টে ফোন করলে এক্ষুনি জানা যায়।"

"করবি একবার ?"

ব'লেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। "না, আমিই করছি।"

ডিপার্টমেন্ট থেকে নম্বর নিয়ে আবার ডায়াল করলাম।

হাওয়ার্ড প্লেস ফোন ধরলেন। আমার নাম বলতেই চিনতে পারলেন। আমাকে অবাক ও অভিভূত ক'রে দিয়ে বললেন, "কেতু! কোথায় তুমি! আমি এসেই তোমার খোঁজ করেছিলাম। কেউ বলতে পারল না তুমি কোথায়।"

আমি শুধু বললাম, "আমি এ শহরেই আছি। আপনার সঙ্গে একবার দেখা হ'তে পারে ?"

"নিশ্চয়, কেতু," বললেন হাওয়ার্ড প্লেস, "এক মিনিট দাঁড়াও। কাল সন্ধ্যেবেলা আসতে পারবে ? খুব ভালো। সাতটা ? খুব ভাল। আমরা একসঙ্গে কোথাও কিছু খেয়ে নেব। ঠিক ? খুব ভাল। তোমার স্বর শুনে খুব ভাল লাগল, কেতু। খুব ভাল।"

মালিনী আর শৈলেশকে বললাম, "দেখলে তো! হ'য়ে গেল!"

"কি হ'য়ে গেল ?" মালিনী প্রশ্ন করল।

"কলম্বিয়ায় ভর্তি। বছরে ছ' হাজার ডলারের চাকরী। এবং কাল একটা ভাল ডিনার।"

এবার শৈলেশও সশব্দে হেসে উঠল।

সন্ধ্যের কিছু আগে মালিনী বলল, "আমি বেরুচ্ছি। তোরা তিনজন খেয়ে নিস।"

"তুই কোথায় খাবি ?" জানতে চাইলাম আমি।

মালিনা মুচকি হাসল।

একটু পরে বেরিয়ে গেল মালিনী। শৈলেশ বলল, "দেরী হবে ফিরতে ?"

মালিনী বলল, "হতে পারে।"

শৈলেশ নিজের কাজ নিয়ে বসল। আমি বসলাম অনলকে নিয়ে।

অনলের চার বছর পূর্ণ হয়েছে। বিশেষ বাড়ে নি। কিন্তু দারুণ চৌখস। মালিনীর মতই উচ্ছল।

অনল বলল, "কেতু কাকু, আমি মুনে যাচ্ছি, তা জানো ?"

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ। মুনে যাবার স্পেসশীপে সীট বুক ক'রে চিঠি লিখেছি। দেখবে ?"

অনল নিয়ে এল তার চিঠির প্রতিলিপি। লিখেছে আর কাউকে নয়, একেবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড মিলহৌস নিক্সনকে। "ডিয়ার মিঃ প্রেসিডেন্ট, টাইম ম্যাগাজিন লিখেছে প্রথম স্পেসশীপে সাধারণ যাত্রীরা চন্দ্রালোকে যেতে পারবে। আমার বয়স তখন হবে কুড়ি। আমি চাঁদে-যাওয়া প্রথম স্পেসশীপে সীট বুক করতে চাই। এখন আমার কোনও টাকাকড়ি নেই। কিন্তু রোজ আমি কিছু না কিছু জমাচ্ছি। নিশ্চয় আমার অনেক টাকা হবে। আপনি অনুগ্রহ ক'রে প্রথম চাঁদে যাওয়া স্পেস-শীপে আমার জন্যে একটি সীট সংরক্ষিত রাখবেন। ইতি অনল রায়।" পু- শ্চঃ "বলতে ভুলে গেছি আমি ভারতীয় পিতামাতার সন্তান। তার জন্যে নিশ্চয় আমার চাঁদে যাওয়া আপনি আটকাবেন না। ভারতবর্ষে ছশ' মিলিয়ন লোক আছে। তাদের মধ্যে আমি প্রথম চাঁদে পৌঁছব, যদি আপনি অনুগ্রহ করেন। আমার মা-বাবার পুরো সম্মতি আছে আমার চাঁদে যাবার। অবশ্যি, আমার মা ও বাবার শীঘ্রই ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যাবে; তখন আমি মার কাছে থাকবো। অনল রায়।"

কিছুক্ষণ পরে শৈলেশকে বললাম, একটু রাস্তায় হেঁটে আসচি। বেরিয়ে প'ড়ে হাঁটতে হাঁটতে ডাউন টাউনে গিয়ে পৌঁছলাম! অনেকগুলি সমস্যা এক সঙ্গে মনের মধ্যে তোলপাড় করছে। হাওয়ার্ড স্লেশকে কি বলব ? কলম্বিয়া য়ুনিভারসিটিতে ভর্তি হ'তে চাই ? ভর্তি হ'লেই পড়বার খরচ কোথায় পাবো ? জব পারমিট হয়তো মিলে যাবে, কিন্তু চাকরীর বাজারে যে রকম মন্দা, খুচরো কাজের চেয়ে বেশি কি জুটবে ?

য়ুনিভারসিটির কাছ থেকে ধার নেওয়া টাকা শোধ-করাই শুরু হয় নি এখনও, দ্বিতীয় ধার নিশ্চয় পাওয়া যাবে না। কাজকর্ম ক'রে নিজের খরচ হয়তো তুলে আনতে পারব, কিন্তু ভর্তি হ'তে হ'লে প্রথমেই একসঙ্গে এক সেমিষ্টারের মাইনে দিতে হবে, সে অর্থ আসবে কোথা থেকে? এ সব চিন্তায় মন আমার অন্ধকার হ'য়ে যাবার কথা, কিন্তু, কি আশ্চর্য, কে যেন মনের মধ্যে ব'সে অবিরাম উইন ক'রে চলেছে, এগিয়ে যাও, হ'য়ে যাবে! আমি এত সঙ্গত কারণ থাকতেও নিরাশ হ'তে পারছি না কেন? কেন সন্ধ্যার টরোণ্টো শহরটাকে হঠাৎ এত সুন্দর লাগছে? কেন মনে হচ্ছে, জীবনের চেয়ে বড় আর নেই কিছু; বাঁচার চেয়ে বড় এ্যাডভেঞ্চার আর কিছু নেই? মালিনী আর শৈলেশ কি ছেড়ে দিচ্ছে একে অন্যকে? আশ্চর্য ছেলে এই শৈলেশ। মালিনীর প্রাণ প্রাচুর্যের শেষ নেই। দেহের অপর্যাপ্ত যৌবন-সম্ভার। মালিনীকে দেখে চঞ্চল হয় না এমন পুরুষ বিরল। মালিনী ঠিক সুন্দরী নয়, কিন্তু এত বেশি প্রাণোচ্ছল, এত বেশি মালিনীর স্নেহ, প্রেম, করুণা, মায়া, মমতা, আকাঙ্ক্ষা, এত বেশি হাসি আর আনন্দ যে ওর উপস্থিতিই একটি বিদ্যুৎ-চকিত আকর্ষণের সৃষ্টি ক'রে দেয়। শৈলেশ শান্ত, ধীর, নীরব, সমাহিত। মালিনী ধনী ঘরের মেয়ে, শৈলেশ সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। দুজন পরস্পরকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছে বছর দু'এক আগে। বিপরীতের প্রতি বিপরীতের আকর্ষণ? বিয়ের পরেই দুজনে বুঝতে পেরেছে, ভুল হ'য়ে গেছে। শৈলেশ নিজেকে দিতে জানে না। কাউকে গ্রহণ করার ক্ষমতাও ওর নেই। শৈলেশ নিজের মধ্যে নিজে অনেকখানি সম্পূর্ণ। মালিনী অনেক দিতে চায়, চায় অনেক পেতে। দু'বছরে ওদের প্রেম শুকিয়ে স'রে গেছে, কিন্তু বন্ধুত্বটি পরিপূর্ণ বজায় আছে। ওরা দুজন দুজনকে শুধু বোঝেই না, শ্রদ্ধা করে, দুজন দুজনের আন্তরিক ভালো চায়। মালিনী শৈলেশকে টরোণ্টোতে আনিয়েছে, ডক্টরেট করবার ব্যবস্থা করেছে, শৈলেশের যাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয় তার জন্যে মালিনী সর্বদা সতর্ক। শৈলেশ জানে, মালিনীর পক্ষে পুরুষের জ্বলন্ত, দুর্বার প্রেম অপরিহার্য, সে নিজে যা দিতে পারে নি, মালিনী অন্য কারুর কাছ থেকে তা পেতে চাইলে তার কোনও আপত্তি দেখা যায় নি। শৈলেশ কোনও দিন চায় নি মালিনীকে অধিকার করতে, কোনও কিছুকে অধিকার করাই শৈলেশের চরিত্রে নেই। টরোণ্টোতে আসবার পর মালিনী অন্য পুরুষের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, শৈলেশের কাছ থেকে কিছুই গোপন করে নি, শৈলেশ নির্বিকার ঔদার্যে মালিনীর ইচ্ছে মেনে নিয়েছে। ওরা জানে, একদিন আলাদা হ'তে ওদের হবেই, মালিনী যেদিন এমন কোনও পুরুষের সন্ধান পাবে যাকে নিয়ে সে নতুন ক'রে ঘর পাততে চায়, শৈলেশ সেদিন স্বেচ্ছায় স'রে যাবে মালিনীর পথ পরিষ্কার ক'রে। তেমন পুরুষ, আমি যতদূর জানি, যানে,

ছ'মাস আগেও যা জানতাম, মালিনীর জীবনে এখনও আসে নি। তার মানে মালিনী চায় শৈলেশের ডিগ্রীটা হ'য়ে যাক, যাতে জীবনে সে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে।

মালিনী-শৈলেশকে আমি দুবছর জানি, এই দীর্ঘকালে ওদের সঙ্গে আমার আন্তরিক বন্ধুত্ব তৈরী হ'য়ে গেছে। সুজানকে নিয়ে অনেকবার মালিনীর বাড়ীতে এসেছি আমি, খেয়েছি, গল্প করেছি; মালিনী-শৈলেশও কমিউনে এসেছে অনেকবার। আমার কথা সবই ওরা জানে। কোনও দিন ওরা আমাকে তিরস্কার করে নি, বুঝিয়ে সুঝিয়ে সংশোধন করতে চায় নি। বাবা, তোমার, মার, মিতুর কথাও মালিনী-শৈলেশের কিছু অজানা নেই। শৈলেশ তো প্রায় কথাই বলে না, মালিনী আমার দ্বন্দ্ব আর সংকটের সময় বার বার বলেছে, "কেতু, জীবনের দাবী দিনদিন কঠিন হ'য়ে উঠছে। দাবী না মিটিয়ে রেহাই নেই। জীবন কার কাছ থেকে কোন মাশুল আদায় করে নেয় কেউ বলতে পারে না। তুই চলছিস তোর নিজস্ব বেগে, চলতে চলতে যেখানে গিয়ে পৌঁছুবি তাই তোর বন্দর। এক বন্দর থেকে অন্য বন্দর, এই হল জীবনের নিয়ম। যাদের জীবনে বন্দর পরিক্রমা নেই তারা কি ক'রে বুঝবে তোর আমার জীবন রহস্য?"

মালিনী সন্ধ্যের আগেই কোথায় গেল, কার কাছে গেল, আমিও জানি, জানে শৈলেশও, অনলও। মালিনী গেছে অস্কারের কাছে। অস্কার আরনল্ড, পৃথিবীর ভাস্কর্য-গগনে অন্যতম জ্যোতিষ্ক। অস্কার আরনল্ড ইংরেজ পিতামাতার সন্তান, বারো বছর বয়সে তার তৈরী পাথরের ভাস্কর্য পশ্চিম য়ুরোপকে বিস্মিত ক'রে ছিল। সেই থেকে অস্কার আরনল্ড ভাস্কর্য-নন্দনের "প্রডিগেল সন"। ত্রিশ বছর বয়সে অস্কার আরনল্ড ভাস্কর্য-জগতের "ওয়াণ্ডার এ্যাণ্ড টেরর।" কোপেনহাগেনে তার তৈরী শতের ফুট দীর্ঘ "ম্যান দ' ভিক্টিম" দর্শকদের বুকে ত্রাস ও শঙ্কা এনে দিয়েছিল; পাথর কেটে আর খোদাই ক'রে অস্কার এমন একটি পুরুষের মূর্তি তৈরী করেছিল যার প্রতিটি অঙ্গে, শিরায়-উপশিরায়, চোখে, মুখের ভঙ্গিতে, কপালে এবং কেশে বর্তমান যুগের মানুষের বিপন্ন আত্মা বিমূর্ত হয়ে উঠেছিল। সমালোচকরা বলেছিল, মিখেল-এঞ্জেলোর ডেভিডের পরে এমন আশ্চর্য সুন্দর পুরুষ-মূর্তি আর কেউ তৈরী করতে পারে নি। ডেভিডের মুখে-চোখে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে মিখেল-এঞ্জেলো মানুষের গড়া সভ্যতার প্রতি যৌবনের গভীর সন্দেহ ও দৃঢ়মূল প্রত্যাখ্যান ফুটিয়ে তুলেছিলেন। অস্কার তার পুরুষের মধ্যে সভ্যতার অত্যাচারে বিপন্ন মানুষের শংকা, আতংক, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ একসঙ্গে বিমূর্ত করেছিল। তারপর থেকে এমন কোনও পশ্চিম য়ুরোপীয় দেশ নেই যার রাজধানীতে অস্কারের তৈরী অন্তত একটি ভাস্কর্য স্থান পায়নি। তিনবছর আগে অস্কার আরনল্ডকে নিউ ইয়র্কের রকেফেলার

ব্রাগার্স ফাউণ্ডেশন আমেরিকায় নিয়ে আসে। অস্কার প্রথম কমিশন পায় নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে লোয়ার ম্যানহাটানের সংস্কার ও পুনঃগঠনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে দুটি মূর্তি তৈরীর। তার মধ্যে একটি স্থাপিত হবে ব্যাটারী পার্কে, যেখান থেকে ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি প্রত্যেকের চোখে পড়ে। অস্কার তৈরী করল একটা বিরাট নিগ্রো পুরুষ, যার মুখে আমেরিকার দু'শ বছরের বেদনা পুঞ্জীভূত, যার মাংস-পেশীতে দুশো বছরের মুক্তি-সংগ্রাম বিঘোষিত। মূর্তিটি প্রশংসা পেল বিস্তর, আবার নিন্দাও কুড়ল অনেক। অস্কারের দ্বিতীয় শিলাকৃতি তার মার্কিন-প্রবাস খতম ক'রে দিল। এই মূর্তিটিতে, সবাই একস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, অস্কার আরনল্ড আমেরিকাকে দেখিয়েছে বিশ্বগ্রাসী রণ-উন্মাদ ক্ষমতা-মাতাল মহাশক্তির রূপে। অস্কার আরনল্ড হ'য়ে উঠল যুদ্ধ বিরোধীদের শিল্পী-দেবতা। এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-সমর্থকদের এবং শাসককুলের বিরাগভাজন। আর কোনও কমিশন সে পেল না! তার তৈরী মূর্তি দুটিও স্থাপিত হল না লোয়ার ম্যানহাটানে। পশ্চিম য়ুরোপেও অস্কার আরনল্ডের খ্যাতিতে ভাটা পড়ল। তার অসামান্য প্রতিভা অস্বীকৃত হল না, নিন্দিত হল প্রতিভার ব্যবহার কোনও একটি বিশেষ ইডিওলজি ও আন্দোলনের সমর্থনে।

এ সময়টা কানাডায় নতুন জাতীয়তাবাদ প্রস্ফুটিত হল, যার উদ্বেলিত তরঙ্গে চেপে ক্রডো প্রধানমন্ত্রী হলেন। কানাডিয়ান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে মার্কিন প্রভাবে ও নেতৃত্বে তৈরী। এই প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে ক্রডোর প্রচেষ্টায় টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অস্কার আরনল্ডকে কলেজ অব আর্টসে ভাস্কর্যের অধ্যাপক নিযুক্ত ক'রে বসল। অস্কার চলে এল কানাডায়।

কয়েক মাসের মধ্যেই অস্কার আরনল্ড বুঝতে পারল, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের কাছে সে মোটেই প্রিয় নয়। কলেজে অধ্যাপনা ছাড়া কোনও কমিশন সে পেল না। তবু টরোন্টোর অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশ অস্কারের ভাল লাগল। অধ্যাপনার বাড়তি সময়ে নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগল অস্কার। এরই মধ্যে একদিন অস্কারের সঙ্গে মালিনীর পরিচয় হ'য়ে গেল। অস্কারের খ্যাতি মালিনীকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল কলেজ অব আর্টসে, অস্কারের স্টুডিয়োয়। প্রথম দৃষ্টিতে অস্কার মালিনীর প্রতি আকৃষ্ট হল। কয়েক মিনিট আলাপের পরই বলে বসল, "আপনি যে-কোনও ভাস্করের স্বপ্ন।"

মালিনীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল : "আপনি যে কোনও নারীর মহানির্বান।"

শিল্পীর স্বপ্ন ও নারীর মহানির্বান আকাঙ্খা সংযুক্ত করল অস্কার ও মালিনীকে। তিন মাস পরে অস্কার মালিনীর প্রতিমূর্তি তৈরী করতে লেগে গেল, শেষ হল সাইত্রিশ দিনে। নাম দিল, "অ' স্কাল্প্টারস ড্রীম।"

মালিনী অস্কার আরনল্ডের প্রেমিকা হল কাউকে পরোয়া না ক'রে, যেন এ জন্যেই সে প্রতীক্ষা করছিল সারা জীবন। শৈলেশ খুব সহজ ভাবেই মেনে নিল মালিনীর এই দুরন্ত দুর্বার অভিযান। মালিনী অস্কারের প্রেমে ভেসে গেল, কিন্তু শৈলেশের প্রতি তার মমতার ঘাটতি পড়ল না। অস্কারের সঙ্গ পেয়ে মালিনী নতুন ক'রে বার বার প্রস্ফুটিত হ'তে লাগল; তার অন্তরে রক্তের প্রবাহে নতুন নতুন তাণ্ডব বিস্ফোরণের কথাগুলির সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও নীরব শ্রোতা হল শৈলেশ।

একদিন মালিনী আমাকে বলেছিল, "জানিস, কেতু, একটা মানুষ যে কতো বিচিত্র কতো গভীর, কতো বিরাট, তা সে জানতে পারে কেবল ভালোবেসে। এক একটা প্রেম এক এক নবতর জগতের দুয়ার খুলে দেয়। অস্কারকে ভালোবেসে, অস্কারের ভালোবাসা পেয়ে আমি যেন সৃষ্টির মতোই মহান ও রহস্যময় হ'য়ে গেছি।"

আমি বলেছিলাম, "যেদিন এ নাটক শেষ হবে ?"

"সে শেষটাও নিশ্চয় হবে বিরাট ও মহান।"

"অস্কারকে তুই বিয়ে করবি ?"

"পাগল ! অস্কার কি কারুর স্বামী হবার জন্যে জন্মেছে ?"

"শৈলেশকে দেখে আমি অবাক হ'য়ে যাই," বলেছিলাম আমিও।

মালিনী বলেছিল, "শৈলেশের মত লোক হয় না। ওর অস্তিত্বের সবটুকুই মস্তিষ্ক। এমন র‍্যাশনাল লোক দ্বিতীয় দেখি নি। যুক্তি ছাড়া ওর হৃদয় আর কিছু মানে না।"

"ওর কোনও বান্ধবী নেই ?"

"একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব হ'য়েছিল।"

"ভেঙ্গে গেল ?"

"এমন র‍্যাশনাল ও নীরব পুরুষ নিয়ে কোন মেয়ের মন ভ'রে, বল ?

"অনেক মেয়ে তো নীরব পুরুষ পছন্দও ক'রে।"

"শৈলেশের বাইরেটাই শুধু নীরব নয়, ভেতরটাও। ওর যা কিছু কথাবার্তা, কেবল নিজের সঙ্গে।"

"তুই ওকে ভালোবেসেছিলি কি ক'রে ?"

"শৈলেশকে এখনও আমি ভালোবাসি। ওর মত মন বেশি লোকের নেই। আকাশের মত বিরাট ও স্বচ্ছ ওর মন।"

মালিনী শৈলেশের বিধবা মাকেও ভালোবাসে। বছর খানেক আগে শাশুড়ীকে লিখেছিল, শৈলেশের সঙ্গে ঘর করা ওর পক্ষে আর বেশিদিন সম্ভব হবে না। কেন, তাও লিখেছিল সবিস্তারে।

উত্তরে শাশুড়ী লিখেছিলেন, "তুমি যা লিখেছ আমি তা আগেই জানতাম।

শৈলেশ এমন পুরুষ নয় যাকে নিয়ে কেউ ঘর বাঁধতে পারে। তোমরা যদি আলাদা হ'তে চাও, আমার কিছু বলার নেই। তোমার পত্রের প্রতিটি ছত্রে শৈলেশের প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধা সুস্পষ্ট। তোমাদের মধ্যে যদি বন্ধুত্ব বজায় থাকে, অনলের ভবিষ্যৎ খুব খারাপ হবে না। তুমি যাই করো, আশীর্বাদ থাকবে তোমার সঙ্গে।"

মালিনী অনলকেও বুঝিয়ে বলেছিল, একদিন তার মা ও বাবা আলাদা হ'য়ে যাবে। অনল থাকবে মার কাছে। বাবার কাছেও মাঝে মাঝে থাকবে। অনল অনেক প্রশ্ন করেছিল। মালিনী যতদূর সম্ভব সততা ও প্রাঞ্জলতার সঙ্গে প্রশ্নগুলির জবাব দিয়েছিল।

অনল রিচার্ড মিলহৌস নিকসনকে খুব সহজ ভাবেই লিখেছিল যে তার বাবা ও মা একদিন আলাদা হ'য়ে যাবে।

অনলের কথা মনে নিয়েই আমি একটা রেঁস্তোরায় ঢুকে পড়লাম।

"ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হ'তে পারে?" প্রশ্ন করলাম একজন ওয়েটারকে। সে এক কোণে বসা একটা লোককে দেখিয়ে দিল।

বিরাট মোটা একটা লোক। চেহারা দেখে মনে হল, গ্রীক।

"কোনও কাজ আছে আপনার এখানে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

ঘোৎ ক'রে আওয়াজ হল, "নেই।"

"কোনও কাজ নেই?"

লোকটা এবার তার ঘোলাটে বেড়াল চোখ তুলে আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিল।

"ছাত্র?"

"হ্যাঁ।"

"ইণ্ডিয়ান?"

"করেক্ট।"

"যে কাজ আছে তা তোমার দ্বারা হবে না।"

"ডিস্-ওয়াশিং?"

"পারবে?"

"নিশ্চয়।"

লোকটা আবার আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিল।

"ঘণ্টায় আড়াই ডলার।"

"কবে থেকে চাই?"

"এক্ষুনি লেগে যেতে পার? এ কাজে কেউ টিকে থাকে না। তোমার মত

ছাত্র-ছোকরারা দু সপ্তাহ পরেই পালায়। নিগ্রোটিগ্রো হলে মাস দু'মাস টিকে যায়।"

"পর্শু থেকে আসব।"

"কাল থেকে নয় কেন ?"

"কাল একজন ডিনারে ডেকেছে।

"তাই এসো।"

"চার ঘণ্টার বেশি পারবো না।"

"চার ঘণ্টারই মাইনে পাবে।"

"খাবার পাবো ?"

"পাবে, যদি পাঁচটার মধ্যে এসে যাও।"

"আমার নাম ও কোন নম্বর দিয়ে যাবো ?"

"আগে এসো তো পর্শু, তখন ওসব হবে।"

নিজেকে আরও হালকা মনে হল। মালিনার ওপরে দু বেলা খেতে হবে না। রোজ দশ ডলার রোজগার, দু সপ্তাহ কাজ করলে এক মাসের খরচ উঠে আসবে। ততদিনে নিশ্চয় একটা কাজ পেয়ে যাব।

বাড়ী ফিরে শৈলেশ আর আমি ডাল ভাত বাঁধাকপির তরকারী খেলাম। অনন্ত তখন শুতে চলে গেছে।

শৈলেশকে বললাম, "চলো একটা মুভী দেখে আসি।"

শৈলেশ চোখ দিয়ে প্রশ্ন করল।

উত্তরে বললাম, "ডাচ।"

শৈলেশ রাজী হল। আমরা মাইল খানেক হেঁটে একটা সিনেমা-হল পেলাম। দেখলাম, আমার পছন্দের মুভী দেখান হচ্চে। "ইক।" ঢুকে পড়লাম।

বাড়ী ফিরতে সাড়ে বারোটা। মালিনী তখনও ফেরে নি।

পরের দিন সাহসে বুক বেঁধে হাজির হলাম য়ুনিভারসিটি হোটেলে।

হাওয়ার্ড স্লেশ আমার জন্তে লাউঞ্জেই অপেক্ষা করছিলেন।

দেখতে পেয়েই এগিয়ে এলেন। করমর্দনের পর জড়িয়ে ধরলেন।

"খুব ভাল লাগছে তোমাকে দেখে। খুব ভাল।"

আমি বললাম, "ইউ লুক ইয়ংগার বাই টু ইয়ার্স।"

স্লেশ বললেন, "খুব ভাল চাটুকারিতাটুকু, তোমার। খুব ভাল।"

সঙ্গে সঙ্গেই, "চলো, বেরিয়ে পড়া যাক। আমি ওয়াকার স্ট্রীটে একটা রেস্তোরাঁর সঙ্গে পরিচিত। তোমার গ্রীক ফুড ভাল লাগে তো ?"

আমি বললাম, "চমৎকার লাগে।"

"খুব ভাল, খুব ভাল," বলতে বলতে স্নেশ আমাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। রাস্তায় এসে তিনি একটা ট্যাক্সি ধরলেন। মিনিট দশেকের মধ্যে আমরা রেস্তোঁরাটায় গেলাম।

ট্যাক্সিতে ব'সে কথাবার্তা হল কানাডার রাজনীতি নিয়ে। স্নেশ ক্রুডোর প্রশংসক। আমি সমালোচক। আমার সহানুভূতি নিউ ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতি। নিউ ডেমোক্রাটরা একটা প্রদেশে রাজত্ব পেয়েছে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে। আমি তাতে বেশ উৎসাহী।

স্নেশ বললেন, "তুমি তরুণ এবং ভারতীয়। আমার চেয়ে অনেক বেশি বামপন্থী হওয়াই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক।"

আমি বললাম, "সব তরুণ আর সব ভারতীয়রাই বামপন্থী নয়।"

"হওয়া উচিত," স্নেশ জোরের সঙ্গে বললেন, "আমি যদি চীনে জন্মাতাম, নিশ্চয় বিপ্লবী হতাম।"

"ভাগ্যিস আমেরিকায় জন্মেছিলেন!" ব'লে ফেললাম আমি।

স্নেশ হেসে উঠলেন। বললেন, "খুব ভাল, খুব ভাল"। অর্থাৎ রসিকতাটা খুব খারাপ হয় নি।

খেতে ব'সে আমার কাহিনী শুনলেন হাওয়ার্ড স্নেশ। আমি লুকোলাম না। সুজানের কথা না, তোমাদের কথা না, কুইনস কলেজের বিচিত্র তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা না।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করলেন হাওয়ার্ড স্নেশ। সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন কমিউন সম্বন্ধে।

আমার কথা শেষ হ'লে, বললেন, "তুমি কলম্বিয়া ফিরে এসো।"

আমি আর্থিক সমস্যার কথা বললাম।

স্নেশ বললেন, "ভর্তি তোমার হ'য়ে যাবে। তুমি তো আমাদেরই ছাত্র! তোমার এম. এ. রেজাল্টও বেশ ভাল। কুইনসের ব্যাপারটা আমাদের উপেক্ষা করতে হবে। এটুকু আমি ম্যানেজ করতে পারব।"

চিন্তাকুল মুখে হাত বুলিয়ে বললেন, "ফেলোশিপের প্রশ্নই ওঠে না।"

আমি বললাম, "জানি।"

"কিছু রোজগারের ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব।"

"মাইনের টাকাটা—"

"ওটাই মুস্কিল। ওয়েল! এখনও তো দেরী আছে। সেপ্টেম্বরে তো ভর্তি হতে পারবে না। ফেব্রুয়ারীর জন্তে দরখাস্ত করো। দশ মাস সময় হাতে পাচ্ছ। মজোটা

পার টাকা জমিয়ে নাও। তারপর ভর্তির চিঠি পেলে, চলে এসো। কিছু একটা হ'য়েই যাবে।"

আমার মনের মধ্যে কেবল গুঞ্জরিত হতে লাগল কিছু একটা হ'য়েই যাবে। কিছু একটা নয়, যা চাই তাই হ'য়ে যাবে, বারবার বললাম আমি আমাকে। "ডলফিন" রেঁস্তোরায় ডিশ-ওয়াশিং ক'রে গেলাম পুরো আটত্রিশ দিন, শেষের দশ দিন ছ'ঘণ্টা করে। নিজেকে বলে গেলাম, হ'য়ে যাবে, হ'য়ে যাবে, হ'য়ে যেতেই হবে। মালিনী শেশের বাড়ীটাতেই একতলায় একখানা ঘর খালি হ'তে আমি নিয়ে নিলাম, ভাড়া সপ্তাহে বারো ডলার। ঘরটা খুব ছোট নয়, কিন্তু ভীষণ ঠাণ্ডা, সারা বাড়ীটাতেই হীটিং নামে মাত্র, এবং বাইরের আলো-হাওয়া থেকে একেবারে বঞ্চিত। একটা জরাজীর্ণ রেফ্রিজারেটর ছাড়া, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। মালিনী কোথা থেকে একটা সিঙ্গল বেড নিয়ে এল একদিন, বলল তো রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছে, আসলে নিশ্চয় নামমাত্র দামে কারুর কাছ থেকে কিনে নিয়েছে। আমি নিজেই রাস্তা থেকে দুটো চেয়ার কুড়িয়ে আনলাম একদিন ; নড়বড়ে, কিন্তু ভাঙ্গা নয়। পাঁচ ডলার দিয়ে পুরান ফার্নিচারের দোকানে একটা ডাইনেট টেবিল পাওয়া গেল। এরই মধ্যে ষ্ট্যান হুকনার আর তার বান্ধবী এসে হাজির একদিন। আমি ডাল, গরুর মাংস ও ভাত রান্না ক'রে খাওয়ালাম ওদের, ওরা নিজেরাই এক বোতল ওয়াইন নিয়ে এসেছিল। তিন দিন পরে দুজনে আবার এসে হাজির হল। ওদের ঝ্যাকড়া ইস্পালা থেকে বেরিয়ে এল একটা মস্ত কুড়ি বছরের পুরান সোফা সেট, পুরো তিন পীস। হুকনার বলল, "কেতু, তোমার স্বাধীন জীবন যাত্রায় আমাদের সামান্য উপহার।"

অতএব, দেখতে পাচ্ছ বাবা, সুজান চলে যাবার দু মাসের মধ্যে আমার অবস্থা ফিরে গেল। তোমরা আমার দু বছরের জীবনের প্রায় কিছুই জানতে না। জানতে না, কুইনস থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। জানতে না, আমার রোজগার নেই। জানতে না, আমি কম্যিউনে বাস করছি। জানতে না, সুজানও অনেক সময় কম্যিউনেই থাকত। তোমাদের জানিয়ে কোনও লাভ হ'ত না। তোমরা দুঃখ পেতে, চিন্তিত হ'তে, তার চেয়েও খারাপ কিছু হ'তে পারত তোমাদের। তোমরা বুঝতে পারতে না কেন আমার জীবনে এত সব ঘটে গেছে, যা আর দশটা ভারতীয় ছেলের জীবনে ঘটে না, ঘটে নি।

তোমাকে আমার প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে প্রথম চিঠি লিখতে আরও কিছুদিন কেটে গেল। আরও দুটো ঘটনা ঘটল আমার জীবনে, যা ঘটবার প্রয়োজন ছিল, না ঘটলে আমার ফিরে যাওয়ার পথ কিছুতেই খুলত না।

প্রথম ঘটনা ঘটল সুজান চলে যাবার পর দ্বিতীয় মাসে। আমাদের ওপেন স্কুলটা

চলছিল, আমার পড়ানও থামে নি। একদিন ক্লাস শেষ ক'রে কয়েকটি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় একটি লোক এসে আমার কাছাকাছি উপস্থিত। মাথায় ঈষৎ টাক পড়েছে, চোখে চশমা, চওড়া কপাল, মোটা জোরাল নাক। দেখলাম, লোকটি আমারই সন্ধানে এসেছে ওপেন স্কুলে।

সামনেই একটা ছোট্ট রেঁস্তোরা। দুজনে গিয়ে বসলাম।

ভদ্রলোকের নাম হেনরী ওয়ালেস। টরোণ্টো শহরেরই ইয়র্ক য়ুনিভারসিটিতে সোসিওলজির এ্যাসোসিয়েটেড প্রফেসর।

ওয়ালেস বললেন, "আমি উইমেন্‌স্ লিবারেশন নিয়ে একটা বই লিখছি। এই আন্দোলনের সামাজিক, অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য থাকবে বইটাতে। আমার একজন রিসার্চ এ্যাসিস্টেন্ট দরকার। তুমি পারবে আমাকে সাহায্য করতে? দু বছরের প্রজেক্ট আমার।"

আমি তো বিস্ময়ে, আশায় হতবাক!

আমি কিছু বলবার আগেই ওয়ালেস যোগ দিলেন, "তোমার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়েছি আমি। মোটামুটি তোমার বায়োডাটা আমার জানা। কুইনস কলেজ, কম্যিউন, যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন, ওপেন স্কুল, এমন কি তোমার বর্তমান ডিসওয়াশিং-এর 'চাকরী' সব আমি জানি। আমার কাছে এ সবই তোমার কোয়ালিফিকেশন। ঠিক তোমার মতো একটি সহকারী আমার প্রয়োজন। আমি তোমাকে ঘণ্টায় চার ডলার দিতে পারব। সপ্তাহে পঁচিশ ঘণ্টা কাজ করতে পারবে তুমি।"

মনে মনে চটপট হিসেব ক'রে নিলাম। মাসে চারশ' ডলার! দেড়শ ডলার যদি খরচ করি, শ' দুই জমান সম্ভব হবে, বাকীটা যাবে ইনকাম ট্যাক্সে। এক বছর কাজ করতে পারলে প্রায় আড়াই হাজার ডলার জমাতে পারব। ফেব্রুয়ারীতে না গিয়ে কলম্বিয়ায় যদি সেপ্টেম্বরে যাই, তাহলে বছর দেড়েক কাজ করতে পারব। ভর্তি হবার টাকার ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে।

তবু মনের মধ্যে একটা ভার বোধ করলাম। সেটা না কাটলে ওয়ালেসের প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

"আমার নাম পেলেন কোথায় আপনি?"

ওয়ালেস বললেন, "তা জানা কি তোমার পক্ষে বিশেষ দরকার?"

"খুব দরকার।"

"যিনি তোমার কথা আমাকে লিখেছেন তাঁর ইচ্ছে তোমাকে না বলার।"

আমার মনের ভারটা এবার পাথর হ'য়ে উঠল।

"একটা প্রশ্নের জবাব আমার চাই। না পেলে এ কাজ আমি করতে পারব না। যদিও, ঈশ্বর জানেন, কাজটার কি সাংঘাতিক প্রয়োজন আমার।"

"কি প্রশ্ন তোমার?"

"সুজান ফোর্ড নামে কেউ কি আমাকে সুপারিশ করেছে আপনার কাছে?"

হেনরী ওয়ালেস বললেন, "না। সুজান ফোর্ড নামে কাউকে চিনি না আমি।"

পাথরটা নেমে গেল। ভারটা সব নামল না।

"কবে শুরু করতে হবে?"

"কালই করতে পার।"

"আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা নেই আমার। আমি কালই শুরু করবো।"

কে আমার কথা হেনরী ওয়ালেসকে বলেছিল? আমি অনেক পরে না জানতে পারলেও বুঝতে পেরেছিলাম। র‍্যামপার্টস ম্যাগাজিনের পুরান সংখ্যাগুলি ঘাঁটতে ঘাঁটতে নজর পড়েছিল সীজর সাভাজের ক্ষেতমজদুর আন্দোলন নিয়ে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে। রচয়িতার নাম হেনরী ওয়ালেস।

ওয়ালেসকে এ নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করি নি। তখন সাত মাস তাঁর কাছ থেকে মাইনে নেওয়া হ'য়ে গেছে আমার। ওয়ালেস আমাকে পড়াশোনা গবেষণার জগতে ফিরিয়ে এনেছেন; অনেকদিন পরে আমি আবার সোপান বেয়ে উঠতে শুরু করেছি। 'উইমেনস লিব' আমেরিকায় নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তরঙ্গ, এ আন্দোলনের অনেক সস্তা ও চটকদার অভিব্যক্তি আছে, মিডিয়াগুলোর কল্যাণে এ অভিব্যক্তিগুলিই লোকের সহজে ও প্রথম চোখে পড়ে। কিন্তু আন্দোলনের গভীর দিকগুলি অনেকবেশি তাৎপর্যপূর্ণ। পশ্চিমী সমাজ দ্রুতবেগে পোষ্ট ইনডাষ্ট্রীয়াল যুগে প্রবেশ করেছে, কিন্তু মেয়েরা এখনও পুরুষদের শাসনে। মেয়েরা এখনও আসলে সেক্সপট। পুরুষদের আকর্ষণ করা ও ধরে রাখার জন্যেই যেন মেয়েদের সৃষ্টি করেছেন বিধাতা। যান্ত্রিক সভ্যতা যে অর্থনীতির ওপরে নির্ভর, তার অনেকখানি এই পুরুষ-ধরা মেয়েলিপনায় সমৃদ্ধ। কসমেটিকস, ড্রেস, ফ্যাসান, আরও অনেক কিছু নিয়ে তৈরী হয়েছে এক সীমাহীন বিউটি-ইনডাষ্ট্রি, যার গায়ত্রী-মন্ত্র হল মেয়েদের পুরুষদের কাছে আরও বেশি লোভনীয় করে তোলা, আরও বেশি, আরও। চাকুরে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সমাজ ও দেশের ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রবেশ অধিকার হয় একেবারে নেই, নয় নিতান্ত সীমিত। মেয়েরা 'সফট্' কাজ করবে, হার্ড কাজ সব পুরুষদের জন্যে। অথচ সন্তান গর্ভে ধারণ করা ও জন্ম দেওয়ার মত 'হার্ড' কাজ কিন্তু পুরুষকে করতে হয় না প্রকৃতির নিয়মে। এই হার্ড কাজের পুরস্কার মেয়েদের জন্যে নির্দিষ্ট ক'রে রেখেছে গৃহ, রান্নাঘর এবং শয্যা। তোমরা

নার্সিং করো, স্কুলে পড়াও, আমাদের সেক্রেটারী হও, দোকানে সেলসগার্ল, টেলিফোনে তোমাদের মিষ্টি কণ্ঠস্বর শুনতে আমরা ভালোবাসি, কেরাণীর চেয়ারেও তোমরা একেবারে বেমানান নও। কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু, বেশি সংখ্যায় হতে চেয়ো না। তোমরা আমাদের সংরক্ষণে থাকো, আমরা তোমাদের ভালো ক'রে রাখব। পুরুষের চেয়ে অনেক বড়ো তোমরা। তোমরা শুধু পুরুষের সমান নও।

হেনরী ওয়ালেস একটা চার্ট তৈরী করেছিলেন যাতে মার্কিন সমাজের কোন কোন স্তরে মেয়েরা পুরুষের ধারে কাছেও নেই তার এক নজর পরিচয় পাওয়া যেত। সেই চার্টটা বুঝিয়ে দেবার সময় ওয়ালেস বলতেন, "মজা হচ্ছে, প্রায় সব কিছুতেই মেয়েরা এখন আছে—ক্যাবিনেট থেকে সৈন্যবিভাগে—কিন্তু আছে একেবারে নিচের তলায়, পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও শাসন প্রতি মুহূর্তে মেনে নিয়ে। মেয়ে ডাক্তার অনেক আছে, কিন্তু গাইনকলজি ও সাইকায়াট্রির বাইরে তাদের সংখ্যা নগণ্য। মেয়ে ইনজিনীয়রও পাবে দু একজন, যদিও দায়িত্বপূর্ণ কাজ তাদের দেওয়া হবে না। ম্যানেজমেন্টের মাঝামাঝি স্তরে পাবে কিছু মেয়েকে, তার ওপরে প্রায় পাবে না বললেই হয়। এই যে হিমালয়ের মত বিরাট আমাদের ওয়ার-ইনডাষ্ট্রি, এর মধ্যেও মেয়েরা আছে, তবে একেবারে নিচের তলায়। বিজ্ঞানে যারা নাম করছে, নোবেল প্রাইজ পাচ্ছে, তার মধ্যে একজনও স্ত্রীলোক নয় কেন? দ্বিতীয় মাদাম ক্যুরী কেন তৈরী হয় নি? পুরুষরা হ'তে দেয় নি। মেয়েদের ভোট না পেলে কেউ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হ'তে পারে না, কিন্তু কংগ্রেসে স্ত্রীলোকের সংখ্যা দশের বেশি আজ পর্যন্ত ওঠে নি, ক্যাবিনেটে যদি বা কখনও কোনও স্ত্রীলোককে নেওয়া হ'য়ে থাকে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনকল্যাণ ছাড়া অন্য কোনও দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয় নি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, ইতিহাসের সব শোষিত ও শাসিত শ্রেণীর মধ্যে মেয়েরা নিজেরাই এখনও নিজেদের অধিকার ও শক্তি সম্বন্ধে সচেতন নয়। তারা নিজেরাই চায় সেক্স ও বিউটির শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে। মেয়েদের, সুতরাং, ঠিক সেই অবস্থা যা ছিল, এখনও আছে, দেশে দেশে, চাষীদের ও শ্রমিকদের।"

হেনরী ওয়ালেসকে আমার খুব পছন্দ হ'য়ে গিয়েছিল। বয়স তার চল্লিশ পেরোয়নি, দেখলে কিন্তু মনে হত পঁয়তাল্লিশ চলে গেছে। বিয়ে করেছিল, ভেঙে গেছে, একটি মাত্র মেয়ে, মা ও সৎ পিতার সঙ্গে বেশ সুখেই আছে নর্থ ক্যারলিনায়। ওয়ালেস আর বিয়ে করেনি, যদিও সহবাস করছে এক মহিলার সঙ্গে, যিনি টরোন্টোর নতুন-গজান উইমেনস লীব আন্দোলনের কেন্দ্র-বিন্দু। ক্যারল সামার্স তাঁর নাম। তিনিও তাঁর প্রথম স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন। ক্যারল সামার্স টরোন্টো হেরাল্ড পত্রিকার সোসাইটি বিভাগের সম্পাদক।

ওয়ালেস-এর বাড়ীতে সপ্তাহে অন্তত দু'দিন আমার ডিনার বাঁধা হ'য়ে গেল। রিসার্চ বুঝিয়ে দেবার দিন এ দুটো। সন্ধ্যেবেলা গিয়ে, আহার সেরে, রাত এগারটা পর্যন্ত ওয়ালেস আর আমি একসঙ্গে কাজ করতাম। মাইনে দেবার সময় ডিনারের সময়টাও ওয়ালেস ওয়ার্কিং টাইমের মধ্যে গুনে নিতেন। মাঝে মধ্যে ক্যারল এসে বসতেন আমাদের সঙ্গে।

ওয়ালেসের সন্দেহ নেই, পুরুষ মেয়েদের দাবিয়ে রাখছে প্রধানত এজন্যে যে সে সেক্সুয়ালিটির ক্ষেত্রে মেয়েদের থেকে অনেক দুর্বল। ওয়ালেস বলতেন, "জীব-বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, স্ত্রীলোকের সেক্স অনেক বেশি পুরুষের চেয়ে। চাহিদা বেশি, দেবার ক্ষমতাও বেশি। পুরুষ যত সহজে সেক্স-তৃপ্তি পেয়ে থাকে, মেয়েরা তা পায় না। অতএব প্রায় সব স্ত্রীলোককেই কমবেশি বঞ্চিত ও ক্ষুধার্ত থাকতে হয়। পুরুষের নিয়ম হল : সেক্স দাবী করবে পুরুষ, সেই দাবী মেটাবে নারী। পুরুষের দেহের ক্ষুধা মেটান নারীর ধর্ম, নারীর দেহের ক্ষুধা মেটান পুরুষের ধর্ম নয়। মেয়েরা যদি পুরুষের কাছে সেক্স দাবী করে, তাহলে তারা নির্লজ্জ, বেহায়া, দুশ্চরিত্র। কতগুলি সার্ভেতে প্রমাণিত হয়েছে, স্ত্রী এ্যাগ্রেসিভ' হ'লে স্বামী তৎক্ষণাৎ 'অপারগ' হ'য়ে যায়। মেয়েরা যাতে সমান সেক্স-স্যাটিসফেকশন দাবী না ক'রে বসে অন্তত সেজন্যেও তাদের দাবিয়ে রাখা পুরুষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।"

ওয়ালেস বলতেন, ইতিহাসের সব মুক্তি সংগ্রামের চেয়ে স্ত্রীলোকের মুক্তিসংগ্রাম হবে দীর্ঘতম। কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে মেয়েদের অনেক হার্ড-ওয়ার্ক দেওয়া হ'য়ে থাকে, মেয়েরা ট্রেন চালায়, স্পেস-ফ্লাইটে অংশ নেয়, লড়াই করে। অসংখ্য স্ত্রীলোক ইনজিনীয়র, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকা এখনও পুরুষদের চেয়ে অনেক হীন। এবং সেক্সুয়ালিটির দিক থেকে ক্যাপিটালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট সমাজে স্ত্রী পুরুষের সম্ভোগ অধিকারে কোন তফাৎ নেই।

আমি একদিন বলেছিলাম, "মেয়েরা সমান সেকস্যুয়াল স্যাটিসফেকসন দাবী করলে সমাজের ভিৎটাই কি ভেঙ্গে পড়বে না? ফ্যামিলি এবং হিউম্যান রিলেশনশিপ কি একেবারে তচনচ হ'য়ে যাবে না?"

ওয়ালেস বলেছিলেন, "গুরুতর পরিবর্তন ও রূপান্তর হবে, কিন্তু ভেঙ্গেও যাবে না, তচনচও হবে না। মনে রেখো, বঞ্চিত মানুষকে অধিকার দেবার বিরুদ্ধে যুগে যুগে এই একই যুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা তো সব দেশেই ভেঙ্গে যাচ্ছে। পারিবারিক জীবনও বদলাচ্ছে। আমেরিকায় তিনটি বিবাহের মধ্যে একটি ভেঙ্গে যায়, য়ুরোপে প্রায় দু'টি। সোভিয়েট রাশিয়ায়ও ডিভোর্সের পরিসংখ্যান আমেরিকার চেয়ে বিশেষ কম নয়। হালকালে আমেরিকায় ডিভোর্স

কমে যাচ্ছে। কেন? শুধু এ কারণে যে ছেলেমেয়েদের অবিবাহিত সহবাস সমাজ গ্রহণ ক'রে নিয়েছে। ক্যারল ও আমি একসঙ্গে বাস করছি, যদিও আমরা স্বামী স্ত্রী নই। কাল যদি আমরা আলাদা হ'য়ে যাই, আমাদের ডিভোর্স হবে না। অবিবাহিত পুরুষ-নারীর সন্তান যদি প্রপার্টি রাইট থেকে বঞ্চিত না হয় তাহলে বিবাহের প্রয়োজন আরও কমে যাবে। নারীর সব বিষয়ে সমান অধিকার মেনে নেওয়া এবং সে অধিকার বাস্তবে রূপায়িত হ'য়ে গেলে স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক তো আমার মতে অনেক বেশি দৃঢ়, স্বচ্ছ ও পবিত্র হবে। আজ যা আছে তার অনেক কিছু থাকবে না, কিন্তু কাল যা ছিল তার অনেক কিছু তো আজ আর নেই। মানুষ ঠিক তার সমাজকে, পারস্পরিক সম্পর্ককে একটা নতুন ভারসাম্যে নিয়ে যাবে।"

সেদিন ক্যারল সামারস্ ছিলেন আমাদের সঙ্গে। তিনি বলেছিলেন, "কেতু, একটা বড় কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ। প্রেম। মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসতে পারে। এবং ভালোবাসা থেকেই মেয়েদের অনেকখানি সেকস্যুয়াল স্যাটিসফেকশন এসে যায়। পুরুষকে সেক্স স্যাটিশফাই করতে হলে ইজেকশন চাই-ই চাই। মেয়েরা তৃপ্তি পায় স্পর্শে, আদরে, চোখের চাহনিতে, মুখের রেখায়, অন্তরের উত্তাপে। তোমার লিবারেটেড স্ত্রী অথবা প্রেমিকা তোমার কাছে সেক্স নিয়ে দাবী ক'রে ক'রে তোমার জীবন অতিষ্ট করে দেবে, এমন ধারণা করা ঠিক হবে না। তুমি তাকে ভালোবেসেই কতখানি স্যাটিসফেকশন দিচ্ছ তা তোমার জানা নেই। সে শুধু চাইবে, সম্ভোগের সময় তুমি স্বার্থপর অত্যাচারী নিষ্ঠুর না হ'য়ে ওঠো, তুমি নিজে যতটুকু পাচ্ছ, ততটুকু তাকেও পেতে দাও।"

মনে পড়ল, সুজানও ঠিক এ কথাই বলত, একবার না, অনেকবার।

হেনরী ওয়ালেস ও ক্যারল সামারস আমার পুনর্বাসনে অনেক সাহায্য করেছিল, বাবা।

কিন্তু যে আমাকে শেষ পুনর্বাসিত করেছিল, তার নাম জুন। তার আদরের নাম জোনাকি।

জুন আমাকে ফিরিয়ে এনেছে জীবনের রাজপথে।

জুন আমার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন নদীর মধ্যে সেতু বেঁধেছে।

বাবা, আজ এই চব্বিশ বছর পূর্তির দিনে তোমার কাছে যে জবানবন্দী পেশ করছি, তার উপসংহার জুন।

জুন এক নাটকের যবনিকা। জুন আর এক নাটকের সূচনা।

জুনের সঙ্গে প্রথম দেখা মালিনী-শৈলেশের বাড়িতে।

জুন মাসের দশ তারিখ। বরফ গলে গেছে। গাছে গাছে ঘন-সবুজের অন্তহীন পরিব্যাপ্তি। বাতাস বয়ে বেড়াচ্ছে নানা ফুলের সৌরভ। শীতের দেশের লোকেরা গ্রীষ্মে প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে।

মালিনী তার কয়েকটি বন্ধুকে ডিনারে ডেকেছে।

তাদের একজনের নাম রবার্ট সিমসন।

নামটা আমার জানা। মালিনীই কয়েকবার বলেছে রবার্ট সিমসনের কথা। ভাস্কর্য শিখতে রবার্ট এসেছে ইংলণ্ড থেকে টরোণ্টোতে। এসেছে অস্কার আরনল্ডের আকর্ষণে। রবার্টের কাজ দেখে অস্কার খুশি। তাকে ডেকে এনেছে ছাত্র ক'রে। রবার্ট পুরো একবছর শিখছে অস্কার আরনল্ডের কাছে; তার প্রতিভার পরিচয় পেয়ে অস্কার পুলকিত। ইতিমধ্যে রবার্ট সিমসন হ'য়ে পড়েছে মালিনীরও বিশেষ এডমায়ারার। নেহাৎ মালিনী অস্কারের বান্ধবী। তা নইলে রবার্ট ও মালিনীর কি ঘটত বলা যায় না।

আমার পার্টিতে পৌছতে একটু দেরী হয়ে গেছল। পৌছে দেখি বাকী নিমন্ত্রিত সবাই এসে গেছে। অস্কার আরনল্ডকে আমি আগেই জানতাম। মালিনী বাকীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল আমার। থিয়োডোর মোজেজ, টরোণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিকের শিক্ষক; এডিথ মোজেজ, থিয়োডোরের নর্তকী স্ত্রী; ম্যাকডোনাল্ড কিংসবী, পাশ্চাত্য দর্শনের অধ্যাপক; মেরী হপম্যান, ম্যাকডোনাল্ডের বান্ধবী; অলিভিয়া কোনো, দর্শন বিভাগের জাপানী ছাত্রী; প্ল্যাটো সেকস্টন, টরোণ্টোর ব্ল্যাক-লিবারেশন লীগের সভাপতি; রবার্ট সিমসন; জুন সিমসন।

আমার চেয়ে এক ইঞ্চি লম্বা ঋজু দেহ, যেন শিল্পীর হাতে তৈরী। মাথা ভরা সোনালি চুল, পিঠে ছড়ান। সরু নাক, ডিম্বাকৃতি মুখখানায় আলগা লাবণ্য। ছোট ছোট গভীর সুনীল চোখ। ধারাল চিবুক। দেহের বর্ণ আইভরী-শ্বেত।

মালিনী বলল, "জুন হল এ পার্টির সারপ্রাইজ। মাত্র এক সপ্তাহ হল জুন টরোণ্টোতে এসেছে। জুন রবার্টের বোন।"

রবার্টকে দেখেও আমি ইম্প্রেসড। ছ'ফুটের বেশি লম্বা। সোজা তালগাছের মত মেরুদণ্ড। লালচে চুল কাঁধ ছাড়িয়ে পিঠে নেমেছে। লম্বা মুখখানায় লালচে দাড়ি-গোঁফ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যীশুর বোধহয় এমনি চেহারা ছিল।

জুনকে আমি বললাম, "লণ্ডন থেকে এসেছ?"

জুন বলল, "না। লিভারপুল থেকে।"

মিহি মিষ্টি গলা। উচ্চারণ অত্যন্ত পরিষ্কার।

"এখানে পড়বে ?"

জুন বলল, "না। আমি য়ুনিভার্সিটি অব ইয়র্কে পড়ছি।"

"ফ্রেশম্যান ?"

"সফোমোর।"

"কিসে মেজর করছ ?"

"ফিলসফি।"

"তাহলে তুমি মালিনীর দলে! দুজন ফিলজফার বান্ধবী একটু বেশি হ'য়ে পড়বে।"

জুন তৎক্ষণাৎ কাটল, "আমি শুধু তিনমাসের জন্যে বেড়াতে এসেছি।"

আমি সামলে নিয়ে বললাম, "খুব দুঃখের কথা। ভাবছিলাম মালিনীর হাত থেকে এবার মুক্তি পাওয়া যাবে।"

মালিনী বাহু ধরে সরিয়ে নিয়ে গেল আমাকে, "আমার ঈর্ষায় মুখ সবুজ হ'য়ে আসছে। কেতু, অস্কার তোকে কয়েকটা প্রশ্ন করবে।"

জুনের সঙ্গে সেদিন আমার বিশেষ আর কথাবার্তা হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা নানা রকম লিব নিয়ে মেতে উঠলাম। ব্ল্যাক লিব, ইয়ুথ লিব, উইমেনস্ লিব। আমি হেনরী ওয়ালেসের রিসার্চ সহকারী, অতএব উইমেনস লিব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। আমাদের আলোচনা গরম হ'য়ে উঠল। শুধু আমি কয়েকবার লক্ষ্য করলাম, জুন একমনে সবাকার কথা শুনে যাচ্ছে।

রবার্ট সিমসনের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হ'য়ে গেল। রবার্ট শুধু ভাস্কর নয়, কবিতাও লেখে। লণ্ডন থেকে হালে প্রকাশিত একটি কবিতা-ত্রৈমাসিকে অন্যতম উদ্যোক্তা ও সম্পাদক। আমারও কবিতা লেখার প্রচেষ্টা আছে শুনে রবার্ট খুব উৎসাহ দেখাল। ঠিক হল রবার্ট পরের সপ্তাহে আমার ডেরায় আসবে, ওর কবিতা প'ড়ে শোনাতে।

আমি বললাম, "জুনের যদি ইচ্ছে থাকে, ওকেও নিয়ে এসো। আমি মালিনীর মতো রাঁধতে পারিনে, কিন্তু যা রাঁধি তা অখাদ্য হয় না।"

রবার্ট ও জুন একটু তাড়াতাড়িই বিদায় নিল। পরের দিন ভোর বেলা জুন তিন দিনের জন্যে মন্ট্রিয়েল যাচ্ছে।

বিদায় নেবার সময় জুন আমাকে নিমন্ত্রণের অবকাশ না দিয়ে নিজেই বলল, "রবার্টের সঙ্গে আমাকে আসতে বলার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।"

আমি বললাম, "তুমি আসবে ?"

জুন বলল, "আই উড্ লাভ টু।"

মিহিমিষ্টি স্বর। কথা বলার সময় ধারাল চিবুকটি ন'ড়ে ওঠে। মাথাটা একটু ডান দিকে কাৎ হ'য়ে যায়।

পরের সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে জুনকে সঙ্গে নিয়ে রবার্ট এসে গেল। ওরা দুজনে সঙ্গে আনল এক বোতল গ্রীক ওয়াইন, একগুচ্ছ লাল গোলাপ।

আমি বললাম, "এ ঘরে অমন গোলাপ মানায় না।"

ফুল রাখার ভাস তো নেই। জুন একটা গেলাসে জল ভরে গোলাপগুচ্ছ খাবার টেবিলের সামনে রাখল।

অনেক, অনেক গল্প হল আমাদের। রবার্ট উচ্ছ্বসিত হ'য়ে অস্কার আরনস্তের ভাস্কর্য আমাকে বোঝাতে লেগে গেল। রবার্টের মতে ভাস্করের শ্রেষ্ঠ কীর্তি "অ স্কাল্পটারস্ ড্রীম।"

রবার্ট বলল, "টাইটেলটা নিয়ে আমার আপত্তি আছে। আমি হ'লে 'এ' অক্ষরটা বাদ দিয়ে দিতাম।"

জুন বলল, "অস্কার তোমার মাথা ভেঙ্গে দেবে।"

মালিনী প্রসঙ্গ উঠলে রবার্ট একদিকে যেমন উদ্দীপ্ত, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বিষণ্ণ।

আমি রবার্টের কবিতা শুনতে চাইলাম। রবার্ট পর পর দশটি কবিতা পাঠ করল। তার মধ্যে দুটি অনবদ্য।

জুন আমাকে বলল, "এবার তোমার কবিতা শুনব। রবার্টের কবিতা শুনে শুনে সব মুখস্ত হয়ে গেছে।

আমি বললাম, "আমার কবিতা শোনাবার মতো নয়।"

ওরা মানল না। অগত্যা, খাতা বার ক'রে কয়েকটা কবিতা পড়লাম।

রবার্ট একটু বেশি তারিফ করল। জুন একটা কথাও বলল না।

রবার্ট দুটো কবিতা বেছে নিল তার পত্রিকার জন্যে।

জুন বলল, "আমার কাছে 'ক্যালকাটা' কবিতাটি সবচেয়ে ভালো লেগেছে। তুমি ওটা নিচ্ছ না কেন, রবার্ট?"

আমি বললাম, "সত্যি ছাপবে তুমি কবিতাগুলো?"

রবার্ট বলল, "নিশ্চয়"।

আমি বললাম, "কলম্বিয়ায় ভর্তির জন্যে দরখাস্ত করেছি। অন্তত একটা কবিতা যদি ছাপা হয়, আমার দরখাস্তের জোর অনেক বাড়বে।"

রাত একটার সময় দুজনে বিদায় নিল।

যাবার সময় জুন বলল, "আমি খুব এনজয় করেছি। আশা করি আবার দেখা হবে আমাদের।'

আমি বললাম, "দেখা হলে খুব খুশি হবো।"

দিন সাতেক পরে অপরাহ্নে আমার হঠাৎ ক্ষিধে পেয়ে গেল এবং দেখলাম ঘরে খাবার মত নেই কিছু। মালিনীদের ঘরে গিয়ে একটা স্যাণ্ডুইচ খেয়ে নেব ভেবে বেল টিপলাম।

দরজা খুলল জুন সিমসন। আমাকে দেখে আইভরী রং একেবারে সিঁদুর।

"তুমি!" অবাক হ'য়ে ব'লে ফেললাম আমি।

জুন বিব্রত হ'য়ে বলল, "ওরা কেউ বাড়ী নেই।"

"তুমি একা একা ব'সে আছ এখানে? ঢুকলে কি ক'রে?"

জুন বলল, মালিনীর কাছ থেকে চাবি নিয়ে এসেছি।

আমাকে তখনও অবাক দেখে জুন ব্যাপারটা বলেই ফেলল।

''তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। শেষ পর্যন্ত এখানে ব'সে আছি।''

আমি হেসে উঠলাম: "আমার ঘরে যেতে ভয় করল?"

জুন তখনও লাল: "ভয় না! ইতস্তত লাগছিল।"

আমি বললাম, "ভাগ্যিস ক্ষিধে পেয়ে গিয়েছিল আমার! দুদিন ধ'রে বাজার করাই হচ্ছে না। ঘরে এক কামড় খাবার নেই। অথচ উইমেনস লিব নিয়ে পড়তে বসলেই পেট চোঁ চোঁ করে। তাই এসে গেলাম স্যাণ্ডুইচের সন্ধানে। তুমি লাঞ্চ করেছ?"

জুন বলল, না, করি নি। "বিশেষ ক্ষিধে নেই আমার।"

"খুব ক্ষিধে আছে," বললাম আমি, "দুটো সাণ্ডুইচ বানাতে পারবে?"

কিছু একটা করতে পেরে জুন যেন বেঁচে গেল। ফ্রিজ খুলে দেখে শুনে বলল, "হ্যাম আছে। চীজও আছে।"

"আমার জন্য চীজ মিলিয়ে হ্যাম সাণ্ডুইচ।"

"কফি?"

"একশ বার।',

জুন চটপট কফি আর স্যাণ্ডুইচ তৈরী ক'রে ফেলল। খেতে খেতে আমরা গল্প জুড়ে দিলাম। জুন বলল তার বাড়ীর কথা। বাবা লিভারপুল পুলিশের মাঝারি স্তরের অফিসার। মা-ও লিভারপুলেরই মেয়ে। "আমার পরিবার নিতান্ত প্রভিন্সিয়াল, জুন বলল, "তুমি জান, এখনও আমি লণ্ডন দেখি নি!" রবার্ট পড়ছিল লণ্ডনে। তারপর চলে এসেছে টরোণ্টো। অস্কার আরনল্ডের কাছে, ভাস্কর্য শিখবে বলে।

ভাইবোনে খুব ভাব। রবার্ট কি করছে, কেমন আছে দেখবার জন্যে জুনও গ্রীষ্মের ছুটিতে চলে এসেছে টরোণ্টোয়। "রবার্টের মস্ত দোষ, একেবারে চিঠি লেখে না। যাও লেখে মাসে দু'মাসে একখানা, নিজের কথা বলে না কিছুই।"

"তাই তুমি দেখতে এলে ভাই কি ক'রে বেড়াচ্ছে সাত সমুদ্দুর পারে?"

জুন বলল, "পুরো এক বছর ইয়র্ক শহরে পার্ট টাইম কাজ ক'রে কিছু টাকা জমিয়ে ছিলাম। সামারে খুব সস্তায় ইংলণ্ড থেকে কানাডায় যাওয়া আসা করা যায়। তাই চলে এলাম।

"মালিনীর কথা আগে শুনেছিলে?"

"রবার্ট আমাকে একটা চিঠিতে মালিনীর কথা অনেক লিখেছিল। বোধহয় জানো রবার্ট মালিনীকে ভালোবেসে ফেলেছে।"

"মালিনীকে ভালোবেসে ফেলা পুরুষদের অভ্যেস," আমি বললাম।

"তোমারও?" জুন প্রশ্ন ক'রেই বলল, "মাপ করো, আমি মোটেই কৌতুহলী নই।"

আমি বললাম, "তুমি কৌতুহলী হ'লে'ই আমার লাভ।"

জুন আবার রক্তিম হল।

বললাম, "মালিনী আমার বিশেষ বন্ধু। শৈলেশও। ওদের দুজনকেই আমি খুব ভালোবাসি।

জুন বলল, "মালিনীও তোমাকে খুব ভালোবাসে। তোমার কথা বলতে গিয়ে থামতে চায় না।"

"ওটাই মালিনীর বৈশিষ্ট্য। ওর মধ্যে তো কতো রকমের কতো ভালোবাসা আছে তা অবাক হ'য়ে দেখতে হয়।"

জুন বলল, "তুমি সেদিন কমিউনের কথা বলছিলে। শুনতে আমার খুব ভালো লাগছিল। আমি আরও শুনতে চাই তোমার কাছ থেকে কমিউনের কথা। অবশ্যি যদি তোমার সময় থাকে।"

আমি বললাম, "শ্রোতা পেলে আমার বকবকানি থামবে না কিন্তু।"

জুন বলল, "তোমাকে তো বাজার করতে হবে!"

"তা হবে।"

"চলো না, তোমার বাজারটা ক'রে দি।"

"চমৎকার। আমি এক্ষুনি আসচি।"

দুজনে আমরা বেরিয়ে পড়লাম পাঁচ মিনিটের মধ্যে। সুপার মার্কেটটা আধ মাইল দূরে। আমি সাধারণত কাছাকাছি একটা মুদির দোকানে বাজার করি। জুন চাইল

স্থপার মার্কেটে যেতে। আমি বললাম, বোঝা বয়ে এতটা ফিরে আসতে কষ্ট হবে। জুন বলল, "আমি বইব। আমার গায়ে খুব জোর।"

হাঁটতে হাঁটতে আমি জুনকে কমিউনের গল্প বললাম। জুন অনেক প্রশ্ন করল। প্রত্যেকটি সত্যকে জুন যেন চাক্ষুষ দেখতে চাইছে।

আমি বললাম, কমিউনে কোনও যুগলকে আলাদা ঘর দেওয়া হত না। প্রত্যেক ঘরে দুটি যুগল বাস করত। মাঝে মাঝে, অতিথি-বন্ধুরা এসে পড়লে, তিন-চারটিও।

জুন এ নিয়ে বিশেষ কৌতুহল দেখাল না।

আমি কমিউনের সেক্স-লাইফ সম্বন্ধেও জুনকে অনেক কিছু বললাম। জুন শুনে মজা পেল, হাসল, কিন্তু প্রশ্ন করল না।

বাজারটা একটু বেশিই করা হ'য়ে গেল। বোঝার বেশির ভাগ বইল জুন। কিছুতেই আমার আপত্তি শুনল না।

বাজার নিয়ে আমরা আমাদের ঘরে ঢুকলাম। ঘরটা অনেকদিন অগোছাল হ'য়ে ছিল। আমার লজ্জা করতে লাগল।

জুন ফ্রিজে ও কিচেনে বাজার গুছিয়ে রাখল।

তারপর বলল, "ঘরটা একটু গুছিয়ে দিলে তুমি কিছু মনে করবে না তো।"

আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই ঘর গুছোবার কাজে লেগে গেল জুন। লেগে গেলাম আমিও। ঘন্টাখানেক পরে নিজের ঘর দেখে নিজেই বিস্মিত চমৎকৃত হলাম।

জুনকে বললাম, "তুমি যদি ফ্রী থাকো, চলো বাইরে খেয়ে আসা যাক।"

"আমাকে ডেট করছ?" জুন ঈষৎ প্রগলভ হাসল।

"করছি।"

"তোমার না টাকা জমাবার কথা।"

"এমন কি আর খরচ হবে?"

জুন বলল, "তার চেয়ে একটা কাজ করা যাক। আমি রাঁধতে ভালোবাসি। চট ক'রে কিছু রান্না ক'রে নিচ্ছি। ল্যাম রোষ্ট তোমার ভালো লাগে? লাগে তো? সঙ্গে আলু, বীনস, আর গাজর সেদ্ধ। এক ঘন্টার মধ্যে হ'য়ে যাবে। তারপর চলো আমরা একটা মুভী দেখে আসি। ডাউনটাউনে ব্যরিম্যানের 'দ সাইলেন্স' হচ্ছে। আমার খুব দেখবার ইচ্ছে। কি বলো?"

আমি খুশি হ'য়েই সায় দিলাম।

জুন কোমরে এ্যাপ্রন বেঁধে রান্নায় লেগে গেল। আমি লেগে গেলাম জুনকে সাহায্য করতে। রান্না করতে করতে জুন লিভারপুল আর ইয়র্ক শহরের গল্প বলে গেল।

"তুমি ভর্মে থাকো ?"

জুন বলল, "প্রথম প্রথম ছিলাম। ছ'মাসে দম আটকে এল। তখন এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করলাম আমি আর আমার এক গার্ল-ফ্রেণ্ড।"

পরিপাটি ক'রে খাবার নিয়ে বসল জুন। ল্যাম রোষ্ট আর তরকারী সেদ্ধ এমন সুন্দর ক'রে সাজিয়ে পরিবেশন করা যায় আমি জানতামই না। রোষ্ট মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠতে হল, "চমৎকার।"

জুন খুব খুশি। ,

"আমার মা খুব পাকা রাঁধুনী", জুন বলল, 'অবশ্যি, আমাদের খাবার তোমার মুখে বিস্বাদ লাগবে।"

"মোটেই না। তোমাদের খাবারও আমার খুব প্রিয়। আসলে আমি হরেক রকম খাবার খেতে ভালোবাসি। আমার মাও খুব ভালো রান্না করেন।"

জুন বলল, "তোমার বাবা-মা-বোনের কথা বলো।"

বলতে গিয়ে দেখলাম, গলায়, বুকে বিঁধছে। অনেকদিন কাউকে তোমাদের কথা বলিনি, বাবা। অনেকদিন কেউ শুনতে চায়নি। একটু একটু আলগা-আলগাব বেশি বলতে পারলাম না।

জুন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"তুমি খুব ভালোবাসো ওঁদের, না ?"

"তার চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসেন ওঁরা আমাকে," বলতে আমার চোখ জলে ভ'রে এল।

লুকোবার জন্যে আমি উঠে রান্নাঘরে চ'লে গেলাম। ফ্রিজ থেকে ছটো সেভেন-আপ নিয়ে এলাম।

খানিকক্ষণ কাটল নীরবতায়।

প্রসঙ্গ বদলে, জুন ওপেন স্কুলের কথা তুলল।

"আমি আসতে পারি তোমাদের স্কুলে ?"

"নিশ্চয়।"

"তোমার লেকচার কবে ?"

"সপ্তাহে ছদিন। পর্শু।"

"আমি আসব।"

খাওয়া শেষ হলে জুন আমাকে বাসন ধুতে দিল না। আমি ড্রাই করলাম। তারপর দুজনে বেরিয়ে পড়লাম।

অনেকখানি পথ। সাবওয়ে নিলাম। টিকেট কিনে সিনেমায় ঢুকে দেখলাম

ছাবর শেষাংশ চলছে। শেষ হবার পরে আবার ‘পুরোটা দেখতে হবে আমাদের।

ছবি দেখতে দেখতে জুনের হাত আমার হাতে আবদ্ধ হল, আবদ্ধ রইল।

ছবি শেষ হ'লে জুন বলল, "কফি খাবে ?"

"নিশ্চয়।"

"এবার কিন্তু আমার খরচে।"

"বেশ তো।"

কফি খেতে খেতে জুন প্রশ্ন করল, "তুমি কি সুজান ফোর্ডকে এখনও ভালোবাসো ?"

প্রশ্ন শুনে আমি বিস্মিত হলাম। জুনের বুদ্ধি আছে, মানতে হল।

জুনকে আমি সুজানের কথা বলে গেলাম পুরো আধ ঘণ্টা ধরে।

শেষের দিকে বললাম, "সুজান চলে না গেলে আমি ওকে ছাড়তে পারতাম না। চলে গিয়ে সুজান আমাকে মুক্তি দিয়েছে। আমি অনেক হালকা হ'য়ে গেছি। বুঝতে পেরেছি, এবার আমাকে ফিরতে হবে। সুজানকে আমি ভুলব না কোনও দিন। কিন্তু প্রেম আমার আর নেই। চলে গিয়েছিল অনেকদিন আগেই। আমি বুঝতেও পারি নি। সুজান বুঝেছিল। তার স'রে পড়বার তাও সম্ভবত একটা কারণ।"

জুন এক মনে, একটা কথা না বলে, আমার কথা শুনছিল। আমি ওর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ওর বুক দুটি মৃদু তরঙ্গিত হচ্ছিল। জুনের দেহ থেকে হালকা মৃদু সুবাস উঠে এসে আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল।

আমি থামলে, জুন বলল, "তোমাদের সম্পর্কটা খুব ইনটারেষ্টিং ছিল।"

আমি বললাম, "এ্যাণ্ড ভেরী একস্‌পেন্‌সিভ।"

"সব ইনটারেষ্টিং সম্পর্কই দাম তুলে নেয়।"

জুনকে যখন রবার্টের বাসায় পৌঁছে দিলাম, তখন দুটো বাজতে দশ মিনিট।

জুন বলল, "পরশু আসছি তোমার স্কুলে।"

আমি বললাম, "আজ দিনটা বড় ভাল কাটল।"

জুন বলল, "আমারও।"

আমার ঠোঁটে আলতো চুমু বসিয়ে দিয়ে জুন বলল, "গুডনাইট, এ্যাণ্ড থাংক্যু ভেরী মাচ্‌।"

কি আশ্চর্য, কি বিচিত্র, কি ভীষণ রহস্যময় মানুষের জীবন! কোথা থেকে, কিসের প্রেরণায়, কোন কারণে, কার নির্দেশে জুন সিমসন এসে গেল গ্রামের টিউলিপ-রঙিন

টরোন্টোতে, এসে গেল আমারই জন্তে। আমার প্রত্যাবর্তনের পথ তৈরীর বিশ্বস্ত প্রতিশ্রুতি হ'য়ে। জুন এল এক-আকাশ কোমলতা নিয়ে, আমার ভারতের নীলাকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ প্রাক-বর্ষা মেঘের মোলায়েম মমতা নিয়ে। জুন এল বুক-ভরা অনুভূতি নিয়ে, হা... বিশ্বাস নিয়ে। জুন আমাকে উত্তাল বন্যাস্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল না, বিশ্বস্ত তরীতে বসিয়ে নিয়ে এল তীরে। ঝড় নয় প্রভঞ্জন নয়, প্লাবন নয়, বিস্ফোরণ নয়। জুন এল প্রশান্তি নিয়ে, প্রত্যয় নিয়ে, আগামী কালের প্রতিজ্ঞা নিয়ে।

এমন একটি শুভ্র কোমল শান্ত দৃঢ়-প্রত্যয় কন্যার জন্যে বুঝি আমার অন্তর প্রতীক্ষা করছিল, তিন বছরের ঝড় ঝাপটা ভাঙ্গাচোরার ঘাত-প্রতিঘাতে, অথচ আমি এই প্রতীক্ষার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না। জুন এসেছে দু তিন মাসের জন্যে ভাই-এর কাছে বেড়াতে, জুনের সঙ্গ আমার ভাল লাগছে, ওকে কাছে পেলে আমি সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠছি, ভাল লাগছে জুনের নীরব মনোযোগ আমার সরব আত্ম-সমীক্ষায়, ভাল লাগছে, জুন আমাকে "তৈরী" করতে চাইছে না, আমি যা তাকে নিয়েই জুনের সুখ। পৃথিবীকে, সমাজকে, মানুষকে ঢেলে সাজাবার গরজ নেই জুনের, নিজের প্রত্যয়, মূল্যবোধ, সততাটুকু বজায় রেখে জীবনটাকে যতটা সম্ভব উপভোগ করা জুনের জীবন বোধ। আমাদের পৃথিবীতে সবাই সবাইকে মারছে, আঘাত করছে, জুন বলে, কেউ কি 'হীল' করছে ? আই উড রাদার হীল দ্যান হার্ট।

জুন এসেছিল কানাডা ঘুরে বেড়াতে। যাবার কথা ছিল উত্তর-পূর্ব প্রদেশে, উত্তর-পশ্চিমে বৃটিশ কলম্বিয়ায়, যদি সম্ভব হয় তুষারাচ্ছন্ন দক্ষিণের আলাস্কা সীমান্তে। দুদিনের জন্যে অটোয়া বেড়িয়ে আসার পরে জুন আর কোথাও গেল না। প্রথম প্রথম সপ্তাহে দু'দিন আমাদের দেখা হত, পরিচয়ের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে রোজই আমরা একত্র হ'তে লাগলাম। আমি লাইব্রেরীতে ব'সে হেনরী ওয়ালেসের কাজ করছি, জুন বসে আছে সামনা সামনি, বই নিয়ে, ম্যাগাজিন নিয়ে। আমার অবসর সময়ের অনেকটাই জুনের সঙ্গে কাটতে লাগল। আমরা একসঙ্গে প্রায় রোজই খেতে লাগলাম, হয় রেঁস্তোরায়, নয় আমার ঘরে। জুন আমার সব ইতিহাস শুনে নিল, শিশুকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ; জুনের ইতিহাসও আমার শোনা হ'য়ে গেল।

একদিন বললাম, "তোমার না কানাডা ভ্রমণের কথা ছিল ?"

জুন বলল, "ছিল।"

"এখন নেই ?"

"মনে হচ্ছে না। এখানে বেশ ভাল লাগছে।"

"সারা ছুটিটা এখানেই থাকবে ?"

জুন বলল, "দেখা যাক।"

আমি বললাম, "তুমি চলে গেলে খুব একা-একা লাগবে।"

জুন বলল, "চলে যাই তো আগে।"

জুনকে সবচেয়ে ভাবিয়ে তুলেছিল, বাবা-মা-বোনের সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক। তোমাদের কথা বলতে বলতে আমি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতাম। ছোটবেলার কথা বলতে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠত দিল্লীর পথ ঘাট, চাণক্যপুরীতে আমাদের বাড়ী, লনের দক্ষিণ কোণে পর পর তিনটে ঝাউ গাছ, পেছনের বাগানে মস্ত নিম। ভেসে উঠত সেন্ট-কলম্বা আর জীসাস-মেরী, দেখতে পেতাম স্কুলের বাসে দুপুরবেলা বাড়ী ফিরছি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে মা আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে। জুন চুপ করে শুনে যেত, সবটাই ওর কাছে অভিনব।

অথচ যে মনুষ্য-সম্পর্ক সম্বন্ধে জুনের একটুও অভিজ্ঞতা নেই, তাকে সে বুঝতে পারত, সম্মান করতে পারত।

"আমার কি মনে হয়, জানো?" জুন বলল একদিন আমার কাছে তোমাদের আরও এক কিস্তি কথা শুনে, "আমার মনে হয়, মানুষে-মানুষে ভালবাসার মত সুন্দর আর কিছু নেই।"

আমি বললাম, "ভালবাসা কিন্তু ভয়ানক স্বার্থপর।"

"শুধু স্বার্থপর হ'লে তাকে ভালবাসা বলব না।"

"তোমাদের দেশে অনেকক্ষেত্রে দেখতে পাই টীরানি অব লাভ। ভালবাসার [illegible] দম আটকে যায়।"

জুন বলল, "তুমি তো আমাদের সমাজের টীরানি সব ইনডিফারেন্সের সঙ্গে পরিচিত নও! ভালবাসার অত্যাচার উদাসীনতা ও ঘৃণার অত্যাচারের চেয়ে অনেক ভাল।"

জুন বলল, "আমি আমার বাবা-মাকে ভালবাসি। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নেই আমার। কথা বলতে গিয়ে দেখি ওয়েভলেংথ নেই। যা বলতে চাই পৌঁছচ্ছে না কোথাও। রবার্টের অবস্থাও তাই। বাবা-মাকে ভালবাসে, তাই বছরে অন্তত দুবার লিভারপুল আসবেই। প্রত্যেকবার আসবার দিনই বাবার সঙ্গে দারুন ঝগড়া বেধে যাবে।"

"কি নিয়ে ঝগড়া?"

"কিছু নিয়ে নয়। অত্যন্ত সামান্য, তুচ্ছ ব্যাপারে দুজনের মধ্যে আগুন লেগে যায়।"

"তোমার মা?"

"মা খুব চুপচাপ মানুষ।"

জুন আর একদিন বলল, "নিউ ইয়র্ক কবে যাচ্ছো?"

"কি সর্বনাশ। কি কাজ পেল ?

"একটা রেস্তোঁরার ক্যাশিয়ার। রাত আটটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত। মাইনে সপ্তাহে সত্তর ডলার।"

"বলো কি। এতো নেকেড একসপ্লয়টেশন।"

"জুন বলছে, শুরু তো করি, পরে এর চেয়ে ভাল কিছু পেলে ছেড়ে দেব।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আমি বললাম, "রবার্ট, জুনের এখবরটা আমাকে তুমি কেন দিচ্ছ ?"

রবার্ট বলল, "এক সপ্তাহ ধরে জুন আর আমি এ নিয়ে অনেক কথা বলেছি। জুনের বড় ভাই আমি, কিন্তু ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করান আমার দ্বারা সম্ভব নয়। সম্ভব হ'লেও আমি করতাম না। জুনের কুড়ি বছর হয়ে গেছে এই জুন মাসে। নিজের জীবন নিয়ে বড একটা সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলেছে জুন।"

আমি চুপ ক'রে শুনলাম।

রবার্ট বলল, "জুন তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে, কেতু।"

আমি রবার্টের নীল-চোখে চেয়ে রইলাম। ব্যথায় কাঁপছে রবার্টের দৃষ্টি।

"প্রেমে পড়া জুনের এই প্রথম নয়। কিন্তু জুন বলছে, এখন যা হচ্ছে ওর মধ্যে, তা আগে কখনও হয় নি।"

আমার মুখে কথা নেই।

"জুন বলছে, তুমি ওকে খুব পছন্দ করো, কিন্তু ভালবাসো না।"

আমাকে চুপ দেখে রবার্ট বলল, "জুন তোমারই জন্যে থেকে যাচ্ছে এখানে। ওকে তুমি মমতার সঙ্গে দেখো। জুন যদি বড আঘাত পায় আমার খুব কষ্ট হবে, কেতু।"

আমি এবার বললাম, "রবার্ট, তিনটে বছর আমার অনেক ঝড়-ঝাপটায় কেটেছে। সুজান আমার কাছ থেকে অনেক খানি নিয়ে গেছে। আমি মাত্র ছ'মাস হল নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টায় আছি। জুন আমাকে এ কাজে কতোটা সাহায্য করেছে তুমি জানো না। আমার অনেক আঘাত সেরে গেছে জুনের সান্নিধ্যে। অনেক সময় মনে হয় জুনকে আমি ভালবাসি, গভীর ভাবে ভালবাসি। আবার মাঝে মাঝে সন্দেহ এসে যায়। আবার ভালবাসতে পারি, এ আত্মবিশ্বাস এখনও পুরো ফিরে আসে নি আমার। আমি সর্বদা নিজেকে সতর্ক করছি,যাতে জুনের মত একটি মেয়ের বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে তাকে নিজের প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার ক'রে না বসি।

রবার্ট বলল, "জুন তা জানে। জুনের অনুভূতি যেমন গভীর, বুদ্ধি তেমনি তীক্ষ্ণ। জুন আমাকে বলেছে, পশ্চিমের কোনও ছেলে এত কাছে পেয়েও একটি মেয়েকে ছুঁয়ে থাকে না।"

আমি বললাম, "রবার্ট আমি প্রতিজ্ঞা করছি, জুনকে আঘাত করবো না।" এর বেশি কিছু আমার গলা দিয়ে বার হল না।

রবার্ট আর আমি বসবার ঘরে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আহার শুরু হ'য়ে গেল। জুন তখনও আমাকে এড়িয়ে চলছে। আমার অন্তস্তলে হাজার তন্ত্রীতে সঙ্গীত বাজছে। সারা ঘরটাকে, সব লোকগুলিকে মায়ালোকের সৌন্দর্যে আলোকিত দেখতে পাচ্ছি। সমস্ত পৃথিবী উদার হ'য়ে আমাকে কি যেন, কেন যেন, দিচ্ছে, দিচ্ছে, দিচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি আকাশ এসে মিশেছে সমুদ্রে, সূর্য সে মিলন দেখে হাসছে, লক্ষ পাখি একসঙ্গে ডেকে উঠছে, বিশ্বের সব ফুল ফুটেছে আমার দৃষ্টির সামনে।

কিছুক্ষণ পর জুন আর আমি মুখোমুখি।

আমরা তাকিয়ে আছি দুজন দুজনের চোখে। সময় থেমে গেছে। পৃথিবী নিশ্চল।

দুটি মানুষের দৃষ্টি লেগেছে দু'টি হৃদয়ে। আমরা দুজনে দুজনের চোখের আগে দাঁড়িয়েছি।

আরও দশটা দিন কেটে গেল। দশটা মুহূর্তের মত। জুন কাজ করছে ডাউন-টাউনে একটা রেঁস্তোরায়। রেঁস্তোরাটার নাম ইটারনিটি। জুন রাত্রির ক্যাশিয়ার। আটটা থেকে দুটো পর্যন্ত জুনের কাজ। দুটোর সময় সাবওয়ে চেপে জুন ফিরে আসে তার নিজের ঘরে। আমি যে বাড়ীটায় বাস করি, মালিনী-শৈলেশও, তার দু ফার্লং দূরে একটা বাড়ীতে জুন একখানা ঘর নিয়েছে। তিনটে থেকে দশটা এগারটা পর্যন্ত জুন ঘুমোয়। উঠে, স্নান সেরে, চলে আসে আমার কাছে। প্রায় সারাদিনই আমরা যতক্ষণ সম্ভব একসঙ্গে। আমি লাইব্রেরীতে কাজ করি, জুন ব'সে থাকে, বই পড়ে, ম্যাগাজিন পড়ে। কখনও কখনও আমার কাজে হাত লাগায়। বিকেলে আমরা বেড়াই। সন্ধ্যেবেলা একসঙ্গে খাই। জুনকে আমি তার কাজের রেঁস্তোরায় পৌছে দি, যেদিন আমাকে হেনরী ওয়ালেসের বাড়ীতে যেতে না হয়।

আমাদের কথার আর শেষ নেই। বলি আমিই বেশি। জুনও এখন অনেক বেশি বলে আগের চেয়ে।

এখন ভাবতে আশ্চর্য লাগে, রবার্ট আমাকে যা বলেছিল তা নিয়ে আমার ও জুনের মধ্যে একটা কথাও হল না এই দশদিনে। আমি জুনের টরোন্টো থেকে যাওয়া, কলেজ থেকে ছুটি নেওয়া নিয়ে একটা কথাও বলিনি। জুনও এ প্রসঙ্গ তোলে নি একবারও। রবার্ট যা বলেছে তাতে আর আমাদের বলার কিছু নেই। আমি বুঝতে পেরেছি, আমাদের এ নিয়ে কথা যাতে না বলতে হয় সেজন্যেই জুনের অনুরোধে রবার্ট আমাকে সব বলেছে। আমরা জানি কোথায় আমরা পৌচেছি। এর পরে

কোথায় যাবো, কোথাও আর্দৌ যাবো কিনা ; এই আমাদের দুজনার অনুচ্চারিত বাঙ্ময় প্রশ্ন।

এ সময়ই, বাবা, আমি তোমাকে আমার ছ বছরের জীবনের বড় বড় সব কিছু সবিস্তারে কিছু না লুকিয়ে লিখেছিলাম। লিখেছিলাম কুইনসে আমার ব্যর্থতার কথা। লিখেছিলাম, সুজানের স'রে পড়ার কথা। হাওয়ার্ড শ্লেশের কথা। হেনরী ওয়ালেসের কথা। কলম্বিয়ায় ভর্তি হবার কথা। পরিশেষে জুনের কথা।

লিখেছিলাম, "আমি ফিরে আসছি, বাবা। ফিরে আসচি জীবনের চেনা জানা প্রশস্ত ঐতিহাসিক পথে। যে পথ দিয়ে সব দেশে সব কালে প্রায় সব মানুষ চলে, সেই পথে। সংখ্যালঘুদের বিপরীত পথ ত্যাগ ক'রে, নিয়মের পথে। এ পথ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, পরিণতি কি হবে আমার, জানি নে। তবু জানি, ফিরে আসছি। প্রডিগাল সনের প্রত্যাবর্তন নয়। একটি ব্যাতাহত পুনর্জীবিত সাধারণ মানুষের ফিরে আসা।"

লিখেছিলাম, "তবু, বাবা, আমি আর কোনও দিনই তোমার সেই একদিনের কেতু হ'তে পারব না। আমার মধ্যে মিশে গেছে বিস্তীর্ণ পৃথিবীর কতো বিচিত্র ভাবধারা, কত বহু চরিত্রের বহুভূমিকার মানুষ। তারা সবাই মিলে তৈরী করেছে আমাকে, আমি-আজ-যা, তাকে। ভাস্কর্য হিসেবে সুন্দর কিছু তৈরী হয় নি, অন্তত আরনল্ড্ দেখলে নিশ্চয় নাক সিট কে ঠোঁট উল্টে স'রে যাবে। তবু এ যুগের বর্ণসংকর ভাবসংকর আমি। তোমরা আমাকে নিয়ে গর্বিত হয়ত হবে না, খুশি হবে কিনা তাও জানি না, তোমাদের কাছে গৃহীত হবার বাইরে আমার কিছু প্রার্থনা নেই। আমি তোমাদের সঙ্গে একত্ব রেখেও বাঁচতে চাই আমার নিজের জীবন, আমার নিজের নির্বাচিত, পথে, নিজের জোরে—সে পথ যাই হোক না কেন। তার শেষ যেখানেই হোক না কেন। তোমাদের অভিধানে সার্থকতা, বাধ্যতা, আনুগত্য ইত্যাদি অনেক শব্দ আছে যা আমার অভিধানে নেই, থাকলেও তাদের অর্থ এক নয়। আমাদের যুগটা বিদ্রোহী। তোমাদের হাতে গড়া পৃথিবী ও মানুষ-সমাজ আমাদের গর্বিত করে না, লজ্জিত করে। তবু এ পৃথিবীতেই আমাদেরও জীবন কাটাতে হবে। তোমাদের একেবারে না-মেনে উপায় আমাদের নেই। কিন্তু, বাবা, আমরা এ পৃথিবীটাকে নতুন ক'রে গড়ব, আজ না হয় কাল, কাল না হয়, আরও পরে। আমরা মানে আমি নই, আমরা মানে পুত্ররা, নতুন যুগের নতুন ছেলেমেয়েরা। তোমাকে মানব না আমি, আমাকে মানবে না আমার পুত্র, তাকে মানবে না তার আত্মজ সন্তানরা। আগামী কাল মানবে না গতকালকে। ভবিষ্যৎ এগিয়ে যাবে অতীতের শৃঙ্খল ভেঙে।"

লিখেছিলাম, "জুন ইংরেজ হ'লেও, দেশাতীত। জুন শুধু মানুষ। জুন আমা

জীবন-সঙ্গিনী হবে কিনা জানি নে। জুনকে অর্জন করার যোগ্যতা আমার আছে কিনা, হবে কিনা তাও জানি নে, তোমাদের শুধু জানিয়ে রাখছি আমার ফিরে আসার পথ যে সবচেয়ে বেশি তৈরী করছে, তার নাম জুন সিমসন।"

দশদিনের পরের দিন শনিবার। জুন বলে রেখেছিল, শনিবার সে টরোণ্টোর বাইরে যাবে। রবার্টের সঙ্গে ফিরে আসবে রাত্রে কোনও এক সময়ে।

সারাটা দিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চেষ্টা ক'রেও আমি নিঃসঙ্গভাব বোঝা ব'য়ে গেলাম। রাত দশটার সময় বেল বাজল।

জুন ঘরে এল।

জুনকে দেখেই আমি ব'লে উঠলাম, "ভীষণ খিদে পেয়েছে।"

জুন বলল, "খাও নি?"

আমি বললাম, "তোমাকে দেখে মনে পড়ল সারাদিন খাই নি।"

"কেন?"

"খিদে পায় নি।"

জুন ফ্রীজ খুলে চটপট সাণ্ডুইচ বানিয়ে ফেলল।

খেয়ে আমার শরীর শান্ত হল। জুন বলল সারা দিনের কাহিনী। রবার্ট জুনকে নিয়ে গিয়েছিল শহর থেকে আঠার মাইল পশ্চিমে এক বন্ধুর বাড়ী। বিরাট ধনী সে বন্ধুর বাবা। রবার্ট কিছু কাজের কমিশন পেয়ে গেছে।

"তুমি গেলে কেন?" আমি জানতে চাইলাম।

"আমারও একটু কাজ ছিল," বলল জুন।

জুন প্রশ্নের উত্তর দিল না।

"আমাকে বলবে না!" আমার স্বরে বাঙালী অভিমান।

"একা একা কিছু চিন্তা করার দরকার ছিল। একটা বিষয়ে মনস্থির করার জন্য।"

"করেছ?"

"করেছি।"

"বলবে?"

"আজ রাত্রে আমি তোমার কাছে থাকবো।"

"জুন!"

"শুধু আজ রাত্রে নয়, যদি সম্ভব হয়, প্রত্যেক রাত্রে।"

"আরও বলছি, শোনো। তুমি যদি সঙ্গে নাও, আমি পৃথিবীর শেষপ্রান্তে যাব।"

জুন তখন আমার বাহুবন্ধনে।

"তুমি যাদের ভালবাসো, আমিও তাদের ভালবাসব।"

জুনের দুগাল বেয়ে জল ঝরছে।

"তুমি যে পথে যাবে, আমিও সে পথে যাবো। যেদেশে নিয়ে যাবে, তোমার সঙ্গে যাবো। আমি তোমার সন্তানের মা হব। তোমার যারা আপন তারা আমারও আপন হবে। আমি তোমাকে চাই, কেতু। আমি আরও বেশি চাই তুমি আমাকে চাও।"

জুনের রূপগুলি আমার স্যাঁতসেঁতে ঘরখানাকে গরম ক'রে দিয়েছে। সেই নিবিড় কম্পিত উত্তাপ আমাদেব রক্তে প্রবাহিত হচ্ছে।

কতক্ষণ নীরবতায় কাটল কে জানে? হয়তো এক মুহূর্ত। হয়তো এক যুগ। জুন আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমরা দুজনে দুজনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

আমি বললাম, "তোমাব অনুপস্থিতিতে আমিও একটা আবিষ্কার ক'রে ব'সে আছি।"

জুনেব সুনীল নয়নে থরথর জিজ্ঞাসা।

"যা খুঁজে পেয়েছ তাব একটা প্রাচীন নাম আছে। প্রেম।"

এবার আর কোনও ব্যবধান রইল না। বিশেষে আমরা এক হলাম।।

আমি দেখলাম প্রাণ ভ'রে দেখলাম, জুনের আইভরী দেহ। জুনের দেহ আর হৃদয়ের রং এক।

এক সপ্তাহ পবে তোমার চিঠি এল, বাবা।

এই এক সপ্তাহে সব কিছু বদলে গেছে। জুন আর আমি একসঙ্গে বাস করছি। ঠিক হয়েছে, দুজনে একসঙ্গে নিউ ইয়র্ক যাবো। জুন কাজ করবে। আমি পড়ব। পরে, আমি কাজ করব, জুন পড়বে। জুন বিবাহে বিশ্বাস ক'রে না। তার নিজস্ব অভিপ্রায় বিবাহ না করা। কিন্তু আমি যদি চাই, জুন বিবাহে নিজেকে সম্মত করিয়ে নেবে। বিবাহ নামক একটা উপহার আমাকে দিতে পারলে জুন খুশি হবে আমাব জন্মদিনের উপহার।

জুন বলেছে, "বিয়ে যদি হয়, হবে দিল্লীতে। তোমার বাবা-মা'র কাছে।"

আমি বলেছি, "দেখ, বাবা-বা কি লেখেন।'

জুন ভীত হ'য়ে বলেছে, "ওরাঁ রাজী হবেন না।"

আমি ভীত আশ্বাস দিয়েছি, "নিশ্চয় হবেন।"

তোমার চিঠি জুনই এনে আমাকে দিল। দেখলাম, জুনের মুখে একবিন্দু রক্ত নেই।

তুমি লিখেছ, "তুমি কোনও দিন গাঁয়ে [illegible] আমরা প্রতীক্ষা ক'রে বসে আছি। তুমি আসবেই। [illegible] না। কেবল আসে। ফিরে ফিরে আসে।"

তুমি লিখেছ, "পিতার চেয়ে পুত্র বড়, যেহেতু। পিতা পুরাতন, পুত্র নূতন। পিতা গতকালের, পুত্র আগামী কালের। যতদিন আমরা বেঁচে আছি, তোমাদের দেখব। যদি দেখতে পাই, তোমাদের জীবন মহত্তর, তোমাদের শ্রদ্ধা করবই। যদি দেখি তোমরা আমাদেরই মতো পচে গলে বাঁচছ, আর যাই পাও, শ্রদ্ধা পাবে না।"

তুমি লিখেছ, "জুনকে হারিও না। বড় পুরস্কার দুবার আসে না।"

তুমি লিখেছ, "দুজনে একসঙ্গে থেকো। এক সঙ্গে সব কিছু কোরো। শুধু বিদেশে বিয়ে ক'রে বোসো না। আমাদের অনুরোধ, তোমাদের বিয়ে দেব আমরাই।"

তুমি লিখেছে, "জুনকে আমাদের ভালবাসা ও আশীর্বাদ দিও। তোমার মা ওর একটা আদরের নাম রেখেছে। জোনাকি।"

জুনের মুখে আনন্দের পূর্ণ চাঁদ।

আমি আস্তে বললাম, "জোনাকি।"

জুন একটু একটু বাংলা বলতে শিখেছে। বলল, "জোনাকি মানে কি?"

॥ সমাপ্ত ॥